সেতুবন্ধ

উপন্যাস

মনোজ বসু

22 Cm.
249 P.
Rs. 30/=

বেঙ্গল পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

॥ এক ॥

তারণকৃষ্ণ সরকার লোয়ার-ডিভিসন ক্লার্ক। দুই মেয়ে, এক ছেলে। জীবনে তিন কর্তব্য—মেয়ে দুটি পাত্রস্থ করা এবং ছেলেটিকে মানুষ করে তোলা। ...রের সময় হয়ে এলো—একটিমাত্র কর্তব্য এতদিনে সমাধা হয়েছে। বড় মেয়ে ...র বিয়ে দিয়েছেন। পাত্রটির অবস্থা রীতিমতো ভাল, বড়বাজারে হোসিয়ারি ...টা-কাপড়ের মস্তবড় দোকান—অধিকন্তু একটা পাশও দিয়েছে। এহেন সুবন্ধ ...খরচপত্রের ব্যাপারে দৃক্‌পাত করেন নি। নগদ পণই গুণে নিল দুটি হাজার।

...রের মেয়ে পূর্ণিমা। দুই মেয়ে মাথায় মাথায়, বিয়ে দিলেই হয়—দেওয়া একান্ত ...থ উচিত। মেয়ে যত ধিঙ্গি হবে, ঝঞ্ঝাট বাড়বে ততই। কিন্তু মুখের কথায় তো ...য়ে হয় না। প্রায় কপর্দকশূন্য অবস্থায় তারণকৃষ্ণ আঁকুপাকু করছেন।

ইতিমধ্যে এক কাণ্ড, পূর্ণিমা ইস্কুল-ফাইন্যাল পাশ করে বসল। গলির মোড়ে ...ন মেয়ে-ইস্কুল বসিয়েছে, ঝি পাঠিয়ে পাড়ার যত মেয়ে খেঁটিয়ে নিয়ে তোলে। ...র্ণিমাকেও হেন অবস্থায় ঘরে বসিয়ে রাখা গেল না। মোটমাট তো দুটি বছর ...র ...াত করল—তার মধ্যেও এ-ছুটি সে-ছুটি। আচমকা একদিন শোনা গেল, পাশ ...ছে পূর্ণিমা।

...র মানে ঝামেলা বাড়ল। অণিমা ইস্কুলে পড়ে নি, বড় জামাই একটা পাশেই ...-মরি মানিয়ে গেছে। পাশ না হলেও কথা ছিল না। ছোট জামাইয়ের বেলা ...টি হবে না। কনে একটা পাশ তো জামাইয়ের কমপক্ষে দুটো পাশ তো চাই-ই। ...শি হয় তো আরও ভাল।

প্রতিবেশী পূর্ণ মুখুজ্জে হিতৈষী সুহৃৎ। রিটায়ার করবার পর ইদানীং প্রধান ...জ সন্ধ্যার পর তারণের সঙ্গে দাবাখেলা। দুটো বাজি অন্তত না খেললে পেটের ...ন্ন হজম হয় না। তিনি মতলব দেন: বর জুটছে না তো কলেজে ভর্তি করে দাও। ...য়ে রেখো না ভায়া। অলস মাথা শয়তানের কারখানা।

তারণকৃষ্ণ সদুঃখে বলেন, বর না জোটা মেয়ের দোষে নয়—মেয়ের বাপের দোষ। ...য়ে তো একনজরে পছন্দ করে ফেলে, শুধো মেয়ে নিতে হবে শুনে শেষটা পিছিয়ে ...য়। এমন অবস্থায় গুচ্ছের খরচ-খরচা করে মেয়ে আবার কলেজে দিতে বলছ।

দেখ ভায়া, অত বড় অফিসের অ্যাকাউণ্টাণ্ট ছিলাম আমি, হিসেব না বুঝে কথা ...লি নে। দু-একশ' টাকা খরচা করে যদি দু-দশহাজারের রেহাই পেয়ে যাও—এমন ...াভের লগ্নি কেন করবে না?

তারণকৃষ্ণ তাকিয়ে পড়লেন। কথা হেঁয়ালির মতন ঠেকে।

পূর্ণ বলেন, পাশ করে যে পাঁচটা হাত্তিশবের্‌বে তা নয়। দেখছি তো আর দশটা ...সংসারে। পাশ করে ইউনিভার্সিটির চূড়োয় উঠে গেছে, বিয়ের পরে বউ হয়ে এসে ...সই খুন্তি-হাতা আর ছেলেমেয়ে ধরা। তবু যে কালের যেটা ফ্যাসান। সেকালের বউ মাটিতে পিঁড়ি পেতে ঠাঁই করে থালা-বাটি-গ্লাস সাজিয়ে দিত, একালে টেবিলে চিনামাটির প্লেটে লাঞ্চ সাজিয়ে দেয়। বস্তু সেই একই—চিঙড়িচচ্চড়ি আর ভাত।

ভুঁড়ি নাচিয়ে মউজ করে খুব খানিকটা হেসে নিলেন পূর্ণ মুখুজ্জে। বলেন, লেখাপড়ায় মন আছে পুনির। দেখতে সুশ্রী, কলেজে পড়তে থাকুক—দেখ চট করে

বিয়ে হয়ে যাবে। ভাল ভাল ছেলের আজকাল কলেজি মেয়ের উপর টান। খবর নিতে গিয়ে ঘটকমশায়রাও তাই শুধান : মা-লক্ষ্মীর কোন্ ইয়ার চলছে—না সায়েন্স? বলুন না মশাই—

অণিমার বিয়ের যে ঘটক যোগাযোগ করেছিলেন, তিনি উপস্থিত আছেন। মাঝে এসে পাত্রের বাজারের হালচাল শুনিয়ে দিয়ে যান। পূর্ণ মুখুজ্জে তাঁকে ম মানেন : বলুন তাই কিনা?

ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে ঘটক বলেন, পাত্রী খোঁজার আমরা এক নতুন ফিকি করেছি আজকাল। মেয়ে-কলেজে ছুটি হবার মুখটায় তফাতে দাঁড়িয়ে নজর মেয়েরা বেরুচ্ছে—তার মধ্যে যেটির চেহারা নজরে ধরল, গুটিগুটি তার পিছু নি পশ্চিমে চলল তো পশ্চিমে যাচ্ছি, দক্ষিণে চলল তো দক্ষিণে। ট্রামে উঠল তে ট্রামে আমিও বাদুড়-ঝোলা হয়ে চললাম। পিছু পিছু গিয়ে বাড়িটা ভাল করে নি করলাম, বাড়ির নম্বর টুকে নিয়ে এলাম। সেদিন এই অবধি। আবার একদিন বাড়ির দরজায় বেল টিপে বৈঠকখানায় উঠে বসি : শুনতে পেলাম মশায়ের সর্বসুল এক কন্যা আছে, পাত্রস্থ করবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র হয়েছেন? মেয়ের বাবা বর্তে —এখন বিয়ে দেবো না, এমন কথা কখনো কারো মুখে শুনলাম না। আমার হ সাড়ে তিনশ পাত্র—ইঞ্জিনীয়ার ডাক্তার গেজেটেড-অফিসার ইস্তক সেই অফিসারে কেরানি-পিওন। তা কেমনটা চাই বলুন, খরচপত্র কি পরিমাণ হবে? কলেজি পাত্রী বেলা কত সস্তায় যে এক একটা কিস্তিমাত করেছি, ভাবতে পারবেন না। আপনার ব মেয়ের গায়ে খানিকটা যদি মা-সরস্বতীর গন্ধ থাকত, পণের খাঁই অর্ধেকে নামি আনতাম।

পূর্ণ মুখুজ্জে জুড়ে দেন : অলিতে-গলিতে এত যে মেয়ে-কলেজ, চাহিদা আ বলেই না জন্মাচ্ছে। উপকার না পেলে কেন লোকে ঘরের মেয়ে খামোকা কলে পাঠাতে যাবে। বলি হিসাবের বাইরে তো কিছু নেই। কাগজ-কলম নিয়ে হিস এসো ভায়া—

এত কথাবার্তার পরে তারণকৃষ্ণ দোমনা হয়েছেন, তেমন আর রা কাড়েন ভূতপূর্ব অ্যাকাউন্টান্ট মুখুজ্জেমশায় কাগজ-কলমের অভাবে মুখে মুখেই হি ধরছেন : কলেজে ভর্তি বাবদ কত লাগতে পারে, কম-বেশি যাহোক বলো একটা অং ট্রামে-বাসে কত, দু-বছরের মাইনে খাতে কত পড়বে, বই কিনতে হবে কত টাকার—

বাধা দিয়ে ঘটকমশায় বলেন, বই একটা-দুটো কিনলেই হয়ে যাবে। তাই বা কে ভদ্রলোকের বাড়ি বই কি আর নেই? মোটা মোটা দেখে খান কয়েক বাছাই ক দেবেন। হাতে করে কলেজে ঢোকা আর বেরিয়ে আসা—কোন বই কে খুলে দেখ যাচ্ছে! আর মাইনেই বা পুরোপুরি দু-বছরের লাগছে কিসে? বিয়ে দু-চার মাে মধ্যে নির্ঘাৎ গেঁথে যাবে—তারপরে মাইনে লাগবে না, বই বওয়াবয়িরও আর ঝ নেই।

আরও ভালো—। নড়েচড়ে বিজয়ীর ভঙ্গিতে পূর্ণ মুখুজ্জে বলেন, খুব বেশি তে শ' দেড়েক টাকা খরচা। অণিমার বিয়ের দু হাজার টাকা পণ আদায় করল, কলেজে পড়া পুনির ক্ষেত্রে অন্তত তার আধাআধি মকুব। দেড়-শ' লগ্নি করে তাহলে কমসে-কম হাজার টাকা পিটছ। আর মেয়ে যদি তুখড় হয়—

একটু থেমে হাসিমুখে চোখ-পিটপিট করেন : পুনি এমনি তো বেশ চটপটে সংসারের গতিক বুঝে বড়লোকের একটা সৎ ছেলের সঙ্গে যদি প্রেম-ট্রেম করে, একেবারে

্তে কার্যসিদ্ধি। রেজেস্ট্রি বিয়ে সেরে জোড়ে এসে প্রণাম করবে : জামাইয়ের সঙ্গে চয় করো বাবা। পুরুত-পরামাণিকের হাঙ্গামা নেই, বরযাত্রী খাওয়াতে হল না— লা জামাই বাবাজিকে খান দুই কাটলেট খাইয়ে ছুটি।

নানা জনের পরামর্শে তারণকৃষ্ণ হিসাব করে পূর্ণিমার হাতে ভর্তির টাকা দিয়ে বলেন। আহ্লাদে গলে গিয়ে পূর্ণিমা বলে, এই যা দিলে বাবা, আর এক পয়সাও বো না তোমার কাছ থেকে। সংসারের এত খরচা—তার উপরে আমার খরচা দিতে ই হবে তোমার।

মেয়ের দিকে তাকিয়ে পড়ে অবিশ্বাসের সুরে তারণকৃষ্ণ বলেন, তাই নাকি?

টুইশানি ঠিক করে ফেলেছি। সন্ধ্যাবেলা ঝুনুকে দু'ঘণ্টা করে পড়ানো, ওর া পনের টাকা করে দেবেন বলেছেন। বই আর মাইনে তাতেই কুলিয়ে যাবে একরকম।

খবরদার!

তারণ মেজাজ হারিয়ে হুংকার দিয়ে উঠলেন : তালুকদার ছিলাম আমরা। তালুক নেই, অঞ্চল জুড়ে তবু খাতিরটা আছে। মেয়ে-বউরা সেকালে ঘর ছেড়ে বাইরেই আসত না—আকাশের সূর্যঠাকুর দেখে ফেলেন পাছে। তালুকদার বাড়ির বেটা-ছেলেরাই বা কোন্ পুরুষে রোজগার করে খেয়েছে! ভূসম্পত্তি হারিয়ে শহরে এসে পড়ে আমার বাবার আমল থেকে এই দুর্দশা। চাকরি করে খাচ্ছি। সেই বাড়ির মেয়ে হয়ে, ইস্কুল-কলেজে না হয় পড়লি—তাই বলে বিদ্যে ভাঙিয়ে রোজগার?

ধমক খেয়ে পূর্ণিমা থেমে গেল, টুইশানি নিতে সাহস করল না। পূর্ণিমার প্রস্তাব শুনেই বোধকরি তারণের জেদ চাপল। ঘোড়া হলে চাবুক চাই। মেয়ে কলেজে দিলেন তো যথোচিত সাজপোশাক বিহনে উদ্দেশ্য মাটি হবে। মাস অন্তে মাইনে হাতে পেয়ে মেয়ের জন্য দুই প্রস্থ ভাল শাড়ি-জামা কিনলেন। পছন্দসই হাইহিল-জুতোও দিলেন একজোড়া। অতিরিক্ত কয়েকটা টাকা তার হাতে গুঁজে দিলেন : তোদের বয়সে গায়ে মুখে কত কি মাখে, সেইসব কিনে নিস।

তারণকৃষ্ণ অফিসে যান, ছেলে ও মেয়ে প্রায়ই একই সঙ্গে বেরোয়। তাপসের সামান্য পথ, গলির মোড়ে ইস্কুল, কয়েক পা গিয়েই সে ইস্কুলে ঢুকে পড়ে। বাপে মেয়েয় তারপরেও এগিয়ে চলে। ট্রাম-রাস্তায় পড়ে তারণ ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে পড়েন। আরও বেশ খানিকটা গিয়ে পূর্ণিমার কলেজ। খুটখুট খুটখুট জুতোর আওয়াজ তুলে বাঁ হাতের বই বুকের উপর ধরে দ্রুতবেগে আড়াল হয়ে যায়, মুগ্ধ চোখে তারণকৃষ্ণ মেয়ের দিকে চেয়ে থাকেন : না, সেজেগুজে দিব্যি দেখায় পুনিকে। দশজনার চোখে পড়ছে, এ মেয়ের এইবারে কদর না হয়ে যায় না। যে কালের যা—বুদ্ধিটা বাতলেছে পূর্ণ-দা মন্দ নয়।

সন্ধ্যার পর পূর্ণ মুখুজ্জের সঙ্গে দাবায় বসেন। তার মধ্যেও এই প্রসঙ্গ ওঠে। তারণকৃষ্ণ বলেন, বিদ্যেয় কেবল যে জ্ঞান-বুদ্ধি বাড়ে তা নয় দেহের জেল্লুষও বাড়ে। কলেজের পথে পুনিকে একেবারে আলাদা মেয়ে বলে মনে হয়। খরচার কসুর করছি নে—কোন অঙ্গে খুঁত থাকতে দিই নি। এখন কপাল আমাদের।

পূর্ণ মুখুজ্জে দ্রুত একটু হিসাব করে নেন : হল কদ্দিন? কী আশ্চর্য, এরই মধ্যে ছ-মাস! পুজোর ছুটি বড়দিনের ছুটি—ছুটিছাটাই তো একনাগাড় চলল। এখন থেকে একটানা কলেজ—আর দেরি হবে না, লেগে যাবে এইবারে। নির্ঘাঃ লাগবে।

আশায় আশায় আছেন তারণকৃষ্ণ। ভোরবেলা বেড়াবার নাম করে বেরিয়ে যান, অমনি বাজারটা সেরে আসেন। তারপর যতক্ষণ না স্নানের সময় হচ্ছে, ফর্শা গেঞ্জি-জামা গায়ে চাপিয়ে খবরের কাগজ হাতে নিয়ে বাইরের ঘরে চুপচাপ কান খাড়া করে থাকেন। খুট করে কোনদিকে একটা শব্দ হল কিংবা দরজার কড়া নড়ল সঙ্গে সঙ্গে অমনি সচকিত হয়ে ওঠেন ঃ ঘটক ঢুকে পড়ে এইবারে হয়তো বলবে, মশায়ের সর্বসুলক্ষণা এক কন্যা আছে শুনতে পেলাম—

কাকস্য পরিবেদনা ! দরজা খুলে হয়তো দেখা যাবে ধোবা এসেছে কাচা-কাপড়ের বোঁচকা ঘাড়ে নিয়ে। অথবা কয়লাওয়ালা পাওনা আদায়ের জন্য হামলা দিয়ে পড়ল।

গোড়ায় সকলে ভরসা দিলেন, দু-মাস চার মাসের বেশি কলেজ-খরচা লাগবে না, কিন্তু পুরোপুরি দুই সেসান কাবার করে পূর্ণিমা ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিল, পাশও হয়ে গেল। কোন বরের টিকি দেখা গেল না এতদিনের মধ্যে।—কানাখোঁড়া খুঁতো বরও নয়।

এখন তারণকৃষ্ণ হামেশাই খোঁটা দেন পূর্ণ মুখুজ্জেকে ঃ তোমার হিসাবে ভুল হয় না বলে জানতাম পূর্ণ-দা। মিছে একগাদা খরচা করিয়ে দিলে, এই টাকায় মেয়ের খান চারেক গয়না গাড়িয়ে রাখলেও কাজ খানিকটা এগিয়ে থাকত।

পূর্ণ এক আজব সংবাদ দিলেন—পাত্র সম্প্রদায়ের ইতিমধ্যে নাকি মতিগতি বদলেছে। বলেন, আমার ছোট শালা ইঞ্জিনীয়ার হয়ে পাঁচ-শ' টাকার চাকরি করছে, বিয়ের নামে তিড়িং করে ছিটকে পড়ে। রহস্যটা কি ?

প্রশ্নের জবাবে শালা সত্যি সত্যি এইরকম বলেছিল—অথবা হতে পারে, মান বাঁচানোর জন্য মুখুজ্জেমশায়ের নিজের বানানো জবাব।

পাঁচ-শ টাকায় লোকে ঐরাবত-হাতী পুষতে পারে, আর তুমি সামান্য একটা বউ নিতে ভয় পেয়ে যাচ্ছ—মতলব কি ইঞ্জিনীয়ার সাহেব ?

ছোট শালা বলল, ভাল পাত্রী পাচ্ছি কোথায় যে বউ করব ? বই মুখস্থ করে করে হাড়গিলে চেহারা, তদুপরি সেই হাড়গিলের বায়নাক্কার ঠেলায় অস্থির ! ইচ্ছা-সুখে ঝগড়ার বাণ্ডিল কে কাঁধে তুলে নেবে ?

বলে, গাছ-মুখ্যু পাত্রী চাই, 'ক' অক্ষর যে জানবে না। নাম সই করতে বললে টিপসই দেবে ! দিন জুটিয়ে এমনি, এক্ষুনি বিয়ে করব। তা তেমন মেয়ে কোথায় আজকাল—কথা ফুটতে না ফুটতেই তো অক্ষর-পরিচয় হয়ে যায় ! ঠেকায় পড়ে আধুনিক পাত্রেরা নাকি মত পালটেছে।

আঁতের ঘা নয়, তাই রসিয়ে রসিয়ে পূর্ণ মুখুজ্জে গল্প করে গেলেন। আর সেই গল্প পূর্ণিমার কানেও না যাবার কথা নয়। মেয়ে কিন্তু বিন্দুমাত্র দমে নি। বাপের কাছে সাহস করল না—মায়ের কাছে গিয়ে বায়না ধরে ঃ পড়ব আমি, অন্তত গ্রাজুয়েট তো হতেই হ'ব।

তরঙ্গিণী ভয়ে ভয়ে স্বামীর কাছে কথাটা তুললেন ঃ বড় জেদ ধরেছে মেয়ে। এই সমস্ত বলছে।

তারণকৃষ্ণ মারমুখি ঃ বোকামির বিস্তর দণ্ড দিয়েছি বারোজনের কথায় পড়ে। আর নয়। আর নয়। তুমিই বা কোন্ আক্কেলে ছেঁদো কথা মুখে নিয়ে এসেছ। ডিসেম্বরে রিটায়ার করাচ্ছে, মরে গেলেও আর এক্সটেনসেন দেবে না। পেন্সনের ক'টা টাকার উপর সংসার চলবে। তার পর তাপস ক্লাস নাইনে উঠবে এবার—সে বড় চাট্টিখানি কথা নয়। মাইনে টাইনে পরের কথা—ক্লাসের বই কিনতে কিনতেই ফতুর ! ছেলের ওজন যা,

বইয়ের তাই। তা বলো তুমি—তাপসের পড়ায় ইস্তফা দিয়ে পুনিকেই বিদ্যাধরী বানাই।

তরঙ্গিণী তবু বলেন—জেদি মেয়ে অভিমানী মেয়ে পূর্ণিমাকে তিনি ডরান। স্বামীর ধমক খাওয়ার পরেও তরঙ্গিণী মিনমিন করে বলেন, তার খরচা সে নিজে চালাবে, বলে দিয়েছে। একটি পয়সাও তোমার লাগবে না। কিন্তু তোমার যে ধনুক ভাঙা পণ। পাড়ার মধ্যে একটা মেয়ে পড়ানো ঠিক করেছিল, তা-ও তুমি নিতে দাও নি। এ বাজারে অত কড়াকড়ি চলে না।

তারণ বলেন, আমাদের বংশের কোন্ মেয়ে কবে বাড়ির বার হয়েছে? তবু তো অনেক হতে দিয়েছি—ফরফরিয়ে হেঁটে ইস্কুলকলেজ করে বেড়াল এতদিন।

তরঙ্গিণী বলেন, তোমার বংশের কোন্ পুরুষই বা বাড়ির বার হত সেকালে? তারাই এখন মার্চেন্ট অফিসে কলম পিষে জনম কাটিয়ে দেয়। দিনকাল বদলেছে। পুরুষের বেলা যা হচ্ছে, মেয়ের বেলাও এবারে তাই হতে দিতে হবে।

স্বামীকে এই বললেন, ওদিকে আবার মেয়েকে নিরস্ত করবার জন্যেও প্রাণপাত করেছেন। পূর্ণিমাকে কাছে বসিয়ে তারণের কথাগুলোই অনেক ঘুরিয়ে মোলায়েম করে বলেছেন, দু-দুটো পাশ তো হয়ে গেল। ডিসেম্বরে উনি রিটায়ার করছেন, সামনের বছর থেকে তাপসের খরচাও বিষম বেড়ে যাচ্ছে। তাই বললেন পরের ঘরে যাতে তাড়াতাড়ি দিতে পারি সেই চেষ্টা এখন। কপালে যদি থাকে তেমন ঘরে যদি পড়িস কলেজে পড়িয়ে তাদের বউ তারাই গ্রাজুয়েট করে নেবে।

পূর্ণিমার মনেও মাঝে মাঝে রঙের ছোঁয়া লাগে। বাপ-মা বিয়ের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন, বিয়ে না দিয়ে সোয়াস্তি নেই তাঁদের। নতুন ঘরবাড়ি, অচেনা সব লোকজন। একটি মানুষ সর্বক্ষণ ঘুরঘুর করছে আশেপাশে। দেহের আর মনের এক কণিকা নিজের বলতে নেই—সমস্ত সেই মানুষটির দখলে। রাত্রিবেলা তারই বাহুর ঘেরে নিঃশঙ্ক নিদ্রা। এক বিচিত্র সর্বসমর্পণ—এমনি সমর্পণ করে এ বয়সে সব মেয়ে ধন্য হতে চায়। নিতান্ত যার ভাগ্যে হল না, তার মতন দুঃখী বুঝি দুনিয়ায় নেই। তারাই পড়িয়ে গ্রাজুয়েট করে নেবে, মা সেই কথা বলছেন। নাকি সেই প্রত্যাশা। পড়ানোর ভারও নিশ্চয় নবীন সাথীটির উপর। সেই পড়ানোর গল্প সবিস্তারে বলেছিল এক বান্ধবী—বিশাখা। বলবে কি—হেসে হেসেই খুন। আজব পড়ানো অত সব মুখে বলা যায় বুঝি, লজ্জা করে না? কথায় কথায় পুরস্কার—একটা কিছু ভাল হয়েছে, আর রক্ষে নেই, নাছোড়বান্দা মাস্টার পুরস্কার না দিয়ে ছাড়বে না। এক পুরস্কারেই শেষ নয়—চলল একনাগাড়ে। সাগরতরঙ্গের মতো। ইস্কুল কলেজেও কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার দেয়। বছর ঘুরে গিয়ে বৃহৎ আয়োজনে জবর মীটিং হবে, প্রবীণ এক জ্ঞানী ব্যক্তি সভাপতি হয়ে বসবেন। এবং এক কালের গুণবতী কোন খুনখুনে বুদ্ধার হাত থেকে পুরস্কার নিতে হবে। উত্তাপ জুড়িয়ে পুরস্কার পানসা হয়ে যায় ততদিনে—মজা থাকে না।

হাতে হাতে নগদ পুরস্কারের উপাখ্যান বিশাখা বলে যায়, শুনতে শুনতে কাঁটা দিয়ে ওঠে সর্বাঙ্গ। ব্যবস্থা উত্তম বটে—তবে সামান্য একটু মুশকিল, শিক্ষকের শিক্ষা-নৈপুণ্যে য়্যুনিভার্সিটির ডিগ্রি পাওয়া দিনকে-দিন মরীচিকাবৎ হয়ে ওঠে। সে যাকগে, শিক্ষক মনোরম হলে চলুক না শিক্ষা শ'খানেক বছর ধরে। তাতে আর কোন্ আপত্তি?

॥ দুই ॥

বিয়ে যে বিশ্বজগতের মধ্যে শুধু বিশাখারই হয়েছে তা নয়। এই বাড়িরই আছে একটি—অণিমা। জায়া থেকে প্রোমোশন পেয়ে ইদানীং দস্তুরমতো জননী। দু' বছরের বাচ্চা ছেলে কোলে। অণিমার মুখে উল্টো কথা। বাপের বাড়ি এসে মায়ের উপর তেড়ে পড়েঃ বিয়ে দিচ্ছ নাকি পুনির?

তরঙ্গিনী বলেন, দেবো বললেই তো হয় না। খরচপত্রের ব্যাপার। এ বাজারে সংসার চালিয়ে তার পরে দশটা টাকাও তো এক সঙ্গে করা যায় না। রিটায়ার করবার সময় প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা পাবেন, বিয়েথাওয়া যদি হবার হয়, তখন।

অণিমা বলে, তখনও নয়। বিয়ের যা খরচ সেই টাকায় পড়াও তোমার পুনিকে। মেয়ে হলেই সাত-তাড়াতাড়ি পরঘরি করে দেবে—কেন মা, পেটে জায়গা দিয়েছিলে তো ঘরে কেন জায়গা দেবে না? লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে ইচ্ছে হয় তো, তারপর বিয়ে করবে। পোড়া বিয়ে না হলেই বা কি?

এইমাত্র নয়। পূর্ণিমা বাইরে কোথায় গিয়েছিল, তার জন্যে ওত পেতে আছে। বাড়িতে পা দিতেই হাত নেড়ে কাছে ডাকলঃ শোন্, ওদের কথা কানে নিবি নে। খবরদার, খবরদার। মেয়ে যেন সংসারের আপদবালাই—বিদেয় করে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চায়। লেখাপড়া শিখে চাকরি-টাকরি জুটিয়ে আগে আখের গড়ে নে, বিয়ের কথা তারপর। বিয়ে তোকে কেউ করবে না, তুই করবি পছন্দসই পুরুষ দেখে নিয়ে। তোর কেউ মালিক নয়—নিজের মালিক তুই নিজে।

ওরে বাবা, কানের কাছে মোহমুদ্গরের শ্লোক আওড়াস। এই তিনটে বছরে একেবারে যে ত্রিকালদর্শী হয়ে গেছিস দিদি।

পূর্ণিমা খিলখিল করে হেসে উঠলঃ আমায় এত সব বলছিস, আর নিজের বেলা সেজেগুজে দিব্যি তো হাসতে-হাসতে সেদিন কনে-পিঁড়িতে বসেছিলি। ভুলি নি দিদি, সে ছবি মুখস্থ করে রেখেছি। আমাকেও তো করতে হবে তাই।

অণিমা বলে, বিয়ে না বিয়ে—তলিয়ে বুঝতাম কি তখন? আমার তো কোন বড় বোন ছিল না, যে আমায় সামাল করে দেবে। মায়ে-বাবায় তোর জামাইবাবু সম্বন্ধে কথা হত, লুকিয়ে-লুকিয়ে শুনতাম। মনে হত, পক্ষীরাজে চড়ে না জানি কোন্ রাজপুত্তুর আসছে—

পূর্ণিমা কথা আর বেশি এগুতে দেয় না, প্রবীণার মতো ঘাড় নেড়ে বলে, জামাই-বাবুর সঙ্গে ঝগড়া করে বুঝি এসেছিস? মুখে চ্যাটাংচ্যাটাং বুলি—বুঝি লো বুঝি, কপালে চাঁদের সাইজের ফোঁটা, পা দুটো আলতায় রাঙানো, ছেলে কোলে এখন নিশ্বাস ছাড়ছিস কতক্ষণে সে মানুষ মান ভাঙাতে আসে।

কিন্তু ভোলানো যায় না, তামাশায় মনের আগুন নেভে না। অণিমা বলে, সিঁদুর ফোঁটায় কপাল জ্বালা করে আমার, লোকলজ্জায় মুছতে পারি নে। পেটের ছেলেটাই বা কোলে না নিয়ে কি করি—

বলতে-বলতে যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। বলে, তা-ও ইচ্ছে করে ছেলের জন্মদাতা বাপের কথা যখন মনে পড়ে—ইচ্ছে হয় কোলের ছেলে ছুঁড়ে ফেলে দিই, সিঁদুর মুছে বিধবার বেশ ধরি।

পূর্ণিমা হঠাৎ ছোঁ মেরে দিদির কোল থেকে ছেলে তুলে নিল। নিয়ে ছুট।

অণিমা দুধ খাওয়ানোর আয়োজনে বসেছিল, তরঙ্গিণী দুধ নিয়ে আসছিলেন। দুধের বাটিও পূর্ণিমা মায়ের হাত থেকে নিয়ে নিল।

ব্যস, নিশ্চিন্ত। মাসি-বোনপোয় আদর-সোহাগ-হাসাহাসি এখানে। কাউকে তাকিয়ে দেখতে হবে না। বাচ্চা থাকবে ভাল, পূর্ণিমাও।

অণিমা পানটা কিছু বেশি খায়। কোল খালি তো মায়ের ঘরে গিয়ে পানের বাটা নিয়ে বসল। পান সেজে তরঙ্গিণীকে দেয়, নিজে মুখে ফেলে। আর সেই সঙ্গে দুঃখের কাঁদুনি : এত খরচ-খরচা করে জামাই নিয়ে এলে, শোন মা তোমাদের জামাইয়ের কথা—

কলের পুতুলের মতো মুখ বুঁজে অহর্নিশ খেটে যাচ্ছি, তারই মধ্যে পান থেকে চুনটুকু খসলে আর রক্ষে নেই। পুরুষসিংহ তুলসীদাস, চোখা চোখা বচন, রেখে ঢেকে বলবার মানুষ নয়। বলে, বিয়ের ঝামেলায় কি জন্যে গেলাম—আরামে থাকব বলেই না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার—রোজগার করে খাওয়াচ্ছি-পরাচ্ছি, কত সুখে রেখেছি। তোমাদের হল ছাতের তলে পাখার নিচে শুয়ে-বসে গতর বাগানো, আর অবরেসবরে পতির একটু খেদমত করা—

রোজগার আছে বটে, তবে সেটা মাথার ঘাম পায়ে ফেলার ব্যাপার নয় এবং তার জন্যে তুলসীদাসকেও কিছু করতে হয় না। বড় বাজারে প্রকাণ্ড দোকান, পিতামহ তৈরি করে গেছেন—খুব নাম ছিল এক সময়, টাকা রোজগারের কামধেনু বিশেষ ছিল। এখন পড়ে যাচ্ছে। কর্মচারীরা বেধড়ক চোর, দু হাতে ফাঁক করছে। তুলসীদাসেরও হয়েছে দিনগত পাপক্ষয়। খরচ-খরচা চলে গেলেই হল—চোর ধরা কিংবা ব্যবসা বাড়ানোর মাথাব্যথা নেই।

আর কি সুখে রেখেছে, তা-ও বলি শোন। সন্ধ্যার পর দোকান বন্ধ করে কোন আড্ডাখানায় চলে যাবে, সেখানে গিয়ে নাকি তাস পাশা খেলে। মিছে কথা, মিছে কথা মা। খেলা হয় বটে সেখানে, কিন্তু তাসপাশার চেয়ে ঢের-ঢের মজাদার। শেষ রাতের দিকে বাড়ি ফিরে খুট-খুট দরজা নাড়বে। জেগে বসে থাকি, পলকের মধ্যে উঠে দরজা খুলে মানুষটাকে ধরে নিয়ে শুইয়ে দিই—

মায়ের কাছে অণিমা বিড়বিড় করে বলে, আর চোখের জল মোছে। পূর্ণিমা কখন এসে পড়েছে, সে বলে ওঠে, না দিস যদি দিদি ?

রক্ষে আছে তবে ? একদিন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, দুয়োর খুলতে বোধহয় মিনিট দুই-তিন দেরি হয়েছে। ও অবস্থায় লজ্জা-ঘেন্না থাকে না তো—

ছেলে আচমকা মাসির কোল থেকে ঝাঁপিয়ে মায়ের কোলে পড়ল। কথা সব ভণ্ডুল হয়ে যায়। দেখাচ্ছে কী সুন্দর—পাউডার ঘষে ময়লা ছেলে আহা-মরি করে দিয়েছে। চোখে কাজল, কপালে টিপ। নখ বড় হয়েছিল—পরিপাটি করে কেটে আলতা দিয়েই বোধহয় এমন রাঙা করেছে। দুধ খাওয়ানো সেরে এতক্ষণ এই সমস্ত করছিল পূর্ণিমা। বাচ্চা কাছে পেলেই মেতে ওঠে—সে বাচ্চা আপন হোক, আর একেবারে পরের হোক।

অনিমার অশ্রু-ভেজা চোখে হাসি চিক-চিক করে! ছেলে আদর করছে : মাসিমণি তোমায় একেবারে মেয়েছেলে করে দিয়েছে রঞ্জু—কী লজ্জা, কী লজ্জা!

হাতে মুখ ঢেকে রঞ্জু অমনি লজ্জার অভিনয় করে। এ-ও মাসিমণির শেখানো। বুঝি কোন কাজের কথা মনে পড়ে তরঙ্গিণী উঠে চলে গেছেন। অণিমা শুধায় : ছেলের বড্ড সাধ তোর ?

জানিস তো সবই। জেনেশুনে তবু গাড়িভাড়া করে বাগড়া দিতে আসিস। কত রকম ভয় দেখাস।

অণিমা বলে, মিথ্যে একটুও নয়। রাতদুপুরে নিত্যিদিন কী লাঞ্ছনা। দুয়োরে লাথি, গালিগালাজ। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে আমি গুম হয়ে থাকি। তবু রেহাই নেই। বলে, গাই-বাছুর সবসুদ্ধ বাপের বাড়ি তুলে দিয়ে আসব, সেইখানে থাক গিয়ে!

বলতে বলতে অণিমা গর্জন করে উঠল: বাবা-মা শত্রুতা করেছে আমার সঙ্গে। আবার তোর উপরে পড়ছে। আমার ছোট বোন তুই, তোকে এই জ্বালায় জ্বলতে না হয়—

কণ্ঠ ভারী, বর্ষণ শুরু হয় বুঝি আবার। পূর্ণিমা তাড়াতাড়ি বলে, কথা দিচ্ছি দিদি, একটা ছেলে-টেলে কোলে পাই তো বিয়ের নাম মুখাগ্রে আনব না। খাস কন্দর্প মালা নিয়ে এলেও মালা ছিঁড়ে মাথা ঘুরিয়ে নেব। রাগের মাথায় কবে তুই ছেলে রাস্তায় ছুঁড়ে দিবি—আমি বলি কি, রঞ্জুকে দিয়ে দে আমায়। দিয়ে হাত-পা ঝাড়া হয়ে নিশ্চিন্তে বরের সঙ্গে কোন্দল করগে যা। এসো রঞ্জু, আমার কাছে থাকবে তুমি, কুঁদুলে মায়ের কাছে যাবে না।

হাত বাড়ানোর মাত্র অপেক্ষা—রঞ্জু এসে আঁকড়ে ধরে। আদরে-আদরে অস্থির করে দেয় পূর্ণিমা। ছেলেটাও তাই চায়, খিলখিল—খিলখিল হেসে-হেসে খুন।

অণিমা ওদিকে বিড়বিড় করে বলছে, কোন্দল আমি করি নে, চুপ করে থাকি। বলতে গেলে আরও তো বাড়াবে, পাড়ার লোক হাসবে। কাটা-কান তাই চুল ঢেকে বেড়াই—

পূর্ণিমা বলে, একটা কথা বলি দিদি। জামাইবাবু যত যা-ই করুক, রঞ্জুর হাতখানা ধরে বুকের উপর বুলিয়ে দিস, দেখবি সব দুঃখ জুড়িয়ে গেছে। দিন-রাত্তির ভেবে-ভেবে নিজে তুই জ্বলেপুড়ে মরছিস, আমাদেরও মন খারাপ করে দিস।

এমনি সময় অফিস-ফেরতা তারণকৃষ্ণকে দেখা যায়। চোখ পাকিয়ে পূর্ণিমা শাসন করে: বাবার কাছে, খবরদার, প্যান প্যান করবি নে। দিনভোর খেটেখুটে এলেন, রাতের ঘুমটুকু ওঁর নষ্ট করে যাস নে।

তা সামলে নিল বটে অণিমা। বলে, তোমার জন্যে আছি এতক্ষণ বাবা। একটু-খানি চোখে না দেখে কেমন করে যাই। রাত হয়ে গেছে, আসি এবারে—

তারণ নাতির গলা টিপে একটু আদর করে দুটো-একটা কথা বলে হাত-মুখ ধুতে কলঘরে ঢুকে গেলেন।

অণিমা ডাকে: আয় পুনি, বাসে তুলে দিবি। এখন বাসে ভিড় হবে না।

দুই বোনে পথে বেরুল। পূর্ণিমার কোলে রঞ্জু। এখন বড় গম্ভীর পূর্ণিমা। যেতে যেতে বলে, মায়ের কাছে কান্নার বন্তা খুলে বসেছিলি—ইচ্ছে হচ্ছিল, ছুটে গিয়ে মুখ চেপে ধরি তোর। থাবড়া মারি মুখের উপর। তাই হয়তো কোনদিন করে বসব, দিদি বলে মানব না।

অণিমা বলে, কত বড় দুঃখের কান্না, সে তুই কি করে বুঝবি। বুঝতে না হয় যেন জীবনে। ভগবানকে ডাকি: বিধবা করে দাও ঠাকুর। নয়তো নিজেই কোনদিন আত্মঘাতী হব।

তিক্তস্বরে পূর্ণিমা বলে, বিধবা হতে ভগবান লাগবে কেন, নিজের হাতেই আছে। আছে তোর সে সাহস?

শিউরে উঠে অণিমা বলে, কী বলছিস তুই?

না, খুনখারাবির কথা নয়। বর খুন করে বিধবা হওয়া—অত হ্যাঙ্গামার দরকার পড়ে না আজকাল। আইন হয়ে গেছে—প্যান-প্যান না করে সাহস থাকে তো ডিভোর্স-

কোর্টে চলে যা। উকিল-মোক্তাররা মুকিয়ে আছে—ফী পেলে সত্যি-মিথ্যের গেঁথে কেস তুলে দেবে! তোকে কিছু করতে হবে না, গোটা কয়েক সই মেরে খালাস। বলিস তো আমিও না হয় সঙ্গে থেকে তদ্বিরের জোগাড় দেবো।

বাস-স্টপে এসে দাঁড়িয়েছে। রঞ্জুকে মায়ের কোলে দিয়ে পূর্ণিমা আবার বলে, চরম হলে একেবারে সেই কোর্টে গিয়ে মুখ খুলবি—সেই পর্যন্ত ঠোঁটে কুলুপ এঁটে থাক। প্যান-প্যান করে প্রতিকার নেই—লোকে মজা দেখে। নিজেই তো বললি কাটো-কান চুলে ঢেকে রাখবার কথা। পারিস তো উল্টোটাই বরঞ্চ অভিনয় করে দেখা। পতিদেবতাকে যেন পলকে হারাস—এক জোড়া চখাচখি, প্রেমে গলে গলে পড়ছিস। মুখে লোকে আনন্দের হাসি হাসবে, মনে মনে ঈর্ষায় জ্বলবে: হায়রে হায়, মেয়েটার এত সুখের কপাল! দুটো মিথ্যে কথার গুণে পরের বুকে আগুন জ্বালানো—এর চেয়ে মজাদার জিনিষ কী আছে!

অণিমার দুঃখ পূর্ণিমা কানে নিল না—তাকে অভিনয় করে যেতে বলে। মনটা কিন্তু সেই থেকে ভারী। কে জানে, বিশাখারও হয়তো অভিনয়—মনের রঙিন স্বপ্ন-গুলোই মিছামিছি সে গল্প বানিয়ে বলে। গল্প বলে লোভ ধরিয়ে ফাঁদে ফেলতে চায় তাকে। লেজ-কাটা শিয়াল যেমন চায় শিয়ালমাত্রই লেজহীন হোক। নিজেকে অবারিত করে কোন এক পুরুষের হাতে সঁপে দেওয়া—কে জানে কেমন সে বস্তু। বিয়ের চিন্তায় কৌতুক আছে, আশংকাও আছে রীতিমত।

॥ তিন ॥

আর এক জোড়া আছে—শহর কলকাতায় নয়, দূরে মফঃস্বলে। শিশির ও পূরবী। উঁহু পূরবী নয়, রাণী। শিশির নাম দিয়েছে—চুপিসারে শিশির ডাকে রাণী বলে। জগতের মধ্যে গুপ্তনাম জানে মাত্র ঐ দু-জন। মাথার উপরে মা-জননী আছেন, তিনি জানেন না। কতটুকুই বা জানেন তিনি নবীন-নবীনার ছলাকলা!

ষড়যন্ত্রী দু-জন। বাইরে দেখবেন—বনিবনাও নেই, নালিশ আর নালিশ, শাশুড়ির কাছে ঠোঁট ফুলিয়ে পূরবীর কাঁদুনি: শিশির এটা করেছে, সেটা করেছে। শিশিরও মায়ের কাছে যেটুকু সময় থাকতে পারে, অমনি সব কথা। উভয়কেই মা প্রবোধ দেন: বকে দেবো। বকেনও সময় সময়: দিন-রাত্তির খিটিমিটি—কী তোরা হয়েছিস বল তো। আর জন্মে ঠিক লড়ুয়ে সেপাই ছিলি—তা মুখে মুখে অনেক তো হল, লাঠি বন্দুক ধর এবারে।

বকুনিতে কিছুমাত্র ফল হয় না, উল্টে নতুন কলহের উৎপত্তি। বউয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন তো সে বলবে, মিথ্যে মিথ্যে বলে আপনার কান ভাঙিয়েছে মা, আপনি আমায় আর দেখতে পারেন না। ছেলের দিকে তাকালেন তো সে বলে, জানি জানি, নিজের ছেলে পর করে দিয়েছে বাইরে থেকে কুচুটে মেয়ে এসে। ঘর-গিন্নীর এমনি দোর্দণ্ড প্রতাপ, কিন্তু এদের এই বিচারের মধ্যে পড়ে দিশা করতে পারেন না। বুড়ো মানুষের নজর খাটো—নইলে দেখতেন, ঠোঁট ফুলিয়ে বলছে বটে বউ কিন্তু চোখের কোণে হাসি চিকচিক করছে। কানও তীক্ষ্ন নয়—নয়তো ধরে ফেলতেন, যে-সুরে শিশির ঝগড়া করছে, তার মধ্যে রাগ-দুঃখ কণামাত্র নেই, উছলে পড়ছে আনন্দ।

শিশির আর পূরবী জড়াজড়ি হয়ে ঘুমোয়। কমবয়সি দম্পতিরা যেমন করে।

মাঝরাতে হয়তো ঘুম ভেঙে জেগে উঠল একবার পূরবী। আলো-নেভানো ঘর, জানলার পথে ধবল জ্যোৎস্না তেরছা হয়ে শয্যায় এসে পড়েছে। বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছে শিশির। সারা দিনমানে লহমার জিরান নেই, সকালবেলা উঠেই চাষের জমিতে ছুটোছুটি, মাহিন্দারকে দিনের কাজ বুঝিয়ে দেওয়া। তারপর পুকুরে পড়ে ঝাপুসঝুপুস ডুব এবং নাকে-মুখে চাট্টি খাওয়া সেরে মায়ের পায়ে প্রণাম করে সাইকেলে উঠে কিড়িং কিড়িং বেল দেবে কয়েকটা। পূরবী ত্রিসীমানাতেও নেই। খিড়কি-পুকুরে স্নানের নামে চলে গেছে, পুকুরপাড়ে গাছতলায় সে দাঁড়িয়ে। হাসবে শিশির, জবাবে হাসবে একটু পূরবী—আর কিছু নয়। এবারে সাঁ-সাঁ করে অতি দ্রুত চালিয়ে মাইল-দুই দূরের মহকুমা শহরে ছুটল—সেখানকার হাই-ইস্কুলের মাস্টার শিশিরকুমার ধর, বি-এ। নিত্যিদিন প্রায় একই রকমের ব্যাপার। কর্মস্থল থেকে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। মাহিন্দারের কাছে সমস্ত কাজ জেনে বুঝে নিয়ে এবার বিশ্রাম। উঁহু বিশ্রাম নয়, কলহ। সকালে নাওয়া-খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে যা একটু হয়েছে, নিশ্চিন্তে বসে সেই জিনিষ এবারে ফলাও হয়ে চলল।

রাত দুপুরে চাঁদের আলোয় দিনমানের সদাব্যস্ত সেই মানুষটি কী রকম অসহায় এখন! তাকিয়ে তাকিয়ে অকস্মাৎ মমতার বন্যা এসে যায় পূরবীর মনে। সে-ও এই মুহূর্তে আর-এক মানুষ—শুধুমাত্র স্ত্রী নয়, ঘুমন্ত অসহায় বয়স্ক-শিশুটির পাশে খানিকটা মা-ও যেন। পাশ ফিরে আলগোছে এলোমেলো কয়েকটা চুল শিশিরের কপাল থেকে সরিয়ে দেয়, হাত বুলিয়ে দেয় কপালের উপর। তারপরে ছোট্ট একটু চুম্বন। শিশিরও ঘুমের মধ্যে জড়িত কণ্ঠে ডেকে ওঠে ঃ—রাণী—। মুখখানা পালাতে দেয় না, নিবিড় করে ঠোঁটের উপর ধরে রাখে।

রাণী নাম সংসারের মধ্যে দুটি প্রাণী শুধু জানে—যে-জনের এই নাম, আর যে-মানুষটি নামকরণ করেছে। চুপিসারে একজনে ডাকে, অন্যে সংগোপনে সাড়া দেয়। সেই রাণী রান্নাঘরে বাটনা বাটেন—হাতে-কাপড়ে হলুদের দাগ। কুটনো কোটেন, রান্না করেন, বাসন মাজেন, গরুকে ফ্যান জল দেন। কালো রোগা, সামান্য লেখাপড়া-জানা গ্রামবধূ, তা সত্বেও রাণী, মহারাণী—নিশিরাত্রে নিভৃত শয়নঘরে একটিমাত্র বংশবদ প্রজার কাছে।

রাণীর মাথায় এসেছে গ্রাম ছেড়ে শহরের বাসিন্দা হবে। ষড়যন্ত্র চলছে। আজে-বাজে শহর নয়, খাস কলকাতা। মেটেঘর এবং পাড়াগাঁ জায়গা মহারাণীর পক্ষে নিশ্চয় বেমানান। কারণটা এই হতে পারে। প্রশ্ন তুললে পূরবী কিছু বলে না, ফিক-ফিক করে হাসে। বরেরও এভাবে আর মাস্টারি করা চলবে না। 'মাস্টারমশায়' 'মাস্টারমশায়' ডাক ছাড়ে অঞ্চলের লোক—গা ঘিনঘিন করে তার। মাস্টার বলতে বুড়ো-হাবাগবা যে-নরচিত্র মনে এসে যায়, শিশিরের সঙ্গে তার মিল কোথায়? জপাচ্ছে তাই অহরহ ঃ কলকাতায় চাকরি দেখ। মাস্টারি নয়, ভালো কিছু।

শিশির নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলে, বেশ তো আছি। কী দরকার?

হয়তো বা পূরবীকে ক্ষেপাবার জন্যই। পূরবী করকর করে ওঠে ঃ আজকে বেশ আছ, কাল থাকবে না—

হুবহু মামার কথা। চিঠিতে মামা লিখেছিলেন, পূরবী কথাগুলো মনে গেঁথে নিয়েছে। লিখেছিলেন, বীরপাড়া ছেড়ে নিরুদ্দেশে যাচ্ছি। আত্মমর্যাদা নিয়ে এখানে থাকা সম্ভব নয় আর। আমার এমন সাধের বীরপাড়া ছাড়ব, কোনোদিন কি স্বপ্নে ভেবেছি? আমি যাচ্ছি, তোমাদেরই বা কেন সাহস হবে না?

মামা অবিনাশ মজুমদার। আজ্ঞে হ্যাঁ, ধরেছেন ঠিক। তিনিই। যৌবনে বোমা-রিভলভার নিয়ে মাতামাতি করতেন, অনেক বছর জেলে কেটেছে, যথোচিত প্রমাণের অভাবেই জেলের অধিক হতে পারে নি। রীতিমত নাম ছড়িয়েছিল সে-আমলে (আপনার দেখছি মনে রয়ে গেছে, আশ্চর্য!) নাম ক্রমশ চাপা পড়ে গেল, বয়স হয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন তিনি, মস্তবড় ভারতবর্ষের সমস্যা ছেড়ে নিজের গ্রামখানা নিয়ে পড়লেন। ছেলেপুলে নেই, স্বামী আর স্ত্রী—স্ত্রী-ও লেগে আছেন স্বামীর সঙ্গে। মনের মতন করে গ্রাম গড়ে তুললেন, যেন পরিপূর্ণ ছবি একখানা। রাস্তাঘাট, লাইব্রেরি, বারোয়ারি আটচালা, সকাল-সন্ধ্যা দু'বেলা বাজার, ফ্রী প্রাইমারি ইস্কুল, মায় মেয়ে-ইস্কুল অবধি। গ্রামের নাম বীরপাড়া—নতুন চেহারা দেখে লোকে এবার টাউন-বীরপাড়া বলতে লাগল।

দেশ ভাগ হয়ে হিন্দুস্থান-পাকিস্থান হল, অবিনাশ ক্ষেপে গেলেন তখন: রাজত্ব করবি, তার জন্য কয়েকটা বছর আর সবুর করতে পারলি নে? পৃথিবীর কত দেশ স্বাধীন হয়েছে, আরও কত হতে যাচ্ছে—ধড়-মুণ্ডু আলাদা হতে কে হাড়িকাঠে গলা ঢোকায়? ঘুঘু রাজনীতিক ইংরেজ স্বাধীনতা বলে যে-জিনিষ দিল, আসলে সেটা কোন্দলের পাহাড়। দু রাজ্যে তোরা মাথা ফাটাফাটি করে মরবি, আলগোছে দাঁড়িয়ে মজা দেখবে ইংরেজ। দুনিয়াসুদ্ধ দেখবে।

ডেরাডাণ্ডা তুলে অবিনাশ হিন্দুস্থানের পারে চলে যাবেন। বলেন, যাচ্ছি, আবার একদিন ফিরে আসব। এতবড় অন্যায় চিরকাল চেপে থাকব না। যে যার আপন অঞ্চলে আবার এসে ঠাঁই নেবো।

বাড়ি বিক্রি করবেন, খদ্দেরও আসছে। যে-সে খদ্দের হলে হবে না, সৎ খদ্দের। ঘরবাড়ি ঠিক রাখবে, বাগানের গাছ কাটবে না, যেমনটি আছে—ঝকঝকে তকতকে অবস্থায় তেমনি রাখতে হবে। অবশ্য মূল্য দিয়ে কিনলে জোর করবার কিছু নেই—কথার উপরে বিশ্বাস। কথার যে মর্যাদা রাখবে, তেমনি খদ্দের চাই।

ভাগনেকে এই সময়ে চিঠি লিখলেন: চলে যাবার তালে আছি। একসঙ্গে যাই চলো। শিক্ষা, উদ্যম, আত্মমর্যাদা আছে তোমার, বয়স আছে। উঞ্ছবৃত্তি করে কেন এইভাবে জীবনপাত করবে?

চিঠি নিয়ে শিশির মাকে দেখায়: মামা তো এইসব লিখেছেন।

অবিনাশ বয়সে ছোট ঘর-গিন্নীর চেয়ে। তাঁর প্রসঙ্গে গিন্নী তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন: চিরকেলে বাউণ্ডুলে। মাঝে ক'টা বছর স্থিতি হয়েছিল, আবার পথের টান ধরেছে। তোদেরও পথে বের করবার মতলব। খবরদার, খবরদার! আছিস ভালো—কাজকর্ম করছিস, খাচ্ছিস-দাচ্ছিস, এমন ঘরবাড়ি পাড়াপড়শি ছেড়ে কোন্ দুঃখে আমরা যেতে যাব?

দুঃখ আজ না থাকুক, কোন একদিন হতে পারে। তখনকার উপায়? এই তো, আমাদের হেডমাস্টার মশায়, বিশ বছরের পাকা চাকরি ছেড়ে সরে পড়লেন—

অর্থাৎ ছেলের মনও উড়ু-উড়ু। জাদু জানে অবিনাশ, চিরকাল ধরে দেখছেন, মানুষ পটাতে ওর জুড়ি নেই। ছেলেকে নয়—পুরবীকে বলেন, জবাবটা আমিই দেবো বউমা। আমি বলে বলে যাচ্ছি, তুমি লেখো। আচ্ছা করে গালমন্দ দেবো, ভিটে ছেড়ে চলে যাবার উস্কানি কখনো যাতে না দেয়।

হল তাই। ঘর-গিন্নী বলছেন, হাঁটুর উপর পোস্টকার্ড রেখে পুরবী লিখে যাচ্ছে! লিখল: তোমার পত্রে সমস্ত বিষয় অবগত হইলাম। তোমাদের চেষ্টা সফল হউক,

নূতন জায়গাজমি লইয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে বসতি করো, ঠাকুর লক্ষ্মী-জনার্দনের কাছে নিরত প্রার্থনা করিতেছি। শ্রীমান শিশিরকেও যাইতে লিখিয়াছি, কিন্তু এখনই তাহা কি করিয়া সম্ভব। চাকরি ছাড়িয়া বিষয়-আশয়ের বিলি-ব্যবস্থা করিয়া যাইতে কিছু সময়ের আবশ্যক। তাহার জন্যও তুমি একটি ভালো জায়গা দেখিবে এবং একটি চাকরির ব্যবস্থা করিবে। কোনপ্রকার সুযোগ হইলেই পত্র লিখিবে। এখানে থাকিবার তিলার্ধ ইচ্ছা নাই। অভিভাবক বলিতে একমাত্র তুমিই বর্তমান— তাহার ভবিষ্যৎ তোমাকেই দেখিতে হইবে...

সাহস কী দুর্দান্ত! বাঘের মতন শাশুড়ি—আক্রোশ ভরে বলে যাচ্ছেন। প্রতিটি কথা অখণ্ড মনোযোগে পূরবী শুনে যায়, তারপর খসখস করে লেখে। লিখেছে কিন্তু এইসব— যে-কথা বলছেন, একেবারে তার উল্টো।

শাশুড়ি বলেন, কি লিখলে পড়ো দেখি বউমা। স্মৃতিশক্তি পূরবীর প্রখর—পড়বার সময় শাশুড়ির কথাই মোটামুটি শুনিয়ে যায়। নিশ্চিন্ত আছে, নিজে ঘর-গিন্নী পড়তে পারবেন না। এক বয়সে নাকি ছাপা বইয়ের দু-চার ছত্র পড়তেন, চালশে-ধরা চোখে এখন সব অক্ষর একাকার—হাতের লেখা অক্ষরের তো কথাই নেই। আরও নিশ্চিন্ত, শাশুড়ির আদরিণী বউ—ছেলের উপর না থাক, এই বউয়ের উপর তাঁর অগাধ আস্থা।

এবং বাইরে-বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে ডাকবাক্স। বাক্সে এক্ষুনি চিঠি ফেলে আপদের শান্তি করবে। শাশুড়ির হাত দিয়েই বরঞ্চ ফেলবে এই চিঠি।

॥ চার ॥

কলেজে ঢোকা আর হল না, বাড়িতেই পূর্ণিমা পড়াশুনোর চর্চা রাখবে। আর ইতিমধ্যে বিয়ে হয়ে গেলে—ভরসার কথা মা শুনিয়ে রেখেছেন, সেই নতুন সম্পর্কের সদাশয় লোকেরা বউকে পড়িয়ে যদি পাশ করিয়ে নেয়।

পূর্ণিমা এক চাকরি জুটিয়ে নিল, প্রাইভেট-টুইশানিরই রকমফের, কোচিং ইস্কুলে মাস্টারি। প্রাইভেট-মাস্টার রাখা দিনকে-দিন ব্যয়সাধ্য হয়ে পড়ছে, বড়লোক ছাড়া পেরে ওঠে না—এ হল গুচ্ছের ছেলেমেয়ে এক ঘরে এক সঙ্গে বসিয়ে পাইকারি হারে পড়ানো। একলা একজনের জন্য ট্যাক্সি ভাড়া না করে অনেকে মিলে বাসে করে যাওয়া —জিনিষটা তেমনি। ব্যবসাটা ঘোরতর চালু হয়ে গেছে, অলিতে গলিতে সর্বত্র, সাইনবোর্ড ঝুলাতে না ঝুলাতে ছাত্রছাত্রী পঙ্গপালের মতো এসে পড়ে। ঝানু লোকেরা সব নেমে পড়েছে—শিক্ষার নতুন কায়দাকানুন নিয়ে চমকদার বুলি কপচায়, এবং অভাবী কাঁচ কাঁচ মাস্টারনী ও অবসরভোগী বুড়ো বুড়ো মাস্টার জুটিয়ে এনে মুখে রক্ত তুলে খাটায়। মাইনের বেলা লবডঙ্কা। মাসান্তে যা দেবে, সে টাকায় আজকাল ভাল ঝি-চাকরও জোটে না।

দেবে তবু যা-হোক কিছু। সামান্য মাইনে বলেই কাজটা সহজে জোটানো গেছে। মায়ের কাছে গিয়ে পূর্ণিমা সর্বপ্রথম খবরটা বলল, চাকরি নিচ্ছি মা। সর্বক্ষণ ঘরে বসে বসে দিন কাটে না। কলেজে পড়ালে না, প্রাইভেটে আমি বি-এ দেবো। তার জন্যে বইটই আছে, নিজের হাতখরচাও দু-পাঁচ টাকা লাগে। বাবার কাছে চাইতে গেলে তেড়ে আসবেন। লজ্জাও করে কথায় কথায় হাত পাততে।

তরঙ্গিণী বলেন, চাইলেও দেবেন কোথা থেকে সেটা তো ভেবে দেখবি। চাকরি

আছে এই ক'টা মাস—পরের কথা ভেবে এখন থেকেই চোখে অন্ধকার দেখছি।

তবে মা তুমি আপত্তি কোরো না। রোজগার হলে আমিও সংসারে দিতে পারব। মাসে মাসে তোমায় প'চিশ টাকা করে দেবো।

মাইনে কত দেবে শুনি—নিজের হবে, সংসারের হবে?

তোমার হাতে প'চিশ টাকা দিয়ে যা থাকবে তাতেই আমার কুলিয়ে যাবে মা।

প্রস্তাবটা তরঙ্গিণীর ভালই মনে হচ্ছে। কিন্তু তারণের কথা ভেবে দ্বিধা করেন: উনি মত দেবেন না। পাড়ার মধ্যে একটা মেয়ে পড়ানো—সেবারে তা-ও তো নিতে দেন নি। টের পেলে ক্ষেপে যাবেন।

টের যাতে না পান, তাই করবে তোমরা।

তাপস ছিল সেখানে, তাকে পূর্ণিমা সামাল করে দেয়: বাবাকে কিছু বলবি নে, ঘুণাক্ষরে উনি টের না পান। আমি এগারোটায় বেরুব, তার আগে দশটার মধ্যেই বাবা তো রওনা হয়ে যান। আমার চারটেয় ছুটি, বাবার অনেক আগে বাড়ি এসে পড়ব। রবিবারে অফিস নেই, আমার ইস্কুলেও ছুটি সেদিন। তোরা না বললে উনি কিছু জানতে পারেন না।

তাপস বলে, ডিসেম্বরে রিটায়ার করবেন, তারপর তো জেনে ফেলবেন।

পূর্ণিমা বলে, এই ক'টা মাস করে নি। যা পাওয়া যায়, তাই লাভ। অবস্থা বুঝে তখন না হয় ছেড়ে দেবো।

তরঙ্গিণী জুড়ে দিলেন: তোর ছোড়দি চিরকাল বুঝি চাকরি করে তোদের দেখবে। নিজের ঘরসংসার হবে না, রিটায়ার করে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকাগুলো হাতে এসে যাবে, সময়ও অঢেল পাবেন তখন। ফাঁকতালে যা-হোক কিছু রোজগার—এইসব ভেবে আমিও কিছু বলছি নে।

ডিসেম্বরে তারণকৃষ্ণ রিটায়ার করলেন। সুদ সমেত ঋণের টাকা কেটে নিয়ে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড একসঙ্গে হাতে দিয়ে দিয়েছে। অখণ্ড অবসর তারণের। পূর্ণ মুখুজ্জের সঙ্গে দাবার আসর শুধু সন্ধ্যার পরে নয়, দুপুরে—এমন কি কোন কোন দিন সকালবেলাও বসে। আর একটা জিনিস নজরে পড়ে—কী যেন শলাপরামর্শ দু'জনের মধ্যে—পূর্ণিমাকে দেখলেই চুপ। চুপ করুন আর যা-ই করুন, বুঝতে কিছু বাকি থাকে না। হাসে পূর্ণিমা মনে মনে। প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের অতগুলো টাকা ফুটছে বাবার গায়ে—টাকা থাকতে থাকতে পরের ঘরে আমায় চালান করে বাঁচবেন। অবসরভোগী দুই সুহৃৎ সেই কর্মে কোমর বেঁধে লেগেছেন। কিন্তু এত ঢাক-ঢাক কেন কে জানে—গুরুজনে ভাল ভেবে করছেন, আমি বুঝি ক্যাটক্যাট করে উল্টো কথা শোনাতে যাব তাঁদের মধ্যে পড়ে!

একদিন অমনি চলেছে, পূর্ণিমা চা নিয়ে এসে হাজির।

তারণ বলেন, বড্ড শীত পড়েছে পূর্ণ-দা। হাত-পা যেন সিঁধিয়ে যাচ্ছে দেহের ভিতর।

পূর্ণ বলেন, কামার বুড়ো হয়ে গেলে লোহা শক্ত হয়। শীত নয়, বয়স বেড়েছে।

যেন দু-জনের মধ্যে আবহাওয়ার কথাই চলছিল এতক্ষণ। মরীয়া হয়ে পূর্ণিমা বলে উঠল, একটা কোচিং-ইস্কুল হয়েছে পাড়ার মধ্যে। ওরা বলছে মাস কতক সেখানে পড়িয়ে দিতে। কলেজে যেতে দিলে না, বাড়ি বসে বসে কাজ তো খুঁজে পাই নে। তাপসও ওখানে বিনি-খরচায় কোচিং পাবে। বই কেনা হয় নি তাপসের—বলো তো অগ্রিম কিছু নিয়ে এসে তাপসের বইগুলো কিনে দিই।

তারণের আগেই পূর্ণ মুখুজ্জে সমর্থন করে উঠলেন : লেগে পড়ো মা এক্ষুনি। দু-দুটো পাশ করেছ শুধু বাসনমাজা আর হাঁড়ি-ঠেলার জন্য নয়। তুমি আপত্তি কোরো না ভায়া।

ভাল-মন্দ কিছু না বলে তারণ নিঃশব্দে চায়ে চুমুক দিতে লাগলেন।

হাঁ-না যা হোক কিছু বলে দাও বাবা। কাল সকালে জবাব দিতে হবে—

এবং মোক্ষম টোপ প্রয়োগ করল পূর্ণিমা সেই সঙ্গে : ভাইয়ের বইয়ের জন্য পঞ্চাশটি টাকা অগ্রিম চেয়ে রেখেছি ওদের কাছে। বলো তো কালই টাকাটা এনে দিই।

তারণ বললেন, এ মাস্টারি বেশিদিন চলবে না, স্পষ্টাপষ্টি বলে দিস।

পূর্ণ মুখুজ্জে বাধা দিয়ে বললেন, কী বলতে যাবে আবার! বলি কন্ট্রাক্ট করে তো কাজ নিচ্ছে না। সময় হলেই ছেড়ে দেবে।

তারণ আর কিছু বললেন না, নীরবে চা খেতে লাগলেন। পায়ে পায়ে সরে এলো পূর্ণিমা। একটা মেয়ে পড়ানো নিয়ে বাবা সেবারে কুরুক্ষেত্র করলেন—এত সহজে কার্যোদ্ধার হবে, কে ভেবেছে। রিটায়ার করার সঙ্গে সঙ্গে তালুকদারের গরবও ধ্বংস হয়ে গেছে। কষ্ট হয়!

তরঙ্গিণীর কাছে গিয়ে পূর্ণিমা বলে, পঞ্চাশটি টাকা দিতে হবে মা।

টাকা দিয়েছিস কি ফেরত নেবার জন্য?

হাওলাত চাচ্ছি, ফেরত দিয়ে দেবো। বাবার ফরমান পেয়ে গেছি, আর ডরাই নে—চাকরি নির্ভয়ে চলবে, বরাবরই তোমায় টাকা দিয়ে যেতে পারব। ফার্স্ট হয়ে ভাই প্রোমোশান পেল, ইস্কুল খুলে যাচ্ছে, তার বই কিনবার জন্য পঞ্চাশ টাকা।

তরঙ্গিণী বলেন, নেকলেশ আর ব্রেসলেট দেবো তোর বিয়ের—আমার কঁড়িহার ভেঙে গড়াতে দিয়েছি। তোর টাকা সব তোলা আছে স্যাকরাবাড়ির জন্য।

পূর্ণিমা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে, তলে তলে তুমি এইসব করো মা! কিন্তু ঘোড়া যখন হবে তোমার এই চাবুকের জন্য তখন আটকে থাকবে না।

তরঙ্গিণী বলেন, মুখে রক্ত তুলে রোজগারের টাকা তোর কাছ থেকে হাত পেতে নিই—সে বুঝি সংসারের ভোগে লাগাব বলে? তোর টাকা আবার তোর কাছেই ফিরে যাবে আমার পছন্দের একটা-দুটো গয়না হয়ে।

হেসে উঠে মাকে জড়িয়ে ধরে পূর্ণিমা আবদার করে : যাতে তুমি খুশি হও, তাই করো মা। শুধু এইবারের মতো পঞ্চাশটি টাকা কর্জ দাও। বাবাকে বলে এসেছি, না দিলে হবে না। সুদ সমেত শোধ করব।

চলে এমনি। কোন ঝঞ্ঝাট নেই, তারণের চোখের উপর দিয়েই পূর্ণিমা কাজে বেরিয়ে যায়, ছুটির পর বিকালবেলা চোখের উপরেই ফেরে। কাশীপুর থেকে অণিমা এসে পড়ে মাঝে মাঝে। মন খারাপ হলে আসবেই। আর সে বস্তু লেগেই আছে হরবখত। উচ্ছ্বসিত হয়ে বোনকে বলে, জোর কপাল তোর পুনি। স্বাধীন রোজগার, ইচ্ছাসুখে চলাফেরা, কারো চোখ-রাঙানির ধার ধারিস নে। বিয়ে-বিয়ে করে নাচিস নে, সামাল করে দিয়েছিলাম তোকে। তখন কটু লেগেছিল, তর্ক করেছিলি। এখন?

মিটিমিটি হেসে চোখ বড় বড় করে পূর্ণিমা বলে, এখন তর্ক করি নে দিদি, তা বলে আশা কিন্তু ছাড়ি নি। মা বাবা আমি—কেউ না। প্রভিডেন্ড ফাণ্ডের টাকা যখের ধনের মতো বাবা আগলে আছেন, একের পর এক মা গয়না গড়িয়ে যাচ্ছেন—পোঁ-পোঁ করে সানাই বাজছে, একদিন এসে হঠাৎ শুনতে পাবি।

মাস কয়েক পরে তারণ বললেন, জিনিসপত্তোর অগ্নিমূল্য, পেন্সনের ঐ ক'টা টাকায়

হতো কুলিয়ে উঠতে পারি নে মা। রোজগারে যখন লেগেছিস, তাপসের ইস্কুলের মাইনেটা দিস তুই। মাইনেও তো বাড়িয়ে দেড়া করেছে। কেউ ছাড়ে না, যে যেদিক দিয়ে পারে বাড়িয়ে নিচ্ছে। আমারই কেবল অর্ধেক হয়ে গেল।

তরঙ্গিণী বললেন, ক্লাসের ফার্স্ট বয়—তাই তাপস বলছিল, দরখাস্ত করলে ইস্কুলে ফ্রী করে নিতেও পারে।

তারণ সহজভাবে তাপসকে বলেন, দরখাস্তের ছাপা ফরম আছে, নিয়ে আসিস তো একটা।

পূর্ণিমা এবারে আগুন হয়ে ওঠে ভাইয়ের উপর ঃ ক্লাস নাইনে উঠে ভারি যে মাতব্বর হয়েছিস। মাথায় এই সমস্ত আসছে! ভেবো না বাবা, তাপসের মাইনে আমি দেবো। সই দিয়ে তুমি মাইনে মকুবের দরখাস্ত করবে সে আমি হতে দেবো না। কিছুতে নয়। দয়ার দান নিয়ে পড়বে না আমার ভাই।

মেয়ের রাগ দেখে তারণকৃষ্ণ হাসেন ঃ কেন, তোর বাপ কোন্ লাটসাহেব শুনি ? তালুকদার নাম আছে বটে মফঃস্বলে, কিন্তু তালপুকুরে আজ ঘটিও ডোবে না। মাস্টারি করে মেয়ে মুখে রক্ত তুলে পয়সা আনে, তার ভাই ফ্রী পড়বে—অন্যায়টা কি তাতে ?

দাবায় না বসে ইদানীং পূর্ণ মুখুজ্জে সঙ্গে তারণ প্রায়ই বেরিয়ে পড়েন। রাশভারি মানুষ তিনি, কোথায় যান কি বৃত্তান্ত বাড়ির কেউ প্রশ্ন করে না। কিন্তু বুঝতে কি আর বাকি থাকে ? পুরানো ব্যাধি গাউটে তরঙ্গিণী সম্প্রতি কয়েকটা দিন শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন। ডাক্তারে ওষুধে বিস্তর খরচা হল। পূর্ণিমা সাধ্যমতো দিচ্ছে, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকায় তবু হাত পড়ে গেল। সঞ্চয় দিনকে-দিন হালকা হচ্ছে, তাই বোধকরি অস্থির হয়ে পড়েছেন তারণ—টাকাকড়ি নিঃশেষ হবার আগে কন্যাদায় চুকিয়ে ভারমুক্ত হতে চান। দাবাখেলা মাথায় উঠে গেছে, নাকে-মুখে চাট্টি গুঁজেই দুই সুহৃৎ বেরিয়ে পড়েন। ফিরতে সন্ধ্যা গড়িয়ে যায়। মুখ শুকিয়ে এতটুকু, অর্থাৎ প্রত্যাখ্যানের ধাক্কা খেয়ে এসেছেন আজও। হায় রে, কত খোয়ার প্রাচীন ঐ মানুষ দুটির !

একদিন এমনি অবস্থায় পূর্ণ মুখুজ্জে প্রবোধ দিচ্ছেন—পূর্ণিমার কানে গেল কয়েকটা কথা, তারপর জানলায় কান পেতে সম্পূর্ণ শুনে নিল। মুখুজ্জে বলছেন, মুসড়ে যাচ্ছ কেন ভায়া, দুটো চারটে জায়গায় বেকুব তো হবেই। আমার উপরে আস্থা রাখ। এত লোকের সঙ্গে জানাশোনা, গেঁথে ফেলব নিশ্চয় কোনখানে—

কে কোথায় দেখে ফেলবে—আর বেশি সাহস করে না পূর্ণিমা, এইটুকু শুনে ফুড়ুৎ করে পালিয়ে গেল।

কিন্তু বড় একটা দুশ্চিন্তার বিষয়—পূর্ণিমা ইদানীং দেরী করে বাড়ি ফিরছে। এক-আধ দিন নয়, নিত্যনিয়মিত। জিজ্ঞাসা করলে উড়িয়ে দেয় ঃ কাজে ছিলাম মা। মেজাজি মেয়ে, বেশি বলতে সাহস হয় না। করছেও তো খুব—এমনি করে সংসারের হাল না ধরলে ঠাটবাট কিছুই ঠিক রাখা যেত না। দেরি হোক যা-ই হোক, এসেই সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘরে হাঁড়ি ঠেলতে ঢুকবে। রাতের রান্নাটা নিজে করে—ভোজনবিলাসী বাপের কথা মনে করে দুটো বেলাই কুসমির উপর ছেড়ে রাখতে পারে না। তারণ নিজেও ফেরেন অতিশয় ক্লান্ত হয়ে, মন খিঁচড়ে থাকে—পূর্ণিমা কখন ফিরছে, এসমস্ত খেয়ালে আসে না তাঁর। আর বাইরের লোক পূর্ণ মুখুজ্জে দিনে রাত্রে যখন তখন হানা দিচ্ছেন—অতএব একেবারে মুখ বুঁজে থাকতে হয়, সোমত্ত মেয়ে নিয়ে কোন কথা বাইরে না চলে যায়। নিঃশব্দে তরঙ্গিণী বিছানায় পড়ে এপাশ ওপাশ করেন।

অণিমা মায়ের অসুখে দেখতে এসেছে : আগে তো পুনি পাঁচটার আগেই চলে আসত। ভালো কথা নয় মা—কোথায় থাকে সে, কি করে?

অপেক্ষা করে থাকে অণিমা! পূর্ণিমা ফিরলে বলে, ইস্কুলে চারটের ছুটি—এতক্ষণ কোথায় ছিলি, কি করছিলি? সমস্ত খুলে বল্, না শুনে আমি নড়ব না।

বলব?

অণিমা এবাড়ি এলে সকলের আগে পূর্ণিমার যে কাজ—ছোঁ মেরে রঞ্জুকে বুকে তুলে নিল। সেখান থেকে কাঁধে। কাঁধে নিয়ে ঘুরঘুর করে নাচের ভঙ্গিতে সারা ঘরে পাক দিয়ে এলো। হাসে রঞ্জু খিলখিল করে। বলের মতন এবারে লোফালুফি বার কয়েক, ভয় পেয়ে রঞ্জু মাসির চুলের গোছা আঁকড়ে ধরে। চুলে টান পড়ে যন্ত্রণায় পূর্ণিমা হেসে ফেলে।

খেলা সাঙ্গ করে শান্ত হয়ে পূর্ণিমা বলে, শুনতে চাস দিদি? রাগ করতে পারবি নে—

হ্যাঁ, সমস্ত শুনব। সেইজন্যে বসে আছি। বয়সটা খারাপ, বিয়েথাওয়া হয় নি, ইচ্ছে মতন ঘোরাঘুরি করলেই হল না—

পূর্ণিমা চুপি চুপি বলে, প্রেম করে ঘুরি দিদি, বিয়ে যাতে তাড়াতাড়ি হয়। ছেলেধরার তালে আছি—বড়লোকের কোন সৎ ছেলের সঙ্গে বিনাপণে যাতে গছে যেতে পারি—

ঠাস করে অনিমা চড় মারল তার গালে।

গালে হাত বুলাতে বুলাতে পূর্ণিমা জোর দিয়ে বলে, মারিস কেন, ওটা পূর্ণ-জেঠারই কথা। বাবাকে লোভ দেখিয়েছিলেন, আশায় আশায় বাবা কলেজে ভর্তি করে দিলেন। পুরো দুটো বছর পড়ালেন—তা এমন অপদার্থ মেয়ে আমি, আশা পূরণ করতে পারি নি। বড়লোক মরুক গে, গরিবের একটা ওঁচা ছেলেও প্রেম করতে এগোল না। বুড়োমানুষ দু'জন নিজেরাই এবার নেমে পড়েছেন, ঘুরে ঘুরে নাজেহাল হচ্ছেন। এমন অবস্থায় আমিই বা কোন আক্কেলে হাত-পা কোলে করে বসে থাকি? উঠেপড়ে লেগেছি। বল্ দিদি, এতই কুরূপ-কুচ্ছিৎ আমি—কোন্ একটাকে খপ্পরে ফেলতে পারব না?

চড়ের উপর এবারে তো দিদির হাতের কিল-ঘুসি—তার জন্য পূর্ণিমা তৈরি। কিন্তু অণিমার হাত ওঠে না, হঠাৎ কেমন বিহ্বল হয়ে গেছে। বলে, পুরুষমানুষ খপ্পরে পড়ে রূপ দেখে নাকি? কাল আমি তা নিজের চোখে দেখেছি—

বোনের গলা জড়িয়ে ধরে অণিমা এদিক-ওদিক তাকায়। চোখভরা জল। অর্থাৎ নিজের কথা এইবারে, চোখের জল তার ভূমিকা।

কাল মার্কেটে গিয়েছিলাম গোটাকয়েক কাপড়-জামা কিনতে। মাগিটাকে তখন চর্মচক্ষে দেখলাম। সে আর তোর জামাইবাবু। হাসাহাসি ঢলাঢলি, যেন গলে গলে পড়ছে। শরম বলে কিছু নেই। খাঁচাসুদ্ধ পাখি কিনেছে, আরও কত কি কিনে কিনে বেড়াচ্ছে। আমায় দেখতে পায় নি—আঁকুপাকু করছি কোনদিক দিয়ে পালাই। তারা ফুলের স্টলে ঢুকে পড়ল, রক্ষে পেয়ে গেলাম।

এবং থেমে দম নিয়ে আবার বলে, সামান্য সময়—তবু দেখে নিয়েছি। কটকটে কালো রং, আমার দেড়া বয়স—এই হিড়িম্বামূর্তি নিয়ে একেবারে মজে আছে। দিনান্তে একটিবার দোকানে গিয়ে যা-কিছু হাতড়ে পায়, শ্রীচরণে নিয়ে ঢালে। এ মজা আর বেশিদিন নয়, ধার-দেনায় ডুবু-ডুবু—এতবড় জাঁকের দোকান, মালপত্রের অভাবে খাঁ খাঁ

করে। শুনতে পাই গৃহস্থঘরের মেয়ে—নাকি মা-বাবার সঙ্গে থাকে, ঝাঁটা মারি সেই মা-বাপের মুখে, টাকার লোভে যারা বিধবা মেয়ের সঙ্গে বেলেল্লাপনা করতে দেয়। তা-ও বাড়ির উপরে বসে।

শুনতে শুনতে পূর্ণিমার মুখ কঠিন হল। অণিমা কান্নায় ভেঙে পড়ছিল, ছোটবোনকে ভয় করে সে—তার দিকে চেয়ে সামলে নেয় তাড়াতাড়ি।

তিক্ত কণ্ঠে পূর্ণিমা বলে, ঝাঁটা তুই কেবল মুখে মুখে মারিস দিদি। অক্ষমের আস্ফালন শুনে হাসে সবাই। সাহস থাকে তো বল্, সত্যি গিয়ে মেরে আসি।

সেই আর একদিনের মতো বলতে লাগল, আমি তোর সাথী থাকব, দুই ঝাঁটা দুই বোনের হাতে। সেই বাড়ি গিয়ে পড়ব—যে সময়টা জামাইবাবু থাকে। যাবি তো চল্, এসপার-ওসপার করে আসি। আর নয় তো জানিনে জানিনে করে হাসিফুর্তি করে বেড়াবি। ওসব ভাবতেই যাবি নে, চোখের আড়ালে যা ইচ্ছে করুক গে। হেলা করবি, নিজের ডাঁট নিয়ে চলবি!

পূর্ণ মুখুজ্জে হন হন করে এসে পড়লেন। আনন্দে উচ্ছ্বসিত। বারাণ্ডায় পা দিয়েই চেঁচাচ্ছেন: কোথায় গেলে ভায়া, শোন শোন! সুখবর—এইবারে নির্ঘাৎ গেঁথে যাবে। আর ভাবনা নেই।

রান্নাঘরে ছিল পূর্ণিমা, বেরিয়ে এলো। বাবা নিশ্চয় ঘরে নিয়ে বসাবেন। সবিস্তারে কথাবার্তা হবে। বাইরে দাঁড়িয়ে পূর্ণিমা শুনে নেবে।

তা নয়, দেখতে পেয়ে মুখুজ্জে পূর্ণিমাকেই কাছে ডাকলেন: একটা কথা বলি শোন। খাটনি কমিয়ে দেহের যত্ন নাও। ইস্কুলে সারা দিনমান খাটছ, তার উপরে আবার টুইশানি কেন বলো দিকি? বাড়ি বাড়ি বিদ্যের ফিরি করে বেড়ানো—ওটা বড় উঞ্ছবৃত্তি। শুনে অবধি মোটেই আমার ভাল ঠেকছে না। ছেড়ে দাও, কি দরকার?

সন্দেহ নেই, সুজাতা ফাঁস করে দিয়েছে—পূর্ণ মুখুজ্জের মেয়ে সুজাতা। একটা টুইশানি সত্যিই নিতে হয়েছে, কিন্তু কাউকে বলে নি পূর্ণিমা। ইস্কুলের পরেই পড়ানোটা অমনি সেরে আসে—বাড়ির লোকে ভাববে ইস্কুলের কাজেই সে আছে, ইস্কুল থেকে বেরুতে দেরি হচ্ছে। অণিমার প্রশ্ন সেদিন ঠাট্টাতামাসায় উড়িয়ে দিল। কিন্তু যাকে পড়ায় তার বড় বোন সুজাতার বন্ধু—ক'দিন আগে সুজাতা হঠাৎ গিয়ে পড়েছিল।

ইতিমধ্যে তারণও এসে যোগ দিলেন: বাড়ি ফিরে এসে জলটল খেয়ে খানিক বিশ্রাম করে সন্ধ্যার সময় না হয় গেলি—

বাবার আপত্তিটা এখন তবে সময়-নির্বাচন নিয়ে দাঁড়িয়েছে। পূর্ণিমা জো পেয়ে গেল: তখন যে রান্নাঘরের কাজ। ন'টা না বাজতেই তাপস ক্ষিধে-ক্ষিধে করে পড়ে। বিকেলে কী আর খায়—ক্ষিধের কোন দোষ নেই।

কিন্তু পূর্ণ মুখুজ্জে সোজাসুজি রায় দিলেন: টুইশানি ছাড়ো। কাল পার তো কালই। তোমার বয়সে মেয়েরা কতরকম সাজগোজ হাসিস্ফূর্তি করে বেড়ায়। তুমি সারাদিন শুকনো মুখে খেটে খেটে বেড়াবে—বেশি খাটনিতে দেহের লালিত্য ঝরে যাচ্ছে।

পূর্ণিমা হাসিমুখে বাপের দিকে তাকিয়ে পরখ করছে: ছাড়ব নাকি টুইশানি? তুমি কি বলো?

দ্বিধাহীন ভাবে তারণকৃষ্ণ ঘাড় নেড়ে দিলেন: ছাড়—

তার পরে? তোমার যখন খুচরো টাকা থাকবে না?

খোঁটা দেওয়া বাপকে। নিয়মিত মায়ের হাতে পঁচিশ টাকা করে দিয়ে যাচ্ছে, তাপসের ইস্কুলের মাইনে আর বই দিচ্ছে। কোন কিছুই তারণের অজানা নয়। তার উপরেও তারণের প্রায়ই খুচরো টাকা-পয়সা থাকে না। জমাদার এসেছে, তারণ পূর্ণিমাকে ডাকেন : একটা টাকা দিয়ে দে ওকে। নোট ভাঙানো নেই। কাল সকালে নিয়ে নিস।

কোন সকালেই পাবে না, পূর্ণিমা জানে। তাগিদ করে না বাপের কাছে। পরের সকালেই হয়তো আবার চাইলেন : আছে-টাছে কিছু? দে, নইলে তো বাজার হয় না।

বলেন, আগেরটা দেওয়া হয় নি বুঝি? পেনসনের টাকা পেলে এক সঙ্গে দিয়ে দেবো। চেয়েচিন্তে নিস—মোটে তুই রা কাড়িস নে, তোরই তো দোষ।

সেই কথা মনে করিয়ে দিয়ে সকৌতুকে পূর্ণিমা বলে, বেশ ছাড়ছি টুইশানি। নোটের ভাঙানি না থাকলে আমি কিন্তু নাচার।

দৃক্‌পাত না করে তারণকৃষ্ণ বলেন, আলবৎ ছাড়বি—কাল থেকেই। ইস্কুলের কাজও ছাড়তে হবে। চিরকাল এই করে চলবে না।

মনের মতন খোঁজ পেয়েছেন তবে এতদিনে, পাকাপাকি কথাও পেয়েছেন। বাবার কণ্ঠে নইলে এত জোর সম্ভব না। পূর্ণ-জেঠার কীর্তি। ঐ যে মানুষটি—অসাধ্য-সাধনের ক্ষমতা ধরেন উনি। নিজের জীবনেও কি কম দেখালেন—সাধারণ ম্যাট্রিক অবধি পড়ে মস্তবড় কনসারনের অ্যাকাউন্টান্ট হয়ে বসলেন। কাজকর্ম নিপুণ দক্ষতায় চালিয়ে এসেছেন, তা-বড় তা-বড় অডিটারও পাইপয়সার খুঁত বের করতে পারে নি। বাবাকে নিয়ে যা ঘোরাঘুরি লাগিয়েছেন পূর্ণজেঠা—হবেই একটা-কিছু, না হয়ে পারে না।

তবে শেষ পছন্দটা আমার। সেকেলে বুড়োদের চোখ প্রত্যয় করা চলে না। পাত্রকে ছাদনাতলায় বসিয়ে দিয়ে কনেপিঁড়ি পেতে হুকুম হবে, বসে পড়—আর টুপ করে বসে পড়ব—অণিমার বেলা যা হয়েছিল, এবারে সে জিনিষ হবে না। মানুষটিকে ভাল মতো বাজিয়ে নিতে হবে—দ্বিতীয় এক তুলসীদাস জুটে না যায়।

আরও এগিয়েছে।

তারণকৃষ্ণ বললেন, কাল বিকালে আমরা মাঠে বেড়াতে যাব। তুইও যাবি পুনি।

কেন বাবা?

ফাঁকায় খানিকটা বেড়িয়ে আসা। শরীর ভাল রাখার জন্য এ সমস্ত করতে হয় রে! বেলা একটু পড়লে এই চারটে সাড়ে-চারটেয় বেরিয়ে পড়ব, বুঝলি?

শরীর-রক্ষার জন্য বেড়ানো ব্যাপারটা অত্যাবশ্যক, জীবনের শেষ অঙ্কে এসে সহসা বাবার জ্ঞানোদয় হল। সে এমন জরুরি—মা শয্যাশায়ী, তিনি একটু সুস্থ হয়ে উঠবেন, সেই ক'টা দিন সবুর চলল না। বেড়ানোটা আবার কাছাকাছি কোন পার্কেও নয়—অনেক দূরের গড়ের মাঠে। ট্রাম-বাসের ভিড়ের পেষণে আধখানা হয়ে পৌঁছুতে হবে সেখানে। শরীর-রক্ষায় এতদূর ঝামেলা।

দিদি অণিমার ক্ষেত্রেও হয়েছিল। সেবারে গড়ের মাঠে নয়, থিয়েটারে। এখনকার দিনে শুরুতেই কনে এনে সামনাসামনি দাঁড় করায় না, ছুতোয়-নাতায় পাত্রপক্ষ দেখে নেয় আগে। মোটামুটি পছন্দসই হলে তখন বিধিসম্মত কনে দেখা, পনের দরাদরি এবং আনুষ্ঠানিক কাজকর্ম। তা আমারই বা কী মাথাব্যথা—পাকাপাকির মুখে দরকার হয় তো সেই সময় কিছু বলব। ভাল বুঝে যা করবার করুন গে ওঁরা—যেখানে যেতে বলবেন, জানি না জানি না এমনি ভাব দেখিয়ে যাব চলে, যা করতে বলবেন করব।

আবার একসময় তারণকৃষ্ণ মেয়েকে বললেন, কাল আর ইস্কুলের কাজে যাস নে। কামাই কর্। মাঝে মাঝে কামাই দেওয়া ভাল, দেহ ভাল থাকে, চেহারা সুশ্রী হয়।

॥ পাঁচ ॥

—ভোরবেলা—না, ভোর কোথা, রাত্রি আছে তখনো—ঘুম থেকে পূর্ণিমা ধড়মড় করে উঠে পড়ল। দোর খুলে বারাণ্ডায় আসে। ভোর কোথা, আকাশে তারা। তবে অন্ধকারটা কিছু ফিকে হয়ে এসেছে—দিনমানের পূর্বাভাস। সব দিন আসে আর চলে যায়—আজকের আসন্ন এক অপরূপ দিনমান। সারা দেহ চঞ্চল, বারাণ্ডায় থাকতে পারে না—লাফ দিয়ে গলিতে নেমে পড়ে। মোড় অবধি ফর ফর করে ঘুরে আসে। যেন নতুন দিনকে ডেকে এলো সদর রাস্তা থেকে: এসো গো, তাড়াতাড়ি চলে এসো। আহা, কী ভালো যে লাগছে!

বেলা হয়েছে। চা খাচ্ছেন তারণকৃষ্ণ, চিন্তিত মুখভাব। সন্দেহ নেই, বিকালের পরীক্ষার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন তিনি। হঠাৎ এক সময় ডাক দিলেন: পুনি, শোন্। তোর ভাল শাড়ি যে ক'খানা আছে, বের করে আন। আমার সামনে নিয়ে আয়। আরে, তুই দেখি রান্নাঘরে ঢুকে আছিস—

বিষম চেঁচামেচি শুরু করলেন: কে বলেছে তোকে রান্নাবান্না করতে?

মা পড়ে আছে, কে রাঁধবে তবে শুনি? কুসমির রান্না মুখে দেওয়া যায় না—কালও তো রেঁধেছি আমি।

কাল রেঁধেছিস বলে আজকেও?

পূর্ণিমা হলুদ বাটছিল। হাত ধুয়ে বাইরে চলে এলো। বলে, কামাই করলাম তো আজকে বেশিক্ষণ ধরে ভাল করে খান দুই তরকারি রাঁধব। মা অসুখে পড়ে, তোমার দুপুরের খাওয়ার কষ্ট হচ্ছে বাবা। সকালে আমার সময় থাকে না—কোন রকমে সিদ্ধ করে তাড়াতাড়ি নামানো। তাকে কি রান্না বলে, না সে জিনিষ খাওয়া যায়!

তারণ হুংকার দিয়ে উঠলেন: রান্নাঘরের কালিঝুলি মেখে পেত্নী হয়ে থাকবি, সেইজন্যে বুঝি কামাই করতে বলেছি? ফের গিয়ে উনুনের ধারে বসেছিস তো উনুনে আমি জল ঢেলে দেবো।

খাওয়া দাওয়া হবে না তাহলে—উপোস?

তারণ খিঁচিয়ে উঠলেন: নিত্যদিন রাজভোগ হবে, তার কোন মানে আছে? হোক না এদিক-ওদিক একটা দিন। কুসমি যা পারে করুক গে—আগুনের কাছে যাবি নে তুই, মানা করে দিচ্ছি।

অর্থাৎ স্বাস্থ্য তার মজবুত করবেনই বাবা। ইস্কুল কামাই করালেন, রান্নাঘরে গিয়ে আগুনের আঁচ লাগাতেও মানা। দায়ে পড়ে ঝি কুসমির আজ রাঁধুনির কাজে পদোন্নতি হয়ে গেল। পারলে মহামূল্য মণি-মাণিক্যের মতো বাবা তাকে ভেলভেটের বাক্সে রেখে নিশ্চিন্ত হতেন। ব্যাপার তাই বটে।

বলছেন, সাবানে হাত ধুয়ে ভাল শাড়ি যে ক'টা আছে বের করে নিয়ে আয়। এই নিয়ে একটু ভাবনাচিন্তা কর, একলা আমি আর পেরে উঠছি নে।

সতর্কতা এতখানি—রান্নাঘরে পা ছোঁয়ানো নিষিদ্ধ, মেয়ের রঙে দাগ ধরে যায়

পাছে। সাজগোজ করা ছাড়া আজ অন্য কাজ নেই। পছন্দ না করিয়ে ছাড়বেন না ও'রা কিছুতে। সেজেগুজে পরীর মতন ঘুরবে সে, দূরে কাছে অনেক দৃষ্টি তার পানে অপাঙ্গে তাকাবে। একঘেয়ে কাজকর্মের জীবনে দস্তুরমতো এক রোমান্স।

শাড়ি বেছেগুছে চারখানা মাত্র হল। উল্টেপাল্টে দেখে তারণ খুঁতখুঁত করছেন : কচি-কলাপাতা রং হলেই মানাত ভাল। ম্যাড়ম্যাড় করছে, একদম চোখে ধরে না, পছন্দ করে পয়সা দিয়ে এই জিনিষ কিনিস। দামে দস্তা হলেও বুঝতাম সেই বিবেচনায় কিনেছিস।

তার মধ্যেও দুখানা বাতিল সঙ্গে সঙ্গে। আর দুটো পূর্ণিমার হাতে দিয়ে তারণ বললেন, এই শাড়িটা আগে পরে আয় দিকি। তারপর ওটা। বেশ ঝুলিয়ে কোঁচা দিয়ে পরবি। পরে আমার সামনে এসে দাঁড়া।

চুরুট ধরিয়ে তারণ বেশ গদিয়ান হয়ে বসলেন। শাড়ি পরে মিষ্টি ভঙ্গিমায় এসে দাঁড়ায়। বাপ দেখছেন। বসেছিলেন, তড়াক করে উঠে পিছন দিকটায় একবার ঘুরে দেখে নিলেন। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ অবধি খুঁটিয়ে দেখে সর্বঅঙ্গের বিচার চলছে। মা উত্থানশক্তিরহিত, দিদির সেই কাশীপুর অবধি খবর দিতে অনেক ঝামেলা। একলা হাতে পূর্ণিমা কাপড়-চোপড় পরল, পরীক্ষা দিতে বাপের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে —লজ্জা করছে, তা হলেও লাগছে কিন্তু ভালই।

হয়েছে। তারণ রায় দিলেন : আচ্ছা, এই শাড়ি বদলে অন্যটা এবারে পরে আয় —

কোন্ শাড়িতে বেশি ভাল দেখায়, তুলনামূলক পরীক্ষা। বড় গম্ভীর তারণকৃষ্ণ, শক্ত পরীক্ষার ব্যাপারে পরীক্ষকের যেমনটা হওয়া স্বাভাবিক। পূর্ণিমা দ্বিতীয় শাড়ি পরে এসে দাঁড়াল। সেই নজর মেলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা। হঠাৎ ব্যস্তসমস্ত ভাবে তারণ বললেন, আসছি আমি। এক কাজ কর্ পুনি, ভাল করে সাবান ঘষে চান করে নে। তার মধ্যে আমি এসে যাব।

সাঁ করে বেরুলেন। কে বলবে বয়স হয়েছে। সেই মুহূর্তে আবার ফিরলেন : একটা কথা মনে পড়ে গেল। তোদের কত সব আজকাল বেরিয়েছে—পাথুরে মেয়ে ঝকমকে ফর্সা হয়ে দাঁড়ায়, কুতকুতে চোখ পটলচেরা হয়—আছে তোর সে সব মশলা ? ফর্দ করে দে একটা কাগজে।

লজ্জা, লজ্জা ! বাপ হয়ে বলেন এই সব। আসলে সে যা নয়, তেমনিভাবে সাজিয়ে অন্যদের ধোঁকা দিতে চান। কষ্টও হয় বুড়ো মানুষটার ধকল দেখে। কন্যাদায় এমনি সাংঘাতিক।

পূর্ণিমা বাপের উপর তাড়া দিয়ে ওঠে : সমস্ত আছে। তোমায় ছুটোছুটি করতে হবে না।

হুঁ, আছে ! তেমনি মেয়ে কিনা তুই—অবিশ্বাসে ঘাড় নেড়ে তারণ গজর-গজর করছেন : ভস্মমাখা সন্ন্যাসিনী—তুই কিনতে যাবি শখের জিনিষ ! ধাপ্পা দিস নে, কতই বা খরচ [illegible]ক, কম হোক, করতে হবে সে খরচ।

[illegible] গেলেন। [illegible] নেই আজ তারণের। সোয়াস্তি পূর্ণিমারও কি আছে ? নিতান্ত মেয়েছেলে, তার উপরে নিজের বিয়ের ব্যাপার—বাইরে একটা নির্বিকার ভাব দেখাতে হয়। বাবাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ চলে না। মা রোগের যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন, তিনি খাড়া থাকলে খানিকটা [illegible] রহস্যভেদ হত—কোথাকার সম্বন্ধ, ছেলে কেমন, [illegible] কত দূরে [illegible] করেছে। অণিমা মাঝে মাঝে বাপের-বাড়ি এসে পড়ে— সে-ও যদি [illegible] আজকের দিনে [illegible]
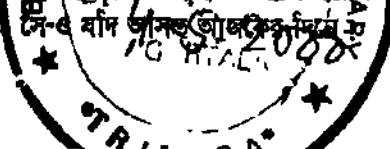
কিটব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে তারণকৃষ্ণ এসে পড়লেন। মেয়েকে ধমক দিয়ে ওঠেন। বসে আছিস যে হাঁ করে ?

কাজে যেতে মানা, রান্নাঘরে ঢুকতে মানা। বসে না থেকে কি করব ? বল তবে, গলির এমুড়ো-ওমুড়ো দৌড়ই—

চান করতে বললাম যে সাবান মেখে—

পূর্ণিমা বলে, বড় ব্যস্তবাগীশ তুমি বাবা। বেরুনো তো সেই চারটের পরে—সাত সকালে সাবান ঘষে যেটুকু চেকনাই হবে, সমস্ত বেমালুম মুছে তোমার মেয়ের আসল মূর্তি বেরিয়ে পড়বে ততক্ষণে।

তারণকৃষ্ণ প্রতিবাদ করে ওঠেন : বলি আসল মূর্তিই বা নিন্দের হল কিসে ? জাঁক করে বলি, আমার ছোট মেয়ের মতন চেহারা সমস্ত পাড়া খুঁজে দ্বিতীয় একটা পাবে না। তবে ভালর উপরে ভাল থাকে -- কায়দা-কৌশল করে আরও খানিকটা যদি তুলে ধরতে পারি, ছেড়ে দেব কি জন্যে ?

কিটব্যাগ খোলা হল। শাড়ি-ব্লাউজ কতকগুলো। তারণ বলেন, পূর্ণ-দা'র বাড়ি চলে গিয়েছিলাম। সুজাতাকে বললাম, বের কর দিকি রং-বেরংয়ের ভাল জিনিষ কতকগুলো। বড়লোক ওরা, অঢেল আছে। তার মধ্যে বেছেগুছে এই ক'টা নিয়ে এলাম।

রাগে পূর্ণিমা ফেটে পড়ে : তালুকদার বলে এত জাঁক তোমার, পরের বাড়ি কাপড় চাইতে ইজ্জতে বাধল না ? ফেরত দিয়ে এস, ভিক্ষে-করা জিনিষ আমি পরব না।

পূর্ণ-দা পর হবে কেন ? আর দায়-বেদায়ে পড়শির একটা জিনিষ চেয়ে আনলে তাকে ভিক্ষে-করা বলে না।

এতটুকু হয়ে গিয়ে তারণ মেয়ের কাছে মিনতি করছেন : যা করবার করে ফেলেছি, ঘাট মানছি বাপু তোর কাছে। কাপড় ফিরিয়ে দিলে ইজ্জত তো আর ফেরত আসবে না। এনেছি যখন, পরে আয় লক্ষ্মী-মা আমার। আগে দুবার পরেছিলি, দেখে রেখেছি। এক এক করে এগুলোও আয় পরে। আমার পছন্দে চলবি আজ—আজকের এই দিনটা শুধু। আর কোনদিন তো বলতে যাচ্ছি নে।

বাবা এত করে বলছেন—পরতে হল শাড়িগুলো, উপায় কি না পরে ? তিনখানা তিনবার পরে এসে দেখায়। শেষেরটা পছন্দ হল তাঁর : ব্যস-ব্যস, দিব্যি দেখাচ্ছে। এইটা পরে যাবি, পাকা হয়ে রইল। চানে যা এবার। চান করে যা-হোক দুটো খেয়ে পাকা একখানা ঘুম দিবি। ঘুমের পর দেহ বেশ তাজা থাকে। তিনটের সময় উঠবি —সাজগোজের পুরো একটি ঘণ্টা চাই। তাড়াতাড়িতে কাজ ভাল হয় না। বলিস তো পূর্ণর মেয়েকে ডাকব তখন, ডলাই-মলাই করে দেবে। ঐ জিনিষটা ওরা পারে খুব—দেখিসনে সর্বক্ষণ কেমন চকচকে হয়ে বেড়ায়।

বাবা !

ডাক শুনে তারণের চমক লাগে : আবার ঐ সুজাতা অবধি যদি যাও—বলে দিচ্ছি বাবা, কোনখানে আমায় নিয়ে যেতে পারবে না। দরজা এঁটে বসে থাকব, দরজা না ভেঙে আমায় পাবে না।

চারটেয় বেরুনোর কথা—তার উপরে তারণকৃষ্ণ একটা মিনিটও দেরি হতে দিলেন না। হাত বড় দরাজ আজকে। স্ট্যাণ্ডে একটা অর্ধেক-খালি বাস এসে দাঁড়াল, তারণকৃষ্ণ উঠতে দেন না : না না, বাসে কেন যেতে যাব ? ট্যাক্সি, ট্যাক্সি—

ভাবখানা, ট্যাক্সি বিনা গড়ের মাঠে কেমন করে যাওয়া যায় ! বাসভাড়া দুজনের

পাঁচ আনায় হয়ে যেত, সেখানে টাকা-তিনেক। তালুকদারের বনেদি রক্ত হঠাৎ যেন মগজে চড়ে বসেছে।

ট্যাক্সিতে উঠে তারণ মেয়েকে বলল, কাচ তুলে দে। নির্ঝঞ্ঝাটে দিব্যি যাওয়া যাচ্ছে। বাসে ধুলো-ধোঁয়া বাঁচানো যায় না, চেহারা কাপড়-চোপড় লাট হয়ে যায়—

পাশাপাশি দুজনে। এক প্রান্তে তারণ একেবারে গুটিয়ে বসলেন: তোকে নিয়েই সমস্ত—ভাল করে বোস দিকি তুই, কষ্ট না হয়।

ঘণ্টা কয়েকের সম্রাজ্ঞী হয়ে গেছে পূর্ণিমা হঠাৎ। কোন রকমে যেন তার তিলেক অসুবিধা না ঘটে। বাবা যা বলেন, নির্বিচারে সে তাই মেনে যাচ্ছে—বিয়ের কনে কিনা! কনে বলতে যা বোঝায়, কোন কিছু মেলে না তার সঙ্গে—বয়স, শিক্ষাদীক্ষা সাংসারিক জ্ঞান ঢের-ঢের বেশি। কিন্তু কনে হয়ে ঐ সমস্ত জাহির করতে নেই। দিব্যি এক মধুরতা অভিভাবকের এমনি আজ্ঞাবহনের মধ্যে। দুটো-চারটে দিনের ব্যাপার—তারপরেই আবার বুদ্ধিপক্ব ঝুনো এক রমণী।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনাসামনি গাছতলায় বেঞ্চি খান দুই। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে তারণ এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন, গাছতলা থেকে পূর্ণ মুখুজ্জে এগিয়ে এলেন: এইখানে আসবে তারা। এসে পড়বে এক্ষুনি, জায়গা আমি ভাল করে বাতলে দিয়ে এসেছি।

পূর্ণ মুখুজ্জে ভারি কারিতকর্মা। কাজের বাড়ি থেকে আহ্বান এলে খেটেখুটে দায়দায়িত্ব নিয়ে নির্বিঘ্নে কাজ তুলে দেন। অণিমার বিয়ের সময় তাই হয়েছিল—বাপ তারণকৃষ্ণ নন, পূর্ণই যেন আসল কন্যাকর্তা। এবারে এই পূর্ণিমার ব্যাপারে আরও যেন বেশি। ঘটক হঠিয়ে ঘটকালির ভারও তিনি নিয়ে নিয়েছেন—কোটরগত চক্ষু-দুটোয় পূর্ণিমার দিকে ক্ষণকাল তাকিয়ে তিনি অভয় দিলেন: ঠিক আছে। ভাবনা কোরো না ভায়া, পছন্দ আলবৎ করবে। না করে যাবে কোথায়?

বসে আছেন তিনজনে একটা বেঞ্চি নিয়ে। বসেই আছেন। তারণ ব্যস্ত হচ্ছেন: সন্ধে হয়ে আসে, রাস্তার আলোয় দেখানো কি ভাল হবে? পূর্ণিমাও অস্থির মনে মনে। রংচঙে পুতুল হয়ে কতক্ষণ ঠায় বসে থাকা যায়! বাড়ি গিয়ে কাপড়-চোপড় ছেড়ে গা ধুয়ে সাফ-সাফাই হতে পারলে বাঁচে।

তারণকৃষ্ণ আচমকা বলে ওঠেন, রবিঠাকুরের পদ্য তোকে মুখস্থ করতে বলেছিলাম—

রাগ করে পূর্ণিমা অন্যদিকে মুখ ফেরাল।

পূর্ণ মুখুজ্জে লক্ষ্য করেছেন। অবহেলার সুরে বলেন, দু-চারটে ও-বয়সে মুখস্থ থাকেই। নতুন করে কি মুখস্থ করতে যাবে? কতক্ষণই বা থাকবে তারা—পদ্য শুনতে যাচ্ছে! তুমিও যেমন!

তারণ বলেন, না শোনে ভালই। তবে সব ঘাঁটিতে তৈরি থাকা ভাল, হেলা করা কিছু নয়। ফরমাস করে বসলে তখন বেকুব হতে না হয়।

পূর্ণ পূর্ণিমাকে সাহস দিচ্ছেন: যা-ই জিজ্ঞাসা করুক ঘাবড়ে যেও না মা। মিষ্টি করে ধীরভাবে জবাব দেবে। পছন্দ আমি করাবোই। জন্ম কাটল ওদের অফিসে। এক দরজার মাঝারি একটা ঘর নিয়ে শুরু, সেই তেতলা বাড়িটা এখন পুরোপুরি নিয়ে নিয়েছে। এত করেছি, তার একটা খাতির হবে না?

ছিল পূর্ণিমা একেবারে অন্ধকারের মধ্যে, পরিচয়ের খানিকটা হঠাৎ প্রকাশ পেয়ে গেল। পূর্ণ-জেঠা যাদের চাকরি করতেন, পাত্র সেই ঘরের। দুর্দান্ত বড়লোক তারা—অত উঁচুতে হাত বাড়ানো ঠিক হচ্ছে কি? ঘটাচ্ছেন পূর্ণ-জেঠা—মেয়ে পছন্দ

হলে বিনামূল্যে বউ করে নেবে, এমনি ধরনের কথা নিশ্চয় হয়েছে। হয়েও থাকে এমন, গল্প শোনা যায়। বিস্তর আছে তাদের, আরও গুচ্ছের যৌতুক-বরাভরণ নিয়ে হবেটা কি? ঔদার্য দেখাতে অতএব ওতরফের অসুবিধা নেই। কিন্তু ঐশ্বর্যের নামেই একেবারে গলে গেলাম, তেমন পাত্রী আমি নই। শেষ বিচারটা আমার। বাবাকে গুছিয়ে বলব, পূর্ণ-জেঠাও শুনতে পাবেন।

ঝকঝকে অতিকায় মোটর এসে থামল। মোটরের আকৃতি দেখে পূর্ণিমার ভয়-ভয় করে। পূর্ণ মুখুজ্জে রাস্তার ধারেই ছিলেন, শশব্যস্তে গাড়ির পাশে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন।

নামল তিনজন—স্বাস্থ্যবান সুদর্শন যুবা তিনটি, কাছাকাছি বয়স। সহজ কথাবার্তা। সাদামাটা হাফসার্ট ট্রাউজার—কাজকর্মের পোশাক। ঐ মোটরগাড়িটা ছাড়া ঐশ্বর্যের ঝলকানি কোন দিকে কিছু প্রকাশ নেই।

তারণকে দেখিয়ে পূর্ণ বলেন, সহোদর ভাই নেই আমার, কিন্তু ভায়ার সঙ্গে ঠিক সেই সম্পর্ক। এঁদের জন্য যদি কিছু করতে পারো, সেটা আমাকেই করা হবে।

তিনজনে পাশাপাশি। মিষ্টি-মিষ্টি লাজুক হাসি মুখের উপর। দেবতাদের মধ্যে শোনা যায়, কন্দর্প সবচেয়ে রূপবান। এই বুঝি তিন কন্দর্প এসে দাঁড়িয়েছে—এ-বলে আমায় দেখ, ও-বলে আমায় দেখ। কিন্তু আসল মানুষ কোনজন এই তিনের মধ্যে?

একজনে তাদের মধ্যে কথা বলে উঠল: অফিস থেকে সোজা চলে এলাম। কিন্তু এত হাঙ্গামা কেন কাকাবাবু—আপনার হুকুমই কি যথেষ্ট নয়? দেখাশুনোর কি দরকার?

ভারী বিনয়ী, ব্যবহার বড় সুন্দর। অত বড় ফার্মের মালিক—এবং পূর্ণ-জেঠা যতই হোক সেই ফার্মের এক ভূতপূর্ব কর্মচারী ছাড়া কিছু নন। তবু কাকাবাবু বলে কত সম্ভ্রম করে কথা বলছে। বড়লোক হলেই কি খারাপ হয়—স্বভাবের ভালমন্দ টাকা থাকা না-থাকার উপর নির্ভর করে না।

একটু আগের বিরূপতা ধুয়েমুছে গিয়ে পূর্ণিমার মন এখন নির্মল। পাত্র কোনটি এই তিনের মধ্যে? তিন নয় দুই—যে জন আগ বাড়িয়ে জেঠার সঙ্গে কথা বলল, তাকে স্বচ্ছন্দে বাদ দেওয়া যেতে পারে। বিয়ের বর যত আধুনিক হোক, সংকোচ কিছু থাকবেই। কোনটি ঐ দুয়ের মধ্যে, দৃষ্টি ফেলে কিছুমাত্র বোঝা যায় না।

মুখপাত্র সেই ছেলেটি আবার বলে, হুকুম দিন কাকাবাবু, বাড়ি চলে যাই। আপনিও আসুন না। কাজ ছেড়েছেন বলে সম্পর্কও ছেড়ে দেবেন নাকি? মা বড় অসুখ থেকে উঠেছেন—তাঁকে দেখে আসবেন, চলুন।

তারণকৃষ্ণ এবং পূর্ণিমাকে নমস্কার করে তারা গাড়িতে উঠে পড়ল। তারণের দিকে পূর্ণ মুখুজ্জে অলক্ষ্য ইঙ্গিত করলেন। অর্থাৎ ফলাফল জেনে নিতে যাচ্ছেন। পূর্ণিমার বুক ঢিবঢিব করে, ছাত্রী অবস্থায় পরীক্ষার ফল বেরুনোর মুখে যেমনটা হত।

গাড়ি অদৃশ্য হল। তারণকৃষ্ণ যেন নিজেকেই বলে উঠলেন, লাগলে হয় এখন! পূর্ণিমার বুকের ভিতরের কথাও যেন তাই।

বাড়ি ফেরা যাক। ট্রামেই যাব।

পূর্ণিমা বলে, অফিস-ফেরতা ভিড় এখনও—

কথার মাঝেই তারণ খিঁচিয়ে ওঠেন: ভারি যে লাটসাহেবের বেটি! ভিড়ের ভয়ে মানুষজন উঠছে না বুঝি? কাজ চুকে গেল—গায়ের এক পর্দা চামড়া ছিঁড়ে গেলেই

বা কী এখন !

তা বটে ! যারা দেখবার, দেখেশুনে চলে গেছে। পছন্দেরও আভাস মিলেছে। মেয়ে এখন না থাকলেই বা কী ! বাবার ভাবখানা এই। কিন্তু নিজেকে নিয়ে নয়। যুবতী মেয়ে কাছাকাছি পাওয়ার লোভে ভিড় মাত্রই আপনা-আপনি ফাঁক হয়ে যায়। তার উপরে আজ এমন বেশ করে এসেছে। বেশ তাই—বাবাকে আগে দিয়ে পিছন ধরে আমি গিয়ে উঠব।

॥ ছয় ॥

রাত দশটা। পূর্ণ মুখুজ্জে এসে বাইরের দরজা নাড়ছেন। সবাই ঘুমুচ্ছে। ঘুমোবে বলে পূর্ণিমাও শুয়ে আছে, তড়াক করে উঠে পড়ল। কেমন একটা ধারণা হয়েছিল, আসবেন পূর্ণ-জেঠা এই রাতের মধ্যেই। খবর চেপে থাকতে পারবেন না। ঠিক তাই। কড়া নেড়ে ডাকাডাকি করছেন : শুয়ে পড়েছ নাকি ভায়া ?

দোর খুলে পূর্ণিমা বলল, ঘুমোচ্ছেন বাবা। শরীরটা খুব খারাপ লাগছিল। তা ছাড়া আপনি এলেন না—দাবাখেলা নেই। ডাকব ?

পূর্ণ বললেন, শরীর খারাপ হবে, সে আর আশ্চর্য কি ? যা ধকলটা গেছে আজ সমস্ত দিন ! তার উপরে মনের উদ্বেগ। শরীর তো আমারও খারাপ, তবু ভাবলাম সুখবরটা না শুনিয়ে ঘুম হবে না। না খাইয়ে কিছুতে ছাড়ল না—এই ফিরলাম, বাড়িও যাই নি। বলে দিও, পছন্দ করেছে ওরা—পাকা-কথা দিয়েছে। জানতাম, আমার কথা কক্ষনো ফেলবে না।

কিছুতে বসলেন না পূর্ণ, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলেন, বত্রিশ বছর ওদের স্বার্থে খেটেছি। ঐ যে এসেছিল অসীম অরুণ আর সমীর—এক এক ফোঁটা শিশু ওরা তখন, কোলেপিঠে নাচিয়েছি, লজেন্স কিনে খাইয়েছি, বড় হয়ে আজও সেই কাকাবাবু বলতে অজ্ঞান। না মা, বসতে গেলে দেরি হবে, দেহ ভেঙে আসছে, গিয়েই শুয়ে পড়ব। ভায়াকে এখন ডাকাডাকি কোরো না। সকালবেলা বোলো, জেঠাবাবু এসেছিলেন।

দরজা দিল পূর্ণিমা। সন্ধ্যাবেলা মানুষ তিনজন দেখেছিল, নিশিরাত্রে পাওয়া গেল নাম তিনটি—অসীম অরুণ আর সমীর। তিন নামের ভিতর কোনটি ? আসল মানুষ কে ?

বাবা বিভোর হয়ে ঘুমুচ্ছে। ডেকে তুললেই বোধহয় ঠিক হত—শোনা যেত সমস্ত। কৌতূহলে বিনিদ্র শয্যায় ছটফট করতে হত না। একই বাড়ির খুড়তুত জেঠতুত ভাই ওরা সব—কোম্পানির এক একটা সেকসনের কর্তৃত্ব নিয়ে আছে। কোন্ জন ওদের মধ্যে—অদূরকালে কোন্ কর্তাটির কড়ে-আঙুলে কড়ে-আঙুল বন্দী করে পাশে দাঁড়াতে হবে ? কোন এক বাড়ির ঘড়ির আওয়াজ ঘণ্টায় ঘণ্টায় রাত্রির পরিমাপ দিয়ে যাচ্ছে। দু-চোখ এক করতে পারে না পূর্ণিমা—মনে মনে স্বয়ম্বরা হচ্ছে। একবার এ-ছেলেটার পাশে একবার ও-ছেলেটার পাশে সকৌতুকে নিজেকে দাঁড় করায়। বরকে ঠিক মতো না জানায় এই বেশ মজা চলল।

সারারাত পূর্ণিমা লহমার তরে দু-চোখ এক করতে পারে নি। রোদ উঠেছে, পড়ে আছে তখনও। সর্বদেহ এক মধুর আলস্যে এলিয়ে আছে, অর্ধেক তন্দ্রার মধ্যে

মন জুড়ে রিমঝিম বাজনা বাজে যেন।

পূর্ণ-জেঠার গলা কানে গিয়ে ধড়মড় করে সে উঠে বসল। এত সকালেই এসে পড়েছেন—ঘুম বুঝি তাঁরও হয় নি। উচ্চকণ্ঠে আত্মকৃতিত্বের ঘোষণা: বত্রিশ বছরের চাকরি—চাট্টিখানি কথা নয়। ঘরের লোক হয়ে গিয়েছিলাম। কর্তাদের জায়গায় এখন ছেলেরা সব বসেছে। তা বলে আমার কথা ফেলবে, এত বড় তাগত নেই। বললও তাই: নেহাৎ আপনি মুখ ফুটে বললেন—আপনার হুকুম মতোই চোখের দেখা দেখে আসা। তারিখ অবধি দিয়ে দিয়েছে—পুজো সকাল সকাল এবার, পুজোর ক'টা দিন গিয়ে অক্টোবরের গোড়ায়।

কী রকম গোলমেলে ব্যাপার যেন। অক্টোবরের গোড়ায় তো আশ্বিন মাস—অকাল, বিয়ে-থাওয়া চলে না তখন। এর পরে পূর্ণিমা আর অন্তরালে থাকতে পারে না। দু-জনে ওঁরা বারান্ডায় বসেছেন, একটা ঝাড়ন হাতে পূর্ণিমা সেখানে চলে আসে।

এক গাল হেসে পূর্ণ মুখুজ্জে বলেন, কেল্লা ফতে মা-জননী। প্যাকা-কথা বলে দিয়েছে।

পূর্ণিমা শুধায়, পাকা-কথা কিসের?

কী মুশকিল! এত কাণ্ড হচ্ছে, বলো নি কিছু ভায়া? চাকরি বাগানো গেল তোমার জন্যে। কাল তো এরই জন্যে দেখিয়ে আনলাম।

পায়ের নিচেটা হঠাৎ ফাঁকা ফাঁকা লাগে। পূর্ণিমা জানলা আঁকড়ে ধরল। ঝাড়ন দিয়ে এক-আধটা বাড়ি দেয়—বারান্ডা ঝাড়পোঁছ করছে, সেই অজুহাত।

বলে, চাকরি তো করছি একটা। চাকরি আর পড়াশুনো একসঙ্গে চলছে।

পূর্ণ তাচ্ছিল্যের সুরে বলেন, মাস্টারি হল চাকরি আর আরশুলা হল পাখি—ছোঃ! আমি যে অফিসে কাজ করতাম, সেইখানে সুযোগ পেয়ে যাচ্ছ।

চাকরির জন্যে তো দরখাস্ত করতে হয়, ইন্টারভিউয়ের জন্য অফিসে ডাকে। গড়ের মাঠে গিয়ে এ কী ব্যাপার।

ঠিকই বলছ মা। ঘাড় নেড়ে পূর্ণ মুখুজ্জে খুব খানিকটা হেসে নিলেন: আইন-মাফিক হতে গেলে দরখাস্তের পাহাড় জমত, সই-সুপারিশের ঠেলায় পাগল হয়ে যেত ছেলে তিনটে। এ কেমন টিপিটিপি কাজ হয়ে গেল। আগের রিসেপসনিস্ট মেয়েটা চাকরি ছেড়ে দিল। খবর পেয়ে আমি গিয়ে ধরলাম: চাকরিটা আমায় দিতে হবে বাবাজিগণ। এ চাকরিতে চেহারাই সকলের বড় কোয়ালিফিকেশন—তাই বরঞ্চ একটিবার চোখে দেখে খুশি হয়ে এসো। অন্য সব কোয়ালিফিকেশনও আছে—যদি কিছু ঘাটতি থাকে, ধীরে সুস্থে মেরামত করে নেওয়া যাবে। ইন্টারভিউ গড়ের মাঠে—অফিসের ভিতরে হলে হৈ-চৈ পড়ে যেত। অ্যাপয়েন্টমেন্টলেটার খুব শিগগির এসে যাবে—হপ্তার ভিতরেই।

কাঠ হয়ে সব শুনল পূর্ণিমা। তারপর চা করতে গিয়ে বসে। এত বড় সুখবর নিয়ে এলেন, শুধু-মুখে কেন যেতে দেবে? আবার তারণকৃষ্ণ এক ফাঁকে রান্নাঘরে এসে বললেন, শুধু চা নয় রে, মিষ্টিমুখ করে যাবে পূর্ণ-দা। তাপসের হাতে টাকা দিয়ে বলেন, ছুটে গিয়ে সন্দেশ নিয়ে আয়।

অনেকদিন পরে তারণ আজ প্রাণখোলা হাসি হাসছেন। শয্যাশায়ী তরঙ্গিণীও দেখি উঠে পড়েছেন—দেয়াল ধরে পায়ে পায়ে হাঁটছেন। আনন্দের জোয়ার বইছে বাড়িতে।

আরও খানিক পরে তারণ এসে বলেন, বাজার-থলিটা দে তো মা। ঘুরে আসি।

পূর্ণিমা বলে, বাজারের শখ চাপল কেন বাবা, কবে তুমি যাও বাজারে?

তারণ বলেন, দেহটা কি রকম জখম হয়ে গেছে। ভিড়ের ধকল মোটে সহ্য হয় না। সেইজন্য যাই নে।

আজকে দেহ ঠিক হয়ে গেল বুঝি?

এক-গাল হেসে বলেন, ঠিক তাই। তোর মাকেও দেখলিনে উঠে কেমন হাঁটতে লেগেছে। আসল ব্যাধি হল দুর্ভাবনা। এই বাজারে পেন্সনের ঐ ক'টি টাকা সম্বল। আর ছিটেফোঁটা তুই যা দিয়ে থাকিস। ভাড়ার দায়ে কোনদিন দূর-দূর করে বের করে দেবে—পথে পড়ে মরবার দশা তখন। পূর্ণ-দা হতে সব সুরাহা হয়ে গেল। ভাবছি, এত বড় সুখের দিনে নিজে গিয়ে কিছু ভাল মাছ-তরকারি নিয়ে আসি।

তারণকৃষ্ণ খাইয়ে মানুষ চিরকাল। সঙ্গতি ফুরিয়ে এসে খাওয়ার বিলাসিতা ইদানীং বন্ধ—কোন রকমে ক্ষুধা-শান্তি করা। ভবিষ্যতের আলো দেখতে পেয়ে পুরানো ক্ষুধা সঙ্গে সঙ্গে চাড়া দিয়ে উঠেছে। বলেন, আজকেও কাজে যাসনে তুই। ছেড়ে দিচ্ছিস যখন, কী দরকার! তাপসের ইস্কুলেও একটা চিঠি দেবো, একটার সময় ওকে যাতে ছেড়ে দেয়। এসে মজা করে খাবে।

বাজারের থলি খুঁজে-পেতে নিজেই সংগ্রহ করে নিলেন। পূর্ণিমা ঝংকার দিয়ে ওঠে: তোমায় বাজার করতে হবে না বাবা। আমি যাচ্ছি। সুখের দিন আমায় নিয়েই তো—ভাল মাছ-তরকারি আমিই এনে রেঁধেবেড়ে তোমাদের খাওয়াব।

প্রতিবাদ করে তারণ কি বলতে যাচ্ছিলেন, কানে না নিয়ে থলিটা তাঁর হাত থেকে একরকম ছিনিয়ে নিয়ে দ্রুতপায়ে পূর্ণিমা বেরিয়ে পড়ল।

উৎকৃষ্ট আহারাদির পর তারণকৃষ্ণ আরাম করে বিড়ি ধরিয়েছেন। রেঁধেছে খুব ভালো। নিষ্ঠা আছে মেয়ের, সর্বকর্মে দক্ষতা। আহা, ভালো হোক ওর, কাজকর্মে উন্নতি হোক। নতুন কাজে প্রায় তো ডবল মাইনে পাবে। আর অফিসের মাইনে থেমে থাকে না, বেড়ে চলবে বছর বছর। অদৃষ্টে থাকে তো দুটো-চারটে আড়গড়া লাফিয়ে একেবারে চূড়ায় ওঠাও বিচিত্র নয়। তাই হোক, তাই হোক—ভারি গুণের মেয়ে পুনি।

তক্তপোশের প্রান্তে দেয়ালে ঠেশান দিয়ে চোখ বুঁজে বিড়ি টানছিলেন। পূর্ণিমা এসে বলে, বসে বসে ঘুমুচ্ছ কেন বাবা? ওঠো। চাদর পেতে দিই, শুয়ে পড়ো।

শুইয়ে দিয়ে আকস্মিক বজ্রনিক্ষেপের মতো পূর্ণিমা বলে, অফিসের চাকরি আমি নেবো না বাবা। পূর্ণ-জেঠাকে বলে দিও।

কেন, কেন?

তারণের চোখের ঘুম পলকে উড়ে গেল, তড়াক করে উঠে বসলেন: চাকরি নিবি নে —পাগল না ক্ষ্যাপা তুই?

পূর্ণিমা হাসিমুখে বলে, তাদেরও কিছু উপরে। তালুকদারবাড়ির মেয়ে আমি—যারা ঘর ছেড়ে বাইরে আসত না পাছে সূর্যিঠাকুরের নজরে পড়ে যায়।

তারণ বলেন, বড়মুখ করে তো বলছিস—সে জিনিষ রাখতে দিয়েছিস তুই? দিনকাল পালটেছে, তবু খানিকটা অন্ততঃ রাখা যেত। ঘর ভেঙে বেরিয়ে নিজের বুদ্ধিতে কোচিং ইস্কুলের চাকরি নিলি—আমায় জানতেও দিস নি। জাতই দিলি যখন, পেট তবে কেন ভরাবি নে? এমন আরামের চাকরি—গতর নাড়তে হবে না, সেজেগুজে চেয়ারে বসে থাকা শুধু—

চাই নে—চাই নে ঐরকম সেজেগুজে বসতে—

তারণকৃষ্ণ মুহূর্তকাল মেয়ের মুখে চেয়ে বিদ্রূপকণ্ঠে বলেন, না, বসতে যাবে কেন —গদি পেতে শুইয়ে মাস মাস মাইনেটা দিলে ভাল হত। সংসারের এই অবস্থা—মেয়ে

হয়ে সমস্ত চোখের উপর দেখেও তুই ঝগড়া করিস।

পূর্ণিমা বলে, দিদিও তো মেয়ে। সংসারের অবস্থা তখনো কিছু ভাল ছিল না। চেয়েছিলে তার রোজগার?

অণিমা আর তুই! তার কোন বিদ্যে আছে, সে কী রোজগার করবে! তার মতন মুখ্যুসুখ্যু হতিস, কেউ কিছু বলতে যেত না। তখন যে জেদ ধরলি: পড়ব আমি কলেজে। বোঝ্—

পূর্ণিমা বলে, কলেজে দিয়েছিলে— আর যা-ই হোক, চাকরির জন্যে নয়। লেখা-পড়াই করব আমি, বি-এ পাশ করব—তার পরেও পড়ব। মাস্টারি ঠিক চাকরি নয়—বিদ্যাদান, ব্রত বিশেষ। পড়াশুনোর আবহাওয়ায় আছি, অফিসের কাজ আমায় দিয়ে হবে না।

তারণ ও তাপসের খাওয়া সারা —অসুস্থ তরঙ্গিণী বসে গেছেন, ধীরে সুস্থে খান তিনি। ভাতের থালা ঠেলে সরিয়ে এঁটো-হাতে টলতে টলতে তিনি উঠে এলেন। রোগে ভুগে চক্ষু কোটরে বসে গেছে, গুহার শ্বাপদের মতো জ্বলছে সেই চোখ দুটো: হাতের লক্ষ্মী দিবি তুই পায়ে ঠেলে?

পূর্ণিমা বলে, তোমার বাপের বাড়ির শ্বশুরবাড়ির কোন মেয়ে এতাবৎ অফিস করেছে বলো দিকি মা? আর অফিসের কী কাজ শুনেছ সেটা? সেজেগুজে চেহারা দেখিয়ে মিষ্টি কথা বলে ওদের খদ্দের পটানো। তোমার শাশুড়ি আমার ঠাকুরমা আশি বছর বয়সেও পুরুষের সামনে একহাত ঘোমটা টেনে দিতেন। তাঁর নাতনিকে বেশরম বেআবরু কাজে দেবে কয়েকটা টাকার জন্যে?

তরঙ্গিণী বুঝি আর জবাব খুঁজে পান না, চুপ হয়ে গেলেন। বাপের গর্জন আরও তুমুল হল: পড়্ তবে তুই। বি-এ পাশ কর্, এম-এ পাশ কর্—পড়ে পড়ে দিগ্গজ হ। বিনি চিকিচ্ছেয় ভুগে ভুগে তোর মা মরে যাক, না খেয়ে শুকিয়ে আমিও আচমকা রাস্তায় পড়ে মরি। তাপসের পড়ার খরচ কে দেবে, ইস্কুল ছেড়ে সে বিড়ির দোকান দিক—

তাপস কোনদিকে ছিল, এই সময়টা এসে দাঁড়াল। ছেলেকে দেখে তারণের রাগ উদ্দণ্ড হল। কুলুঙ্গির মধ্যে পড়ার বই পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখা। তার সেখানে গিয়ে পড়লেন, বই ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছেন মেজেয়।

তাপস ক্ষণকাল হতভম্ব হয়ে দেখে, তারপর কেঁদে পড়ল।

ক্রুদ্ধ পূর্ণিমা ধমক দিয়ে ওঠে: কি করছ বাবা? যাও, শুয়ে পড়ো গে আবার।

তখন আর তারণ বই ফেলেন না, মুখেই গর্জাচ্ছেন: যাক এসব, বিদেয় হয়ে যাক, কি হবে গুচ্ছের জঞ্জাল জড়ো করে রেখে?

তাপসকে বলেন, পেন্সনের টাকা তো পেটে খেতেই কুলোয় না। কোথায় পাবি পড়ার খরচ? কে দেবে? ইস্কুল ছেড়ে বিড়ি বাঁধতে শেখ। মোড়ের দোকানে গিয়ে বসবি—আজ থেকেই।

চোখে অগ্নিবর্ষণ করে পূর্ণিমা বই কুড়িয়ে কুড়িয়ে কুলুঙ্গিতে আবার এনে রাখে। তাপসের চোখে ধারা গড়াচ্ছে। কাছে গিয়ে সে ভাইয়ের চোখের জল আঁচলে মুছিয়ে দেয়।

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে তাপস বলে, আমি আর পড়ব না ছোড়দি?

কেন পড়বি নে, কী হয়েছে? বাবা রাগ করে বললেন--ও কিছু নয়, যত ইচ্ছে পড়ে যাবি। আমার দেহে প্রাণ থাকতে তোর পড়া কোনদিন বন্ধ হবে না।

দুরদৃষ্ট বশে চেহারাটা মোটামুটি ভালো, রিসেপসনিস্টের পক্ষে অনুপযোগী নয় — তদুপরি লেখাপড়া কিঞ্চিৎ শিখে ফেলেছে। চাকরি অতএব না নিয়ে উপায় কি?

॥ সাত ॥

কোচিং-ইস্কুলের মাস্টারি ছেড়ে পূর্ণিমা অতএব অফিসের রিসেপসনিস্ট। হলের প্রবেশ-দরজার ঠিক পাশটিতে তার টেবিল, টেবিলে কিছু স্লিপ ও কাগজপত্র এবং টেলিফোনের রিসিভার। কাজ হল সেজেগুজে বসে থাকা, হেসে হেসে কথা বলা আগন্তুকের সঙ্গে, এ-চেম্বারে সে-চেম্বারে এ-টেবিলে সে-টেবিলে টেলিফোনের যোগাযোগ করে দেওয়া। এবং ঘন ঘন পাফ বুলানো গালে, লিপস্টিক বুলিয়ে ঠোঁটের রং মেরামত করা, আয়না ধরে ললাটের উপরের অবাধ্য চুলের রিং সামলানো। রপ্ত হতে পূর্ণিমার তিনটে চারটে দিন মাত্র লাগল।

বিস্তর মানুষের আনাগোনা নিত্যিদিন—মিস সরকারের মিষ্টি হাসি কথাবার্তা আর তড়িঘড়ি কাজকর্মে বিমোহিত প্রতিটি জন। সুখ্যাতি ওপরওয়ালার কান অবধি গেছে, তারাও খুশি—সেই তিন তরুণ উপরওয়ালা, অসীম অরুণ আর সমীর, একনজরে যারা পছন্দ করে এসেছিল। শান্তা নামে এক অভিজ্ঞ পুরানো মেয়ে এর আগে এই চেয়ারে ছিল—লাইনে আনকোরা নতুন হয়েও মিস সরকার তার অনেক উপর দিয়ে যাচ্ছে। খাসা কাজকর্ম।

যতক্ষণ অফিস করছে, এমনি। অফিস সেরে বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার ঘরের মেয়েটি। কাপড়-চোপড় জামা-জুতো ছেড়ে ফেলে কলঘরে গিয়ে দরজা দেবে। কালই তো আবার এই সমস্ত পরে যাবে—জিনিষগুলো পাট করে আলনায় তুলে রাখবে, সেইটুকু সবুর সয় না। সাবান মেখে গায়ের মুখের চোখের ঠোঁটের রং ধুয়ে ফেলে সাদামাটা একটা তাঁতের শাড়ি পরে যেন বাঁচে। এবারে রান্নাঘরের কাজ। কুসমিকে ঠেলে সরিয়ে দেয়ঃ পান-টান সাজো গিয়ে কুসমি-দি, মা ডাকছেন, ওঘরে যাও। চায়ের জলটা সে তাড়াতাড়ি উনুনে বসিয়ে দিল।

তারণের বড় শান্তি। এত গুণের মেয়ে হয় না। পিতৃভক্তি মাতৃভক্তি ছোট ভাইয়ের উপর দরদ, যে বোনের বিয়ে হয়ে গেছে তার সম্বন্ধেও সতত উদ্বেগ—এ যুগে দেখা যায় না এমনটি। সংসারের যাবতীয় দায়ঝাক্কি একে একে কাঁধে তুলে নিয়েছে। তরঙ্গিণী প্রায়ই শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন, বাড়ির গিন্নি বলতে ঐটুকু মেয়েই এখন। সকলের সব কথা তার সঙ্গে। তারণ বলেন, দুধটা যেন ঘন হয় মা, মিষ্টি একটু বেশিমাত্রায় পড়ে যেন। তাপস বলে, দুটো টাকা দে না ছোড়দি, মাঠে আজ জব্বর খেলা আছে। কুসমি বল, কি কি আনতে হবে বলো দিদিমণি, এক দৌড়ে বাজারটা সেরে আসি—ছিষ্টির কাজ পড়ে রয়েছে। তরঙ্গিণী বলেন, অমাবস্যা লেগেছে— ভাত খাবো না রে পুনি, একমুঠো আটা বের করে দিস, কুসমি দুখানা রুটি করে দেবে। সংসার-খরচা তারই প্রায় সমস্ত। বাপের পেন্সনের টাকা ছুঁতে চায় না। বলে, তোমার আফিং-দুধে খরচা কোরো বাবা। ইচ্ছে হল, সন্দেশটা-আশটা কিনে আনলে কোনদিন। এসবও আমার দেওয়া উচিত—রোজগার বাড়লে তাই করব। পেন্সনের পুরো টাকা তুমি তখন মা'র হাতে দিও।

করুক না করুক, কানে শুনেও তৃপ্তি। একালে কে এমন দেখেছে? দেবী, দেবী, দেবী! পূর্ণিমার মাথায় হাত রেখে তারণ বলেন, মেয়ে হয়ে তুই যা করছিস, ছেলে বড় হয়ে এতদূর কখনো করবে না।

চুপ করে নেই পূর্ণিমা। বি-এ'র বইটই সব কিনেছে। অবসর পেলেই বই নিয়ে

বসে। তার উপরে আর এক ব্যাপার—টাইপরাইটিং ইস্কুলে ঢুকে পড়েছে। অফিসে সারাদিন হাজিরা দিয়ে আবার এই নতুন খাটনি। খেটে খেটে এ মেয়ের যেন আশ মেটে না।

তারণ বলেন, টাইপ শেখবার কি হল রে? তোদের কাজে ওসব তো লাগে না।

রোজগার বাড়াতে হবে না? এই টাকায় চলে কখনো? টাইপের স্পীড ভালো হলে বিস্তর উন্নতি। চিরজীবন চাকরি করেছ, তোমায় কি বোঝাব আমি বাবা?

একগাল হেসে তারণ বলেন, সে হয়ে যাবে, তোর অসাধ্য কিছুই নেই। কিন্তু বলছিলাম, নতুন চাকরিতে সবে তো ঢুকেছিস—এত তাড়া কিসের? সবুর কর, দু-চার মাস জুড়োতে দে। যাচ্ছে কোথায় টাইপ শেখা!

তরঙ্গিণীর ঘোর আপত্তি। সোজাসুজি রায় দিলেন: ছেড়ে দে, কোন দরকার নেই—অফিস থেকে সোজা তুই বাড়ি চলে আসবি।

পূর্ণিমা বলে, এ চাকরি গেলে সঙ্গে সঙ্গে যাতে অন্য চাকরি জুটে যায়, তারই উপায় করে রাখছি মা।

চাকরি যাবে কেন?

কদ্দিন আর! চেহারা চটকদার করে স্মার্ট হাসি হেসে মিষ্টি সুরে কথা বলি—ডিউটি আমার তাই। এ জিনিষ যদ্দিন পারব, চাকরিটা থাকলেও থাকতে পারে। বয়স হয়ে গিয়ে যখন গাল তুবড়ে যাবে হাসি উৎকট দেখাবে, চাকরি সঙ্গে সঙ্গে খতম। একটা দিনও দেরি করবে না। কিন্তু পেটের ক্ষিধে তখনো থাকবে মা। আখের ভেবে টাইপ শিখে রাখছি। শর্টহ্যান্ডটাও শিখে নেবো। রিসেপসনিস্ট তখন থেকে স্টেনোর চেয়ারে।

তরঙ্গিণী কথাগুলো পুরো বিশ্বাস করলেন না। আর যা ভাবছেন স্পষ্ট বলা যায় না মেয়ের কাছে। এই রোজগেরে মেয়ের কাছে। বলেন: তোর চাকরির অন্ন চিরকাল খাবো, তাই বুঝি ভেবেছিস? তাপসের পাশটা হতে যা দেরি, সে-ই খাওয়াবে। ওঁর অফিসে গিয়ে পড়লে একটা কিছু না দিয়ে পারবে না। তুই নিজের সংসারে চলে যাবি তখন।

পূর্ণিমা ঠাট্টা করে বলে, গাছে কাঁঠাল—ঠোঁটে তেল মেখে বসে আছ তুমি মা।

আচমকা তরঙ্গিণী আগুন হয়ে উঠলেন: খেতে দেবে না ছেলে? না দেয়, গলায় দড়ি দিয়ে সকল ভাবনা চুকিয়ে দেবো। তোকে কোন দায় ঠেকতে হবে না। শুধু এই ক'টা বছর তুই ঠেকিয়ে দিয়ে যা।

সন্ধ্যা থেকে জোর দাবার আড্ডা। গভীর রাত্রি অবধি চলে। এরই মধ্যে কখন পূর্ণিমা বাড়ি ফিরে রান্নাঘরে ঢুকে গেছে—কেটলি ভরে চা তৈরি করে হাজির। খেলা ভুলে তারণ সস্নেহে মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকেন। বলেন, বুঝলে পূর্ণ-দা, মা দশভুজা নিজে মেয়ে হয়ে আমার ঘরে এসেছেন। কাজ করছে দশখানা হাতে—দুটো হাতে এত-দূর হয় না। সকল দিকে নজর, সকলের উপর মমতা। বাড়ি এসেই রান্নাঘরে ঢুকে রাঁধতে লেগেছে—তার মধ্যেও সকল হুঁশ রয়েছে। এই দেখ চাইতে হয় নি—চা কেমন এসে গেল। মা-জননী যতক্ষণ বাড়ি থাকে, যখন যেটি আবশ্যক আপনা-আপনি এসে পড়ে।

উল্লাসে বলে যাচ্ছেন। পূর্ণিমার কানে যায় কি না যায়—দুটো কাপে চা ঢেলে দুধ-চিনি মেশাচ্ছে। পূর্ণ মুখুজ্জে সহাস্যে ঘাড় দোলান: শিক্ষার সুফল। মেয়ে কলেজে দিতে চাচ্ছিলে না ভায়া, আমিই তখন জোরজার করেছিলাম।

তারণ বলেন, তুমি কিন্তু পূর্ণ-দা অন্য লোভ দেখিয়েছিলে : কলেজে দিলে ঝট করে বিয়ে হয়ে যাবে। ঘটক আরও বলল, পাঠ্য বই কেনার দরকারই হবে না। আজেবাজে যা-হোক কিছু হাতে নিয়ে এক মাস দু মাস ঘোরাঘুরি করতেই কেল্লা ফতে। হল কই ?

পূর্ণ মুখ বুজে দমেন না। গর্বভরে বলেন, বোঝ তবে স্ত্রী-শিক্ষার গুণ। শাঁখের করাত—এগোলে কাটবে, পিছোলেও কাটবে। বিয়ে লেগে যেত ভাল, না লাগল তো আরও ভাল। মেয়ে রোজগারে নেমে পড়েছে। মুনাফা সকল দিকে। দেশসুদ্ধ তাই বুঝে কোমর বেঁধে লেগেছে—অলিতে-গলিতে মেয়ে ইস্কুল, মেয়ে-কলেজ।

উনুন কামাই যাচ্ছে, বুঝি মনে পড়ে গেল। দুই কাপ দুজনের সামনে দিয়ে নিজের ও কুসমির চা নিয়ে পূর্ণিমা ছুটল।

এক রবিবার সকালে অণিমা বাপের বাড়ি এল। বিশেষ করে রবিবার বেছে নিয়েছে —ছুটির দিনে বোনের অফিস নেই, ভাইয়ের ইস্কুল নেই, ভাই-বোন, মা-বাপ সকলের সঙ্গে আমোদ করে পুরো দিনমানটা কাটাবে।

গরিব এখন তুলসীদাস, বড়বাজারের দোকান লিকুইডেশনে গেছে। স্বর্গীয় কর্তা বুদ্ধি করে লিমিটেড কোম্পানী করেছিলেন, দোকানের দেনায় তাই কাশীবাবুর বাড়ি নিয়ে টানাটানি পড়ল না। নিজেরা উপরতলায় উঠে গিয়ে নিচেরতলা ভাড়া দিয়েছে। তাই একমাত্র আয়, কস্টেসুস্টে চলছে। এত বাবুগিরি বিলাসিতা ছিল—এখন নিতান্তই ছা-পোষা গৃহস্থ। যতদিন না তুলসীদাস একটা কিছু জোগাড় করছে, চলবে এমনি।

গরিব হয়ে তুলসীদাস ভাল হয়ে গেছে সেই রুক্ষ মেজাজ নেই, অনুতাপ এসেছে বোধহয় মনে-মনে। হিড়িম্বাঠাকরুন ঘাড় থেকে নেমেছে—সুখের পায়রা ওরা, সুখের অভাব দেখলেই পালাবে। বাইরের কাজকর্মও নেই—বাড়ি থাকে তুলসীদাস প্রায় সর্বক্ষণ। রঞ্জুকে নিয়ে বউয়ের আঁচল ধরে ঘোরে। বিয়ের পরে গোড়ায় গোড়ায় যেমন করত। এই এসেছে অণিমা বাপের বাড়ি, কথা আছে বিকেলবেলা নিজে এসে সে নিয়ে যাবে। অণিমা বলেছিল, তুমিও চলো না। একা একা বাড়ি থেকে কি করবে ? বাবা-মা বড় খুশি হবেন। তুলসীদাস পালটা বলল, তার চেয়ে রঞ্জুকে রেখে যাও। একলা না থেকে দুজন হবো।

শেষ অবধি ঠিক হল, এদের মা-ছেলেকে নিয়ে আসবে, তুলসীদাস গিয়ে, চা-টা খাবে ওখানে। এই তো অনেকখানি—শ্বশুরবাড়ি খুব বেশীক্ষণ কাটাতে সংকোচ বোধ করে, বোঝে সেটা অণিমা। আগে তো ভাল ব্যবহার করে নি অণিমা সম্পর্কিত কারও সঙ্গে। সেই লজ্জা।

এক সময় অণিমা নিরিবিলি পূর্ণিমাকে ধরেছে : অফিসের ছুটি পাঁচটায়, বাড়ি ফিরিস তুই কখন ?

এই রবিবারের দিনটা বেছে বাপের বাড়ি এসেছে শুধুই কি একসঙ্গে সকলে কাটাবে বলে, না তরঙ্গিণী কোন রকম কল টিপছেন পিছন থেকে ? রবিবার বলে ধীরে-সুস্থে অনেকক্ষণ ধরে জেরা চালান যাচ্ছে।

অণিমা বলে, বাড়ি ফিরতে শুনি আটটা-নটা বেজে যায়। কি করিস অতক্ষণ ?

পূর্ণিমা বলে, আরও একবার এমনি তো শুনেছিলি—বাড়ি আসতে সন্ধ্যা হয়ে যেত তখন। এবারে রাত্রি—আরও বানু হয়ে উঠেছি কিনা এ্যাদ্দিনে। কান তোর খুব লম্বা কিন্তু দিদি। অতদূর কাশীপুর থেকে কেমন সব শুনে ফেলিস।

মিথ্যে যখন নয়—আর একদিন-দুদিনের ব্যাপারও নয়, কেন শুনতে পাব না ?

পূর্ণিমা বলে, অতক্ষণ ধরে কি করি, সেটাও কেন শুনে নিসনে ? জিজ্ঞাসা করে

নিতে হবে কি জন্য ?

শুনেছি বই কি। সবাই যেটুকু শুনেছে তার বাইরেও অনেক কিছু। সেই সমস্ত বলবি আজ আমায়। একটা কথাও চেপে রাখবি নে।

উঃ দিদি, কী কড়া নজর তোদের! কতদিকে কত চর!

দু-হাত ঘুরিয়ে হতাশভাবে পূর্ণিমা বলে, কিছু চাপা রাখবার জো নেই তোদের কাছে। তোর কাছে না, মায়ের কাছেও নয়। ভালবাসিস কিনা বড্ড—বড়শি গেঁথে গুপ্ত-খবর তুলে ফেলিস।

সেই চপল কণ্ঠ পূর্ণিমার, সেই রকম ঠোঁট-চাপা হাসি। এমনি ধারা প্রশ্নের জবাবে আর একবার যেমনটি করেছিল। বলে, টাইপরাইটিং ক্লাস কতক্ষণেরই বা! তার পরেই মজা চলল। রাত করে ফিরি বলছিস—ছাড়েই না মোটে কি করব। আমারও হচ্ছে করে না ছেড়ে আসতে। নায়িকা হয়ে সেখানে কত মিষ্টি-মিষ্টি কথা শুনি—বাড়ি এলেই তো, পুনি এটার কি হবে, ওটা না হলে চলছে না আর—এই সমস্ত। নায়িকা তখন রান্নাঘরে ঢুকে জিরা-মরিচ বাটতে বসে গেলেন।

চোখ-মুখ নামিয়ে পূর্ণিমা বলে যায়। অণিমা যাঃ যাঃ—করে, আর অপলক মুখ-চোখ মেলে যেন অমৃতধারা শুনছে। বলে, যাঃ, বানিয়ে বলছিস তুই। অতসব বিশ্বাস হয় না।

পূর্ণিমা বলে, মরীয়া হয়ে লেগেছি দিদি। বিয়ে হয়ে তোর মতন ঘর-সংসার হবে। মা-মা করে বাচ্চা ঘুরঘুর করবে—কত লোভ আমার! বুড়িয়ে যাচ্ছি—তা বাবা বর না জুটিয়ে চাকরি জোটালেন একটা। তুই নিজে মজা করে কখনও ঝগড়া করিস বরের সঙ্গে, কখনও গদ্‌গদ হস, আমার বেলাতেই যত ঝগড়া। আমি তাই কারো ভরসায় না থেকে নিজে লেগে গেছি। এক-আধটা নয়, আধ ডজন বর এরই মধ্যে পিছন নিয়েছে।

যাঃ—

পূর্ণিমা নিরীহভাবে বলে, কেন, মা-ও তো জানেন।

মা জানবেন কেমন করে ?

পূর্ণিমা জোর দিয়ে বলে, জানেন। সত্যি কথা কথা বল্ দিকি, নইলে ছোট বোনের মরা-মুখ দেখবি। বলে নি তোকে, অত রাত অবধি পুনিটা কী কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে—টাইপ শেখে কতক্ষণই বা! মা বলে নি এমনি সব ?

অণিমা হঠাৎ জবাব দিতে পারে না।

পূর্ণিমা বলছে, আমি জানি, আমি জানি। চাকরি-করা বাইরে-ঘোরা মেয়েদের ব্যাপার যারা ঘরগৃহস্থালী ছেড়ে এক-পা বাইরে যায় না, তারাই বেশি করে জেনে বসে আছে। কী তারা বলাবলি করে, শোনা আছে আমার। মা তোকে যা সব বলেছেন হুবহু এই না হলেও মোটামুটি এই জিনিষ। বাড়ি ফিরে কড়া নাড়ি, মুখ কালো করে মা দরজা খুলে তক্ষুনি আবার গিয়ে শুয়ে পড়েন। বুঝতে কিছু বাকি থাকে না এর পর। দিন-রাত্রির মধ্যে মায়ের সঙ্গে সাকুল্যে পাঁচ-সাতটা কথা—নিতান্ত যা নইলে নয়। দোষ দিই নে—তালুকদার-বাড়ির বউ, ওঁর আমলে সর্বপ্রথম শহরে এলেন। শাশুড়ি দিদি-শাশুড়ির মুখে বাড়ির মেয়েদের হালচাল অন্যরকম শুনেছেন। তোর মধ্যেও সেই জিনিষ দেখেছেন। সোমত্ত মেয়ে নিত্যিদিন রাত করে ফিরি, যত কৈফিয়তই দিই সন্দেহ তবু যায় না। সন্দেহের সঙ্গে মিশে রয়েছে আবার ভয়।

কৌতুক স্বরে শুরু করেছিল, বলতে বলতে কণ্ঠ কটু হয়ে উঠল। বলে, ভয়টা হল সংসার চলবে কি করে ? বাপ-মায়ের এই বয়সে যা-যা দরকার, উচিত খরচা হলে

পেন্সনের টাকা ক'টা তাতেই ফুঁকে যায়। প্রেম-টেম করে বেড়াই—সেটা অপছন্দের বটে, কিন্তু প্রেম করতে করতে বিয়ে করে বসলে না পাড়ি কারও গলায়! তা হলে তো তাহা সর্বনাশ। দিদি, তুই অভয় দিয়ে দিস মাকে। ও'দের ইচ্ছাই শিরোধার্য, বিয়ে করে বিপাকে ফেলব না। রাত করে ফিরি ও'দের সংসারের ভবিষ্যৎ ভেবেই—এই চাকরি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য চাকরি যাতে পেতে পারি।

অণিমা ঝিম হয়ে শুনছিল। বলে, চাকরি যাবার এখন তো কিছু নয়, বুড়ো তুই আজকেই হয়ে যাচ্ছিস নে। এ-ও সত্যি, সেদিনের অনেক আগেই তাপস মানুষ হয়ে দায়ভার কাঁধে নিয়ে নেবে। মায়ের কথা হল তাই—টাইপরাইটিং নিয়ে লেগে পড়বার এক্ষুনি কোন গরজ নেই। যাক না দু-চার বছর। তখন আর দরকারই থাকবে না একেবারে। ও'দের সকলের সেই প্রত্যাশা।

পূর্ণিমা বলে, দু-চার বছর কি, দু-চার দিনও সবুর সইছে না আমার। টাইপ খানিকটাও যদি রপ্ত থাকত, ডিরেক্টরদের গিয়ে বলতাম, স্টেনোর কাজ দিন, চেয়ার আমার ভিতরে চলে যাক।

বলে, মেয়েদের একালে শুধু গৃহস্থালী সামলালেই চলবে না, একলা পুরুষের রোজগারে চলার দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে। ক্ষমতা আছে যখন, কেনই বা পরাশ্রয়ী হয়ে থাকব? বাবা মোটামুটি নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন! পূর্ণ-জেঠাকে ধরে তাঁর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে চাকরিটা তিনিই জুটিয়ে আনলেন। মায়ের অবস্থাটা ত্রিশঙ্কুর মতো, স্বর্গ-মর্ত্যের মাঝামাঝি—চাকরি-বাকরি করবে মেয়ে, কিন্তু পুরুষ-ছেলের দিকে না তাকায়! অফিস বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে দুদ্দাড় করে বাড়ি এসে সদর-দরজায় খিল এ'টে দেবে। আর আমি হলাম—

থেমে গেল পূর্ণিমা। মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে আবার বলে, বাইরে যেমনই দেখিস, মনে-মনে আমি হলাম পুরোদস্তুর সেকেলে। সেকালের তালুকদার-বাড়ির মেয়ে। কাজ-কারবারে কত লোকের অফিসে আনাগোনা—মুখপাতে সকলে আমার কাছে আসবে। জিজ্ঞাসাবাদ করবে, হাসবে, তাকিয়ে থাকবে, অকারণে দাঁড়াবে কিছুক্ষণ, ছল করে কথাবার্তা বাড়াবে। বুঝি আমি সমস্ত। ইচ্ছে করে, গায়ের উপর কালি-গোলা জলের বালতি ঢেলে দিতে পারতাম—সর্বাঙ্গ লোকগুলোর কালি-কালি হয়ে যেত! কালীঘাটের পথে দেখেছিস দরজায় দরজায় মেয়েরা দাঁড়িয়ে। আমি যেন তাদেরই একটি। বাঁধা মাস-মাইনের হাসি কথাবার্তা রূপ বয়স ঠাটঠমক ওদের খদ্দেরের কাছে বেচতে হয় নিত্যিদিন। পারছি নে আর দিদি, বড্ড গা ঘিনঘিন করে।

॥ আট ॥

তারপরে ছ'টা মাসও যায় নি—দরজার পাশ থেকে পূর্ণিমার চেয়ার অনেক ভেতরে চলে গেছে। ডিরেক্টরদের চেম্বারের কাছাকাছি। স্টেনো সে এখন!

মেজো মনিব অরুণের কাছে কথা পাড়তেই সে সায় দিয়ে বলেছিল, ঠিক ঠিক! কিছুদিন থেকে আমরাও ভাবছি জিনিসটা। দু-জন টাইপিস্ট আছেন—ও'রা পেরে ওঠেন না। কাজ বেড়ে গেছে, বিস্তর বাকি পড়ে থাকে। বসুন, আর দু-ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলে নিই। স্পীড কদ্দুর উঠেছে? তার জন্য ঘাবড়াবেন না, কাজ করতে করতে চড়বড় করে উঠে যাবে।

ক'দিনের মধ্যেই চেয়ার পড়ল অপর দুই টাইপিস্টের পাশে। ...

সেন—রিটায়ার করলেই হয়। অন্যটি মেয়ে। নলিনাক্ষ বলেন, কতকাল ধরে বাড়তি একজন লোকের জন্য বলছি, কর্তারা গ্যাঁট হয়ে ছিলেন : এস্টাবলিশমেন্ট আর সিকি-খানাও বাড়ান হবে না। তুমি মা একবার বলতেই হয়ে গেল। ভাল হল, আমাদের কাঁধ হাল্কা হল খানিকটা। কিন্তু তোমার দিক দিয়ে বলি—এত যখন নেকনজর, পে-ক্লার্কের কাজটা চাইলে না কেন তুমি? এক বছরের উপর খালি পড়ে আছে, একে-ওকে দিয়ে চালাচ্ছে।

উপমা দিয়ে একটা গল্প বললেন। উপবাসী ব্রাহ্মণ তপস্যা করছেন, শিবঠাকুর বর দিতে আবির্ভূত হলেন : কি প্রার্থনা? ব্রাহ্মণ বলেন, এক ধামা মুড়ি দাও ঠাকুর, পেট ভরে খাই। খাদ্যের মধ্যে ক্ষীর-সন্দেশের নাম মনে পড়ল না। তোমারে বেলাতেও মা সেই বৃত্তান্ত। পে-ক্লার্কের কাজে উপরি-আয় নিদেনপক্ষে দৈনিক দশটি টাকা। আর এ যা নিয়েছ—মেশিনের চাবি টিপতে-টিপতে আঙুল ভোঁতা হয়ে যাবে। মাইনে বলে খাতায় লিখে যে ক'টি টাকা দেবে তার উপরে একটি আধলাও আর নয়।

তাপস পাশ করেছে। যেমন-তেমন পাশ নয়—ফার্স্ট ডিভিসন, তদুপরি চারটে লেটার। আশা করা যায়, ছোটখাট একটা স্কলারশিপও পেয়ে যাবে। এত ভাল করবে, বাড়ির কেউ ভাবতে পারে নি—তাপস নিজেও না। কিন্তু হলে হবে কি—পরীক্ষা শেষ হবার পরের দিন থেকেই ঘোরাঘুরি করছে। তারণ নিজে সঙ্গে করে তাঁর পুরানো অফিস-সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কাছে নিয়ে দরবার করেছেন। চাকরি দেওয়া পড়ে মরুক—কেউ এতটুকু মিথ্যে ভরসাও দিল না, রাতারাতি সব সত্যবাদী যুধিষ্ঠির হয়ে গেছে। সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সাহেব তো হেসেই খুন : ধরে নিলাম পাশই করবে, কিন্তু হায়ার-সেকেণ্ডারি পাশে কি চাকরি পাবে ছোকরা? আপনিই বা সরকারমশায় জেনেশুনে কি জন্য হন্ড-হন্ড করে ঘুরছেন? পিওনের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছিল—এক ঝুড়ি দরখাস্ত, তার ভিতরে ডজনখানেক অন্তত গ্রাজুয়েট—

উচিত জবাব তারণের মুখে এসেও আটকে রইল : তুমি নিজে ক'টা পাশ? চাকরি করে একসঙ্গে জনম কাটালাম, অত হামবড়া ভাব আমার কাছে না-ই দেখালে!

মুখে এসেছিল কথাগুলো। কিন্তু উমেদার হয়ে এসেছেন, আরও হয়তো আসতে হবে—অসহ্য কথা কানে শুনেও চুপচাপ বেরিয়ে আসতে হয়। আরও এমনি কত জায়গায় তারণ সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন, পূর্ণ মুখুজ্জের সঙ্গে পাঠালেন, কত রকম সুলুকসন্ধান দিলেন—তাপস সারা দিনের পর বিষণ্ণ মুখে বাড়ি ফিরে ক্লান্তিতে শুয়ে রাত্রে আর উঠতে চায় না, ধরে তুললেও ক্ষিধে নেই বলে আবার চোখ বোঁজে।

এমনি সময় পরীক্ষার ফল বেরুল। বাহাদুর ছেলে। কত অসুবিধার মধ্যে পড়া-শুনো করে—বাইরের লোক না-ও যদি বোঝে, পূর্ণিমা অহরহ চোখের উপর দেখে এসেছে। আরও কিছুদিন পর দৈবাৎ একটা চিঠি পূর্ণিমার হাতে এসে পড়ল। তাপসের নামের চিঠি, কিন্তু খাম খুলে পূর্ণিমা আগে পড়ে নিল।

তরঙ্গিণীর কাছে গিয়ে পূর্ণিমা বলে, নেকলেশটা দাও মা—

তরঙ্গিণী বুঝে উঠতে পারেন না : কোন্ নেকলেশ?

ক'টা নেকলেশ আছে আমার? সেই যেটা গড়ালে তোমার হেলেহার ভেঙে।

মা বলেন, কি করবি?

পরব আমি, শখ হয়েছে। বাঃ রে, অবাক হবার কি? আমার নাম করে গড়িয়েছ, গয়না তো পরবার জন্যই লোকে গড়ায়।

তরঙ্গিণী বলেন, বিয়ের সময় পাবি, সেই জন্যে গড়ানো হয়েছে। এখন পরে পুরনো করবি কেন?

পূর্ণিমা হেসে বলে, বিয়ে বিশবাঁও জলের নিচে।

সে কী কথা! পাশ করে গেছে তাপস। যা হোক একটা চাকরি হলেই তোর দায় খালাস হয়ে গেল। বিয়ের তখন বাধা কিসের?

দৃঢ়কণ্ঠে আবার বলেন, চাকরি হোক ভাল না হোক ভাল, বিয়ে তোর আমি দেবই। এই বছরে।

চাকরি কেমন হবে শোন নি মা? বাবা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন অন্য কোথাও নয়—নিজের পুরোনো অফিসে। গিয়েছিলেন সেই লোকের কাছে পাশাপাশি চেয়ারে বিশ বছর ধরে যে কাজ করেছে। বলে দিয়েছে, পিওনের চাকরি পেতে পারে বড়জোর। তার জন্য কলেজে পড়ে গ্রাজুয়েট হতে হবে কিনা, সেটা তেমন স্পষ্ট করে বলে নি।

তরঙ্গিনী বলেন, ও একটা কথার কথা। অন্য কিছু নাই যদি হয়, নেবে তাপস ঐ পিওনের চাকরি। তাই বলে তুই যে চিরকাল ছন্নছাড়া যোগিনী হয়ে ঘুরবি, সেটা আমি হতে দিচ্ছি নে।

পূর্ণিমা চোখ বড় বড় করে বলে, সর্বনাশ। যোগিনী কোথায় দেখলে মা? আমি যে হলাম দেবী—দশভুজা। অন্তর্যামীর মতো সকল দিকে নজর রেখে দশখানা হাতে খেটে যাই। বিশ্বাস না হয় তো বাবাকে জিজ্ঞাসা করে দেখ। তিনি বলবেন।

কথা ঘুরিয়ে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলে, যোগিনী বলেই যদি ঠেকে—গয়না দাও না, গয়না পরে সাজ-পোষাক করে রাজরাণী হয়ে বেড়াই। শখ হয়েছে, দেখিই না পরে কেমন মানায়। তুমি মা অমন করছ কেন?

বেশী বলাবলিতে উল্টো ফল হল। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তরঙ্গিণী বলেন, শখ করবার মেয়ে তুই নোস। অন্য কোন মতলব আছে। গহনা দেব না স্পষ্ট কথা। বিয়ের নাম করে গড়ানো—কনে-পিঁড়িতে বসিয়ে তবে ঐ নেকলেশ পরাব।

তখন পূর্ণিমা নিজমূর্তি ধরে: ঠিক ধরেছ তুমি মা। শখ বলে কিছু নেই আমার। মেয়েমানুষের শখ থাকে, দেবীর কোন শখ থাকতে নেই। পিওন হবার জন্য আমার ভাই আসে নি। চাকরিই করবে না সে। ডাক্তার হবে মেডিকেল কলেজে পড়ে। ভর্তি হতে গুচ্ছের টাকা লাগে। সে টাকা নেই আমার। থাকলে তোমাদের জানতেও দিতাম না।

মায়ে-মেয়ের বচসার মধ্যে তারণ এসে দাঁড়িয়েছেন। নিঃশব্দ ছিলেন—এইবার কৌতুককণ্ঠে বলে উঠলেন, আস্পর্ধা তোর কম নয় পুনি। ডাক্তারি পড়াবি ভাইকে—তা আবার মেডিকেল কলেজে? ভর্তি হওয়া সহজ নয় রে, টাকার আণ্ডিল থাকলেও ভর্তি হওয়া যায় না। তদ্বির লাগে, বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়। তা-বড় লোকের ছেলেও কত সময় ঢুকতে পায় না। আমাদের জেনারেল ম্যানেজার, মনে আছে, পাঁচ হাজার অবধি বাজে-খরচ করতে রাজি ছিলেন—তবু ঢোকাতে পারেন নি।

পূর্ণিমা বলে, সেই অসাধ্যসাধন তাপস করেছে—সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায়। কাউকে কিছু বলে নি—চিঠিটা দৈবাৎ আমার হাতে পড়ে গেল।

চিঠিখানা পূর্ণিমা বাপের হাতে দিল: তাপস সরকার মনোনীত হয়েছে, যে কোন দিন এগারোটা থেকে দুটোর মধ্যে সে ভর্তি হতে পারে। অমুক তারিখের মধ্যে ভর্তি না হলে ধরে নেওয়া হবে সে অনিচ্ছুক। তার জায়গায় তখন অন্য ছেলে নিয়ে নেবে। মাত্র পাঁচটা দিন মাঝে আছে সেই শেষ তারিখের।

তারণ বলেন, গয়না বেচে হোক যেমন করে হোক ভর্তি না হয় হল। তার পরে? পাঁচ-পাঁচটা বছর ধরে পড়ার খরচ কে চালাবে?

পূর্ণিমা বলে, আবার তাপসের দিকটাও ভেবে দেখ বাবা। একলা নিজের ক্ষমতায় এতদূর করেছে, আমরা অপদার্থ বলে যদি সব পণ্ড হয়ে যায়, মনে মনে মস্ত ঘা খাবে সে। আমরাই বা মুখ তুলে তার সামনে তাকাব কি করে?

তরঙ্গিণী ধমক দিয়ে উঠলেন: আরও পাঁচ বছর ভূতের খাটুনি খাটবি, সেই চক্রান্ত করছিস তুই। হবে না পুনি, বিয়ে তোর আমি দেবই। এই দু-চার মাসের মধ্যে। চাকরি-বাকরি না করে ছেলে যদি লাটসাহেব হবার মতলব এঁটে থাকে, করুক তাই। না হয় আমরা গলায় দড়ি দেব—তখন তো আর খাওয়া-পরার ঝঞ্ঝাট থাকবে না।

এই পর্যন্ত তখন। খানিক পরে তাপস বাড়ি ফিরলে তরঙ্গিণী কাছে ডাকলেন: চাকরি হয় না শুনি—হবে কি করে, চাকরি জোটানোর মন আছে তোর? ডাক্তারি পড়া হবে, বিয়ের গহনা বেচে ছোড়দি ভর্তির টাকা দেবে, খেটে খেটে মুখের রক্ত তুলে পড়ার খরচ জোগাবে। নিজের সাধ-আহ্লাদ তার কিছু থাকতে নেই, গুষ্ঠিসুদ্ধর জন্য চিরজন্ম খেটে যাবে শুধু। নিজের বাপ পর্যন্ত দাবা নিয়ে দায়দায়িত্ব বিস্মরণ হয়ে থাকে, আমি মেয়েমানুষ আঁকুপাকু করে কি করব?

গজরগজর করে চলেছেন। কী যেন সাংঘাতিক অপকর্ম করে বসেছে সেই লজ্জায় তাপস ঘাড় নিচু করে আছে। মুখে জবাব নেই। কানে শুনে পূর্ণিমা ছুটে এসে পড়ে। তরঙ্গিণীকে বলে, ওকে কেন বকছ মা? চিঠি এসেছে, এখন অবধি ও জানেই না। যা বলতে হয় আমায় বলো।

তাপসের মুখ তুলে ধরে হেসে উঠল। হেসে যেন তার মনের ভার উড়িয়ে দিতে চায়। বলে, ভাই আমার কত বড় হবে দেখো মা। বিয়ে না হয় ক'টা বছর পিছিয়ে গেল। সব গয়না তাপস সেই সময় পূরণ করে দেবে। বাড়তি নতুন নতুন গয়নাও দেবে কত। কী বলিস রে, মায়ের সামনে কথাবার্তা হয়ে যাচ্ছে, দিতে হবে কিন্তু।

দু হাত মেলে জড়িয়ে ধরে ছোটমেয়েকে যেমন সান্ত্বনা দেয়, পূর্ণিমা তেমনি ভঙ্গিতে বলে, মুখ গোমড়া করো কেন মা, লাভেরই ব্যাপার তো। এক গয়না দিয়ে পাঁচ-সাতখানা পেয়ে যাচ্ছি। এই একবার বলে নয়—কত দেবে, কত নেবে! চিরকাল ধরে। এক ছেলে তোমাদের, আমার আর দিদির একটিমাত্র ভাই। ক'টা বছর সবুর করো—ডাক্তার-ভাইকে নিয়ে কত জাঁক করব আমরা দেখো।

মায়ের আঁচলে চাবির গোছা—লক্ষ্য ঠিকই আছে, চাবির থোলো মুঠির মধ্যে এঁটে ধরল। লড়ালড়ি করে মেয়ের সঙ্গে পারা যাবে না, সে চেষ্টায় তরঙ্গিণী গেলেন না। ওঘরে গিয়ে পূর্ণিমা আলমারি খুলি ফেলল, টাকাকড়ি ও দামি জিনিষপত্র মা কোন খোপে রাখেন জানা আছে—

তাপস কোন্ দিক দিয়ে এসে পায়ের উপর দড়াম করে আছড়ে পড়ল।

ভুল করেছিলাম ছোড়দি। এতদূর হবে আমি ভাবতে পারি নি।

হাসিমুখে পূর্ণিমা বলে, কত দূর কি হল রে?

গয়না কেন বেচবি ছোড়দি? সে আমি কিচ্ছুতেই হতে দেবো না—

বলতে বলতে তাপস কেঁদে ফেলে: বন্ধুরা বলল, পরীক্ষা যত ভালোই হোক এখনকার দিনে বিনা তদ্বিরে কিছু হয় না। তারই পরখ করবার জন্য ভর্তির ফরম এনে পূরণ করে দিলাম। ইন্টারভিউয়ে ডাকল, যা মুখে এলো জবাব দিয়ে এলাম। সত্যি সত্যি নিতে চাইবে, আমি স্বপ্নেও ভাবি নি ছোড়দি। এমন গেরো, চিঠিটাও পড়ল

তোর হাতে। আমি পেলে সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়ে ফেলতাম, কাকপক্ষীও টের পেত না। ডাক্তারি পড়ায় আমার একটুও সাধ নেই।

পূর্ণিমা ধমক দিয়ে ওঠে: সাধ তোর না হোক, আমার। অফিসের কেরানী না হয়ে ডাক্তার হবি তুই। মাথার উপরে গুরুজনরা সব আছি—আমাদের নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কি—তুই তার ভিতরে পড়ে জেঁপোমি করবি কি জন্যে? আমাদের বিবেচনায় যা আসে সেই ব্যবস্থা করব—তোকে যেমন যেমন বলা হবে তেমনি শুধু করে যাবি।

মুখের দিকে তাকিয়ে মায়া হল পূর্ণিমার। সুর নরম করে মধুকণ্ঠে আবার বলে, ভাই আমার মস্তবড় ডাক্তার হবে, নামযশ ছড়াবে চতুর্দিকে, কত লোকের জীবন দেবে, মানুষ কত উপকার পাবে— আমার এমন সাধে কেন তুই বাদ সাধবি? গয়না তো একখানা যাচ্ছে—ঐ একখানার জায়গায় গা ভরে তুই গয়না দিয়ে দিস। ক'দিন আর—চারটে পাঁচটা বছর। তার মধ্যে বুড়ো হয়ে গয়না পরার দিন ফুরিয়ে যাবে—তাই ভেবেছিস নাকি?

তরঙ্গিণীর কাছে গিয়ে তাঁকে শান্ত করছে: সমস্ত জীবন বাবা খেটে গেছেন—একটা দিন কখনো আরাম করে কাটান নি। বুড়ো হয়ে আজ তিনি চোখে অন্ধকার দেখছেন। তবু পূর্ণ-জেঠা আছেন—তাঁর সঙ্গে দাবা নিয়ে দুর্ভাবনা একটুখানি ভুলে থাকেন। তাপসেরও ঐ পরিণাম চাও? বাবা ভুক্তভোগী, হাড়ে হাড়ে বুঝেছেন তিনি—সেই জন্যে চুপ করে গেলেন। কেন রাগ করছ মা, এ ক'টা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। গয়না তুমি আবার দিও, টাকার ব্যবস্থা আমি করব। তোমার পা ছুঁয়ে দিব্যি করছি, আপাদমস্তক গয়নায় সাজিয়ে দিও আমায়—টুঁ শব্দটি করব না।

স্টেনো এখন পূর্ণিমা। চেয়ার বাইরে থেকে ভিতরে গিয়ে পড়েছে। বেশভূষা নিয়ে হাঙ্গামা করতে হয় না, চলনসই রকমের হলেই হল। হাঙ্গামা যত কিছু আনাড়ি আঙুলে দশটা সম্পর্কে—অবাধ্যপনা না করে যেন তারা। টাইপ-রাইটারের চাবির উপর দিয়ে যেখানে যেমনটি প্রয়োজন, দ্রুতবেগে ছুটে বেড়াবে। সুপারসোনিক বিমানের গতিতে—কোন্ আঙুল তর্জনী কোন্‌টি অনামিকা আলাদা করে চেনা যাবে না। আর চোখ বুঁজে থাকবে তখন পূর্ণিমা। এমনি হলেই বলা যেতে পারে, হাঁ, শেখা হয়েছে কিছু বটে।

কিন্তু বিস্তর দেরি তার। পূর্ণিমার চেষ্টার অবধি নেই। অফিসের কাজ সারা হল, পূর্ণিমার মেশিন তারপরেও সমানে চলছে। যথেচ্ছ টাইপ করে হাত রপ্ত করে। দশটায় হাজিরার পর ছুটি না হওয়া অবধি আঙুল তিলেক বিশ্রাম পায় না। নলিনাক্ষ সেন সেই যে আঙুল ভোঁতা হবার কথা বলেছিলেন, তাই না অক্ষরে অক্ষরে ফলে যায়।

অরুণ ক্ষমাশীল মনিব—টাইপের ভুলভ্রান্তি নিজ হাতে কেটেকুটে ঠিক করে নেয়। কাটাকুটো অত্যধিক হলে নতুন করে টাইপ করার প্রয়োজন পড়ে। পূর্ণিমার লজ্জা কাটানোর জন্য একটা দুটো বাড়তি লাইন জুড়ে দেয়—যেন নতুন লাইনের জন্যই পুনরায় ছাপতে হচ্ছে, পূর্ণিমার দোষ কিছু নেই। আমারই ডিকটেশনের দোষ মিস সরকার। অর্ধেক কথা ছেড়ে যাই, সই করতে গিয়ে মনে আসে। করুন আবার, উপায় কি। আনাড়ি ডিরেক্টরের সঙ্গে কাজে বসে এই ভোগান্তি।

এর উপরে তিরিশ টাকা দমকা মাইনে-বৃদ্ধি নতুন টাইপিস্টের কর্মদক্ষতার জন্য। মাইনে বৃদ্ধি হয়েছে, খবরটায় তারণকৃষ্ণ রীতিমত রোমাঞ্চ বোধ করছেন। চিরকাল চাকরি করে এসেছেন। মাইনে তাঁরও বেড়েছে অনেকবার। কিন্তু একলা একজনের আলাদা করে নয়, সকলের সঙ্গে সাধারণ ইনক্রিমেণ্ট। দক্ষতা দেখিয়ে মেয়ে এই সামান্য

দিনের মধ্যে মনিবের বিশেষ সমাদর আদায় করল।

আহ্লাদে গদ্‌গদ হয়ে পূর্ণ মুখুজ্জেকে শোনালেন: পুনিকে তুমিই ঢুকিয়েছ পূর্ণ-দা। ওদের কাছে তোমার মুখ কত বড় হয়ে গেল।

পূর্ণ কিন্তু উৎসাহ দেখান না। মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে বললেন, রোসো, খবরটা ভাল করে নিই। লোক ওরা খারাপ নয়, কিন্তু টাকাপয়সার ব্যাপারে বড় কঞ্জুস। রাস্তায় ছেঁড়া-কাগজ কুড়োয় দেখেছ—ওদের ঠাকুরদা সেই জিনিষের ব্যবসা করে টাকা করেন। টাকা হয়েছে, কিন্তু ছেঁড়া-মন বংশধারায় চলছে। না চাইতে আপোষে মাইনে-বৃদ্ধি হয়ে গেল—এরকম হবার কথা নয়। ভাল করে খবর নিয়ে তারপর বলব।

তরঙ্গিণী মেয়েকে বলেন, ঐ তিরিশ টাকা আমার কিন্তু। মনে কর্ আগের মাইনেই পাচ্ছিস তুই। আমি ঐ টাকা মাসে মাসে পোস্টাপিসে জমা দিয়ে যাব।

পূর্ণিমা বলে, তিরিশ কেন, পুরো টাকাটাই তোমার মা। জমাও, খরচ করো—যেমন তোমার খুশি।

মিষ্টি মিষ্টি বলে আমাকে ভোলাতে পারবি নে। ডাকাতি করে গয়না ছিনিয়ে নিয়েছিস—মাসে মাসে দিয়ে যাবি, টাকা জমিয়ে আমি গয়না গড়িয়ে যাব। একটা গয়না নিয়ে নিয়েছিস, তার খেসারত দিবি দশখানায়।

পূর্ণিমা বলে—ভালোই তো, আমার জন্যে হবে, লাভ তো আমারই। খরচপত্র মিটিয়ে যত খুশি গয়না গড়িও। আমার তো ভাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। হাত-খরচা বলে গেল-মাসে যে ক'টা টাকা রেখেছিলাম, দিদি এসে থাবা মেরে তা নিয়ে গেল। চালাতে পারে না, কি করবে। আট-দশটা দিন হেঁটে হেঁটে অফিস করেছি। ক্যান্টিনে না ঢুকে কলের জলে টিফিন। মাসের পুরো মাইনে তোমায় দিয়ে দেবো মা। বাস-ভাড়া আর টিফিন বাবদ যা ন্যায্য মনে কর, তুমিই আমায় দেবে। কেমন?

॥ নয় ॥

তুলসীদাস বাধ্য স্বামী এখন। বাড়ি বসে বসে রঞ্জুকে কোলে তুলে নাচানো এবং সংসারের ফাইফরমাস খাটা ছাড়া অন্য কাজ নেই।

অণিমা বলে, এই বেশ ভালো—

মুখে বলে এই, মনের কথা ক্রমশ বিপরীত হয়ে উঠছে। বরাবার দরাজ হাতে খরচপত্র করে এসেছে, ভাড়া বাবদ এখন যে ক'টি টাকা পায় তাতে কুলিয়ে ওঠে না। কষ্ট হয় দস্তুরমতো, পূর্ণিমার কাছে গিয়ে পড়তে হয়। তারাও সচ্ছল নয়—লজ্জায় মাথা কাটা যায় ছোট বোনের কাছে বলতে। নিরুপায় হয়ে বলতে হয় তবু।

তুলসীদাসেরও বিষম খারাপ লাগছে। শুধু পাড়ার সবাই জানে আমায়, শহরের বিস্তর লোক জানে। চিরকাল রাজার হালে কাটিয়েছি—এখন এই অবস্থায় এইরকম পোশাক-আশাকে কেমন করে বেরুব। ঘরের মধ্যে জ্যান্ত-কবর আমার।

চিঠিপত্র লেখালেখি চলছিল। কলকাতায় এত বেশি চেনাজানা—কলকাতা ছেড়ে অনেক দূরে কোন একখানে থাকতে পারলে হয়। হলে তো ভালোই, অণিমার কী আপত্তি! বছর খানেক লেখালেখির পর এলো কাজের খবর লুধিয়ানার এক মিল থেকে। এই মিলের বিস্তর হোসিয়ারি জিনিষ এক সময়ে এরা চালিয়েছে। বাবা বর্তমান ছিলেন তখন—তুলসীদাস নিজেই কয়েকবার মাল পছন্দ করতে লুধিয়ানা গিয়েছে।

গিয়ে মালিকের বাড়িতে উঠত। জানাশোনা ভাবসাব সেই থেকে। মিলের অনেক সেল্‌স্‌ম্যান হিসাবে মালিক তুলসীদাসকে নিতে চেয়েছেন। মালিকের নিজ হাতে লেখা চিঠি : *এইখানে থাকো এসে। বাংলা মুলুকের যাবতীয় পাইকারের ভার তোমার উপর থাকবে। ঐ অঞ্চলের ফ্যাসান মাফিক মাল তৈরির পরামর্শ মিলকে দেবে। নতুন নতুন খদ্দের ধরবার চেষ্টা করবে। যদি কখনো নিজস্ব কাজকারবারের বন্দোবস্ত করতে পার, সর্বপ্রকার সাহায্য পাবে মিল থেকে।*

চিঠি দেখে অণিমা লাফিয়ে ওঠে : আমি যাব, রঞ্জু যাবে—সবসুদ্ধ চলে যাব আমরা। বাসা করে একসঙ্গে মজা করে থাকব। ওসব জায়গার জলহাওয়া খুব ভালো, পাঞ্জাবিদের চেহারা দেখে বুঝি। তুমি একলা দূরদেশে পড়ে থাকবে, আমরাই বা একা এখানে থাকতে যাব কেন? আর ঐটুকু বাচ্চা নিয়ে থাকবই বা কোন্ ভরসায়?

তুলসীদাসকে একলা ছাড়তে ভরসা হয় না। সে দেশে কি আর হিড়িম্বা-চামুণ্ডারা নেই, দিলদরিয়া মানুষটার ঘাড়ে চেপে বসা কিছুমাত্র শক্ত নয়। আরও আছে—পরিচিতের মধ্যে থাকতে অণিমারও বড় লজ্জা। দোকান গিয়ে একেবারে নিঃস্ব—তদুপরি তুলসীদাসের বেলেল্লাপনা জানতে কারো বাকি নেই। অণিমার একটা রোগের মতো দাঁড়িয়েছে—যার দিকে তাকায়, মনে হয়, হাসছে সে টিপে টিপে। হেনকালে পালানোর এত বড় সুযোগ এসে উপস্থিত। নাছোড়বান্দা অণিমা, উপরতলাটাও ভাড়া দিয়ে কলকাতার মুখে লাথি মেরে সবসুদ্ধ আমরা চলে যাই—

তুলসীদাস গররাজি নয় : ভালই তো! একা একা আমারও কি ভাল লাগবে সেখানে? মিলের খাসা খাসা কোয়ার্টার দেখে এসেছিলাম তখন—একটা কি তার মধ্যে জোগাড় হবে না? কিন্তু মুশকিল হল—

তুলসীদাস চুপ করে যায়, অণিমা একাগ্র হয়ে চেয়ে আছে। একটু থেমে গলাখাঁকারি দিয়ে আবার বলে, গিয়ে একবার পৌঁছতে পারলে আর অসুবিধা নেই। সেই অবধি যাওয়াই তো মুশকিল। আড়াইখানা টিকিট—অতদূরের পথ, থার্ডক্লাসে গেলে কষ্টের একশেষ হবে—সেকেণ্ডক্লাস নেহাতপক্ষে। তার উপরে জামা-কাপড় আমাদের সকলেরই কিনতে হবে। আগে গিয়েছি, তখন কত বাহার দেখেছে। সেই তাদের সামনে একেবারে ভিখারির বেশ নিয়ে কেমন করে দাঁড়াই।

কথা শেষ হতে দেয় না অনিমা। হাতের চুড়ি খুলে দিয়ে বলে, বিক্রি করো এই চার গাছা।

তুলসীদাস স্ত্রীর মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে দেখে চুড়ি নিয়ে নিল। বলে, বিক্রি নয় বন্ধক দেবো। দুর্দিন কেটে যাবে। চার পাঁচ মাসের মধ্যেই শ্বশুরমশায়ের কাছে টাকা পাঠাব, গয়না খালাস করে ওঁরা পাঠিয়ে দেবেন।

বন্ধক না বিক্রি—তুলসীদাস কোনটা করল অনিমা জানে না। যেমন ইচ্ছে করুক গে, চলে যাওয়াটা মোটের উপর ভণ্ডুল না হলে হয়। কলকাতা শহর শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য—কোন্ কালসাপিনী কখন ফের দংশন করে বসে ঠিকঠিকানা নেই। ভাল আছে, আবার মন্দ হতে কতক্ষণ!

যাওয়ার তোড়জোড় চলছে, তারিখ পাকাপাকি ঠিক হয়ে গেছে। দোকান ঘুরে ঘুরে ছেলের এবং নিজেদের কাপড়চোপড় কেনা হল। এবং বিদেশে যেতে কতকগুলো জিনিস হাতের কাছে থাকা অত্যাবশ্যক, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তা-ও কিনল। রবিবারের দিন অনিমা ছেলে কোলে বাপের বাড়ি এসেছে—যেমন সে আসছে ইদানীং। এই শেষ রবিবার—সামনের শুক্রবারে রওনা হয়ে যাচ্ছে, আর কোন রবিবার পাওয়া যাবে না।

মা-বাপ ভাই-বোনের সঙ্গে সমস্তটা দিন কাটিয়ে যাবে। কতদিন আর দেখা হবে না, এ জীবনে দেখা আর না-ও হতে পারে।

তাপস পূর্ণিমা তরঙ্গিণী সবাই তুলসীদাসের কথা বললেন, বড় বেশি করে বললেন আজ: তাকে কেন নিয়ে এলি নে? এখন আর এত সংকোচের কি আছে। পা পিছলেছিল, সে তো সামলে নিয়েছে অনেকদিন। অতীতের বৃত্তান্ত মন থেকে মুছে ফেলা উচিত। আমাদের বলে নয়, তুলসীদাসের নিজের মন থেকেও।

তা ছাড়ত না আজ অণিমা, নিয়ে আসত ঠিক টেনেটুনে। রঞ্জুকে এগিয়ে দিত, রঞ্জু বাপের হাত ধরে টানাটানি করত। কিন্তু সত্যি সত্যি জরুরি কাজ আজ বাড়িতে। উপরতলাটা ভাড়া নিতে চায় এমনি দুটো পার্টি ঘর দেখতে আসবে, পছন্দ হলে ভাড়া অগ্রিম দিয়ে পাকাপাকি করে যাবে। ঘর দেখাবার কাজে তুলসীদাসকে বাড়ি থাকতে হল। তবে অন্যদিনের মতো নয়—বিকালবেলা আজ সে এসে পড়বে। রাত্রে এখানে খাওয়াদাওয়া সেরে সবাইকে বলে-কয়ে প্রণাম-আশীর্বাদ সেরে ফিরে যাবে।

সন্ধ্যা গড়িয়ে গেল, তুলসীদাসের দেখা নেই। অণিমা ছটফট করছে। তরঙ্গিণী প্রবোধ দেন: চিরকালের বাস তুলে যাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। কোন কাজে আটকে পড়েছে। ব্যস্ত হোস নে, এইবারে এসে যাবে।

পূর্ণিমা ঠাট্টা করে: পথ তাকাতে তাকাতে সারা হলি যে দিদি। ঝগড়া হলে চোখের বালি, ভাব হলো তো চোখের মণি। না আসে ভালই—দু-বোনে পাশাপাশি শোব, মাঝখানে রঞ্জু। ঘুমোব না, গল্পে গল্পে রাত কেটে যাবে। কতকাল আর তোদের দেখব না বল্ তো।

তাপস বলে রেখেছে, পরীক্ষাটা দিয়েই তোদের ওখানে চলে যাব বড়দি।

থার্ড-ইয়ারের পরীক্ষা সামনের মার্চে, বড় কঠিন পরীক্ষা। বলে, কলকাতার বাইরে কখনো যাই নি—বন্ধুরা হাসে, ধানগাছ চিরে কেমন মাপের তক্তা হয় জিজ্ঞাসা করে। এবারে লম্বা পাড়ি—পাক্কা দেড়টি মাস দেখেশুনে বেড়াব।

রাত্রি দশটা বাজল, বাড়িসুদ্ধ লোক এইবারে চিন্তিত হয়ে পড়েছে। কোন রকম বিপদ ঘটল কিনা কে জানে। আর দেরি করা চলে না—গলায় কম্ফর্টার জড়িয়ে লাঠি নিয়ে তারণকৃষ্ণ ওদের পৌঁছে দিতে চললেন। বুড়ো বাপ যাচ্ছেন, তাপসও গেল ঐ সঙ্গে।

তুলসীদাস সরেছে।

একা অণিমা কার ভরসায় থাকে, তারণ সে রাত্রে কাশীপুরে থেকে গেলেন। তাপস অনেক রাত্রে ফিরল, তার কাছে কিছু কিছু বৃত্তান্ত পাওয়া গেল। শুক্রবার অবধি দেরি না করে ট্যাক্সি ডেকে মালপত্র তুলে নিয়ে তুলসীদাস আজ দুপুরেই রওনা হয়ে পড়েছে। দরজায় তালা দিয়ে চাবি নিচের ভাড়াটেদের কাছে দিয়ে গেছে। বলে গিয়েছে, মালগুলো বুক করে আসি। ফিরতে যদি কিছু দেরি হয়—বাচ্চা নিয়ে বাইরে বসে থাকবে কেন, চাবিটা দিয়ে দেবেন ওদের। বিবেচক ব্যক্তি, সন্দেহ কি।

তারণকৃষ্ণ পরের দিন ফিরলেন। রঞ্জু সহ অণিমাও এসেছে। তন্ন তন্ন করে খোঁজ নেওয়া হয়েছে। শঠ নৃশংস নরাধম যত-কিছু বলো, কোন বিশেষণে তুলসীদাসের পরিচয় হয় না। লোকটা ঝানু অভিনেতা। ইদানীং বাইরে দেখাচ্ছিল স্ত্রীর ভালবাসায় গদ্‌গদ, কিন্তু সেই হিড়িম্বার সঙ্গে সম্পর্ক একটা দিনের তরেও ছাড়ে নি। কোনো ফাঁকে গিয়ে দেখাসাক্ষাৎ করে আসত। অণিমার চুড়ি বিক্রির টাকা বেশ-কিছু হাতে রয়েছে, এ মাসের বাড়ি-ভাড়াটাও পরশু আদায় হয়ে গেছে—আপাতত ভাবনা কিছু

নেই। আগে থেকে ভেবেচিন্তে প্ল্যান করা ছিল—ভেগে পড়েছে অণিমার বাপের বাড়ি যাবার সুযোগ নিয়ে। কত দোকান ঘুরে ঘুরে পছন্দের শাড়িজামা কিনেছিল, নতুন জায়গায় নতুন সমাজে বাহার করে বেড়াবে—একটিও তার রেখে যায় নি। শাড়ি পরিয়ে বিধবাকে বউ পরিচয়ে নিয়ে রাখবে। একটা মহৎ দয়া করেছে—রঞ্জুর জামাগুলো নিয়ে যায় নি। ছেলে কেঁদে কেঁদে খুন হবে, এ জিনিষ ভেবে নিশ্চয়ই নয়—নিতান্ত অনাবশ্যক বলেই।

চিঠিও রেখে গেছে খাটের উপর চায়ের কাপ চাপা দিয়ে ঃ আমার খোঁজ করিও না, করিলেও লাভ হইবে না, সময় হইলে সংবাদ পাইবে।

লুধিয়ানার চাকরি খুব সম্ভব ধাপ্পা। সরল বিশ্বাসে ভাল করে তাকিয়েও দেখলাম না তখন, গেছে কোন্ চুলোয় ঈশ্বর জানেন—

হঠাৎ অণিমা ক্ষিপ্তের মতো চেঁচিয়ে ওঠে ঃ না, এতবড় শয়তানি ঈশ্বরের জানিত নয় কখনো। তাহলে ওদের মাথায় বাজ পড়ত।

তরঙ্গিণীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। রঞ্জু অবোধ চোখ মেলে ফ্যাল ফ্যাল করে দেখছে, মায়ের চিৎকারে ভয় পেয়ে সে কেঁদে ওঠে। কোন্ দিকে ছিল পূর্ণিমা—আজ সে অফিসে যায় নি—ঝাঁপিয়ে পড়ে রঞ্জুকে কোলে তুলে নিল।

অণিমা মাথায় চুল ছিঁড়ে চেঁচিয়ে শাপশাপান্ত করছে ঃ মাথার উপর যদি ঈশ্বর থাকো, রেল-কলিশন হয়ে দুটোর যেন পিণ্ডি চটকে যায়। খবরের কাগজে কাল মজা করে পড়ব।

থাম্ দিদি, কী হচ্ছে!

কণ্ঠস্বর ভয়ংকর, অণিমা থতমত খেয়ে গেল। দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে পূর্ণিমা মুখোমুখি দাঁড়াল। সে মুখে তাকিয়ে অণিমা ভয় পেয়ে যায়। ভিন্ন এক চেহারা—মুখের উপর ত্বকই নেই যেন, ভাবলেশহীন মুখোশ দিয়ে ঢাকা। বলে, রেল-কলিশন কেন চাস, এমনিই সে লোক মরেছে। মনে আনবি নে তার কথা। রঞ্জুকেও এমন করে তুলবি, বড় হয়ে ঘৃণায় বাপের নামটা পর্যন্ত মুখে আনবে না। পুরুষের অত্যাচারে মেয়েমানুষের কান্নাকাটি—সে এক যুগ ছিল অতীতে, তোর দুঃখে ঘিরে এসে আরও অনেক ফোঁত-ফোঁত করত। এখন হবি তামাসার পাত্র। তোর যখন কোন দোষ নেই, প্রাণপণে স্ত্রীর কর্তব্য করে গেছিস, কাঁদতে যাবি কিসের জন্য শুনি? কোন্ অনুতাপের যন্ত্রণায়? তুই এমনি ভাবে সরে পড়লে পুরুষটা যা করত, ঠিক সেই জিনিষ করতে হবে তোকে।

কিন্তু পেট চলবে কিসে, বাচ্চা মানুষ করব কেমন করে?

ঘৃণা উপচে পড়ে পূর্ণিমার কণ্ঠে ঃ বলিস নে, বলিস নে—কত রোজগেরে ছিল যেন সে মানুষ! আগে যেমন চলত, তাই চলবে। নিচের তলার ভাড়াটে রয়েছে—আর আচমকা আমার তো তিরিশ টাকা মাইনে বৃদ্ধি হল, ঐ টাকাটা পুরোপুরি আমাদের রঞ্জুর। চলে গেছে আপদ গেছে, একটা মুখের তিন-চার বারের খাওয়া কমেছে। আরও ভাল চলবে দেখিস তোর সংসার।

ঠাণ্ডা মাথায় তারপর শলাপরামর্শ হল। একলা অণিমা থাকতে পারে না, সর্বক্ষণের মানুষ তরঙ্গিণী আপাতত গিয়ে থাকুন কাশীপুরে। গাউটের ব্যথায় প্রায়ই শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন, কিন্তু সংসারে নজর রাখতে পারবেন, রঞ্জুকে ধরতে পারবেন দায়ে-দরকারে। তরঙ্গিণী রইলেন, আর এরাও সব যাওয়া-আসা করবে।

আর খুব কড়া সুরে পূর্ণিমা ধমকে দেয় ঃ কান্নাকাটি করবি নে দিদি, খবরদার।

কেউ জিজ্ঞাসা করলে ভাঁওতা দিতে পারিস ঃ চাকরিস্থলে একলা চলে গেছে—বাসা পেলে নিয়ে যাবে। আর মনে মনে জানবি, বিধবা হয়েছিস তুই। তা-ও নয়—কুমারী মেয়ে, আমারই মতন, ঐ লম্পটের সঙ্গে কোনদিন তোর বিয়ে হয় নি।

॥ দশ ॥

হস্টেলে গিয়ে উঠল তাপস। বাড়ি থেকে কলেজ করা এতদিন যা হোক করে চলেছে, আর এখন উপায় নেই। ক্লাসের লেকচার দিনমানে ঘড়ির কাঁটার হিসাবে, কিন্তু ডিসেকসন ও হাসপাতালের ডিউটিতে দিনরাত্রি সময়-অসময়ের বিচার নেই। বেওয়ারিশ মানুষ মরে গিয়ে লাস হয়ে কখন যে টেবিলে উঠবেন আর ছাত্রেরা বিশেষ রকমের পক্ষী-পালের মতো চতুর্দিক থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ভিড় করে আসবে—আগে থাকতে প্রায়ই হদিস পাওয়া যায় না। কলেজের কাছাকাছি হস্টেল করেছে সেই জন্য। একাধিক আছে। নিচের ক্লাসে যা হোক করে চলে যায়, কিন্তু খানিকটা উঁচুতে উঠে হস্টেলে আস্তানা না নিয়ে গত্যন্তর নেই। কর্তৃপক্ষের আইনও তাই।

তাপস অতএব হস্টেলে চলে গেল। মাসে মাসে এই ভারী ওজনের খরচা।

কথাটা পূর্ণিমা মুখাগ্রে আনে নি, তারণ তবু গায়ে পড়ে ঝগড়া করেন ঃ গরিবের ঘোড়া-রোগ। ভাইকে ডাক্তার বানাবার শখ। ঠেলা বোঝ্ এবারে। মাসে মাসে নিদেনপক্ষে ষাট-সত্তর টাকা, বই-মাইনে তার উপরে। এখন নাকে কাঁদলে হবে না, যেখান থেকে পারিস এনে জোটাবি।

পূর্ণিমা বলে, নাকে কাঁদতে তোমার কাছে কবে গেলাম বাবা?

আরও চটে তারণ বললেন, কাঁদলেই বা পাচ্ছি কোথা আমি? রিটায়ার করে বসে আছি, অক্ষম মানুষ, গায়ে এতটুকু তাগত নেই যে দোকানে একটা খাতা-লেখার কাজ জুটিয়ে পঁচিশটে টাকা এনে দিই। ঠুকঠুক করে চলে বেড়াই সে কেবল আধসের দুধ আর তিন গুলি কালাচাঁদের জোরে। ইচ্ছে হয়, বন্ধ করে দে—তাতে লোকসান বই লাভ হবে না। আফিং বিনে একটা দিনও বাঁচব না—ঐ খরচা বাদ দিয়ে পেন্সনের ক'টা টাকা তবু এখনো হাতে পাস, সেই পাওনাটুকুও বন্ধ হয়ে যাবে।

পূর্ণিমা বলে, তুমি বড় কুঁদুলে হচ্ছ বাবা। আফিং কেন বন্ধ হবে? আর পেন্সন থেকে একটি টাকাও তোমায় দিতে হবে না, আগে থেকে তো বলাই আছে।

কোন্ তালুক-মুলুক আছে তোর শুনি? মচ্ছরের খরচ কোথা থেকে চালাবি?

বাবা তুমি থামবে কিনা বলো। নয় তো আমি একমুখো বেরিয়ে পড়ব—

তাড়া দিয়ে উঠল পূর্ণিমা ঃ তাপস আজ টাকা নিতে আসবে, এক্ষুনি হয়তো এসে পড়বে। শুনতে পেলে রক্ষে থাকবে না। মাথা খুঁড়বে পায়ের উপর পড়ে, হস্টেলে আর যেতে চাইবে না। এদ্দিন ধরে এত টাকা খরচ হল, সমস্ত বরবাদ।

এ তাড়ায় সবাই জব্দ। চুপ করে গিয়ে তারণও সরে পড়লেন। এবার কথাবার্তা কুসুমকে ডেকে। ঝি হলেও কুসমি বাড়িরই লোক। পূর্ণিমার সবে কথা ফুটেছে সেই সময় সে এ বাড়ি এসেছে, তাপসকে সে-ই একরকম মানুষ করেছে। তারণ বললেন, তুই চলে যা কুসমি, আর তোকে রাখতে পারছি নে।

কুসমি ভ্রূক্ষেপ করে না ঃ এদ্দিনের পর, কোথায় এখন কাজ খুঁজে বেড়াব? মাইনে যবে সুবিধা হয় দিও। না হয় দিও না একেবারে।

কিন্তু মাইনে বাদ দিয়েও এ বাজারে একটা মানুষ পোষায় অঢেল খরচা—বেটি একবারও সেটা ভাবছে না। আর বিনি-মাইনের খাটানো—কুসমি বললেই তো হবে না—পূর্ণিমার সে জিনিষ সইবে না কিছুতেই।

তারণ তাই অন্যদিক দিয়ে যান: রিটায়ার করে অবধি কাজ খুঁজে পাই নে, দাবা-পাশা খেলে খেলে দেহ জখম হয়ে গেল। ডাক্তার পইপই করে বলছে, খাটাখাটনি না হলে ছ'টা মাসও আর বাঁচব না। সংসার তো এই—এর মধ্যে কাজ আমি করব, পুনি করবে, আবার তুইও থেকে যেতে চাস—এত কাজ কোথায় আছে বল্। মাইনে নিস আর না-ই নিস, হাত-পা কোলে করে ঠুঁটো-জগন্নাথ হয়ে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা বিনি-কাজে বসে থাকতে হবে। পারবি সে জিনিষ?

কুসুম অগত্যা বিদায় নিল। পাড়ার মধ্যেই রয়ে গেল। পুরানো বিশ্বাসী মানুষটাকে পূর্ণ মুখুজ্জে ছাড়লেন না, নিজের বাড়ি বহাল করে নিলেন। তবু ভাল, যাওয়া-আসায় এদের সঙ্গে শতেকবার চোখের দেখা হবে।

ইতিমধ্যে আর এক বিপদ।

মাসের গোড়ার দিকে তারণ অফিসে গিয়ে পেন্সন নিয়ে আসেন। এদিনও গেছেন; টাকা পকেটে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। অণিমার দুর্ভাগ্যে মনে দাগা লেগেছে, সর্বক্ষণ অন্যমনস্ক থাকেন—এমন প্রিয় দাবা খেলাতেও মন বসে না, প্রায় ছেড়ে দেবার মতো। তার উপরে আজ আসবার সময় ট্রামের ভিড় দেখে খররৌদ্রে হাঁটতে হাঁটতে এত পথ চলে এসেছেন। কারণ যা-ই হোক, সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ মাথা ঘুরে উঠল, পড়ে গেলেন তিনি সিঁড়ির উপর। খাড়া সিঁড়ি—এ-ধাপ থেকে ও-ধাপ, কখনো চিত কখনো কাত—গড়াতে গড়াতে একেবারে ভূঁয়ের উপর। সদর দরজার ঠিক সামনেটায়। সম্বিৎ হারিয়েছেন, থেঁতলে কেটেকুটে গেছে সর্বাঙ্গ।

হৈ-রৈ পড়ে গেল। মস্তবড় বিল্ডিং, দশ-বারোটা কোম্পানির অফিস এক বাড়িতে, অগুন্তি লোকের আসা-যাওয়া। রাস্তা থেকে পথ-চলতি লোকও উঠে আসছে। লোকে লোকারণ্য।

চেতনা পেলেন ক্ষণপরেই। ইতিমধ্যে বালতি বালতি জল এনে মাথায় ঢেলেছে, মুখে ছিটিয়েছে। জলে জলময় চতুর্দিক, জামা-কাপড় ভিজে জবজবে; খাতা-বই রুমাল-তোয়ালে যে যা হাতের মাথায় পেয়েছে তাই দিয়ে বাতাস করছে। ভিড়ের মধ্যে দৈবাৎ ডাক্তারও একটি জুটে গিয়েছেন, তাঁর নির্দেশ মতো সেবাকর্ম হচ্ছে। চোখ খুলতেই সেই ডাক্তার হাঁ-হাঁ করে ওঠেন: উঠতে যাবেন না—খবরদার! হাড়গোড় ভেঙেচুরে কদ্দূর কি হল যতক্ষণ না সঠিক বোঝা যাচ্ছে, যেমন আছেন পড়ে থাকুন।

কিন্তু অবস্থা যেমনই হোক, ভিড়ের মধ্যে এমনিভাবে কতক্ষণ পড়ে থাকা যায়! তারণ মিনমিন করে বলেন, দয়া করে কেউ আপনারা ট্যাক্সি ডেকে দিন—বাড়ি চলে যাই।

তা ছাড়া করবারও কিছু নেই। এমন তো আকছার হচ্ছে—মরে তো বাড়ি গিয়েই মরুক, বাঁচে তো বাঁচুক গিয়ে সেখানে। ট্যাক্সিতে কাত হয়ে বসে তারণের মনে হচ্ছে, কই, এমন-কিছু আঘাত লেগেছে বলে তো ঠেকে না। ডাক্তারটা খামোকা ভয় দেখিয়ে দিল। ট্যাক্সি-ভাড়ার অপব্যয়টা নিশ্চয় রোধ করা যেত, বাসে চেপে বাড়ি চলে যেতেন। বাস-স্ট্যাণ্ড অবধি পায়ে হেঁটে গিয়েই বাসে ওঠা চলত।

গলির মুখে নেমে করলেনও ঠিক তাই। গলিতে গাড়ি ঢোকে না—হেঁটে হেঁটে চললেন। হরি হরি, কয়েক পা যেতেই যেন প্রাণ বেরিয়ে যায়। গোড়ায় খাড়া হয়ে

যাবার চেষ্টা করলেন, তার পরে পাশের বাড়ির দেয়ালটা ধরে ধরে। তা-ও হল কই, বসে পড়লেন রাস্তার উপর। যন্ত্রণা সর্বদেহ জুড়ে। বসতে পারেন না, শুয়েই পড়েন বুঝি বা—

কুসুম এই সময়টা দোকানে কি কিনতে যাচ্ছিল, তারণের অবস্থা দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে: কি হয়েছে, বসে কেন অমনধারা ?

পূর্ণ-দা'কে শিগগির ডেকে নিয়ে আয়। আমার আর বেশিক্ষণ বোধহয় নেই।

কুসুম ছুটে গিয়ে পূর্ণ মুখুজ্জেকে ডেকে আনল। দু'জনে ধরাধরি করে কোন রকমে তাঁকে বাড়ি নিয়ে তুলল। বাড়িতে কেউ নেই, পূর্ণিমা অফিসে গেছে। একসঙ্গে খাওরা-দাওয়া সেরে দরজায় তালা এঁটে বাপে-মেয়ের বেরিয়েছিলেন। তালা খুলে তারণকে খাটে শুইয়ে দেওয়া হল। পূর্ণ মুখুজ্জে বড়রাস্তার এক দোকান থেকে পূর্ণিমার অফিসে ফোন করে এলেন: ছুটি নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে এসো। তাপসের হস্টেলে একটা খবর পাঠিয়ে দাও, পুরোপুরি না হলেও আধা-ডাক্তার তো বটে—যা করতে হয় দেখেশুনে করুক।

সন্ধ্যার দিকে অণিমা আর তরঙ্গিণী এসে পড়লেন কাশীপুর থেকে। তাপস ইতিমধ্যে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে তারণকে হাসপাতাল ঘুরিয়ে এনেছে। বাইরের কাটাছেঁড়াগুলোয় ব্যান্ডেজ হয়েছে। এক্সরে নিয়ে নিয়েছে—ভিতরের কি অবস্থা, এক্সরে-প্লেট না পাওয়া পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে না। কাল সকালে পাওয়া যাবে। ব্যথা সাংঘাতিক—হাতখানা পাখানা উঁচু করে তোলবার শক্তি নেই, এপাশ-ওপাশ করা যাচ্ছে না। বুড়ো বয়সে কী দুর্দৈব রে বাবা—খোঁড়া হয়ে নুলো হয়ে পঙ্গু শয্যাশ্রয়ী হয়ে বেঁচে থাকতে চাই নে আমি। তেমন চিকিচ্ছে করতে হবে না তোদের। বরঞ্চ খানিকটা বিষ দে, খেয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হই।

রাত্রিটা এইভাবে গেল। সকালবেলা তাপস এক্সরে রিপোর্ট নিয়ে আসে। হাসিমুখ—খবর খুব ভাল। হাড় ভাঙেনি—হাড়ের উপর কিছুমাত্র আঘাত-চিহ্ন নেই। সবকিছু আঘাত উপরে উপরে। কিছুকাল ভোগান্তি আছে এই মাত্র। এ বয়সে হাড় ভাঙলে কিছুতে আর জোড়া লাগত না। খুব রক্ষে হয়ে গেছে।

পূর্ণিমার অফিস কামাই হল না। ভালই হল, পারতপক্ষে সে কামাই করে না। কাজের নিষ্ঠা দেখেই মনিবের সুনজর—না চাইতে মাইনে বৃদ্ধি হয়ে যায়। সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসে সে ভাইয়ের উপর হুমকি দিয়ে পড়ে: তুই যে এখনো যাস নি চলে ?

অণিমা কানে শুনে বলে, ও মা, তাড়িয়ে তুলিস কেন ? বাবার এই অবস্থা—এখনই যাবে কী !

সামনে ওর এগজামিন—

অণিমা অবহেলা ভরে বলে, এগজামিন ডরাবে তেমন ছেলে নয় আমাদের তাপস। তুড়ি মেরে পাশ করবে। ক'টা দিনে বাবাকে একটু খাড়া করে তুলে তারপরে হস্টেলে যাবে।

পূর্ণিমা বলে, বড্ড কড়া এগজামিন। ফেল করলে সর্বনাশ—একটা বছরের খরচা বেড়ে যাবে, পাব কোথায় ? তাপস চলে যাক - তেমন কিছু যখন নয়, আমরাই বাবাকে খাড়া করে তুলব।

অণিমা বলে, যেমনধারা আজ সমস্তটা দিন করছিস।

ধরেছিস ঠিক দিদি ! সমস্তটা দিন দেদার আড্ডা দিয়ে এলাম—

তিক্ত হাসি হাসে পূর্ণিমা: বিশ্বাস করিস বা না করিস, বাবার জন্যে তোদেরই

সমান উদ্বেগ। তার উপরে আরও সব উদ্বেগ আছে, যা তোদের নেই। বাবা এই পড়ে গেলেন—আমি দেখছি, বাড়তি খরচা একটা ঘাড়ে পড়ল। কোচিং-ইস্কুলে যা মাইনে ছিল, তার তিনগুণ এখন পাই। ডাইনে আনতে তবু বাঁয়ে কুলোয় না।

খোঁটা দিচ্ছে, মনে হল। অণিমা ফোঁস করে ওঠে: রোজগার করে তুই সকলকে দিয়ে দিচ্ছিস, সবাই সেটা জানে। বার বার শুনিয়ে কি মজাটা পাস?

প্রতি মাসের গোড়ায় অণিমা এসে পড়ে, নিয়মিত তিরিশ টাকা তো আছেই, তার উপর থাবা দিয়ে দশ টাকার নোট একটা হয়তো ধরল। পূর্ণিমা হাঁ-হাঁ করে ওঠে: পারব না দিদি, এদিককার এত খরচা চলবে কিসে? ফি মাসে ধার-দেনা হচ্ছে—

নোট ফিরিয়ে নিয়ে ইতস্তত করে খুচরো তিন-চার টাকার মতো দিতে গেল। টাকা ছুঁড়ে ফেলে অণিমা হাউ-হাউ করে কাঁদে: কপাল-দোষে ভিখারির বেহদ্দ হয়ে ছোট-বোনের কাছে মুখনাড়া খাই। বলি নিজের বেলা তো খরচের অভাব হয় না, সাজসজ্জায় রাজার কন্যে হার মেনে যায়।

পূর্ণিমা বলে, অফিসে ছেঁড়া ময়লা সাজে যাওয়া যায় না। অফিসের ইজ্জতহানি —চাকরি তারপরে দুটো দিনও আর থাকবে না। তাই একটু সাফসাফাই হয়ে যাই। এর মধ্যে খরচ দেখিস তুই কোথায়?

ঝগড়া কান্নাকাটি এমনি লেগেই আছে। একদিন অণিমার কত কত ছিল, কত খরচপত্র করেছে—দুঃখ-যাতনা হল সেই। ভাইয়ের প্রসঙ্গে সেই ঝগড়া আবার উঠে পড়ে বুঝি—সভয়ে তাপস তাড়াতাড়ি বলে, যাবই তো কাল—পরীক্ষার ভয় নেই বুঝি আমার! ছোড়দি না বললেও যেতাম। ফেল হলে সত্যি সত্যি সর্বনাশ।

হেসে জিনিষটা লঘু করে নিয়ে পূর্ণিমাকে বলে, বয়সে ছোড়দি তুই তো মোটে তিন বছরের বড়। কথাবার্তা শুনে কে তা বলবে? কত বড় মুরুব্বি যেন তুই—বড়দি'র চেয়েও বড়। আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ি। কালই চলে যাব হস্টেলে। রাত হয়ে গেছে, আগে থেকে জানানো নেই। আজ যেতে পারলেই ভাল হত, ভোর থেকে পড়াশুনোয় লাগতে পারতাম। এক একটা ঘণ্টা এখন পুরোদিনের সমান।

অণিমা ঠাণ্ডা হল তো তারপরে তরঙ্গিণী। আহ্নিকে বসেছিলেন, কোন রকমে সমাধা করে রে-রে করে পড়লেন: আমি ছিলাম না, কী কাণ্ড করেছিস তুই?

পূর্ণিমা নির্বিকার ভাবে বলে, সকলের কাছেই তো আমার অপরাধ। বলো তুমি, কি করেছি। গালিগালাজ করো—ধরে মারো তাতে যদি শান্তি হয়।

তরঙ্গিণী বললেন, আমার আলমারি খুলেছিলি তুই—

না খুলে উপায় ছিল না। চাবি নিয়ে চলে গেছ তুমি, চাবিওয়ালাকে ডেকে খুলিয়ে নিলাম। তা দেখ, একটা জিনিষও তোমার খোয়া যায় নি। মিলিয়ে দেখে নাও।

তরঙ্গিণী গর্জন করে উঠলেন: আলবৎ গেছে। কানের ফুল আর হাতের ব্রেসলেট গড়িয়েছিলাম—কোথায় সে জিনিষ?

সে জিনিষ তোমার হল কি করে মা? আমার জন্যে গড়িয়েছিলে, আমি নিয়ে নিয়েছি।

তোর বিয়েয় দেবো বলে গড়িয়েছি, কেন তুই নিয়ে নিবি?

নইলে যে তাপসের হস্টেল খরচা দিতে পারি নে, পড়াশুনো বরবাদ হয়ে যায়। বাবা যাচ্ছেতাই করে বলতে লাগলেন, তখন আমার মাথার ঠিক রইল না। ভেবেছিলাম কিছু কিছু জমিয়ে ওগুলো গড়িয়ে রাখব। তুমি টেরও পেতে না মা। বউবাজারে এক

দোকানে কথাবার্তাও বলা ছিল। ভেবেছিলাম কি জানো—

ফিক ফিক করে হাসে পূর্ণিমা এরই মধ্যে। বলে, সোনার গয়নার অত টাকা কোথায়, ভেবেছিলাম গিল্টির গয়না গড়াব। বউবাজারের দোকানদার গ্যারান্টি দিল তিন-চার বছর অবিকল সোনার রং থাকবে। তবে আর কি—গয়না তো পরতে হবে না—আলমারিতে ঠিক মতো রেখে দেওয়া। তোমার মনের তৃপ্তি।

তরঙ্গিণী ভ্রূকুটি করলেন : পরতে হবে না মানে? বিয়ে করবি নে, সেই কথা বলতে চাস?

পূর্ণিমা তাড়াতাড়ি বলে, আজকেই তো নয়—তিনটে বছর পরে অন্তত। ভাই ডাক্তার হয়ে যাবে, তখন আর পায় কে আমাদের! গিল্টির গয়না নর্দমায় ছুঁড়ে দিয়ে, ডাক্তার ভাই আমার সোনাও নয়—হীরে-মুক্তোয় জড়োয়া গড়িয়ে দিত। ঘুণাক্ষরে তুমি জানতে পেতে না। মতলব ঠিকই ছিল, মাঝখানে তুমি এসে পড়ে ভণ্ডুল ঘটে গেল। বাবার জন্যে হঠাৎ এমন আসতে হবে, কে জানত। আর এসেছ বাবার খেদমত করতে, তার মধ্যেও তুমি কিনা আলমারি খুলে বসলে!

পরীক্ষায় তাপস আশাতীত রকম ভাল করল। বিশেষ করে মেডিসিনে। একটা পেপার ডাক্তার অপূর্ব রায় দেখেছেন। ক্লাসও নেন তিনি হপ্তায় দুটো তিনটে দিন। পরীক্ষার পর থেকে তাপস খুব নজরে পড়ে গেল। কলেজ থেকে একদিন বাড়ি ফিরছেন, গেটের কাছে তাপসকে পেয়ে গাড়িতে তুলে তাকে বাড়ি নিয়ে গেলেন। আলাপ করে চমৎকৃত হলেন—জানার আগ্রহ বটে ছেলেটির, আর দশটা ছাত্রের তুলনায় জানেও অনেক বেশি। চা খাওয়ালেন তাপসকে, স্ত্রী ও মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। মেয়ে স্বাতী—কলেজের দু-একটা পার্টিতে তাপস আগেও তাকে দেখেছে। ভাল গান গায়, অনুরোধে পড়ে ডাক্তার রায় কোন কোন কলেজ-পার্টিতে নিয়ে গিয়েছিলেন। চোখের দেখা ছিল, এইবার আলাপ হল।

অপূর্ব রায় উৎসাহ দিয়ে বলেন, তোমার ভিতর প্রতিভা রয়েছে। জীবনে বিস্তর ছাত্রের সংস্পর্শে এসেছি, ভাল ছাত্রও তার মধ্যে অনেক। কিন্তু শেষ অবধি তারা সব কি করল—খবর নিয়ে দেখেছি, রোগী দেখে প্রেস্ক্রিপসন লিখে ভিজিট কুড়িয়ে ঘোরে দিবারাত্রি, টাকার বাইরে অন্য কিছু জানে না। তুমিও ঐরকম নষ্ট হবে না, এই আমার ইচ্ছা। বড় কিছু করবে, সংকল্প নিয়ে নাও।

ছুটির দিনে বাড়ি এসে তাপস ছোড়্‌দি'র কাছে এইসব গল্প করে। পূর্ণিমার খুশির অন্ত নেই। তাপসের মাথায় হাত রেখে বলে, বেশ তো, বেশ তো—

হাত সরিয়ে দিয়ে তাপস বলে, যা বলবি এমনি এমনি বল্ ছোড়দি। মাথায় হাত কি জন্যে?

পূর্ণিমা হেসে বলে, দোষটা কি হল?

না, মনে হচ্ছে ভারিক্কি চালে আশীর্বাদ করছিস যেন তুই—

পূর্ণিমা বলে, আশীর্বাদেরই তো সম্পর্ক। গুরুজন হই নে তোর?

ভারি তো গুরুজন! তিন বছরের বড়—তা ভাবখানা দেখাস তিন হাজার বছর বড় যেন আমার চেয়ে—

অপূর্ব রায়ের কথা নিয়ে তাপস উৎসাহে ডগমগ : ডাক্তার রায় বলেছেন, এখানে পাশ করেই শেষ হবে না। লণ্ডনের এম-আর-সি-পি হয়েও নয়। রিসার্চ করে দুনিয়ার সেরা হতে হবে।

পূর্ণিমা বলে, তোর মধ্যে গুণ দেখতে পেয়েছেন—এত বড় অধ্যাপক নয়তো বলতে

যাবেন কেন ?

আমি কিন্তু সাফ জবাব দিয়েছি : তেমন অবস্থা আমাদের নয়, উঁচু ভাবনা আমরা ভাবি নে। আর দুটো বছর পার করে ঐ প্রেস্কৃপসন-লেখা ভিজিট-কুড়ানো অবধি ভালোয় ভালোয় পেঁছুতে পারলে বাঁচি। এত কথাবার্তার পরেও ডাক্তার রায় কিন্তু তেমনি নাছোড়বান্দা—

নিঃশব্দে পূর্ণিমা ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ডাক্তার রায় বললেন, চেষ্টা করে দেখব কোন স্কলারশিপের জোগাড় হয় কিনা। তার উপর যা লাগে, ধার দেবো আমি। ফিরে এসে রোজগার করে শোধ দিও।

হাসতে হাসতে পূর্ণিমা বলে উঠল, টান যেন বড্ড বেশি—বলি, মেয়ে গছানোর মতলব নেই তো ?

তাপস বলে, মেয়ে বাড়ির আবর্জনা নয় যে, আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেবে। ভাইকে তোরা কী ভাবিস বল তো ছোড়দি ?

তাই বলে মানুষে অহেতুক কৃপা করে, এই আমায় বিশ্বাস করতে বলিস ?

পূর্ণিমার কথার মধ্যে অগ্নিজ্বালা। কী যেন বিষম কাণ্ড ঘটেছে। ক্ষণে-ক্ষণে ক্ষেপে ওঠে। আগে সে এমন ছিল না।

ঘটেছে সত্যিই এই ক'দিন আগে। পূর্ণিমা কাউকে বলে নি। বলবার কথাও নয়। রিসেপসনিস্টের টেবিল বাইরের দিকে, তার জন্যে একদা অনুযোগের অন্ত ছিল না। এখন ভাবছে, দিব্যি ছিল সেই জায়গা। বাইরের লোকের আনাগোনা—মনিবরা আসা এবং যাওয়ার সময়টা হাসিমুখে তাকাতেন পূর্ণিমার দিকে, তাড়াতাড়ি সে নমস্কার করত। তাঁরা প্রতিনমস্কার করে উপরে উঠে যেতেন, অথবা রাস্তায় নেমে গাড়িতে ঢুকতেন। দিনের মধ্যে প্রতি জনের দু-বার—তিন ডিরেক্টরের একুনে ছ'বার মাত্র। ছয়ের বেশি সাত নয়। এখন স্টেনো হওয়ার দরুন ডিকটেশন নিতে ডাক পড়ে। ক্ষণে-ক্ষণে কামরার ভিতরে ঢুকে খাতা-পেন্সিল নিয়ে সামনের চেয়ারে বসে পড়তে হয়।

কৃপা-বৃষ্টির মুখপাতটা এই রকম। মেজ ভাই অরুণ একটা জরুরি চিঠির বয়ান বলে যাচ্ছে। বলতে বলতে পূর্ণিমার মুখের উপর তাকিয়ে পড়ে। তারণ সিঁড়িতে পড়ে গেলেন, তার ঠিক পরের দিনটা। দুশ্চিন্তায় বাড়ির কেউ ঘুমোয় নি, পূর্ণিমার চোখেমুখেও সেই ক্লান্তি লেগে রয়েছে।

অরুণ বলে, কি হয়েছে মিস সরকার ?

কি হবে, কিছুই তো নয়। এড়িয়ে গিয়ে পূর্ণিমা পেন্সিল ঠোঁটের কাছে নিয়ে উঁচিয়ে ধরল। অর্থাৎ ডিকটেশনে পরের বাক্যের অপেক্ষায় আছে।

অরুণ ভ্রূক্ষেপ না করে বলে, অসুস্থ দেখাচ্ছে আপনাকে। কি হয়েছে বলুন।

অগত্যা দুর্ঘটনার কিছু বলতে হয়। বলে, রাত্রিটা কাল বড় উদ্বেগে কেটেছে।

অরুণ বলে, অফিসে এলেন কেন তবে ? ছুটি তো এক দম নেন না, অঢেল ছুটি জমে আছে। আর না থাকলেই বা কি। এমন ব্যাপারেও ছুটি না নেবেন তো ছুটির নিয়ম আছে কি জন্যে ?

সকালে এক্সরে রিপোর্ট পেয়ে এখন অনেকখানি নিশ্চিন্ত। তা ছাড়া বছরের শেষে এখন কাজকর্মের চাপ। গাদা-গাদা বিল ছাড়তে হচ্ছে। পোদ্দার এজেন্সির এই চিঠি ছাড়া আরও তো চারটে ডিকটেশন দেবেন বললেন।

অরুণ হাসিমুখে নির্বাক হয়ে আছে।

পূর্ণিমা বলে, শেষ সেণ্টেন্সটা পড়ে শোনাই ?

অরুণ বলে, না—। জোর দিয়ে আবার বলে, না, একটি লাইনও আর বলছি নে। আগে যা ডিকটেশন দিয়েছি, বাতিল। কিছুই টাইপ করতে হবে না।

পূর্ণিমা ইতস্তত করে বলে, খুব জরুরি চিঠি বলছিলেন আপনি।

আপনার সুস্থ থাকা আরও বেশি জরুরি। ইয়ার-এনডিং বলে অন্য সবাই বহাল তবিয়তে পাওনা ছুটি শোধ করে নিচ্ছে—পুরোনো কর্মচারী তারা, বিস্তর কাল নিমক খেয়েছে। আর নতুন হলেও সত্যি সত্যি অসুস্থ শরীর নিয়ে আপনি অফিস করতে এসেছেন।

হঠাৎ প্রশ্ন করে, থাকেন কোথা আপনি ?

পূর্ণিমা ঠিকানা বলল।

অরুণ বলে, আমি এখনই বেরুচ্ছি। এই ডিকটেশনটা সেরেই বেরুতাম—দরকার নেই, কাল হবে। আপনাদের ঐ পথেই আমায় যেতে হবে—চলুন নামিয়ে দিয়ে যাব।

বড় সহৃদয় মনিব। বাপের জন্য পূর্ণিমারও চিন্তা রয়েছে—অণিমা সেবাশুশ্রূষা তেমন পেরে উঠে না, কি করছে কে জানে! অরুণের বেয়ারা এসে তাগিদ দিল: সাহেব বেরিয়ে পড়েছেন, আপনাকে যেতে বললেন।

লাল রঙের টু-সীটার গাড়িতে অরুণের পাশে সে উঠে পড়ল। অফিসের লোক জুল-জুল করে দেখছে। অসম্ভব নিচু গাড়ি, একটা সাপ যেন মাটির গা বেয়ে সাঁ-সাঁ করে ছুটেছে।

গলির মোড়ে এসে পূর্ণিমা দেখিয়ে দিল: এইখানে। এত ছোট গাড়ি তবু গলির ভিতর ঢুকবে না। মৃদু হেসে সহজ কণ্ঠে বলে, তার জন্যে অসুবিধা কিছু নেই—যত লোক এই গলিতে থাকি, মোটর চড়ে বেড়ানোর কথা ভাবি নে কেউ।

মানুষটি অতিশয় ভদ্র ও নিরহংকার। নেমে গিয়ে ও-দিককার দরজা খুলে দাঁড়াল। পূর্ণিমা নেমে গলির মধ্যে ঢুকে গেল তবে স্টার্ট দিল।

এদিন শরীর খারাপ ছিল, মনে উদ্বেগ ছিল, সকাল সকাল বাড়ি ফিরবার প্রয়োজন ছিল—কৃপাই করেছিল অরুণ, বড় উপকার হয়েছিল। কৃপার এই শুরু। তিনটে কি চারটে দিন পরে অফিস থেকে বেরিয়ে এগিয়ে চলেছে। অফিস-পাড়ার দুরন্ত ভিড় এড়িয়ে বেশ খানিকটা গিয়ে বাস বা ট্রাম ধরে—এই তার নিয়ম। হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে—লাল টুরিস্ট-কার কোন্ দিক দিয়ে ছুটে এসে সশব্দে ব্রেক কষে ফুটপাথের পাশে থেমে পড়ল। দেখে নি দেখে নি করে চলছে পূর্ণিমা—গাড়ির ভিতর থেকে উচ্ছ্বসিত হাসি।

দরজা খুলে অরুণ নেমে পড়ল: আসুন, নামিয়ে দেবো।

বেশ তো যাচ্ছি—

গাড়িতেও খারাপ যাবেন না।

সহসা গম্ভীর হল যেন অরুণ। বলে, আপত্তি থাকে তো কাজ নেই—

ভয়ে ভয়ে অতএব গাড়িতে উঠতে হয়, দু-একটা কথা বলতে হয়, হাসতেও হয়। হেসে পূর্ণিমা বলে, আপনি বুঝি প্রায়ই এদিকে আসেন ?

অবসর পেলেই আসি। ক্লাবে এসে টেনিস খেলি।

কিন্তু মুশকিল হল বড়। পথের উপর ইদানীং হামেশাই দেখা হয়ে যাচ্ছে—গাড়িতে তুলে অরুণ গলির মোড়ে নামিয়ে দিয়ে যায়। সাত-আট দিন এমনি হয়ে গেছে। বলবার কিছু নেই—নিখুঁত সৌজন্য, গাড়ির মধ্যে সামান্য একটি-দুটি কথা।

কিন্তু তাদের মধ্যে কথাবার্তা না হলেও অফিসে কথা চলছে সুনিশ্চিত। সেই বৃদ্ধ টাইপিস্ট নলিনাক্ষ সেন একদিন পূর্ণিমাকে ধরে পড়লেন: রিটায়ার করিয়ে দিচ্ছে

আমার। বিস্তর কাচ্চাবাচ্চা—না খেয়ে মরব। বয়স হয়েছে তা মানি, তা বলে কাজের শক্তি একরত্তি কমে নি মা, নিত্যিদিন তুমি তো নিজে চোখে দেখছ। মেজো সাহেবকে আমার জন্যে বল একবার, তুমি বললেই শুনবে।

হাত জোড়-করা ঠিক নয়—বুড়ো মানুষ হাত দুটো একত্র করলেন।

কী লজ্জা! কী লজ্জা! তালুকদার বাড়ির কর্তারা মেয়েদের তো অসূর্যম্পশ্যা করে অন্দরে রাখতেন—স্বর্গলোকে তাঁরাও নিশ্চয় অধোবদন হয়েছেন লজ্জায়।

অফিস থেকে খানিকটা দূরে গিয়ে পূর্ণিমা ট্রাম-বাস ধরে। একদিন উল্টো পথ ধরল—পশ্চিমে গঙ্গার দিকে। হনহন করে চলেছে, ছুটে পালানোর মতো। কিন্তু দুটি মাত্র পায়ের সাধ্য কতটুকুই বা! লাল-গাড়ি পিছন ধরে ঠিক এসে হাজির। এবং হাসি।

আজ যে ভিন্ন দিকে?

পূর্ণিমা থতমত খেয়ে বলে, এক আত্মীয় হাওড়া স্টেশনে নামবেন—

এত পথ হেঁটে হেঁটে যাচ্ছেন? উঠে পড়ুন।

গাড়ি হাওড়ায় ছুটল। হঠাৎ বুঝি পূর্ণিমার সময়ের খেয়াল হল। হাতঘড়ি দেখে হতাশভাবে বলে, এই যাঃ, গাড়ি তো অনেক আগে এসে গেছে। এখন কি আর স্টেশনে বসে আছেন তিনি?

মুখ ফেরাল পূর্ণিমার দিকে—কি দেখল, কে জানে। জবাবের অপেক্ষা না করে গাড়ি ঘোরাল। বাড়ির গলির মুখে নামিয়ে দিয়ে দে ছুট।

তা বলে শেষ নয়—চলল এই ব্যাপার। উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম—যেদিকে খুশি, ইচ্ছা মতন বেরিয়ে দেখেছে। লাল-গাড়ির চোখে ফাঁকি চলে না। বাজপাখির মত গাড়ি কোন্ অলক্ষ্যে ওত পেতে থাকে, ঠিক সময়টিতে উদয় হয়ে ছোঁ মেরে তুলে নেয়। ছুটির আধ ঘণ্টা আগে বেরিয়ে দেখেছে, আবার ছুটির পর কাজের অছিলায় গড়িমসি করে দেখেছে। ফলের ইতরবিশেষ নেই—গাড়ি এসে পথের মাঝে দুয়োর খুলে দাঁড়াবে। এবং হাস্য। এবং প্রশ্ন: কোথা যাবেন? পূর্ণিমারও সেই এক জবাব: বাড়ি। গল্পের সেই বিধাতাপুরুষের মতো: জেলের কপালে লেখা আছে, জাল পাতলে একটা মাছ সে পাবেই। জেলে কেমন করে লিখনটা জেনে গেছে—জাল পাতে সে জলে নয়, কোনদিন ঘরের চালে, কোনদিন গাছের মাথায়, কোনদিন কাঁটাবনে। বিধাতাপুরুষকে খুঁজে-পেতে সেই সেই স্থানে জালের মধ্যে মাছ দিয়ে আসতে হয়। গাড়ি ঢোকে না এমন গলিঘুঁজি নেই এই হতভাগা অঞ্চলে—তাহলে পূর্ণিমা একদিন সেটা পরখটা করে দেখত।

আরও আছে। ইদানীং নতুন উপসর্গ হয়েছে, আলতো ভাবে হাত এসে পড়ে পূর্ণিমার গায়ের উপর। পূর্ণিমা পাথর হয়ে বসে থাকে। মুহূর্তমাত্র—পরক্ষণেই হাত উঠে গিয়ে স্টিয়ারিং-চাকায় যথাপূর্ব সংলগ্ন হয়। নিতান্ত দৈবঘটনা, ভাব দেখে তাই মনে হয়—হাতের চলাচল কিছুই যেন টের পায় নি অন্যমনস্ক হাতের মালিকটি।

॥ এগারো ॥

একদিন ঠিক ঐ রকমের হাসি। তারপরের প্রশ্নটা একটু ভিন্ন: অফিস আর বাড়ি এর বাইরে কোনখানে কখনও যান না বুঝি?

পূর্ণিমা বলে, আজকে যাব।

সবিস্ময়ে তাকিয়ে পড়ে অরুণ বলে, কোথা যাবেন?

হাওড়া স্টেশনে—না, তারও ওদিকে। শিবপুরে চলুন যাই।

কোন আত্মীয় আছেন বুঝি?

পূর্ণিমা বলে, না, বেড়াব। বটানিক্যাল বাগানে যাই চলুন!

আর কথাটি নয়, গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে ছুটিয়ে দিল। হাত বটে অরুণের! গাড়ির ভিড়, মানুষের ভিড়—তার ভিতর দিয়ে সুকৌশলে এঁকে-বেঁকে বেরিয়ে যাচ্ছে। গাড়ি যেন এক নেংটি ইঁদুর। ঘিঞ্জি অঞ্চল ছাড়িয়ে ফাঁকায় এসে গেল, তখন তো আর কথাই নেই—গাড়ি বাতাসের বেগে ছুটেছে। আর কী আশ্চর্য—এমনি অবস্থার মধ্যেও একটা হাত মুক্ত হয়ে পূর্ণিমার উপর।

অন্যমনস্ক মানুষটার নজর ধরিয়ে দেয় পূর্ণিমা: গাড়ি যে এক হাতে চালাচ্ছেন—

অরুণ সগর্বে বলে, দুটো হাত তুলে নিয়েও পারি।

পূর্ণিমার বুক ঢিব ঢিব করে। একটা হাতে তার ডানহাত চেপে ধরেছে—অপর হাত মুক্ত হলে সেই হাতখানার কাজ কি হবে তখন?

না, তেমন কিছু হবার জো নেই। স্টিয়ারিং থেকে হাত তুলে নিলেও অতিশয় কড়া নজর রাখতে হয়—বেয়াড়া কিছু না ঘটে। দু-এক মিনিটের বাহাদুরি দেখানো, এই মাত্র। এরই মধ্যে গাড়ি হুশ করে বাগানে ঢুকে পড়ল।

অরুণ বলে, এবার?

পূর্ণিমা বলে, বসি গিয়ে একটা ভাল জায়গা দেখে।

ভাল জায়গা, অর্থাৎ নিরিবিলি জাগয়া। গঙ্গার একেবারে কিনারায় ঘাটের উপর বসেছে। মস্ত বড় চাঁদ উঠেছে, দিনমানের মতন জ্যোৎস্না। হাওয়া দিয়েছে—ভারি মনোরম। নড়ে-চড়ে অরুণ নিবিড় হয়ে এলো।

পূর্ণিমা ভালমানুষের মতো বলে, এই সব বুঝি আপনাদের উপরি?

চমক লাগে অরুণের। কথার সুর কেমন যেন।

পূর্ণিমা বলে যাচ্ছে, আমি যে-বাড়ির মেয়ে, সেখানে চাকরি-বাকরি দূরের কথা, মেয়েদের বাইরে বেরুনোই মানা ছিল চিরকাল। এ লাইন অজানা বলেই জিজ্ঞাসা করছি। মনিবের উপরি-পাওনা বুঝি এইগুলো?

খোয়ার স্তূপ একটা অদূরে। কথা নয়, মনে হয় পূর্ণিমা খোয়া ছুঁড়ে মারছে। লোলুপ হাতদুটো অরুণ তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিল।

শান্ত কণ্ঠে পূর্ণিমা নিজেই জিনিষটা ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছে: আপনার অফিসের কর্মচারীরা ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায় কিসে দু' পয়সা উপরি-আয় হয়। অফিসের মনিবরাও তাই। মাইনে দেন, তার জন্য ডিকটেশন নিই, টাইপ করি, ষোলআনা কাজ আদায় দিই। অফিসের বাইরে তারপর গাড়িতে তুলে ঘোরাঘুরি, গায়ের উপর হাত চেপে ধরা—আচ্ছা, এই অবস্থায় আমায় তখন কি করতে হয় বলুন তো। জানি নে

বলেই জিজ্ঞাসা করি, কিছু মনে করবেন না।

অরুণের মুখে কথা নেই, কানেই যাচ্ছে না যেন। একটা নৌকো ঘুরে-ঘুরে আনন্দবিহার করছে, ছইয়ের ছাদে যুবক আর যুবতী, সেদিকে তাকিয়ে আছে সে একদৃষ্টে।

একটুখানি চুপ করে পূর্ণিমা বুঝি জবাবের প্রত্যাশায় ছিল। বলে, আনাড়ি বুদ্ধিতে আমি বুঝি—দুটো জিনিষ করা চলে। হাত ধরেছেন তো সেই হাতে গালের উপর ঠাস করে চাপড় মারা। অথবা হাতে বেড় দিয়ে ধরে আপনার গায়ের উপর ঢলে পড়া, নৌকোর উপর ঐ ওরা যেমন করছে। দুটো জিনিষই নির্ভয়ে করা চলে, নিজে আপনি কোনটাই প্রকাশ হতে দেবেন না। তা হলেও চড়-চাপড়ের পর সেই মনিবের চাকরি কোন মতে আর করা চলে না। কি বলেন?

সমস্যার পড়ে বহুদর্শী হিতৈষী সুহৃদের কাছে সদুপদেশ চাইছে, ভাবখানা এমনি। বলে, চড় দিলে চাকরিও সঙ্গে সঙ্গে ছাড়তে হয়। সে তো পেরে উঠব না। ভাইয়ের জন্য খরচ, সিঁড়ি থেকে পড়ে বাবা অচল হয়েছেন—চাকরি ছাড়লে এঁদের কি উপায় হবে? আবার চড়ের বদলে গায়ে গড়িয়ে পড়েও মুনাফা নেই। শান্তা হতভাগী তাই তো করেছিল।

সচকিত হয়ে অরুণ প্রশ্ন করে, শান্তা কে?

আমার আগে যিনি রিসেপসনিস্ট ছিলেন। আপনার কিছু নয়, সেটা আপনাদের কনিষ্ঠ সমীরবাবুর ব্যাপার, সেইজন্যে বোধহয় সঠিক মনে পড়ছে না। সমীরবাবুর তখনও বিয়ে হয় নি, শান্তা অনেক রকম প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন শুনেছি। টের পেয়ে আপনারা সমারোহে বিয়ে দিয়ে বউ ঘরে আনলেন। কাঁদতে কাঁদতে শান্তা বাড়ি গিয়ে ঘরের দরজা দিলেন। তারপরে আর অফিসে আসেন নি। শান্তার তবু যা-হোক আশা করবার ছিল—আপনার বেলা শুধু স্ত্রী নয়, দু-দুটো বাচ্চা ছেলে। আমি কোন্ লোভে তবে শান্তার মত হতে যাই বলুন।

হেসে উঠল পূর্ণিমা। অরুণ বলে, আপনি অন্যায় দোষারোপ করছেন। ফিরে যাবেন তো চলুন।

পূর্ণিমা দাঁড়িয়ে পড়ল। বলে, তা দেখুন দুয়ের কোনটাই আমি করলাম না। ঠিক সেই জন্যেই আপনি আমার কিছু করে দিন। কোন ভাল অফিসে একটা চাকরি। ব্যবসা সূত্রে আপনাদের বিস্তর জানাশোনা—ইচ্ছে করলেই পারেন। এত সব কাণ্ডের পর আপনার চাকরি না ছেড়ে দিয়ে উপায় নেই।

গাড়ির ভিতরে একটি কথাও নয়। যেন দুই বোবা চলেছে—দুই পাথরের মূর্তি পাশাপাশি। বাড়ির গলির কাছে থামতে পূর্ণিমা দরজা খুলে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। গাড়িও তারপরে মুহূর্তকাল দাঁড়ায় না।

অফিসেও তেমনি। ডাক পড়লে পূর্ণিমা অরুণের চেম্বারে গিয়ে ডিকটেশন নিয়ে আসে, টাইপ করে জিনিষটা বেয়ারার হাতে পাঠিয়ে দেয়। ছুটির পরে ধীরে-সুস্থে গিয়ে ট্রাম ধরে, লাল-গাড়ি ত্রিসীমানার মধ্যে দেখা যায় না।

কেউ কিছু জানে না, পাশের সেই নলিনাক্ষ সেনকে সে কেবল বলেছিল, আমি একজন বাড়তি লোক এসে পড়েছিলাম, আপনাকে তাই রিটায়ার করতে বলল। আর বলবে না, আমি চলে যাচ্ছি।

সাগ্রহে নলিনাক্ষ বলেন, চাকরি অন্য কোথাও ঠিক হল বুঝি?

ভাসা-ভাসা রকমে পূর্ণিমা জবাব দেয়: হয়ে যাবে বই কি।

উল্লাস চেপে রাখতে পারেন নি ভদ্রলোক। বড়সাহেব অসীমের ঘরে তাঁর বেশি কাজকর্ম। সুখবর সরাসরি সেই অবধি তুলে দিয়ে এসেছেন। পূর্ণিমার ডাক পড়ল।

পূর্ণিমা প্রমাদ গণে। কাজের রীতিমত সুনাম হয়েছে ইতিমধ্যে। অসীম যদি মানা করে কি জবাব দেবো? আগে-ভাগে চাউর হতে দেওয়া ঠিক হয় নি।

অসীম বলে, চাকরি ছাড়ছেন নাকি?

আমতা-আমতা করে পূর্ণিমা বলে, ঠিক করি নি এখনো কিছু। মানে, দুবার করে বাস-বদল, ভিড়ের মধ্যে কষ্ট হয় বড্ড—

অসীম উপদেশ দেয়: ঠিক করে ফেলুন, দ্বিধা করবেন না। এখানে ভবিষ্যৎ কি? কত আর আমরা দিতে পারব? ভাল জায়গায় পান তো এক্ষুণি চলে যান।

একটু থেমে আবার বলে, সত্যি বলতে কি—সব জায়গাই ভাল আমাদের এখান থেকে। এ হল নরককুণ্ড।

কী লজ্জা, কী লজ্জা! অরুণের আচরণ কানে গিয়েছে নিশ্চয় কিছু। সরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চান। তাঁর সুরে সুর মিলিয়ে নিরীহ ভাবে পূর্ণিমা বলে, ডালহৌসী স্কোয়ার অঞ্চলে যদি কিছু জোটানো যেত, যাতায়াতের সুবিধা হত আমার পক্ষে।

আলবৎ জুটবে। আমিও খোঁজে রইলাম।

যা ভেবেছিল একেবারে তার উল্টো। সহানুভূতিতে অসীম যেন গলে গলে পড়ছে। বলে, কাজে যা নিষ্ঠা—লুফে নেবে আপনাকে। ধাঁ-ধাঁ করে উন্নতি। দরখাস্ত করেছেন? কোথায় কোথায় করলেন, আমায় বলবেন। চেনা বেরুতে পারে তার মধ্যে—আমি বলে দেব।

এই শেষ নয়। হপ্তাখানেক পরে ছোটসাহেব সমীরের ঘর থেকে তলব।

হার্মান প্লাম্বিং সাপ্লায়াস-এর নাম শুনেছেন?

পূর্ণিমা মৃদু হাসল। মার্চেন্ট অফিসে কাজ করছে, অত বড় কোম্পানির নাম জানবে না?

সেখানে কাজ খালি আছে, দরখাস্ত করুন। দরখাস্তের ড্রাফট তৈরি করে রেখেছি, টাইপ করে নাম সই দিয়ে ছেড়ে দিন। আমাদের কোম্পানির একটা সার্টিফিকেট দরখাস্তের সঙ্গে জুড়ে দেবেন। তারও ড্রাফট আছে—টাইপ করে বড়দাদাকে দিয়ে সই করিয়ে নেবেন।

স্বহস্তে সমীর ড্রাফট বানিয়ে রেখেছে, পূর্ণিমার হাতে দিল। বলে, আপনার মতন কাজের মানুষের উন্নতি হোক, একান্ত ভাবে চাই আমরা।

অর্থাৎ, মধ্যমের লাল-গাড়িতে উঠে ঘোরাঘুরি জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ উভয়েরই কানে গেছে, নজরেও পড়ে যেতে পারে। দুই ভাই অতএব কোমর বেঁধে লেগেছে, পূর্ণিমার উন্নতি না করিয়ে ছাড়বে না। শাস্তার মতন অত দূর যেন গড়াতে না পারে।

আরও হল—সার্টিফিকেটে অসীমের সই নিতে গেছে যখন। অসীম বলে, দরখাস্ত এমনি দিয়ে লাভ নেই। এক কাজ করুন। কাঁটায় কাঁটায় দশটার সময় কাল চলে আসুন। আমি সঙ্গে করে নিয়ে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আসব।

পূর্ণ মুখুজ্জের পুরানো অফিস। চিরজন্ম কাটিয়ে এসেছেন—চাকরি ছাড়লেও মায়া ছাড়ে নি। তাঁর আমলের কর্মচারীও আছেন দু-পাঁচজন। পথে-ঘাটে দেখা হয়ে গেলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যাবতীয় খবরাখবর নেন। নলিনাক্ষ সেনের সঙ্গে দেখা একদিন।

কাজকর্ম চলছে কেমন?

নলিনাক্ষ সেনের নিজের কথাই এক কাহন। বলেন, আপনার মতন আমিও রিটায়ার করছিলাম মুখুজ্জেবাবু। করাচ্ছিল জোর করে। কিন্তু আপনার অবস্থা আমার অবস্থা তো এক নয়। আপনার একটি মাত্র বন্ধন—এক মেয়ে। মেয়েটার বিয়ে দিয়ে ফেললে দুনিয়ায় আর দায় থাকল না। আর সে দায় মোচনের জন্য ঈশ্বরের দয়ায় তিলেকের তরে ভাবতে হবে না। আমার হল পঙ্গপালের সংসার। চোখে সর্ষেফুল দেখছিলাম—তা খুব রক্ষে হয়েছে, তীর কানের পাশ দিয়ে সরে গেছে। যে ছুঁড়িটাকে আপনি দিয়েছিলেন, ভারি তুখোড় কিন্তু। ধাঁ-ধাঁ করে উন্নতি—

পূর্ণ শুনে খুব খুশি হলেন। দেমাক করে বলেন, পাড়ার মেয়ে—ওর বাপের সঙ্গে আমার বড় সম্প্রীতি। ভারি ঘনিষ্ঠতা। ও মেয়ে উন্নতি করবে আমি জানতাম।

ক্রমশ আসল বক্তব্যে এসে পড়লেন নলিনাক্ষ। বেরিয়ে আসবার জন্য যা-সব ফুটছিল পেটের ভিতর। বললেন, উন্নতি এত দূর যে, আমাদের কোম্পানিতে কুলালো না। শেষটা অসীমবাবু নিজে গাড়ি করে হার্মান প্লাশবার্গে তুলে দিয়ে এলেন। দিয়ে এসে তবে সোয়াস্তি। টাল খেয়ে আমার চাকরিও তাই টিঁকে গেল।

কথার ধরন বাঁকা। পূর্ণ মুখুজ্জে নলিনাক্ষর মুখে তাকিয়ে পড়লেন: বৃত্তান্ত কি, খুলে বলুন।

নানান রকম রটনা। অফিসে কানে পাতা যায় না। বাড়িতে মেজোকর্ত্রী শোনা গেল বাপের বাড়ি চলে যাচ্ছেন। অসীমবাবু আর সমীরবাবু মিলে শেষটা কলে-কৌশলে অফিস থেকে সরালেন। তা শাপে বর হয়েছে ছুঁড়িটার। এখানে যা পেত, তার দেড়া মাইনে। অত বড় কোম্পানি—আরও কত দূরে উঠবে, লেখাজোখা নেই।

বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শুনলেন পূর্ণ। খানিকটা বিশ্বাস হল, খানিকটা নয়। আরও ভাল করে শুনবেন বলে পুরানো অফিসে চলে গেলেন। সোজা অসীমের ঘরে।

কাকাবাবু, মনে পড়ল বুঝি এতদিনে?

সেই যে পূর্ণিমা সরকার—কাজকর্মে কেমন হয়েছে মেয়েটা?

ভাল কাকাবাবু, ভয়ানক রকমের ভাল। এত ভাল যে রাখতে পারলাম না—মস্ত জায়গায় ঢুকিয়ে দিয়ে এলাম।

মিথ্যে বলে নি তবে নলিনাক্ষ সেন। তেমন কিছু বাড়িয়েও বলে নি। পূর্ণকে এরা খুব মান্য করে। ঢোক গিলে অসীম আবার বলে, একটা নিবেদন কাকাবাবু। না বললে নয়, তাই বলছি। নেশা সহজে যেতে চায় না, দৃষ্টি পড়লেই টেনে ধরে। আপনি স্পষ্টাপষ্টি বলে দেবেন, মিস সরকার এদিককার ছায়া না মাড়ায়। আমাদের পক্ষে বলাটা ঠিক হবে না। আরও ভয়, মেজোবাবু চটতে পারে। সমান শরিক তো বটে। দাদা বলে মান্য করে, কিন্তু চক্ষুলজ্জা কাটতে কতক্ষণ। আপনি যখন জুটিয়ে দিয়েছিলেন, আপনিই আগে মানা করবেন। কথা না শুনলে আমরা তো আছিই। তখন কি আর ন্যায়-অন্যায় বাছব?

সেদিন সন্ধ্যায় যথারীতি দাবা পাতিয়ে বসেছেন, কিন্তু পূর্ণ মুখুজ্জে কেমন অন্যমনস্ক। মনের মধ্যে আনাগানা করছে: নোংরা কথাটা তোলা যায় কেমন ভাবে। সে সুযোগ তারণকৃষ্ণই করে দিলেন। গদগদ হয়ে সুখবর দিচ্ছেন: পুনির খুব ভাল হয়ে গেল। হার্মান প্লাশবার্গে ঢুকেছে। জান তো কত বড় কোম্পানি—পুনি যে পুনি, তার বাপ পেলে বর্তে যেত। কিন্তু তুমি পূর্ণ-দা সকলের মূলে—সেটা ভুললে চলবে না। পুনিকে কিছুতে কলেজে দেবো না—নাছোড়বান্দা হয়ে তুমি রাজি করালে। কলে দেখানোর কায়দায় পছন্দ করিয়ে চাকরিতে ঢোকানো—সম্পূর্ণ তোমার ব্যবস্থায়।

ভাবতেও ভয় করে, পুনির চাকরি না হলে কোথায় আমার সংসার ভেসে যেত!

পূর্ণ মুখুজ্জে গম্ভীর হয়ে থাকেন। মনে মনে লজ্জা এবং অনুতাপও। এদের বনেদি নির্মল কুলের মেয়েটাকে ঘরের বার করেছি বুদ্ধি দিয়ে। কুবুদ্ধি বললেই ঠিক কথা বলা হয়।

তারণ অবাক হয়ে যান। আহত কণ্ঠে বলেন, কি হল পূর্ণ-দা, পুনির ভাল খবরে এমন চুপ করে গেলে কেন?

টাকাই রোজগার করছে, ভাল আর কিসে হল?

বলতে বলতে পূর্ণ মুখুজ্জে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন: ভুল করেছিলাম ভায়া, মুক্তকণ্ঠে মেনে নিচ্ছি। পোষা বিড়াল বনে গিয়ে বনবিড়াল হয়ে যাবে ভাবতে পারি নি। পুরানো মনিববাড়িতে আমার এত খাতির-ইজ্জত—গিন্নি খবর দিয়ে পাঠিয়েছেন, তা মুখ দেখাবার লজ্জায় যেতে পারি নে।

বৃত্তান্ত শুনে তারণ আপন মনে গর্জাচ্ছেন, কিন্তু পূর্ণিমাকে মুখোমুখি বলতে পারেন না। টাকা রোজগার করে দায়দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে সে এখন সর্বময়ী—তাকে কথা শোনাতে সাহস হয় না।

যে পারে সে হল অণিমা। রবিবার অবধি চেপেচুপে রইলেন কোন রকমে। প্রতি রবিবার সকালবেলা সবসুদ্ধ ওরা চলে আসে—তরঙ্গিণী, অণিমা, রঞ্জু। এসে সমস্তটা দিন হৈ হৈ করে সন্ধ্যাবেলা কাশীপুরে ফিরে যায়। এরই মধ্যে একসময় অণিমাকে আলাদা ঘরে ডেকে তারণ সব কথা বললেন। বলে সামাল করে দেন: নোংরা কথা নিয়ে চেঁচামেচি না হয়—শেষকালে দুর্গন্ধ পাড়াময় ছড়িয়ে পড়বে। আড়ালে গিয়ে চুপি-চুপি বলবি ওকে, এই যেমন তোকে বলছি। তোর মা'কেও বলবি নে—খামোকা মনোকষ্ট পাবে, কী দরকার! অল্পবুদ্ধির সেকেলে মেয়েমানুষ, একটা সিন করেও বসতে পারে। তবে পুনিকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার—কেলেঙ্কারি বিস্তর দূরে গড়িয়েছে, আমাদের কান অবধি পৌঁছে গেছে। নতুন জায়গায় গেছে, ওখানে আবার বদনাম শুনতে যেন না হয়।

পূর্ণিমাকে নিয়ে অণিমা ঘরের দরজা দিল। মুখ কালো করে বলে, তুই যে এমন হবি স্বপ্নেও কোনদিন ভাবি নি।

পূর্ণিমা যেন কিছুই বোঝে না। একমুখ হাসি নিয়ে বলে, কি হয়েছে রে?

বলতে মাথা কাটা যায়—

তাচ্ছিল্যের সুরে পূর্ণিমা বলে, অফিসের কানাঘুষো বাড়িতেও হাজির। ভেবে দেখ্ দিদি, কী কপাল-জোর আমার! একলা আমার বা বলি কেন, তোদের সকলের। ভাগ্যিস ঐ কথাটা অমন ভাবে ছড়াল।

অণিমা বলে, কলঙ্কে কান পাতা যায় না, তাকে তুই ভাগ্য বলছিস?

নইলে কি হার্মান শ্লাম্বার্সে এত টাকার চাকরিতে ঢুকতে পারতাম? কত রকম তদ্বির কত সই-সুপারিশ নিয়ে কতজনে মুকিয়ে ছিল—আমার তদ্বির সকলের সেরা। চিঠি নয়, টেলিফোন নয়, অসীমবাবু গাড়ি করে ম্যানেজারের কাছে নিয়ে ব্যক্তিগত অনুরোধ জানিয়ে চাকরিতে বসিয়ে দিলেন। মূলে তো ঐ কলঙ্ক।

অণিমা বলে, তালুকদার-বাড়ির মেয়ে—গলায় দড়ি তোর, কলঙ্ক নিয়ে দেমাক করিস।

তালুকদার-বাড়ির মেয়েদের যেমনভাবে জীবন কেটেছে, নেহাৎ পক্ষে তুই যেমন কাটাচ্ছিস, আমার তেমন হতে দিলি কই? টাকা রোজগারে আমার যে হাটে-বাজারে

পাঠান হল। মাইনে বেড়েছে আমার, সঙ্গে সঙ্গে সংসারের বরাদ্দ বেড়েছে, তোর টাকাও বাড়িয়ে দিয়েছি। তবে আর বলবার কি আছে শুনি।

হঠাৎ হাসি মুছে গিয়ে কণ্ঠে যেন তার আগুন ধরে গেল: আমি কি চেয়েছিলাম এই জীবনে? কত কেঁদেছি, খবর রাখিস? তালুকদারের মেয়েরা চিরকাল ধরে যা পেয়ে এসেছে, তাই ছাড়া একফোঁটাও বাইরের প্রত্যাশা করি নি। ঘর চেয়েছিলাম, তোর রঞ্জুর মতন একটা সন্তান চেয়েছিলাম। লেখাপড়া একটু-আধটু শিখেছি, সে আমার নিজের ঘরে নিজের ছেলেমেয়ের কাজে লাগত। আবর্জনা-আঁস্তাকুড় ঘেঁটে টাকা কুড়োতে গিয়ে ময়লার ছিঁটেফোঁটা তো লাগবেই। অন্যে যাই বলুক, তোরা বলতে আসিস কোন্ লজ্জায়? দেবী বলিস আমায়—পুরোপুরি পাথরের দেবী চাস বুঝি? সে দেবীকে কিন্তু পুজো দিতে হয় নৈবেদ্য সাজিয়ে। পাল্টা তিনি দেন—কী দেন তা চোখে দেখা যায় না—নিরাকার কল্যাণ। আছিস রাজি এমনি ব্যবস্থায়?

দড়াম করে দরজা খুলে পূর্ণিমা বেরিয়ে গেল। রঞ্জুকে সামনে পেয়ে কোলে তুলে দুম-দুম করে সিঁড়ি ভেঙে ছাতে গিয়ে উঠল।

॥ বারো ॥

গেঁথে আছে পুরবীর মনে—বেরুবোই। শহরবাসী হব। শিশিরের উপর সম্প্রতি বড় বেশি তাগিদ: দেখ, পাড়াগাঁয়ের মানুষ আমাদের অভ্যাস আছে, আমরা খুব কষ্ট করতে পারি। কিন্তু অন্য একজন যদি না পেরে ওঠে—

শিশির বলে, মানুষ তো আমরা দুজন। আর মা। এর বাইরে অন্য কে আছে—তিনি কোন্ হুজুর শুনি?

আছেন বই কি!

শিশির তাকিয়ে থাকে পুরবীর দিকে। পুরবী মিটিমিটি হাসে। শিশিরও হেসে বলে, বুঝেছি। কিন্তু ফাইফরমাস ইচ্ছে-অনিচ্ছে এখন থেকেই তিনি বলতে লেগেছেন?

বলবে না! তুমি বেরিয়ে যাও। মা টিক-টিক করেন, ভারী কোন কাজে হাত ছোঁয়ানোর জো নেই। বড়জোর বিছানার উপর চাদরখানা পাতা, কি বসে-বসে চন্দন-পাটায় ঠাকুরের জন্য একটু চন্দন ঘষা। ষোড়শী-দি এরই মধ্যে বহাল হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছ না? সারাটা দিন তবে আমার কাটে কি করে? হুজুরের জামা-জাঙিয়া বানাই, আর কি কি তিনি বলতে চান শুনি কান পেতে।

শিশির সকৌতুকে বলে, একটু-আধটু আমিও না হয় শুনলাম—

তুমি আগাগোড়া সবই শুনবে। হুকুম নইলে তামিল করবে কে? বর্ষা আসছে, প্যাচপেচে সেই কাদার মধ্যে থাকতে উনি নারাজ। পাকা ঘর-উঠোন চাই, পাকা পথঘাট—

আর?

অন্ধকারে ভয় করবে। ঝলমলে আলো জ্বলবে সারা রাত্তির—ঘরে পথে চতুর্দিকে।

মানে, শহর—

ঘাড় দুলিয়ে দুটো চোখ কুঁচকে পুরবী সায় দেয়: শহর কলকাতা। পার্কে বেড়ানো হবে, তার জন্যে পেরাম্বুলেটার চাই। জামা ডজনখানেক আমিই বানিয়ে দিচ্ছি—মাথার টুপি, পায়ের জুতো-মোজা এই সমস্ত চাই। মেমপুতুল চাই, বাজনা

চাই, হাতী চাই, এরোপ্লেন চাই--

বাপ যে গরিব ইস্কুলমাস্টার—সেটার বিবেচনা হবে না ?

প্‌রেবী সগবে' বলে, কিন্তু মা ?

রাণী !

সোহাগ-ভরা কণ্ঠে শিশির বলে, তাই বটে ! রাণীর কোলে যে আসছে সে তো রাজপ্‌ত্তর। মাটিতে পা না ছোঁয়াতেই তার হ্‌কুম-হাকাম।

প্‌রেবী চিঠি লেখার ব্‌ত্তান্ত বলল। বলে, মামাকে আমি তো এই এই লিখলাম। মায়ের জবানি—তাঁরই সামনে বসে। মা পড়ে শোনাতে বললেন তো গড়গড় করে তাঁর কথাগ্‌লোই বলে গেলাম। অন্য কাউকে পড়তে দিলে ধরা পড়ে যেতাম। পারবে তুমি —সে আর পারতে হয় না ! দাম সাহেবকে তুমি লেখো এবার। গড়িমসি আর নয়, একটা-কিছ্‌ করে দিন। জল-জঙ্গল সাপ-খোপের রাজ্যে নড়বড়ে এই খোড়ো চালের নিচে—মাগো মা, আমরা থাকি বলে, ছেলে কেন থাকতে যাবে ?

ভাগ্যক্রমে কলকাতায় এক বিশেষ ম্‌র্‌ব্বি আছেন—দামসাহেব। প্‌নর্বাসন দপ্তরের কেষ্টবিষ্ট্‌ একজন—শিশিরের জন্য তিনি সত্যিই কিছ্‌ করতে চান। সতীশ দাম ছাত্র-জীবনে শিশিরের বাপের আশ্রিত ছিলেন, পিতৃহীন গরিব ছেলেটার পড়াশ্‌নোর ব্যবস্থা তিনি তখন করে দেন। জীবনে কৃতী হয়ে পিছনের কথা বিলকুল ভুলে যাওয়াই রীতি। কিন্তু দামসাহেব আলাদা ধাঁচের মান্‌ষ—এক বয়সে যে উপকার পেয়েছিলেন, তার কিছ্‌ প্রতিদান দেবার জন্য আঁকুপাকু করেন।

দামসাহেবের সঙ্গে শিশির চিঠিপত্র চালায়, যথারীতি উত্তরও আসে। এবারে প্‌রেবী আচ্ছা রকম ঘাড়ে লাগল : চিঠি দাও, আর এখানে থাকা যাচ্ছে না। এ-দ্‌ঃখ সে-দ্‌ঃখ বানিয়ে বানিয়ে লেখো। তিনি মন করলে চাকরি পেতে একটা মাসও লাগবে না।

দামসাহেব লিখলেন, ও রকম চিঠি ছ্‌ঁড়ে চাকরি হয় না।—বিস্তর কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। গরজ যখন এত বেশি, একবার সরেজমিনে চলে এসো। বর্ডারে এখনো রিফিউজি-স্লিপ দিচ্ছে, বনগাঁ থেকে জোগাড় করে নিয়ে এসো। দশ-বিশ টাকা বাজেখরচ হতে পারে, তব্‌ এনো। ঐ জিনিষ থাকলে চাকরির স্‌বিধা হয়। প্‌ব-বাংলা কোন জন্মে চোখে দেখে নি—তারাও সব জোগাড় করে আনে। স্লিপ নিয়ে অফিসে আমার সঙ্গে দেখা করবে।

তবে আর কি ! যাও চলে। এমন চিঠির পরেও দেরি করবার মানে হয় না—

তাগিদে তাগিদে প্‌রেবী অস্থির করে। ঠোঁট ফুলায় ছোট্ট খ্‌কিটির মতো : গা করছ না। জানি জানি, গাঁ ছেড়ে নড়বার ইচ্ছে নেই। স্পষ্ট করে বললেই তো হয়। নইলে দামের মতন সহায় থাকতে চাকরি হয় না, এ কেউ বিশ্বাস করবে !

শিশির ইতস্তত করছে : তোমায় এই রকম অবস্থায় রেখে যাওয়া—

অবস্থা আবার কি ! ঢের ঢের দেরি এখনো—। আঙ্‌লের কর গ্‌ণে প্‌রেবী দ্রুত হিসাব করে ফেলে : মাসের উপরে আরও অন্তত বাইশ-চব্বিশ দিন। মা রইলেন। ষোড়শী-দি তো চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে মোতায়েন, পাড়ার সকলে আছেন। আর তোমাকেও তো সেখানে পড়ে থাকতে হবে না। একটা হপ্তা বড় জোর।

ম্‌খ শ্‌কনো করে প্‌রেবী শাশ্‌ড়ির কাছে চলে যায় : বিপদ শ্‌নেছ মাগো ? তোমায় কিছ্‌ বলে নি ? প্‌রোনো হেডমাস্টার চলে গিয়ে নতুন এক ছোকরা এসেছে—বি-টি পাশ নয় বলে সে ওকে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট-হেডমাস্টার থাকতে দেবে না। ডি-পি-আইকে লিখেছে মাইনে কমিয়ে জ্‌নিয়ার টিচারে নামিয়ে দিতে। এর পরে ইস্কুলে থাকা

কি করে সম্ভব ?

ধর-গিন্নি এক কথায় বলে দিলেন, থাকবে না। লেগে-পড়ে জমিজমা দেখুক, ইস্কুলের ঐ ক'টা টাকা চাষবাস থেকে উঠে আসবে।

পূরবী সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে ওঠে ঃ আমিও তাই বলছি মা। মাস্টারি না থাকল তো বয়ে গেল—

শাশুড়ির দিকে চোখ পিটপিট করে চেয়ে খুব সতর্কভাবে এগোয় ঃ না-ই বা হল বি-টি—অনার্সে ফার্স্টক্লাস, তার উপর সুনামের সঙ্গে এদ্দিন ধরে কাজ করে আসছে, তার একটা বিচার হবে না ? বলছে কি, ঢাকায় গিয়ে চীফ-ইন্সপেক্টরের কাছে বুঝিয়ে বলে আসবে। সেই ইন্সপেক্টরের ভাইয়ের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়েছে, দুজনে বড় বন্ধুত্ব।

এবারও ধর-গিন্নি বলেন, যাবে তাহলে ঢাকায়। এদিককার হাঙ্গামাটুকু মিটলেই চলে যাবে।

পূরবী ঘাড় নেড়ে বলে, আমিও তাই বলি। ক'টা মাস বাদ দিয়ে পুজোর ছুটির মধ্যে যাওয়াই ভাল। এখন কামাই হলে তাই নিয়ে হয়তো আবার লেখালেখি করবে। কিন্তু সে নাকি হবার জো নেই। দেখুন দিকি মা!

কেন ? বলছে কি শিশির ?

বলে পাঁচটা-সাতটা দিনের তো ব্যাপার। যা করবার এখনই। অর্ডার একবার বেরিয়ে গেলে রদ করানো ভারি শক্ত।

ধর-গিন্নি শেষ রায় দিয়ে দিলেন ঃ চলে যাক তবে। কী হয়েছে- আমরা সব আছি। ষোড়শী রয়েছে—

ষোড়শীকে দেখতে পেয়ে তাকে শুনিয়ে বলছেন, আঁতুড়ঘরের কাজই শুধু নয়, বড় বড় ডাক্তারের কান কেটে দেয় ও বেটি। ওকে পেয়ে নিশ্চিন্ত। তুই কি বলিস রে ষোড়শী—জরুরি কাজে শিশিরের একবার বাইরে যাওয়া দরকার। যাবে ?

বরের কাছে গিয়ে পূরবী দেমাক করে ঃ সমস্ত আমি করেছি। মার কাছ থেকে ছুটি করিয়ে নিয়ে এলাম দেখ। তুমি পারতে ? এখন কোন্ আপত্তি তুলবে ভাবো—ভেবে ভেবে বের করো একটা-কিছু। সময় দিয়ে যাচ্ছি।

কথা ছুঁড়ে দিয়ে পূরবী ফরফর করে চলে গেল।

শিশির ঢাকায় গেল, মা তাই জানেন। গেছে কলকাতায়। ওদের ষড়যন্ত্র তাই। দামসাহেবের কাছে। বর্ডার স্টেশন থেকে রিফিউজি স্লিপ নিয়ে নিয়েছে। পরিবারের ক'জন সঙ্গে আছে, তা-ও স্লিপে লেখা। ঝামেলা নেই, বাঁধা রেট হয়ে আছে—মিষ্টি অধিক আবশ্যক হলে গুড় বেশি পরিমাণে লাগবে, এই হল কথা—পরিবার বাড়াবেন তো খরচাও তদনুপাতে।

দামসাহেব স্লিপখানা ফিরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখে সহাস্যে বললেন, ঠিক আছে।

বিস্তর করলেন তিনি। খান-দশেক দরখাস্ত লেখালেন বিভিন্ন অফিসের নামে। বলেন, ঘুরে ঘুরে নিজের হাতে এগুলো ছেড়ে এসো, অন্যের উপর নির্ভর কোরো না। আর ফোন করে দিচ্ছি গোটাকয়েক জায়গায়—সেই সেই জায়গায়—সেই সেই অফিস-মাস্টারের সঙ্গে দেখা করে যাও। গাড়িতে করে নিজেও কয়েক জনের কাছে নিয়ে গেলেন। সবাই আশা দিচ্ছে। এই সব করতে করতে দুটো হপ্তা যেন উড়ে চলে গেল কোন্ দিক দিয়ে। দু-হপ্তা কেটে আরও ক'দিন হয়েছে।

বাড়ির জন্য মন চঞ্চল। এক সস্তা হোটেলে আছে। পূরবী ঠিকানা জানে না, নিজেও চিঠি লেখে নি জিনিষটা চাউর হয়ে যাওয়ার শঙ্কায়। পাকা আড়াই হপ্তা

কাটিয়ে শিশির দামসাহেবকে গড় হয়ে প্রণাম করল।

সতীশ দাম আরও এক ব্যবস্থা করেছেন। দরখাস্তে শিশিরের কলকাতার ঠিকানা দেওয়া হল দামেরই এক আত্মীয়বাড়ি। শিশিরের নামের যাবতীয় চিঠিপত্র তাঁরা দামসাহেবের কাছে পে'ছি দেবেন, পড়ে দেখে দাম যথাব্যবস্থা করবেন। প্রয়োজন হলে টেলিগ্রাম করবেন শিশিরের মহকুমা ইস্কুলে।

প্রণাম করে শিশির বলে, আসি এবারে দাদা—

সতীশদাম বলেন, তা যাও। কাঁহাতক পড়ে পড়ে হোটেল খরচা করবে। বড় শক্ত ঠাঁই—ভাল হল, নিজে এসে দেখে-শুনে গেলে। নইলে ভাবতে, ইচ্ছে করেই দাদা কিছু করছে না। তক্কে তক্কে রইলাম, হবেই একটা-কিছু।

॥ তেরো ॥

গাঁয়ে পা দিয়েই শিশির দুঃসংবাদ শুনল পা পিছলে পুরবী পুকুরঘাটে পড়ে যায়। আঘাত গুরুতর, রক্তের স্রোত বয়ে গিয়েছিল। সময়ের আগেই প্রসব হয়ে গেছে ঃ মেয়ে। রাজপুত্তুর নিয়ে হাসি-তামাসা হত—কিন্তু ছেলে নয়, মেয়ে হয়েছে।

তা বিধাতাপুরুষ যা দিলেন, হাসিমুখ করে নিতে হয়। ভালই দিয়েছেন। কিন্তু মা-মেয়ে দুজনেই যাবার দাখিল হয়েছিল। অবস্থা রীতিমত সাংঘাতিক। মহকুমা শহরে দুজন প্রবীণ বিচক্ষণ ডাক্তার ছিলেন, উভয়েই পাত্তাড়ি গুটিয়েছেন। সেই দুয়ের জায়গায় নতুন জন পাঁচ-সাত চেয়ার-আলমারি সাজিয়ে এসে বসেছেন। সাক্ষাৎ শমনদূত—হাত ফসকে রোগি কদাচিৎ ত্রাণ পায়। ঐ ডাক্তারবাবুরা বাচ্চাটাকে তত নয়, পুরবীকে প্রায় শেষ করে এনেছিল—তখন ষোড়শী উগ্রমূর্তি ধরে ডাক্তারি ওষুধপত্র আঁস্তাকুড়ে ফেলে নিজস্ব শিকড়বাকড় ও ঝাড়ফুঁক নিয়ে লাগল। এবং সেই ফাঁড়া সামালও দিয়েছে সত্যি।

বাড়ির পথে এইসব খবর শুনল শিশির। সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে, হনহন করে বাড়ি এসে উঠল। কাউকে দেখা যাচ্ছে না। মা এ-সময়টা ঠাকুরঘরে থাকেন। শিশির নেই, সেজন্যে হয়তো মাহিন্দারেরাও সরেছে। ষোড়শীও গেছে কোন্ দিকে।

শোবার ঘরে উঁকি দিয়ে দেখল। পুরবী নিঃসাড়, এই সন্ধ্যারাত্রেও ঘুমুচ্ছে। জুতো খুলে রেখে পথের কাপড়চোপড় ছেড়ে সাবানে হাত-পা ধুয়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে শিশির নিঃশব্দে খাটের কাছে এসে দাঁড়ায়। ঘুমুচ্ছে বটে—দু'জনে পাশাপাশি। মা আর মেয়ে। নতুন মা আর হপ্তা-দুই বয়সের মেয়ে। শিশির এত টিপিটিপি এসেছে, পুরবী তবু জেগে পড়ল। চোখ মেলে তাকাল।

এক লহমা তাকিয়ে রইল—বিশ্বাস হচ্ছে না যেন। শিয়রের দিকে জোর-কমানো হেরিকেন—জোর বাড়িয়ে দিল। কালো বর্ণের পুরবী, হেরিকেনের আলোয় দস্তুরমতো ফর্সা দেখাচ্ছে। ফর্সা নয়, ফ্যাকাশে—রক্তের কণিকামাত্র নেই বোধহয় চামড়ার নিচে। শিশিরের বুকের ভিতরটা হাহাকার করে ওঠে—কাকে রেখে গিয়েছিল, ফিরে এসে কোন্ এক ভিন্ন নারীকে দেখছে!

শীর্ণ হাতদুটো শিশির মুঠোয় তুলে নিল। উফ, জ্বর রয়েছে বোধহয়। পুরবী হাসে ঃ ভেবেছিলাম আর দেখা হল না।

যাও, অমনি করে বলে বুঝি! স্নেহকণ্ঠে শিশির তাড়া দিয়ে ওঠে ঠোঁটের ওপর

তর্জনী চেপে ধরে দুয়োরে কুলুপ আঁটার ভঙ্গিতে।

পূরবী তবু বলে, তোমার মেয়ে—ভেবেছিলাম, তোমার কাছে সঁপে দিতে পারলাম না। বড্ড কষ্ট হচ্ছিল। তা দেখ, সাধ পূরণ হল, আর আমার কোন দুঃখ নেই।

এমন বলতে লাগল আমি কিন্তু পালাব। যেদিকে দুচোখ যায় ছুটে বেরুব। কত ছুটোছুটি করে চাকরি আর বাসা বাঁধার যোগাড়যন্তর করে এলাম, সে সব খবর শুনবে না তো?

এই মন্ত্রে কাজ হল। শিশিরের হাতদুটো পূরবী শক্ত করে জড়িয়ে ধরে। সত্যি সত্যি যেন পালিয়ে যাচ্ছে, হাত বেঁধে তাই ঠেকাল।

শিশির কলকাতার খবর বলে যায়। দস্তুর মতো বাড়িয়ে এবং বানিয়ে বলছে। চাকরি তো একরকম মুঠোয় ধরে নিয়ে এসেছে। একটা উৎকৃষ্ট বাসা—সে-ও কি আর আটকে থাকবে দামসাহেব যখন পিছনে রয়েছেন! রাণী, খুব তাড়াতাড়ি তুমি ভাল হয়ে ওঠে।

শুনতে শুনতে পূরবীর দু-চোখে নির্ঝরের মতন জল গড়ায়। মুছে দেবে, কিন্তু হাত সে কিছুতে ছাড়ে না। অশ্রু ভোবা চোখদুটো এঁটেসেঁটে বন্ধ করল। অশ্রুজল শিয়রের আলোয় ঝিকঝিক করে—কোন স্বপ্নে বুকের ভিতরটা বুঝি আলোময়, ঝলক পড়েছে মুখের উপরেও। চোখ-মুখ প্রাণপণে বন্ধ করে আছে, স্বপ্ন যাতে অনেকক্ষণ ধরে আটকে রাখা যায়।

হঠাৎ ধড়মড় করে খাট থেকে পূরবী নেমে পড়ল। পরক্ষণেই বিকৃতমুখে আবার বসে পড়ে। বলে, না, পারি নে। পেটের মধ্যে এমন মোচড় দিয়ে উঠল—

শিশির বলে, উঠবার কি হল! কী দরকার, বলো আমায়।

ষোড়শী-দিকে ডাকো না একবার। সর্বক্ষণই তো আমাদের নিয়ে আছে—দুজনেই এখন শান্ত হয়ে ঘুমুচ্ছি দেখে একটু হয়তো বেরিয়েছে। কাছেপিঠে আছে কোথাও, বাড়ি ছেড়ে যাবে না।

শিশির একটু উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখে এলো। ফিরে এসে বলে, কী দরকার বলো না আমায়! আমি করে দিচ্ছি।

তুমি পারবে না।

দেখই না বলে।

বলাই যাবে না তোমায়—

মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে দুষ্টুমির হাসি। যে-হাসির জন্য কালো মেয়ের গুপ্তনাম রাণী। রাণী ছাড়া এমন হাসি কেউ কখনো হাসে না হাসতেই জানে না।

বলো, বলো, বলো—

পূরবী বলে, যখনই তুমি বাড়ি ফেরো, আমি কত সাজ করে থাকি। বরাবরই তো করে আসছি। কলকাতা থেকে ফিরবে—মনে মনে কত ভেবে রেখেছিলাম, আরো আরো অনেক করে সেজে থাকব। আমি সাজব, মেয়ে সাজবে। চমকে দেবো আচমকা মেয়ে কোলের উপর দিয়ে। তা চমকে দিয়েছি ঠিকই।

বলতে বলতে চুপ করে যায়। চুপ করে একটুখানি দম নিল ম্লান হেসে বলে, চমকে উঠেছিলে—নয়? এই ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরনে, একমাথা রুক্ষ চুল, খড়ি-ওঠা আদুল গা—উঠে বসতে গিয়ে আমারও সেই সময়টা খেয়াল হল। আমি যে রাণী তোমার। মরে যাবে রাণী, তখনো সে রাণী হয়ে মরবে। ষোড়শী-দিকে ডাকছি, একটা শাড়ি বের করে দিক, চুলগুলো ঠিকঠাক করে দিয়ে যাক।

শিশির আবদারের সুরে বলে ষোড়শী-দি নয়—এসে গিয়েছি তো আমি, তোমার সমস্ত কিছু করে দিই। নিত্যদিন তুমি আমার সব করো, একটা-দুটো দিন আমায় তোমার কাজ করতে দাও।

জ্বরতপ্ত করতক দুটি কুসুমগুচ্ছের মতো মুঠোয় ধরে শিশির ঠোঁটে তুলে ঠেকায়। ঠোঁট-মুখ মিঠা-মিঠা হয়ে গেছে। আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়ে তারপর বলে, শাড়ি কোথায় বলো—

চোখে-মুখে এক অপরূপ ভঙ্গি করে পূরবী : জানি নে তো—

জানিনে-জানিনে করছে দুষ্টামির সুরে, আর আড়চোখে তাকায় এক-একবার আলমারির দিকে। বলার তবে বাকি কী রইল !

শিশিরই বা কম কিসে, সে-ও আর জিজ্ঞাসাবাদ করে না। বালিশের তলে হাত ঢুকিয়ে চাবির গোছা পাওয়া গেল। গোটা সংসারের চাবিকাঠি অধিকর্ত্রী আঁচলে বেঁধে এঘর-ওঘর করত। এ-চাবি ও-চাবি পরখ করতে করতে আলমারি খুলে গেল। একটা শাড়ি হাতে নিয়ে শিশির বলে, চলবে ?

দেখার মানুষ তো তুমি। একমাত্র তুমি। তোমার যা পছন্দ—যে শাড়ি পরে তোমার চোখে আমি ভাল দেখাব।

আবার বলে, শাড়ি তো শুয়ে শুয়ে পরা যায় না। ওঘরের দেয়ালে আয়না—সেখানে যেতে হবে।

পারবে ?

তুমি থাকতে কেন পারব না ? তোমায় ধরে ধরে যাবো মাথা ঘুরে পড়ি তো তোমার বুকেই মাথা থাকবে আমার।

শিশির চুপ করে গেল। কথা বাড়ালে এমনি তো সব আবোল-তাবোল বকবে। খাটের তলে চটিজোড়া। গাঁ-গ্রামে জুতোর তেমন চলন নেই—পুরুষেরাও খালি পায়ে বেড়ায়, তা মেয়ে। শিশির শখ করে সদর থেকে এই জরি-দেওয়া শৌখিন চটি এনে দিয়েছিল। বাড়ির একলা বউয়ের ঘরের মধ্যে পরার বাধা নেই। তবু অবহেলায় পড়ে থাকে খাটের তলে—অবরে সবরে বেরোয়। এই যেমন শিশির বের করল—মাটির মেঝেয় খালি পায়ে অসুখ অবস্থায় চলাচল নিষেধ। ফস করে পূরবীর একটা পা আলগা করে নিয়েছে—

ওকি, ওকি, পায়ে কেন হাত ?

শিশির কানেও নিল না। শক্ত করে ধরেছে, ছাড়িয়ে নেওয়া যায় না। ঠাকুর-প্রতিমার অঙ্গে কুমোরে যেমন ধরে ধরে ডাকের সাজ পরায়, শিশিরের জুতো পরানোর ধরনটা তাই। যেন প্রতিমাসজ্জা হচ্ছে। একটা পা হয়ে গেল তো আর এক পা।

কী পাগলামি তোমার—

ফিক করে পূরবী হেসে পড়ল : আমি যদি না থাকি, মেয়ে আমাদের তবু জুতো পরেই বেড়াবে। কাজটা তুমি দিব্যি পারো, আজ পরখ হয়ে গেল।

মেয়ে কাপড়ও পরবে। জুতো-কাপড় দুটোই খুব ভালো পরাই—মেয়ের মায়ের উপর সে-পরীক্ষাও দিয়ে দিই।—

ছিঃ !

স্বামীজনোচিত আদেশের ভঙ্গিতে শিশির বলে, আয়না অবধি যাওয়া চলবে না, ওঠা-উঠির কোন দরকার নেই। দেখবার লোক একলা আমি—যেমন ভাবে পরলে চোখে আমার ভাল লাগবে, সে-জিনিষ তোমার চেয়ে আমারই বেশি জানা।

অসহায়ের মতো হাত-পা ছেড়ে পূরবী বলে, লজ্জা করে—

চোখ বোঁজ তবে। দেখতে না পাও।

বুঁজল চোখ সত্যি সত্যি। দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, ষোড়শী-দি কি অন্য কেউ হঠাৎ ঢুকে না পড়ে। চোখ বুঁজে বড় মধুর এক উপভোগ। শিশির সব পারে, ঘরকন্নার সর্ব ব্যবস্থায় নিপুণ তার হাত।

চোখ খুলে হঠাৎ পূরবী বলে, রোগা হয়ে আমায় খুব বিশ্রী দেখাচ্ছে—না?

কোন্ আয়নায় দেখলে শুনি?

তোমার চোখ যে-দুটো আয়না রয়েছে। ঘাড় নাড়লে শুনি নে, মন-রাখা কথা আমি ধরতে পারি।

পূরবী আবার কেঁদে পড়ে। ব্যাকুল হয়ে শিশিরকে জড়িয়ে ধরল। সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে—যেন ভেলার কাঠ আঁকড়ে ধরছে। বলে, যত ভরসাই দাও, আমি বাঁচব না। সে আমি জানি, জানি। মেয়ে নেড়েচেড়ে বড় করে তুলব—সে আমার হল না। বুলি ফুটবে ওর মুখে, 'মা' ফালুক ফালুক চাইবে—কোথায় আমি তখন জানি নে।

দৈববাণীর মতো ফলে গেল। দিন-দশেক কেটেছে তারপর, পূরবী ভালোর দিকে। ভালো দেখে শিশির আবার ইস্কুলে যাওয়া ধরেছে। খেয়েদেয়ে সাইকেল নিয়ে খানিক আগে সে রওনা হয়ে গেছে, ধর-গিন্নিও ঠাকুর ঘরে যথারীতি নিত্যপূজার নৈবেদ্য সাজাচ্ছেন, দরজার সামনে ষোড়শী হন্তদন্ত হয়ে এলো : গতিক ভালো নয় গিন্নিঠাকরুন। আমার ভ করছে।

অভিজ্ঞ ধাত্রী, দৃষ্টিতে ভুল হবার কথা নয়। মুখ পাংশু, কথা বেরুচ্চে না গলা দিয়ে। বলে, তাড়াতাড়ি আসুন। আর দাদাবাবুর কাছে কেউ ছুটে চলে যাক—এক্ষুনি।

বাইরের উঠানের একদিকে ঠাকুরঘর। ষোড়শী এসেছে এই তো কয়েক-পা পথ—খবর বাতাসে ছোটে বোধহয়, পাড়ার ভিতরেও চলে গেছে। নবীনা-প্রবীণা জনকয়েক এসে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছেন। ধর-গিন্নি ছুটে এসে পড়লেন : কি হয়েছে বউমা?

শ্বাস টানছে পূরবী, বড় বড় চোখ মেলে তাকিয়ে পড়ল। গলার ঘড়ঘড়ানির মধ্যে ভিন্ন ধরনের একটা আওয়াজ, 'মা' বলে ডাকতে চাইছে সে যেন। বাচ্চাটি পাশে—আহা, ফুটফুটে সোনার-পদ্ম মেয়ে। হাতের মুঠো সঞ্চালিত করে ওঁয়া-ওঁয়া করে মেয়ে কেঁদে উঠল। জ্ঞান আছে পূরবীর স্পষ্ট, চোখ-ভরা জল, আঁকুপাকু করছে বাচ্চার দিকে ফেরবার জন্য—সাধ্যে কুলায় না।

হঠাৎ কী হয়ে গেল। শুচিবেয়ে মানুষ ধর-গিন্নি স্নান করে লক্ষ্মীজনার্দনের কাছে ছিলেন, পরনে শুচি তসরের কাপড়। ফুল-অশৌচ চলছে, ছোঁয়াছুঁয়ি এমনিতেই মানা, সে-সব মানলেন না তিনি, বাচ্চা মেয়ে কোলে তুলে নিলেন। পূরবীর চোখের জল মুছে দিয়ে বললেন, কাঁদিস কেন মা, ভয় নেই সেরে যাবে।

॥ চৌদ্দ ॥

সস্ত্রীক অবিনাশ মজুমদার এবং আরো গুটি-কয়েক গৃহস্থ দেশ-ভুঁই ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন। এখন এঁরা যাচ্ছেন, ভাল খবর পাওয়ামাত্র আরও বিস্তর গিয়ে পড়বে।

বাংলার ঐ পশ্চিম ভাগে—নতুন যার নামকরণ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ, নতুন গ্রামের পত্তন হবে। সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে সকলে একসঙ্গে বরাবর যেমনটি থেকে এসেছেন, নতুন জায়গাতেও তেমনি হবে—এই অভিপ্রায়। অবিনাশ দলপতি—মুখে যা বলছেন, নির্ঘাৎ সেই জিনিষ গড়ে তুলবেন। হারেন না তিনি কোন কাজে—চিরকাল ধরে সকলে দেখছে। তাঁর উপরে আস্থা অগাধ।

বেহালায় শীতল ডাক্তার আছেন। আত্মীয় নন তিনি, রক্তের সম্বন্ধ কিছু নেই—তাতে লোকে এতদূর আপন হয় না। অবিনাশের যৌবনদিনের বন্ধু ও সাগরেদ। স্ত্রী কনকলতাকে শীতলের বাড়ি রেখে অবিনাশ জায়গা দেখে দেখে বেড়াচ্ছেন। সুবিধা হচ্ছে না—একটু পছন্দসই হলেই আকাশ-ছোঁয়া দাম। সে টাকা কোথায়? তাঁর একলার ব্যাপারও নয়—গোটা বীরপাড়ার ইতর-ভদ্র সব বাসিন্দাই উন্মুখ হয়ে আছে। অতএব কেউ যেদিকে ফিরেও তাকাবে না, তেমনি জায়গার খোঁজখবর নাও। দুর্গম পতিত জায়গা।

গড়িয়া ষ্টেশন ছাড়িয়ে পূর্ব-দক্ষিণে অনেকটা গিয়ে—মনে পড়ে সে আমলের কথা? —বিশাল জলাভূমি, মাঝে মাঝে কসাড় কেয়ার জঙ্গল। ট্রেনে যেতে যেতে বরাবর এই দৃশ্য দেখে এসেছেন। দেশ ভাগ হয়ে ঘর-বসত ছেড়ে মানুষ এসে পড়ল—এই অবিনাশ মজুমদারের মতো হাজারে হাজারে, লাখে লাখে—জমি তার পরে আর পড়তে পায় না। পা রেখে দাঁড়াবার মত একটু জায়গা-জমি, ছেলেপুলে ঘুম পাড়িয়ে শুইয়ে দেবার মত ভিটে একটুকু।

জমিওয়ালাদের মজা। কেউ কি স্বপ্নেও ভেবেছিল, এইসব জল-জঙ্গল একদা সোনার দরে বিকোবে? জমির কেনা-বেচায় লাখপতি কোটিপতি হল কত জনা! জয়-জয়কার হোক কর্তাদের—মগজ খাটিয়ে যাঁরা দেশ-ভাগের বুদ্ধি বের করেছিলেন। হয়েছেও তাই বটে—চুটিয়ে সেই থেকে রাজত্ব করে যাচ্ছেন। আরো হোক, আরো হোক। উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে আমরাও নিতান্ত মন্দ নেই। কোটি কোটি নমস্কার আমাদের প্রভুগণের উদ্দেশ্যে।

যাক গে, অবান্তরে এসে পড়েছি। ঐ গড়িয়া অঞ্চলে অবিনাশ জায়গা পছন্দ করলেন। স্টেশনের অনেকটা দূরে। রেল-লাইনের ধারে-কাছে তাবৎ লোকের নজর পড়ে, দর সেখানে হু-হু করে চড়ে যাচ্চে। অবিনাশের ঐ জায়গায় পৌঁছতে কখনো কাদায় পড়বেন, কখনো জলে সাঁতরাবেন। ভূতেও বোধকরি ভয় খেয়ে নিশিবাসে আপত্তি জানাবে।

জায়গা পছন্দ করে অবিনাশ মালিককে গিয়ে ধরলেন।

জমিদার বলতে হবে, নয়তো সম্মানে টান পড়বে। আসলে অনেকগুলো মেছোঘেরির মালিক তিনি। পিতামহ এক বয়সে নিজ-হাতে জাল টানতেন। ধন-সম্পত্তি হয়ে এখন ফিশারির কাজকর্ম লোকজনে চালায়, বাড়ির ছেলে-মেয়েরা ইংরেজি পড়ছে। এবং কর্তা-মশায় জমিদার হয়েছেন।

তাহলেও মানুষটি সদাশয়, সুবিবেচক। অবিনাশের প্রস্তাবে এককথায় রাজি, এবং তাঁকে 'ভাই' বলে সম্বোধন: কেয়াবনে সাপের বাতান কিন্তু ভাই! সাপ মেরে শিয়াল তাড়িয়ে খানাখন্দ বুজিয়ে জঙ্গল সাফসাফাই করে নিতে পারেন তো আমার আপত্তি হবে কেন? ভালই তো, জন্তু-জানোয়ারের বদলে ভদ্র গৃহস্থরা আস্তানা গড়বেন। হয়ে যাক, তারপর আমার সঙ্গে একটা বার্ষিক খাজনার বন্দোবস্ত করে নেবেন। ব্যস।

কৃতজ্ঞতায় গদ্‌গদ হয়ে অবিনাশ বললেন, নিশ্চয়, নিশ্চয়। মালিকের মাল-খাজনা

পেরে জমি ভোগ করলে ফল কখনো ভাল হয় না। কথা তবে পাকা, আমরা লেগে পড়ি গে। যাবেন এক-আধবার আমাদের কাজকর্ম দেখতে। উৎসাহ পাব।

চোখ কপালে তুলে জমিদার বলেন, যাব কি করে ভাই? এ দেহে কুলোবে না। আপনি গিয়েছেন সশরীরে, না দূরে থেকে চোখের দেখা দেখে বলছেন?

অবিনাশ হেসে বলেন, বিস্তর জলকাদা ভেঙে কাঁটার খোঁচা খেয়ে তারপরে আপনার দেউড়িতে এই ঢুকলাম। এখন কেন যেতে যাবেন? পথঘাট হয়ে যাক, যাবেন সেই সময়। আগাম নিমন্ত্রণ জানিয়ে যাচ্ছি।

চিরকেলে কর্মিষ্ঠ মানুষ—বয়স অগ্রাহ্য করে অবিনাশ নতুন উদ্যমে লেগে পড়লেন। *ভিটে মাটি জলের দামে বিক্রি করেও হাজার কয়েক টাকা পেয়েছেন—এই বাবদে সমস্ত খরচ হয়ে যাচ্ছে। স্বামীর সর্বকর্মে স্ত্রী কনকলতার উৎসাহ—এবারে এই প্রথম মৃদু* আপত্তি তুললেন তিনি: বিদেশ-বিভুঁইয়ে একেবারে নিঃসম্বল হওয়া কি ভাল?

উচ্চ হাস্যে অবিনাশ কনকলতার কথা উড়িয়ে দেন: বিভুঁই বলছ কেন তুমি—নিজেদের ভুঁই এখন। আপন দেশ। এক বীরপাড়া ফেলে এসেছি, এখানে নতুন করে বীরপাড়া গড়ব। হার মানব না, হার মানা আমার কুষ্টিতে নেই। দেখই না ক'টা দিন লাগে।

কলোনির নাম হল নব-বীরপাড়া। বীরপাড়া গাঁয়ে যেমন যেমন ছিল, এই নব-বীরপাড়ারও মোটামুটি সেই চেহারা দাঁড়াবে। বিশাল দীঘি ছিল বীরপাড়ার মাঝখানটায়, ততদূর না হোক—মাঝারি গোছের একটা পুকুর কাটালেন এখানে। পুকুরের মাটিতে খানাখন্দ ভরাট হয়ে জমি চৌরস হল। কেয়ার জঙ্গল নিশ্চিহ্ন। চার দিক থেকে চারটে রাস্তা পুকুরপাড়ে এসে পড়েছে, রাস্তার ধারে ধারে চালাঘর—

কাজকর্মের শেষে রাত্রিবেলা অবিনাশ নতুন মাটি-ফেলা রাস্তায় একাকী পায়চারি করেন। আজকের ফেলে-আসা বীরপাড়া নিয়ে একদিন যখন বড্ড মেতেছিলেন, তখনো ঠিক এই করতেন। তাঁর পুরানো অভ্যাস।

বীরপাড়ার বাসিন্দা আরও কিছু কিছু এসেছে। কাজ এগোক না আর খানিকটা—গ্রাম ঝেঁটিয়ে এসে পড়বে। এমনি অবস্থায় ভাগনে শিশিরকে ভুলে থাকতে পারেন না। তার একটু জায়গার জন্য ঘর-গিন্নি বিশেষ করে লিখেছিলেন। এবং একটা চাকরির জন্য।

বধূর অন্তিম সময়ে ঘর-গিন্নি সেই যে পঁচিশ দিনের বাচ্চা মেয়ে কোলে তুলে নিয়েছিলেন, সেই থেকে সর্বক্ষণ প্রায় সে কোলে কোলেই থাকে। ননীর পুতুলি, টুকটুকে পায়ের রঙ—ঠাকুরমা ডাকেন টুকটুকি বলে। অতিশয় সেকেলে নাম—মেয়ে নিয়ে পুরবীর কত শখ, সে থাকলে মুখ টিপে টিপে হাসত। তবু রক্ষে খেঁদি-ভুতি নাম দেন নি দয়া করে। আর দিলেই বা কি—রুচিরা কি মধুছন্দা হয়ে ক'টা মেয়ে পেট থেকে পড়ে, ঐ খেঁদি-বুঁচি নামেই গোটা শৈশব কাটিয়ে ইস্কুলে ভরতির দিন অথবা আরো বিলম্বে বিয়ের লগ্নপত্রের সময় নাম শুধরে নেয়। টুকটুকিও তাই হবে, তাড়াতাড়ি নেই।

ষোড়শীকে ছাড়ানো হয় নি—বাচ্চার কাজে বহাল আছে সেই থেকে। কিন্তু বাচ্চাকে কতটুকুই বা কাছে পায়! ঘর-গিন্নি ছাড়েন না। শিশিরের বাপ গত হবার পর থেকে গিন্নির সর্বপ্রধান কাজ লক্ষ্মী-জনার্দনের সেবা—তারও ইদানীং সময় করে উঠতে পারেন না। পুরুত চক্রবর্তীমশায়কে প্রায় সমস্ত একলা করে নিতে হয়। এমন কি দুপুরের আহ্নিকটাও এক-একদিন বাদ পড়ে যাচ্ছে—টুকটুকি খেদমতে সময় কাটে। সন্ধ্যার পর তাকে ঘুম পাড়িয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে দুবেলার আহ্নিক একসঙ্গে

সেরে নেন।

চক্রবর্তী অনুযোগ করেন : কী মায়ার ফেরে পড়লেন গিন্নিঠাকরুন। ইহকাল-পরকাল সবই যে তলিয়ে যাবার যোগাড়।

ধর-গিন্নী বুকের উপর মেয়েকে আরও নিবিড় করে জড়িয়ে বলেন, কিছুই যাবে না ঠাকুরমশায়। মহামায়া নিজে আমার ঘরে এসে উঠেছেন। ঠাকুরঘরে না-ই গেলাম, শোবার ঘরের মধ্যেই সর্বক্ষণ ঠাকরুণের সেবায় আছি। তাতেই আমার মুক্তি।

এরই মধ্যে কনকলতার চিঠি এসে পড়ল। চেষ্টা এতদিনে মোটামুটি সফল হল, সবিস্তারে সেই সব খবর দিয়েছেন। চিঠি ধর-গিন্নির নামে : পুণ্যশীলা আপনি ঠাকুরঝি। যাত্রামুখে আশীর্বাদ করেছিলেন, আপনার কামনা কখনো নিষ্ফল হবে না জানতাম। শিশিরের জন্যও একটা প্লট রেখেছি—আমাদের বাড়ির লাগোয়া। অবিলম্বে সে যেন চলে আসে। দেরি হলে প্লট থাকবে না। শিশিরের চাকরির বিষয়ে লিখেছিলেন—আপনার ভাইয়ের এতদিন নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ ছিল না, এইবারে চেষ্টা-চরিত্র হবে। যা-হোক কিছু হবেই—এত লোকের হচ্ছে, তার কেন হবে না? আসল দিয়ে চাকরি হয় না, লেগে পড়ে থাকতে হয়। শিশির এসে নিজেই প্লটে ঘরবাড়ি তুলুক, চাকরির চেষ্টা করুক। আমরা তো আছিই। আপনারা সবসুদ্ধ চলে আসুন। নিজের ঘরবাড়ি যদ্দিন না হচ্ছে, আমাদের বাড়ি স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবেন। আপনারা ছাড়া আপন আমাদের কে আছে? চিঠিতে আপনিই সেকথা লিখেছিলেন, এখানে এসে মর্মে মর্মে বুঝেছি। গোটা জেলাটা জুড়ে খাতির-সম্ভ্রম ছিল, এখানে কে চেনে আমাদের?···

এমনি বিস্তর কথা পুরো চার পৃষ্ঠা জুড়ে। খাম খুলে শিশির পড়ে নিয়ে মায়ের কাছে সে আস্তে আস্তে ভাঙছে : মামী চিঠি লিখেছেন—

ধর-গিন্নি টুকটুকিকে কোলের উপর শুইয়ে দুধ খাওয়াচ্ছেন। উঁহু, টুকটুকি নয়—ভারি হাসকুটে মেয়ে, নাম পাল্টে এবার দেখনহাসি হয়েছে। ঠোঁটের দুধ আঁচলে মুছে দিয়ে গিন্নি বললেন, আছে কেমন ওরা?

ভালো। উৎসাহভরে শিশির বলে, মামামশায় কর্মবীর বিরাট এক কলোনী গড়েছেন, এখানকার বীরপাড়ার নামে তারও নাম নব-বীরপাড়া কলোনি। কলকাতা থেকে দূরেও নয়, গড়িয়া এলাকায়—

মায়ের মুখের দিকে একবার চেয়ে ঢোক গিলে বলে, আমাদের জন্যে প্লট রেখেছেন, যাওয়ার জন্য লিখেছেন।

ধর-গিন্নি গর্জন করে উঠলেন : আবার লেগেছ? অত গালিগালাজ করে লিখে দিলাম—লজ্জাঘেন্না নেই?

থতমত খেয়ে শিশির চুপ করে যায়।

তোর যাবার ইচ্ছে, তা জানি। মাতুলের যোগ্য ভাগনে! বউটাকেও নাচিয়ে তুলেছিলি—গাঢ় বুদ্ধির মেয়ে সে, আখের বুঝে সামলে নিল। সে চলে গিয়ে এবারে উদোম হয়েছিস। যেতে হয় তুই গিয়ে মামার আশ্রয়ে ওঠ্। ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে দোরে দোরে ভিক্ষে মাগ গিয়ে। লক্ষ্মী-জনার্দন ছেড়ে এক-পা আমি নড়ব না। মরতে হলে এখানেই মরব। আমার দেখনহাসিও যাবে না, একলা তুই যাবি। কুলের মুশল ঐ ভবঘুরে হতচ্ছাড়া—আমার বাপের ভিটেয় আজ সন্ধ্যে জ্বলে না—আমার শ্বশুরের ভিটেরও তেমনি হাল করবে, সে জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে।

চিঠিটা ধর-গিন্নি নিয়ে নিলেন : যা লিখতে হয়, আমি লিখে জবাব পাঠাব। নিজের

কাজে যা তুই—

বউ পূরবীকে বিশ্বাস করে জবাব লিখতে দিয়েছিলেন, নিজের ছেলের উপর সন্দেহ। শিশিরের কথার মধ্যে বোধকরি ভিটা ছাড়বার ঝোঁকটা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। পূরবীর মত পোক্ত অভিনয় সে পারে না, যতই করুক খুঁত থেকে যায়। সেই অপরাধে শিশিরের দিকে মা আর তাকিয়েও দেখেন না। দুধ খাওয়ানো সারা করে বাচ্চাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে তারই সঙ্গে কথাবার্তা: শুনলে তো দেখনহাসি, আমাদের কোন্ মুলুকে নিয়ে ফেলতে চায়। দাদুকে এমন লেখা লিখব, জন্মের মধ্যে যাতে এমন চিঠি আর না আসে। তুমি কি বল দেখনহাসি, তোমার মতটা কি?

দেখনহাসি সায় দিল: উঁ—

বাচ্চার বুলি ফুটছে, আঁ-উঁ করে। কথাবার্তাও বোঝে বোধহয়—তাক বুকে ঝিকমিকে দাঁত চারটি মেলে হাসে কী রকম!

ঘর-গিন্নি লিখতে পারেন না, দেখনহাসিও শেখে নি এখনো। পাড়ার একজনকে দিয়ে লিখিয়ে জবাব চলে গেল। কি লেখা হল, শিশির জানে না, সে তখন ইস্কুলের কাজে বেরিয়ে গেছে—শক্ত শক্ত গালিগালাজ সন্দেহ নেই।

চিঠি লিখিয়ে ঘর গিন্নি সঙ্গে সঙ্গে ডাকবাক্সে ফেলেছেন, চিঠিন জবাব ডাকযোগে পৌঁছে গেছে অবিনাশের হাতে।

॥ পনের ॥

হার্মান কোম্পানিতে পূর্ণিমার চাকরি এখন। বিরাট কোম্পানি, বিস্তর সুনাম। এজেন্সি কাজকর্মই আগে বেশি ছিল—যত নাম-করা প্লাম্বিং মালপত্র বাইরে থেকে আমদানি করে ভারতের বাজারে ছাড়ত। বিলেত থেকে প্রতি মেলে ডিরেক্টরদের হুকুম-হাকাম আসত—হুকুম যারা তামিল করত, তারাও সব লালমুখো সাচ্চা সাহেব। ম্যানেজার, ডেপুটি-ম্যানেজার, সুপারিনটেণ্ডেণ্ট নেটিভ একটিও নয় তাদের মধ্যে। এমন কি ট্যাঁশ-ফিরিঙ্গিও নয়।

নটবরবাবু হাহাকার করেন: কী সব দিন গিয়েছে। তোমরা আর কতটুকু দেখছ! বড় নদী মজে গিয়ে খালের অবশেষ থাকে, সেই জিনিষ এখন।

স্বাধীনতা হয়ে দেশি লোকে এখন কোম্পানির মালিক। শেয়ার বেচে দিয়ে সাহেবরা পিঠটান দিয়েছে। নটবর হাহাকার করুন, কিন্তু ঠাট এখনো রীতিমত বিলাতি। অফিসও সেই সাবেক বাড়িতেই বর্তমান—রাস্তার নাম যদিচ ক্লাইভ স্ট্রীটের স্থলে নেতাজী সুভাষ রোড। সাহেব ম্যানেজার গিয়ে স্বদেশি কালো ম্যানেজার বটে, তবে চালচলন ও তর্জন-গর্জন অবিকল সাহেবদের মত। জাহাজ বোঝাই বিলাতি মাল এসে এদেশে বিকাত, ফরেন-এক্সচেঞ্জের কঞ্জুসপনায় মাল আমদানি এখন প্রায় বন্ধ। শহরতলিতে বিরাট ফ্যাক্টরি হয়েছে,—বিলাতি স্পেসিফিকেসনের মালপত্র সেখানেই তৈরি হচ্ছে। মোটা মাইনের সাহেব ইঞ্জিনিয়ার আছে গুটি-চারেক। যাই-যাই করছে তারা—আর কয়েকটা বছরের মধ্যে দেশি ইঞ্জিনিয়ারে ভাল করে রপ্ত করে নিলে তারাও সাগর পাড়ি দেবে—সাহেব লোকের টিকিটাও মিলবে না কোম্পানিতে।

এই তো গতিক, নটবরবাবু তবু দমেন না। দেশি কর্তা তো কী হয়েছে—সাহেবরা যেসব চেয়ারে বসে গেছে তার গরম কাটতে এখনো পঞ্চাশটি বছর। যে বসবে, সঙ্গে

সঙ্গে সে সাহেব হয়ে যাবে। বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনের মতন। হার্মান কোম্পানির চাকরির আলাদা ইজ্জত।

এক্সপোর্ট সেকসনের হেডক্লার্ক নটবর। সবাই দাদু বলে ডাকে—খোদ জেনারেল-ম্যানেজার থেকে বেয়ারা-দারোয়ান অবধি। বিলাতি সাহেবেরা যখন কর্তা ছিল—সেই স্বর্ণযুগে তারা অবধি খাতির করে ডাডুবাবু ডাকত। চাকরি পঁয়তাল্লিশ বছর হয়ে গেছে—ছেলেরা সব কাজকর্ম করছে, প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকা এবং ভাল রকম বোনাস নিয়ে যে কোন দিন রিটায়ার করতে পারেন। অফিসসুদ্ধ চাঁদা তুলে বিদায়-সম্বর্ধনা দেবে—গলায় মালা দেবে, তাঁর ভিতরে ভাল ভাল গুণের আবিষ্কার করে যথাবিধি বক্তৃতা দেবে, মিষ্টি খাওয়াবে, বিদায়-উপহার বলে যা দেবে তা-ও যে নিতান্ত হেলাফেলার জিনিষ হবে, মনে হয় না। এত সমস্ত হবে সুনিশ্চিত। কিন্তু নটবর যাবেন না, ওসব অলক্ষুণে কথা মনে ওঠে না তাঁর—

ভবতোষ বলে, পঁয়তাল্লিশ বছর কাটিয়েছেন, আর অন্তত পঁয়তাল্লিশটা বছর কাটুক—সকাল সকাল রিটায়ার কিসে?

নটবর সপ্রতিভভাবে ঘাড় নাড়লেন: ঠিক তাই। রাশিয়ায় কি বলছে, কাগজে পড় নি? বাঁচাটাই নিয়ম, মরা হল ব্যতিক্রম। মানুষ কতকাল বাঁচতে পারে তার কোন মুড়ো-দাঁড়া নেই—সোয়া'শ দেড়শ বছর বাঁচা তো সেখানে ডাল-ভাতের শামিল। অফিস আমার জীয়ন-কাঠি—অফিসের কাজে বহাল থাকতে মৃত্যু নেই, অফিস ছাড়লে তারপরে কিন্তু একটা দিনও বাঁচব না।

কৌটা থেকে একটা খিলি মুখে পুরে আঙুলের ডগার চুন একটু দাঁতে কেটে নিয়ে পান চিবাতে চিবাতে নটবর স্মৃতিমন্থন করেন: সতের বছর বয়স, সবে গোঁফের রেখা দিয়েছে—সেই সময় কেয়ারটেকার হয়ে ঢুকলাম। এখানে, এই অফিসে। বাড়ি পর্যন্ত বদল হয় নি। হুমদো হুমদো সাহেবরা মাথার উপর, দিশি-সাহেব কিংবা ট্যাঁশ সাহেব তার মধ্যে সিকিখানাও নেই। দশ হাত দূরে দাঁড়িয়েও বুক ঢিবঢিব করে। ফাইল, প্যাড, কাগজ, কালি-কলম, পেন্সিল, ব্লটিংপেপার যাবতীয় স্টেশনারি জোগান দিয়ে যাওয়া কাজ আমার। সবাই বলে, চাকরির নামটা যা-ই দিক কাজ আসলে পিওন-বেয়ারার। ভদ্রলোকের বেটা হয়ে এই কাজ কেন নিতে গেলেন? আমি হাসি মনে মনে: সবুর কর বাবুমশায়রা। সাহেব-লোকে যাই দিক হাত পেতে নিতে হয়। ও জাতের বিস্তর গুণ—কাজ দেখালে কদর হতে দেরি হয় না। হল তাই। বড়দিনে এক ঝাঁকা কমলালেবু, তিন বোতল হুইস্কি নিয়ে গুটি-গুটি সাহেবের বাড়ি হাজির হলাম। মেমসাহেবের পদতলে বোতল তিনটে নিবেদন করে জোড়হাতে দাঁড়িয়ে আছি। সাহেব চেয়ে দেখে কাছে ডাকল: সিট ডাউন বাবু। বাবু বলে ডাকা আর চেয়ার দেখিয়ে দেওয়া—দুটোই একসঙ্গে ফলে গেল। বলব কি ভায়ারা, একটা মাস যেতে না যেতে অফিসের ভিতরেও ঠিক সেই জিনিষ। লম্বা টেবিলের এদিকে-ওদিকে দশটা চেয়ার ছিল—সাহেবের হুকুমে দশের পাশে আর একটা বসিয়ে এগারো করল। কালি-কলম, খাতা-ফাইল এতাবৎ আমি সরবরাহ দিয়েছি—আমার জায়গায় নতুন এক ছোকরা বহাল হল। আমার খাতা-ফাইল সেই এখন দিয়ে যায়। ছিল ঘোরাঘুরির কাজ, এক লহমা বসার জো ছিল না—এবারে কাজ হল পাখার নিচে জাপটে বসে কলম চালানো। সেই কলমই চলছে একনাগাড়ে পঁয়তাল্লিশটা বছর। পাইকারি টেবিলে এগারো জনের একজন ছিলাম, এখন একলা আমার জন্যেই পুরোপুরি টেবিল। কলম জেট প্লেনের বেগে চালিয়েও কুল পেতাম না, এখন কাজে বসে একশ-আটবার দুর্গানাম লেখা আর

অন্য লোকের ফাইলের উপর পনের-বিশটা সই—এই হল সারা দিনে কলমের খাটনি। আছে বলেই তবু বেঁচে রয়েছি—কলম যেদিন বন্ধ হবে, বুকের তলের ধুকধুকানিটাও বন্ধ হবে সঙ্গে সঙ্গে।

সাহেবি আমলের কথায় নটবর শতমুখ। কাজকর্ম চলত একেবারে ঘড়ির কাঁটার মতো। কাজে ফাঁকি চলবে না, পাওনাগণ্ডার বেলাতেও ফাঁকি নেই। সেকসনের সাহেব দশটার সময় কাঁটায়-কাঁটায় ঘরে গিয়ে বসত। অ্যাটেনড্যান্স-বই ঠিক সোওয়া-দশটায় সেই ঘরে চলে যাবে। সোওয়া-দশটার পর যে আসবে, সাহেবের ঘরে ঢুকে সই করবে। একটি কথা বলবে না সাহেব, চোখ তুলে তাকাবেও না। কার ঘাড়ে তবু ক'টা মাথা, সই করতে বাঘের সামনে যাবে। অমুক বাবু, তমুক মশায় সই করতে গিয়ে খাতা খুঁজছেন: কী সর্বনাশ, গেছে ঢুকে এর মধ্যে? সঙ্গে সঙ্গে অ্যাবাউট টার্ন—পিছন ফিরেও আর তাকান না। এরকম হামেশাই ঘটত। সাহেবের মুখোমুখি পড়ার চেয়ে একটা দিন কামাই হওয়া ঢের ঢের ভাল।

তখনকার দিনে এই। আর এখন? যখন খুশি আসে, যখন খুশি চলে যায়। ঘড়িতে যতগুলোই বাজুক, সইয়ের বেলা দশটা। কারো কোনদিন সিকি-মিনিটও লেট হয় না। নিজেকে বাদ দিয়ে বলছি নে—আমিও। ভারত স্বাধীন তো আমাদেরই বা অধীনতা কিসের? অফিসের মাঝেও ফুরফুরে হাওয়া—কেউ কারো তোয়াক্কা রাখি নে।

হালফিল এই যে পূর্ণিমা নামে যুবতীটি বহাল হল, নটবর সেজন্য অতিশয় বিরূপ। এর আগে আরও গুটি-চারেক এমনি এসেছে। দেদার এই যে রমণী এনে এনে ঢোকাচ্ছে, কাজের আরো বারোটা বাজল এই থেকে। মেয়েলোকে অফিসের কাজের কি বোঝে? আর আসেও না ওরা কাজ করতে—

ভবতোষের দিকে নটবর আচমকা এক প্রশ্ন ছুঁড়লেন: ছিপ ফেলে মাছ ধরতে বসে যায়, দেখেছ?

ভবতোষ বলে, কেন দেখব না? ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করি—রেল লাইনের পাশে লম্বালম্বি বিল, দুবেলা সেখান দিয়ে যাতায়াত—

রেললাইন ঢুঁড়তে হবে কেন ভায়া, কাছে-পিঠেই তো সব লাইনবন্দি বসে।

হেসে গড়িয়ে পড়েন নটবর: এই অফিসের ভিতরেই। আগেকার এক গণ্ডা, তার সঙ্গে ইনি জুটে একুনে পাঁচ হলেন। কাজকর্ম করতে আসে না ওরা, পুরুষ গাঁথতে আসে। হাসাহাসি ফষ্টিনষ্টি চোখ-ঠারাঠারি—এই সমস্ত হল কাজ। আর হালফিল কর্তারাও দেখছি দিব্যি এলাকাড়ি দিচ্ছেন। দেশে বেটাছেলের যেন দুর্ভিক্ষ, ঘরের মেয়েলোক ধরে তাই টান পড়েছে।

ভবতোষ বলে, হালফিল কেন হবে দাদু? মেয়েলোক তো সাহেবি আমলেও ছিল।

মেয়েলোক নয় তারা, মেমসাহেব। ফিরিঙ্গি-পাড়ার মাল। রঙে চাপা বটে, তবু ভারতে যারা রাজত্ব করত তাদেরই রক্ত ধমনীর মাঝে। রতি-মাপার ওজনে হলেও রাজরক্ত—তার গুণ যাবে কোথা? হাসি বলে বস্তু ছিল না মুখে—একটা কাজের কথা বলতে গেলেও ফ্যাশ করে উঠত হুলো-বেড়ালের মতো। তারা করবে ফষ্টিনষ্টি রং-তামাসা হাসি-মস্করা! সে আমাদের এই দেশি দিদিঠাকরুনরা—লং-সাইটের চশমা দিয়ে পিটপিট করে দেখি, ছোঁড়াগুলোকে যেন বড়শি গেঁথে খেলাচ্ছে।

পাশ করল তাপস—ডক্টর তাপস সরকার, এম-বি-বি-এস। যা ভাবা গিয়েছিল, তেমন কিছু নয়—পাশ করল এই মাত্র। অপূর্ব রায়ের ধারণা একটুও চিড় খেলো না তবু। বলেন, পরীক্ষা ব্যাপারটা পাশার দানের মতো। ঐ দিয়ে মেধার বিচার হয়

না। ফ্যাসাদ হল, ফরেন স্কলারশিপ মিলবে না। আকাশ-ছোঁয়া নম্বর পেয়ে পেয়ে সব বসে আছে, তারা দাবি ছাড়বে কেন?

বলতে বলতে ঘাড় নেড়েই যেন দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দেন: কুছ পরোয়া নেই। জুনিয়ার হয়ে আমার সঙ্গে থাকো। চেম্বার-প্রাকটিশে সাহায্য করবে, পেসেন্টের বাড়িতেও নিয়ে যাব তোমায়। জানাশোনা হবে বহুজনের সঙ্গে, কৃতিত্ব দেখাতে পারলে নামযশ হবে। দুটো চারটে বছর চালিয়ে হাতে কিছু পয়সা করে নাও। বাদবাকি ধার নিয়ে বেরিয়ে পড়বে। কৃতী হয়ে ফিরে এসে শোধ কোরো।

হেসে পড়লেন: ধার আমিও দিতে পারি, সুদ লাগবে। বুঝলে হে, অতি-অবশ্য সুদ চাই, সুদের লোভেই টাকা লগ্নি করা।

মাসখানেক পরে, তাপস ক'খানা দশ টাকার নোট এনে পূর্ণিমার হাতে দিল। পূর্ণিমা অবাক হয়ে বলে, কিসের টাকা রে?

প্রথম রোজগার আমার। তোর কাঁধ তবু যেটুকু হালকা করা যায়। একা একা বিস্তর খেটেছিস, এবার থেকে আমি তোর পাশে।

আর কিছু না বলে পূর্ণিমা টাকা রেখে দিল।

আবার একদিন একশ টাকার একটা নোট। এক হপ্তা যেতে না যেতে আরও কিছু। রোজগার দিব্যি জমে আসছে।

টাকা দেয় আর গর্বভরে তাপস বলে, দেখিস কি ছোড়দি। সমস্ত দায়ভার আস্তে আস্তে নিজের কাঁধে নিয়ে নেবো। মেয়েমানুষ নাক উঁচিয়ে কর্তামি করবে—অসহ্য, অসহ্য! আমি হব সংসারের কর্তা—হুকুম-হাকাম চালাব তোর উপর।

হাসিমুখে পূর্ণিমা ছোট ভাইয়ের পাগলামি শুনে যাচ্ছে।

তাপস বলে, এইসা দিন নেহি রহেগা—পুজো নাগাত দেখতে পাবি। নোটিশ দিয়ে রাখছি, পুজোর সময় এবারে তোদের বাইরে বেড়ানো। রোজগেরে ভাই আমি—সকল খরচা আমার। মাকে নিয়ে যাবি, দিদি যাবে। বাবার নড়াচড়া চলে না—আমি আর বাবা দু'জনে বাড়ি থাকব।

পূর্ণিমা বলে, পুজোর আগে বিয়ে করে বউ নিয়ে আয় তবে। বাবাকে নাওয়ানো-খোয়ানো, রেঁধেবেড়ে হাতে তুলে খাইয়ে দেওয়া—ডাক্তারি ছেড়ে তুই তো এসব করতে যাবি নে। বউ এসে করবে।

বউ আনব, তোকে বিয়ে দিয়ে বিদায় করি আগে। মা সামনের উপর নেই, তাগিদ-পত্তর হচ্ছে না—ভাবছিস জোর বেঁচে গেছিস। মোটেই নয়, সর্বক্ষণ আমার মনে গাঁথা আছে—কড়া বর দেখছি, ধাতানি দিয়ে তোকে যে জব্দ রাখবে।

কিন্তু বলছে কাকে এতসব? পূর্ণিমা ওঘরে চলে গেছে, ওঘর থেকে সেভিংস-ব্যাংকের বই এনে ধরল: তোর রোজগার যেমন-কে তেমন জমা রয়েছে, এই দেখ।

জোর দিয়ে বলে, একটি পয়সা খরচ হয়নি—হবেও না। আমার মাইনে থেকেও অল্পসল্প রাখছি। নিজের টাকায় বিলেত যাবি। ডক্টর রায় লোক ভাল, ভালবাসেন তোকে—তাহলেও পরের সাহায্য যত কম নেওয়া যায়। না নিতে পারলেই ভাল।

বিলেত পাঠাবি তুই আমায়?

বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে তাপস বলে, বিলেত যাব, তিল তিল করে তার সঞ্চয় করছিস? বড়-ডাক্তার না বানিয়ে ছাড়বি নে আমায়?

ডাক্তার বড় হবি, মানুষ আরও বড় হবি! টাকা রোজগার করবি, কিন্তু তা-ই সব নয়। সে তো ব্ল্যাকমার্কেটিয়াররা সকলের চেয়ে বেশি করে। দেশ-জোড়া নাম হবে

তোর। কত রকম উপকার পাবে কত জনা—তারা ধন্য ধন্য করবে—

বলতে বলতে পূর্ণিমা চোখ বুজল। মধুর হাস্যে মুখ রাঙিয়ে গেছে, জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখছে সে যেন। বলে, সংসারের অভাব ঘুচবে, বাবার মনের অশান্তি যাবে। বড়-বাড়ি নেবো ভাল রাস্তার উপর। কাশীপুরের বাড়ি ভাড়া দিয়ে দিদি এসে থাকবে। মা রঞ্জু দিদি একসঙ্গে থাকব সকলে। খোঁজখবর করে জামাইবাবুকেও ধরে আনব। সুখ উছলে পড়বে।

তাপস অভিভূত হয়ে বলে, তোর যত সাধ আমাদের সকলকে নিয়ে নিজের জন্য কিছুই নয়?

বাঃ রে, আমারই তো সব। তুই মস্তবড় হবি, মজা তখন আমারই সকলের বেশি। লোকে আমায় আঙুল দিয়ে দেখাবে: কত বড়লোকের বোন যাচ্ছে দেখ ঐ। চাকরিতে সঙ্গে সঙ্গে ইস্তফা। চাকরি ছেড়ে ঘরে এসে গদিয়ান হয়েছি, সংসার অঙ্গুলি-হেলনে চলে আবার। ধমক-ধামক দিই ভাইবউকে, আবার বুকে জড়িয়ে ধরি—

হঠাৎ কণ্ঠস্বর কাতর হয়ে পূর্ণিমা সম্পূর্ণ নিজের কথায় এসে গেল: চাকরির এই উঞ্ছবৃত্তি আমার একটুও ভাল লাগে না। বড্ড সামাল হয়ে চলতে হয় রে ভাই, ডাইনে বাঁয়ে কড়া নজর—কোন্‌খানে পাঁক, কোন্‌দিকে কাঁটা। কোনপুরুষে অভ্যাস নেই তো—তালুকদার-বাড়ির মেয়ে চাকরিতে বসল আমা হতে এই প্রথম। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছুঁড়িগুলো কাজ করে—পুরুষানুক্রমে চাকরি করা জাত, ওরা বেশ পারে। চাকরিতে ঢোকার সময় মা-খুড়ি পিসি-মাসিরা তাদের তালিম দিয়ে দেয়—অপমান করবার সুযোগ পায় না কেউ।

তাপসের চোখ সজল হয়ে আসে। দিন কয়েক আগে সুজাতার বিয়ে হয়ে গেল। তিন মেয়ে পূর্ণ মুখুজ্জের—বড় দু'টির বিয়ে হয়ে গেছে অণিমার বিয়ের আগেই। ঘরসংসার করছে তারা। একটি গোরক্ষপুরে থাকে, জামাই রেলে কাজ করে। অন্যটি নদীয়া জেলার এক গ্রামে। তারপর গৃহিণী গত হলেন, পূর্ণ মুখুজ্জেও চাকরি থেকে রিটায়ার করেছেন। সমস্ত গিয়ে দুটি মাত্র বন্ধন - ছোট মেয়ে সুজাতা এবং দাবাখেলা। তার ভিতরে প্রধানটি মোচন হয়ে গেল এবার। ভাল সম্বন্ধ—জামাই ইঞ্জিনিয়ার, বিহার গভর্নমেণ্টে কাজ করে। বদলির চাকরি, রাজ্যের এ জায়গায় সে-জায়গায় ঢোল ফেলে বেড়ানো। জীবনের এই শেষ কাজ—দস্তরমতো ধুমধাম করলেন পূর্ণ মুখুজ্জে। এই গলির মধ্যে তেমন জাঁকজমক হবে না বলে বড় রাস্তার উপর ঘর ভাড়া হল। আলোয় বাজনাবাদ্যে নিমন্ত্রিত আত্মীয় বন্ধুর ভিড়ে সমারোহের অন্ত ছিল না।

তারণ চলাচল করতে পারেন না, আহত হাঁটু দুটোয় বাতে ধরেছে। বিয়েয় তিনি যান নি, পূর্ণিমা আর তাপস গিয়েছিল। কাশীপুর থেকে অণিমাও এসেছিল তরঙ্গিণী ও রঞ্জুকে নিয়ে। মেয়েজামাই আজ জোড়ে এসে তারণকে প্রণাম করে গেল। বাড়িতে আর একবার বেশ ভাল করে জামাই দেখা গেল। দৃঢ়দেহ সুদর্শন ছেলে, কথাবার্তাও চমৎকার। সুজাতাও এই ক'দিনে একেবারে যেন বদলে গেছে—ঢলঢল চেহারা, হাসি-ভরা মুখ! চলে গেল দু'জনে গুঞ্জন করতে করতে। আজ দেরি হয়ে গেল ছোড়দি'র—চাট্টি নাকে মুখে গুঁজে তাড়াতাড়ি সে অফিসে ছুটেছিল! আজকেই সকালবেলার ঘটনা।

ছোড়দি তাকে বিলেতে না পাঠিয়ে ছাড়বে না। পাখি বাসার জন্য দিনের পর দিন খড়কুটো সঞ্চয় করে, সকলের অজান্তে ছোড়দি তাই করে যাচ্ছে। মুখ ফিরিয়ে তাপস চোখের উদ্গত অশ্রু মুছে ঢিব করে পূর্ণিমার পায়ের গোড়ায় প্রণাম করে।

খিল খিল করে পূর্ণিমা হেসে উঠল : অ্যাঁ, করলি কি তুই তাপস?

অবাক কাণ্ড বটে! অন্য সময় না হোক, অন্তত বিজয়াদশমীর দিনে একটা প্রণামের [illegible]ন্য দু'জনে কী হুটোপাটি! জোর করে ঘাড় নুইয়ে ধরেও প্রণাম বাগানো যায় নি। তাপস বলত, একরত্তি একটুখানি ছোড়দি—সে আবার গুরুজন!

সেই ভাব আচমকা আজ পায়ে মাথা ঠেকায়।

পূর্ণিমা হেসে বলে, এত ভক্তি ছোড়দি'র উপর—হল কি হঠাৎ?

ছোড়দি বলে নয়, তুই দেবী—

বাবাও তাই বলতেন। এখন বোধহয় আর বলেন না।

সেকথা কানে না নিয়ে তাপস বলে, তবে দেবী হোস মা-ই হোস প্রণাম ঐ যা পেলি —শোধবোধ। ওর উপরে কানাকড়িও আর নয়। তুই পড়ে পড়ে কষ্ট করবি আর আমি বিলেত যাবো—একথা তোর কিছুতেই শুনব না।

শেষ পর্যন্ত কি হত বলা যায় না, কিন্তু সম্ভাবনাটুকু অকস্মাৎ ধুয়েমুছে গেল। ডক্টর অপূর্ব রায় মারা গেলেন। পার্টিতে যাবেন, দরজায় গাড়ি, তার আগে একটা টেলিফোন করে নিচ্ছেন কাকে যেন—হাতের রিসিভার ঠকাস করে মেজেয় পড়ল, আধখানা কথার মধ্যেই নিস্তব্ধ তিনি।

বা'পর সঙ্গে স্বাতীও যাবে। সাজগোজ করে করিডরে নেমে দাঁড়িয়েছে। আওয়াজ শুনে এসে দেখে এই কাণ্ড। গিন্নি বিজয়া দেবীও ছুটে এলেন, লোকজন সব এসে পড়ল। ধরাধরি করে বিছানায় এনে শুইয়ে দিল। তখন সন্ধ্যাবেলা, তাপস এলো, শহরের বড় বড় ডাক্তার এলেন। সারা রাত যমে-মানুষে টানাটানি। রক্ষে হল না। ভোর না হতেই সমস্ত শেষ।

শিশিরের মা ধর-গিন্নিরও অমনি আশ্চর্য মৃত্যু! শিবরাত্রির উপোস করে আছেন, বিষম শীত। দেখনহাসি দেড়-বছরেরটি হয়েছে—লেপের নিচে তাকে বুকের মধ্যে নিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছিলেন। ক্লান্তিতে উপোসের কষ্টে নিজেও কখন ঘুমিয়ে গেছেন।

॥ ষোল ॥

শেষরাতে পুজো দিতে যাবার জন্য পাড়ার এক গিন্নি ডাকতে এসে দেখেন, নেই তিনি—শিবলোকে প্রয়াণ করেছেন। সোরগোল পড়ে গেল। ঘুম ভেঙে দেখনহাসি হাত বাড়াচ্ছে মৃতার দিকে। হায় রে হায়, কচি কচি হাত দু'খানায় বুঝি কালকূট মাখানো। যেটা আঁকড়ে ধরে, তাই অমনি লয় পেয়ে যায়। ভূমিতল ছুঁতে না ছুঁতেই জলজ্যান্ত মা'টি গেল। ঠাকুরমা বুক পেতে নিয়ে নিলেন তো তিনিও।

এবারে বিচার-বিবেচনা, পছন্দ-অপছন্দের কিছু নেই—একটি নাম শুধু মনে আসে। দুনিয়ার উপর আপন বলতে একজন মাত্র—মাতুল অবিনাশ মজুমদার। নিজে জায়গা সংগ্রহ করেই ভাগনেকে সঙ্গে সঙ্গে ডেকেছিলেন। বোনের দাবড়ি খেয়ে তারপর সেই যে নিস্তব্ধ হলেন, এতদিন কেটে গেছে—তার মধ্যে 'আমরা ভাল আছি' 'তোমরা কেমন আছ' গোছের সাধারণ পোস্টকার্ডের চিঠিও নেই একটা। অবিনাশ লেখেন নি, এ তরফ থেকেও যায় নি। মায়ের সেই চিঠিতে পুত্রবধূর মৃত্যু-সংবাদ নিশ্চয় ছিল। কি-ভাবে লিখেছিলেন, জানা নেই। সেদিনের অপমানিত মামার নামে সোজাসুজি চিঠি লিখতে সাহস হয় না—মামী কনকলতাকেই লিখল :

তোমাদের বউমা দেড় বছর আগে চলে গেছে, এবারে মা-ও গেলেন তাঁর লক্ষ্মী-জনার্দন ও সাধের নাতনি ছেড়ে। বাচ্চাটা না থাকলে আমি একেবারে মুক্তপুরুষ। আত্মীয়বন্ধু পাড়া-প্রতিবেশী অনেকেই সরেছে, যে কয়েকটি আছে তারাও যাই-যাই করছে। বাচ্চা নিয়ে আমি অকূলপাথারে হাবুডুবু খাচ্ছি, কেমন করে বাঁচাব ভেবে দিশা পাই না। মামা নিশ্চয় রাগ করে আছেন, কিন্তু ওঁদের ভাই-বোনের ব্যাপারে আমার কি করণীয় ছিল? আমার জন্যে প্লট রেখেছিলেন, সেটা কি আছে এখনো?

ঝটিতি জবাব এসে গেল। প্রত্যাশার অনেক বেশি। সেই অত দূরে মামী যেন দু'হাত বাড়িয়ে আছেন দেখনহাসিকে কোলে তুলে নেবার জন্য। ছিঃ, দেখনহাসি নয়—শহর-বাজারে এ নাম যার কানে যাবে সে হাসবে। পূরবীর চুপি-চুপি দেওয়া হালফ্যাসানি নাম কুমকুম। আহা এই নাম ধরে ডেকে যেতে পারল না, মৃত্যুর মুখে শুধু একদিন সে শিশিরকে নামটা বলেছিল। কুমকুমকে নিয়ে এই মুহূর্তে যাবার জন্য লিখেছেন মামী। আর ধমকও দিয়েছেন খুব:

প্লট পড়ে নেই—কী দরকার প্লটের! কত জায়গা লাগবে তোমাদের শুনি? চার-খানা ঘর নিয়ে দুটি প্রাণী আমরা পড়ে থাকি, এর মধ্যে কুলোবে না? মেয়ে আমিই মানুষ করে দেবো। কোন চিন্তা নেই, দিনরাতের মধ্যে কাজটা কি আমার? চিঠিপত্তোর লিখে অনুমতি নিতে হচ্ছে, এখনকার ছেলেদের এই বুঝি দস্তুর—ভরসা করে চলে আসতে পারলে না? মায়ের দুধ পায় না বেচারি, ভাল দুধের দরকার, তাই এরই মধ্যে গাইগরু কিনে ফেলেছি। দু'সের-আড়াইসের দুধ দেয়—

ইত্যাদি বিস্তর কথা। ঐ খামের ভিতর অবিনাশেরও চিঠি। নব-বীরপাড়া কলোনীতে পৌঁছানোর পথ-ঘাট সবিস্তারে বুঝিয়েছেন—নক্সা এঁকে দিয়েছেন চিঠির উল্টোপিঠে। আর দুধাল গরু ছাড়া ভিন্ন রকম সুব্যবস্থাও ইঙ্গিত আছে—সুব্যবস্থারও ইঙ্গিত আছে চিঠিতে—নম্র সুশ্রী সদ্বংশীয় ডাগর-ডোগর একটি মেয়ে আছে কলোনিতে, তার মায়ের কাছে কনকলতা ইতিমধ্যে কথা পেড়ে রেখেছেন—বাচ্চা মেয়ের কোন দিক দিয়ে কষ্ট-অসুবিধা যাতে না হয়।

বিলাতি ডিগ্রি সম্মান-ইজ্জত দিত নিশ্চয়, কিন্তু নিতান্তই দেশি ডাক্তার এবং জুনিয়ার ডাক্তার হওয়া সত্ত্বেও রোজগারের দিক দিয়ে যা হচ্ছে সেটা খুব নিন্দের নয়। যে কোন ছোকরা-মানুষের মাথা ঘুরে যাবার কথা। হচ্ছে প্রবীণ বিচক্ষণ ডাক্তার অপূর্ব রায়ের বাঁধা পশারের খানিকটা পেয়ে গেছে বলে। এবং চিকিৎসার ধারা দেখে নির্ভয়ে বলা যায়, অভিজ্ঞতা বেড়ে কোন একদিন তাপস ডাক্তার রায়েরই কাছাকাছি পৌঁছুবে। বিজয়া দেবী তো এরই মধ্যে বলতে লেগেছেন, এম-আর-সি-পি হয়ে কি শিং গজাবে দুটো? এই পশার ফেলে চলে যাবে—কত ডাক্তার কত দিকে শেয়াল-শকুনের মতন মুকিয়ে আছে, রোগিপত্তর পলকে বাঁটোয়ারা করে নেবে। ডিগ্রি গলায় ঝুলিয়ে ফিরে এসে দেখবে ফাঁকা মাঠ। আমাদের ডিস্পেনসারিও উঠে যাবে তদ্দিনে—নিজের ডাক্তার না বসলে ডিস্পেনসারি থাকে কখনো! তোমাকে উনি হাতে ধরে বসিয়ে গেছেন—ছেড়ে-ছুড়ে সাগর পাড়ি দেওয়া ঠিক হবে কিনা বুঝে দেখ।

তাপস কী আর বুঝবে—বোঝবার মালিক আর একজন। তিন বছর, পুরো তিনও নয়—আড়াই বছরের বড় দোর্দণ্ডপ্রতাপ গুরুজনটি। হাঁ-না—কোন রকম জবাবই দিচ্ছে না ছোড়-দি।

মাস কয়েক পরে বিজয়া দেবী হঠাৎ একদিন তারণকৃষ্ণের বাড়ি এসে উপস্থিত: পূর্ণিমা এতক্ষণে অফিস থেকে ফেরে—জেনে-শুনে এসেছেন।

মোটরগাড়ি গলিতে ঢোকে না—বড়-রাস্তায় গাড়ি রেখে পায়ে হেঁটে আসতে হল। ড্রাইভার আগে আগে এসে কড়া নাড়ছে।

খিল খুলে পূর্ণিমা মুখোমুখি পড়ল। অবাক হয়ে গেছে। কিন্তু মুহূর্তকাল। পা ছুঁয়ে প্রণাম করে সপ্রতিভ কণ্ঠে বলে, আমাদের এঁদো-বাড়িতে পায়ে হেঁটে এলেন, এ তো ভাবতেই পারা যায় না।

বিজয়া দেবী বলেন, আমায় চেনো তুমি ?

চোখে দেখা নেই, কিন্তু তাপসের মুখে অনেক শুনে থাকি। ড্রাইভারকেও দু-একদিন তাপসের সঙ্গে দেখেছি। না হলেই বা কি—ড্রাইভার ছাড়া শুধু যদি একলাও আসতেন, চিনতে আমার মোটে একটি সেকেণ্ড লাগত।

বাইরের ঘরখানায় তারণ থাকেন। দেয়াল ঘেঁষে দুটো চেয়ার এবং অন্য প্রান্তে তক্তাপোষের উপর তাঁর শয্যা। অর্থাৎ ছেঁড়া তোষক, ময়লা চাদর-বিছানা। প্রায় সর্বক্ষণই তারণ শুয়ে-বসে থাকেন। এই পড়ন্ত বেলায়—পাড়ার মধ্যে ছোট্ট পার্ক মতো আছে, সেইখানে গিয়ে একটু বসেছেন। মোটা মানুষ বিজয়া দেবী। অধিকক্ষণ দাঁড়াতে পারে না। তার উপরে সারা গলিটা পায়ে হেঁটে এসে হাঁপাচ্ছেন দস্তুরমতো। চেয়ারের দিকে না গিয়ে সামনের মাথায় তারণের শয্যা পেয়ে তার উপর এলিয়ে পড়লেন।

পূর্ণিমা বলছে, অন্যায়—কী অন্যায়! দেখুন দিকি, ওর মধ্যে গিয়ে বসতে হল। আগে যদি ঘুণাক্ষরে একটু খবর পেতাম—

বিজয়া দেবী বলেন, খবর পেলে কি হত ?

আসতে দিতাম না। কী দরকার, আমিই আপনার কাছে গিয়ে শুনে আসতাম।

বিজয়া দেবী হেসে বলেন, তুমি গেলেও দরকার মিটত না মা। আসতেই হবে আমায় —এসে করজোড়ে তোমার বাবার কাছে দায় জানাতে হবে।

দরকার বুঝতে আর বাকি থাকে না। মহিলাকে তাই নিজে আসতে হল, এবং আলাপে-আচরণে এই চূড়ান্ত ভদ্রতা। এদিক-ওদিক চেয়ে বলেন, তিনি কোথায় ?

পার্কে যান এই সময়টা। দিন-রাত্রির মধ্যে এই যা একটু চলাচল। এক্ষুনি এসে যাবেন, সন্ধ্যে হবার আগেই।

বিজয়া বলেন, তোমাকেই বলি তবে মা। কর্তামশায় এলে আবার বলব। বড় ভাল মেয়ে তুমি—সমস্ত না হলেও কিছু কিছু আমি শুনতে পাই। এযুগে এমনটি দেখা যায় না। তাপসের যা-কিছু হয়েছে, তোমারই জন্যে।

পূর্ণিমা না-না করে ওঠে : ভাইয়ের হাতে সামান্য দু-দশ টাকার বেশি দিতে পারি নি কখনো। প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়। কত কষ্ট করে যে পড়াশুনো চালিয়েছে। যদি কিছু হয়ে থাকে, সম্পূর্ণ তার নিজের গুণে।

বিজয়া লুফে নেন কথাটা : গুণের ছেলে, সে কি আর বলে দিতে হবে ? ছেলের গুণ দেখেই তো বাড়ি বয়ে দরবার করতে এলাম।

পূর্ণিমা বলে, আপনি আসবেন টের পেলে অন্ততপক্ষে ছেঁড়া-বালিশটা সরিয়ে ফেলতাম, ছেঁড়া-তোষক চাদরে ঢেকে দিতাম। ঘরখানা ঝাঁটপাট দিয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে ভদ্রস্থ করে রাখতাম একটু।

বিজয়া হাসিমুখে ঘাড় নাড়েন : ছেঁড়া-তোষক দেখিয়ে আমায় ভয় দিতে পারবে না মা। বালিশ-তোষক দেখে তো মেয়ে দেবো না।

পূর্ণিমা তেমনি লঘুকণ্ঠে বলে যায়, সেটা ঠিক। মেয়েই যদি দেন তোষক-বালিশ

কি আর দেবেন না ? অথবা আরও বেশি—আস্ত একটা বাড়িই হয়তো দিয়ে দেবেন। এই বাড়িতে আপনাদের মেয়ে কী করে ঘরকন্না করবে !

ব্যস্ত হয়ে হঠাৎ বলে, আসছি—

ছিটকে পড়ল যেন গলিতে। মিনিট দুয়ের মধ্যে ফিরে এসে বলে, পান-জর্দা খান আপনি খুব। মোড়ের দোকানে বলে এলাম। ভাল করে পান সেজে এক্ষুনি নিয়ে আসবে।

বলে, একটা মেয়েছেলে কাজ করত, পুরানো ভাল লোক। অসুবিধায় পড়ে তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হল। ছোট্ট সংসার, চলে যাচ্ছে কোন রকমে। তেমনিধারা একটি ভাল লোক পেলে এখন আবার রাখা যায়।

প্রসঙ্গ এড়িয়ে বিজয়া দেবী বললেন, পান-জর্দার খবরও এসে গেছে ? আমাদের কোন কথা তাপস বুঝি বাদ দেয় না ?

আপনাদের স্নেহের কথা সব সময় তার মুখে। আপনার কথা বলে, ডাক্তার রায়ের কথা বলত। আপনার ছেলেমেয়েদের কথা বলে। শুনে শুনে সবাই আপনারা চেনা।

কৌতূহলী বিজয়া বলেন, স্বাতীর কথাও বলে নিশ্চয়। কি বলে তার সম্বন্ধে ?

পূর্ণিমা বলে, ভাল মেয়ে সে, বুদ্ধিমতী—

বিজয়া এবার খোলাখুলি বলেন, স্বাতীর জন্য এসেছি মা তোমাদের কাছে। এক মেয়ে ঐ আমার—তাপসের হাতেই দিতে চাই। ওঁর বড্ড ইচ্ছে ছিল, দুজনে আমাদের কথাবার্তা হত প্রায়ই।

নিরুৎসাহ শীতল কণ্ঠে পূর্ণিমা বলে, ওদের ইচ্ছেটাই তো সকলের আগে জানা দরকার।

মুচকি হেসে বিজয়া বলেন, ইচ্ছে না জেনে কি বলতে এসেছি ? আজকালকার ছেলেমেয়ের উপর জোর খাটানো যায় না—

দোকানের ছোকরাটা পান-জর্দা নিয়ে এলো। দুটো খিলি একসঙ্গে গালে ফেলে খানিকটা জর্দা ঠেসে দিয়ে বিজয়া বলতে লাগলেন, ওদের মতেই মত দিয়ে যাওয়া উচিত, বুদ্ধিমান অভিভাবকে তাই করে। জোর-জবরদস্তি করে তো ঠেকানো যাবে না—ছোট্টটি নেই আর, আইনও ষোলআনা ওদের পক্ষে। তা ছাড়া সবদিক দিয়ে যখন ভাল জুটি, ঠেকাতে যাবোই বা কি জন্যে ?

একটুখানি ইতস্তত করে বললেন, বালিশ সরাও আর তোষক ঢাকা দাও, বড়লোক তোমরা নও সেটা ভালভাবেই জানা আছে। জেনে-শুনেই মেয়ে দিচ্ছি। মেয়ে অভাব-অনটনে কষ্ট পাবে না, সে ব্যবস্থা আমি করব। সেকথা তুমি নিজেও তো বলে দিলে। কিন্তু তার বোধহয় দরকার হবে না—এখনই তাপস জমিয়ে এনেছে। যা গতিক বছর দুই-তিনের মধ্যে ওঁর পশারের অন্তত আধাআধি নিতে পারবে। সেই তো অঢেল।

তারণ এসে পড়লেন এমনি সময়। বিছানা ছেড়ে বিজয়া চেয়ারে গিয়ে বসলেন। তাঁর সঙ্গেও মোটামুটি ঐ কথা—তাঁর বেলা অনেক সংক্ষেপে। অর্থাৎ আসল মানুষ যেজন, তাকে সব ভালভাবে বলা হয়ে গেছে—এটা হল সামাজিক রীতি মেনে কিঞ্চিৎ সময়ক্ষেপ করা। বলেন, আমার মেয়ে কি বলে সেটাও শুনুন তবে। প্রেসিডেন্সিতে বি-এস-সি পড়ে। বলে, পাশ করে বসে থাকব না—কোন একটা কাজে ঢুকে পড়ব। একজনের উপর কেন সব দায় থাকবে—যার যেমন ক্ষমতা, ভাগাভাগি করে নিলে গায়ে লাগে না।

বলতে বলতে হেসে উঠলেন : পাকা পাকা কথা শুনুন। আজকালকার ছেলেমেয়েরা

এই রকম। নিজের পায়ে দাঁড়াবে—অন্যের দেওয়া জিনিষ হাতে নিতে যেন ছাঁকা লাগে—বাপ-মা, শ্বশুর-শাশুড়ি যে-ই হোক না কেন। বলে ওর কলেজের মেয়েবন্ধু যারা আসে তাদের সঙ্গে, আমার কানে পেঁাছে যায়। ভাবলাম, এতদূর যখন, চুপচাপ থাকা কাজের কথা নয়—কথাবার্তা পেড়ে ফেলা ভাল। তা আপনার মতটা শুনি এইবারে —শোনবার জন্য বসে আছি।

তারণ ইদানীং সর্বব্যাপারে যেমন জবাব দিয়ে থাকেন ঃ আমি কি জানি। বলুন পুনিকে—পুনি আমার মা, পুনি জগজ্জননী। সংসার বলতে যা-কিছু, সমস্ত ঐ একটা মেয়ে। ও যা করবে তাই হবে, ও বললেই সকলের বলা হয়ে গেল। আমায় আলাদা করে কিছু আর বলতে হবে না।

কিন্তু মেয়ের সম্বন্ধ করতে এসে এ সমস্ত কানে নেওয়া চলে না। অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথাবার্তা চলল। বললেন, নিজের মান নিজের কাছে—সেটাও বুঝতে হবে বইকি! আমাদের না জানিয়ে ধরুন ওরা রেজিস্ট্রি-বিয়ে করে বসল, লোকের কাছে তখন আমরাই তো লজ্জায় পড়ব।

বাপের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে, এরই মধ্যে পূর্ণিমা কখন সরে পড়েছিল। ফিরে এসেছে এক রেকাবি মিষ্টি নিয়ে। বিজয়া দেবী আঁতকে ওঠেন, অনেক না-না করে একটা অবশেষে তুলে নিলেন। হেসে বলেন, কন্যাদায় নিয়ে এসেছি, হুকুম অমান্য করি কোন সাহসে?

আলাপে, ব্যবহারে বিজয়া দেবী ভারি চৌকস। এমন কি তারণের পায়ে হাত দিয়ে প্রণামও করলেন। বলেন, পা সরিয়ে নেন কেন? বয়সে বড়, প্রণম্য আপনি। যে দরবার নিয়ে এসেছি—মঞ্জুর হবে বৈবাহিক সম্পর্ক সত্যি সত্যি যদি ঘটে, তখনও প্রণাম করব। আগে থেকে দাবি জানিয়ে যাচ্ছি।

কথাবার্তা সেরে বিজয়া উঠলেন। পূর্ণিমা সঙ্গে গিয়ে গাড়িতে তুলে দিয়ে এলো।

তারণকৃষ্ণ বলে, মানুষটি বড় ভাল রে। মেয়েও ভাল হবে। এর চেয়ে ভাল সম্বন্ধ কোথায় জুটবে; তোর ভাইয়ের বিয়ে এইখানেই দিয়ে দে পুনি।

দিতেই হবে বাবা, না দিয়ে রক্ষে নেই। শাসানো কথা কত কি বলে গেলেন।

মেয়ের দিকে তারণ অবাক হয়ে তাকিয়ে পড়লেন।

পূর্ণিমা বলে, শুনলে কি তবে এতক্ষণ? আমরা দিই আর না দিই, এ বিয়ে হবেই —প্রস্তাবটা পাত্র-পাত্রীর কাছ থেকে আসার আগে আমাদের দিক দিয়ে গেলে তবু মান রক্ষে হবে। আরও আছে। ফি বছর গাদাগাদা ডাক্তারি পাশ করে ফ্যা-ফ্যা করে বেড়ায়—ডাক্তার রায়ের বাঁধা রোগিগুলো পেয়েই তাপস দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। ও-বাড়ির জামাই হতে দাও তো ভালই—নয় তো যে লোক জামাই হবে, ওঁদের ডাক্তারখানায় বসা তারই একচ্ছত্র অধিকার, ডাক্তার রায়ের পশারও তার উপরে বর্তাবে। কথা অসঙ্গত নয়, তবে বড় বেশি স্পষ্ট। রিভলভার উঁচিয়ে ডাকাতি করার মতো ঃ টাকা দাও, নয়তো প্রাণ দাও। এর পরে ভেবেচিন্তে মতামত দেবার কি আর রইল বলো।

তাপস এলে পূর্ণিমা খবরটা দিল ঃ ডাক্তার রায়ের স্ত্রী এসেছিলেন আমাদের এখানে। কেন বল্ দিকি?

আমি তার কি জানি?

ঠিক আছে। না জানিস তো জেনে কাজ নেই।

প্রসঙ্গের ইতি করে পূর্ণিমা রান্নাঘরে চলল। তাপসও যাচ্ছে।

পিছন ধরলি কেন? আমি বলব না।

তাপস বলে, সেই জন্যে বুঝি ? খিদে পেয়ে গেছে, খেতে দিবি নে ?

তার জন্যে রান্নাঘর অবধি যেতে হবে না। কোন্ দিন গিয়ে থাকিস ? খাবার এইখানে আসবে।

খাবার দিয়ে পূর্ণিমা ফিকফিক করে হাসে : তুই পাঠিয়েছিলি তাপস। আগে বলিস নি কেন ? ছেঁড়া-বিছানা, নোংরা ঘরবাড়ি দেখে গেল।

তাপস বলে, আমি পাঠাই নি কাউকে। আমি কিছু জানি নে, বিশ্বাস কর্ ছোড়দি। সাজিয়ে-গুছিয়ে দেখানো হয় নি, সে তো ভালোই। যা আমাদের অবস্থা, ঠিক ঠিক সেই জিনিষ চোখে দেখে গেল।

হঠাৎ পূর্ণিমা গম্ভীর হয়ে গেল : তোদের বিয়ে তোরাই পাকাপাকি করে ফেলেছিস, মিসেস রায় বলে গেলেন। ভালোয়-ভালোয় 'হাঁ' বলে যেতে হবে আমাদের, নইলে তো ইজ্জত বাঁচে না।

আর আমি যেটা বলছি শোন্। লক্ষ বার 'হাঁ' দিলেও বিয়ে করব না, যদ্দিন না তোর নিজের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে।

পূর্ণিমা আগের কথার জের হিসেবে বলে যায় : বিয়ে না করলে ওঁদের ডাক্তারখানায় বসা বন্ধ। নতুন ডাক্তার হয়ে যেমন সব হাত-পা কোলে করে বসে থাকে, তোরও সেই গতি হবে তখন।

সকলের আগে তবে সেই পরীক্ষাই হোক ছোড়দি—

ভবিষ্যতের শঙ্কা তাপস যেন তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়। বলে, হতেই হবে। বাইরে ঘরটা চাই আমার—আলমারি আর টেবিল-চেয়ার ঢুকিয়ে চেম্বার করব। ডাক্তারখানায় বসা আমিই বন্ধ করে দিচ্ছি।

সঙ্গে সঙ্গে বলে, কয়েকটা দিন আরও অবশ্য বসতে হবে। জরুরি কেস নিয়ে লোকে এসে বাসা খুঁজে খুঁজে বেড়াবে, সেটা ঠিক হয় না। এ বাড়ির ঠিকানাটা রোগিদের জানিয়ে বুঝিয়ে আসব। খুব বেশি তো এক মাস, তার মধ্যেই হয়ে যাবে সমস্ত।

কথার কথা নয়, পরের দিন থেকেই তাপস নতুন ব্যবস্থায় লাগল। ঘর নিয়ে একটু ভাবতে হচ্ছে। বাড়িতে ঘর বলতে দুখানা। নিচের তলায় একখানা, আর ছাতের উপর সিঁড়ির ঘরের সঙ্গে মিলিয়ে অ্যাসবেসটোসের ছাউনি দিয়ে একখানা। এ ছাড়া ভিতরের বারান্দার খানিকটা ঘিরে নিয়ে অতিরিক্ত এক ঘর বানানো হয়েছে—দুখানা সরু সরু খাট সেখানে। পূর্ণিমা মায়ের সঙ্গে এখানে থাকত—তরঙ্গিণী কাশীপুর চলে যাওয়ার পর একাই থাকে সে এখন। নিরিবিলি পড়াশোনার জন্য তাপস উপরের ঘরে থাকত, ডাক্তারি পাশের পরেও সেইখানে আবার আস্তানা নিয়েছে। আর বাইরের বড় ঘরে তারণ। সে ঘর ডাক্তারের চেম্বার হয়ে যাচ্ছে। আর তারণের পক্ষে উপর-নিচে করা অসম্ভব। বাপে-ছেলেয় অতএব বারান্দার ঘরে না এসে উপায় নেই। এবং পূর্ণিমাকে অগত্যা উপরের ঘরে গিয়ে উঠতে হচ্ছে। গলির মধ্যে বাড়ি—কিন্তু উপকার পেলে রোগিরা সেখানেই খুঁজে খুঁজে চলে আসবে। গলিই বা কোন্ ছার—ডাক্তার যদি হাওড়ার পুলের চূড়োয় বসে থাকে, সেইখানে রোগি পিলপিল করে উঠে পড়বে।

একটুকু মেঘ উঠেছিল পূর্ণিমার মনে, মেঘ ছিন্নভিন্ন হয়ে আলো ফুটল। বড় শান্তি। তাপস সেই যেমন-কে-তেমন। পড়াশুনো বড় কষ্ট করে চালিয়েছে, ডাক্তারির নামযশও কষ্ট করে খেটে-খুটে নিজে জমিয়ে তুলবে। ডাক্তার রায়ের বাঁধা পশার নিয়ে বড় হতে চায় না।

ডক্টর তাপস সরকার এম-বি-বি-এস—বাইরের ঘরের দরজার পাশে নেমপ্লেট পড়েছে।

সকাল ন'টা অবধি বসছে আপাতত। তারপর হাসপাতালের ডিউটি, ফিরতে প্রায় দুটো। বিকালবেলা অপূর্ব রায়ের পুরানো ডাক্তারখানায়—ডাকলে রোগির বাড়ি। সন্ধ্যার পর ঘরে এসে ডাক্তারি বই নিয়ে বসে, অথবা গল্পগুজবে মেতে যায় বাবার সঙ্গে, ছোড়দির সঙ্গে। তখন আর অন্য কিছু নয়—বাবার ছেলে, ছোড়দির ছোটভাইটি। সব দিন অবশ্য ঘটে ওঠে না—রোগির বাড়ির লোক এসে রসভঙ্গ করে। রোগের লক্ষণ বলে পরামর্শ নিয়ে চলে যায়, যেমন-তেমন ক্ষেত্রে নাছোড়বান্দা হয়ে বাড়ি নিয়ে তোলে।

আপাতত এই চলছে। মাসখানেক যেতে দাও—বিকালটাও তখন নিজের বাড়ির বাইরের ঘরে। ও'দের ডাক্তারখানার সঙ্গে কোনরকম সম্পর্ক থাকবে না।

ইতিমধ্যে স্বাতীকে উস্কে দিয়েছে তাপস: ঘটকালিতে মা বড় কাঁচা। ছোটদি বিগড়ে বসে আছে।

স্বাতী বলে, তুমিই বলো তাহলে ছোড়দিকে।

নিজের বিয়ের নিজে ঘটক—সে বিয়ের কন্যা হলে তুমি, বড়লোকের মেয়ে। বলতে হবে আবার ছোড়দির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ওরে বাবা!

ভঙ্গি দেখে স্বাতী হেসে পড়ল। বলে, মেয়েলোককে এত ভয়? তার উপরে বোন হলেন তোমার—প্রায় সমবয়সী বোন—

মেয়েলোক কে বলে? তাপসের স্বর গম্ভীর হয়ে উঠল: মেয়ে নয় ছোড়দি, দেবী। বড় আমার চেয়ে পুরো তিন বছরেরও নয়—তা মনে হয়, তিন হাজার বছর আগে জন্মে বসে আছে।

॥ সতের ॥

বিকালবেলা বাড়িতে একা তারণ। ঘুম ভেঙে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে কলকের তামাক দিয়ে টিকে ধরাবার তালে আছেন, দরজায় কড়া নড়ে উঠল। ঠিকে-ঝি বাসন মাজতে এসেছে ঠিক—কিন্তু এত সকাল সকাল? না জানি কোন্ দরবার আজ আবার মহারাণীর মুখে! সকাল সকাল কাজ সেরে গাঁয়ের বাড়ি মায়ের কাছে চলল হয়তো, তার মানে কাল দু-বেলা কামাই। ও-মাসে যেমনটা হয়েছিল।

দোর খুলে দেখেন, ঝি নয়—ফুটফুটে মেয়ে একটি। অচেনা। মেয়েটা নিঃসংকোচে ঢুকে পড়ে ঢপ করে প্রণাম করল। একালের মেয়েরা এমনভাবে প্রণাম করে না—তারণ হতভম্ব হয়ে গেছেন।

মেয়ের দৃক্‌পাত নেই। সপ্রতিভভাবে সদর-দরজায় খিল দিয়ে দিল আবার। তারই যেন বাড়ি—আজে-বাজে লোক ঢুকে পড়তে না পারে সে জন্য সতর্কতা।

খিল দিয়ে তারণের আগে আগে বারান্ডার ঘরের দিকে চলল। এ বাড়িতে যেন সর্বসময়ের চলাফেরা—তারণকে তেমনিভাবে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ছাদের পাইপের জল পড়ে রোয়াকের এই দিকটা পিছল,—এ মেয়ে তা-ও ভাল মতো জানে। তারণকে সতর্ক করে দেয়: সামাল হয়ে আসুন বাবা—

বাবা ডাক শুনে তারণ চকিতে মুখ তুললেন। মেয়েটা বলে ওঠে: উঁহু, দেখেশুনে, পা টিপে টিপে। হাত ধরব নাকি আমি?

জুতো খুলে ঘরে ঢুকে তারণকে তাঁর খাট দেখিয়ে দিল। দুই খাটের মধ্যে কোন্‌টা তাঁর কোন্‌টা তাপসের, তা-ও সে জানে। তারণ বসলেন তো পায়ের কাছে মেঝের

ফালিটুকুতে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে পড়ল। তারণ এবারে 'উঁহু' 'উঁহু' করছেন—কেবা শোনে কার কথা, কানেই যেন শুনতে পাচ্ছে না মেয়েটা। টেমি জ্বালা রয়েছে, টিকের মালশা পাশে, সেদিকে তার নজর। বলে, ধরিয়ে দিই—কেমন?

তারণ বলেন, কিন্তু মা, তুমি কে তার এখনো পরিচয় পেলাম না।

আমি স্বাতী—

তারণের তো খাট থেকে ছিটকে পড়ার অবস্থা। বলেন, ডাক্তার রায়ের মেয়ের নামও স্বাতী। তুমি মা তবে কি—

স্বাতী মুখটি মলিন করে বলে, বাবা তো চলে গেছেন, 'বাবা' ডাক বন্ধ হয়ে গেছে। কষ্ট হয় বড্ড আমার। কদ্দিন থেকেই তাই ভাবছি—এই পথে কলেজ যেতে হয়, আসতে-যেতে ভাবি, আপনার কাছে বসি এসে খানিক—

একটু থেমে আমতা-আমতা করে বলে, তা লজ্জা করে তো, নিন্দের ভয়ও আছে খুব। ভাবলাম, এই সময়টা কেউ বাড়ি নেই। আর আমার যাতে নিন্দে হয়, আপনি কখনো সে কাজ করবেন না। তামাক দেখি সাজাই আছে, টিকে ধরিয়ে দিই বাবা?

না—

তারণ কড়া হয়ে বলেন, পয়লা দিন এসেই তুমি হাত কালি করে দাসীবৃত্তি করবে সে হবে না। ভাল হয়ে উঠে বসো ঐ খাটের উপর।

একটু আগে মেজেয় বসবার মুখে যেমনটা হয়েছিল, এবারেও ঠিক তাই। তারণের কথা কানেই নেয় না স্বাতী—কে যেন কাকে বলছে। টিকে ধরে গেছে ইতিমধ্যে, কলকেটা হুঁকোর মাথায় বসিয়ে তারণের হাতে দিয়ে এতক্ষণে জবাব দিল: রাগ করছেন কেন, বাবাকে সেজে দিতাম তো।

অতএব বিশ্বাস করতে হবে, ডাক্তার অপূর্ব রায় হুঁকোয় তামাক খেতেন, আদুরে মেয়ে টিকে ধরিয়ে তামাক সেজে দিত। এবং বই-খাতা-কলম কিছুই নেই—তা সত্ত্বেও বিশ্বাস করতে হবে, শূন্য হাতে মেয়েটা কলেজ করে ফিরছে।

হুঁকো টানতে টানতে এতক্ষণে তারণ নজর মেলে ভাল করে দেখেন। এক দোষ মিথ্যে কথা বলে—তবু মেয়েটা সত্যি ভাল। বড়লোকের বেটি, কিন্তু বেশভূষা-চালচলতির মধ্যে তার চিহ্নমাত্র নেই। বিধবা হয়েও এর মায়ের যা ঠাটঠমক, কুমারী মেয়ের তা নেই। ভাল লাগছে মেয়েটাকে। কিন্তু তিনি হলে তো হবে না—পুনির কি উপায়ে ভাল লাগানো যায়?

খানিকক্ষণ বকর বকর করে এবং কথার অন্ধি-সন্ধিতে বার বার 'বাবা' ডাক ডেকে স্বাতী হঠাৎ উঠে পড়ল। বলে, আবার আসব, রাগ করেন নি তো?

শুধু-মুখে চলে যাবে কি রকম? সে হবে না। বাড়িতে অন্য দিন কিছু না কিছু থাকে, আজ নেই। বসো তুমি—ঠিকে-ঝি এক্ষুনি এসে যাবে।

কিন্তু উঠে দাঁড়িয়েছে তো স্বাতী। পায়ে পায়ে চলল। তারণ ভয় দেখান: দেখ, রাগ এতক্ষণ করি নি—এইবারে করব। সব্বাইকে বলে দেব যাতে তোমার নিন্দে রটে যায়।

হুঁ, তাই কিনা পাবেন! ভ্রূভঙ্গিতে স্বাতী তারণের কথা উড়িয়ে দেয়: কখনো পারবেন না, আমি জানি। বাবাকেও কত জ্বালাতন করেছি। ভয় দেখাতেন তিনি—কিন্তু মা শুনলে বকুনি দেবে তাই মাকে অবধি বলতেন না। কোন বাবা মেয়েকে কিছু বলেন না, সে আমি জানি।

কি ভেবে হঠাৎ ঘুরে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। কৌটা হাতে বেরিয়ে আসে: বললেন

যে নেই কিছু ঘরে ?

মুড়ি তো—

মুড়ি আমি সবচেয়ে ভাল খাই। বাড়িতে দিতে চায় না। বেশ হল, মজা করে আজ মুড়ি খেয়ে যাব।

খবরের কাগজের উপর ঢেলে নিয়ে ছোট্ট মেয়েটির মতো স্বাতী নিঃসঙ্কোচে মুড়ি খেতে লাগল।

বিজয়-গর্বে স্বাতী চলল তাপসের কাছে। সবুর সইছে না মেয়েটে। ডিস্পেনসারিতে তাপস এখন—সুবিধা হল, একাই রয়েছে, বড় ঘাঁটি পয়লা দিনেই দখল হয়ে গেল। আর কি! চেপে বসে ওখান থেকেই পরের আক্রমণ।

বৃত্তান্ত শুনে তাপস অবাক: কী বেহায়া তুমি গো! সোজা গিয়ে উঠলে বাড়িতে? বাবার সঙ্গে যেচে আলাপ-পরিচয় ?

তাই বোঝ। একে মেয়েছেলে, তার উপরে যার বিয়ে সেই মেয়ে হলাম আমিই—

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে কৃত্রিম বিষাদের সুরে বলে, অদৃষ্ট যে আমার তাই, কী করব! মা গিয়ে তো গোলমাল ঘটিয়ে এলো। তুমি সামলে দিতে পারতে—তোমার বাবা, তোমার বোন, তোমারই ঘরবাড়ি। তা আমি আবার একটা মানুষ—মুখের উপর তুমি স্পষ্ট 'না' বলে দিলে। বেহায়াপনা ছাড়া উপায় কি তখন বলো।

কয়েকটা দিন পরে স্বাতী আবার গিয়েছে। তারণ তেমনি একা আছেন। রান্নাঘরে চায়ের সরঞ্জাম সেদিন লক্ষ্য করে গিয়েছিল—তাই একেবারে মুখে নিয়ে এসেছে। বলে, চা খাবেন তো বাবা ?

চা এ-সময় খাই নে মা। অফিস থেকে ফিরে পুনি চা বানাবে, সকলে একসঙ্গে খাবো।

স্বাতী আবদার ধরে: এখন খান, তখন আবার খাবেন। ওতে কি হয়, আমার বাবা তো যখন-তখন খেতেন।

তারণ বলেন, তা বুঝেছি। তোমার নিজেরই ইচ্ছে হয়েছে খেতে—

প্রতিবাদ না করে স্বাতী মৃদু হাসে। ভাবখানা হল, মনের কথাটা তারণ বড্ড ধরে ফেলেছেন।

তারণ উঠে রান্নাঘরের দিকে চললেন। স্বাতী হাত ধরে ফেলল: বাস রে, চা আপনি বুঝি করবেন? আমি আছি কি করতে? মেয়ে থাকতে পুরুষমানুষে করে বুঝি! বসে থাকুন।

ধমকে বসিয়ে দিয়ে স্বাতী নিজে চলল। তাচ্ছিল্যের সুরে বলে, আমিই তো চা করে বাবাকে খাওয়াতাম। খুব পারি, দেখুন না।

আসল তো এই-ই। চা করাটা ক'দিন ধরে খানসামার কাছে শিখে নিয়েছে। হাতে-কলমে তৈরি করে নিজে খেয়েছে, খানসামাকে খাইয়ে তার মতামত নিয়ে নিঃসংশয় হয়ে তবে এসেছে। এবং সেই সঙ্গে দারোয়ানের বউয়ের কাছ থেকে উনুন ধরানোর প্রণালী। তোলা-উনুনটা অতএব উঠান থেকে রোয়াকে তারণের প্রায় চোখের সামনে এনে কয়লা সাজাচ্ছে। প্রত্যেকটি পর্ব স্বচক্ষে দেখে তারণের তাক লেগে যাবে, তবে তো!

তারণ হাঁ-হাঁ করে উঠলেন: উনুন কেন, ইলেকট্রিক হীটার রয়েছে, হীটারে জল চাপাও।

তাই হতে দিল আর কি স্বাতী! জবাব মেয়েটার মুখ যেন জোগানো থাকে। বলে, হীটারের গরম-করা জলে চা ভাল হয় না। দেখেছি করে করে। কয়লার জ্বালের

আলাদা স্বাদ। স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভাল। চা করছি তো আজ থেকে নয়।

নাছোড়বান্দা। কাঁহাতক তারণ জোয়ান মেয়ের সঙ্গে উন্নে কাড়াকাড়ি করবেন। শক্তি নেই—কন্টেস্‌ন্টে দু-চার পা চলাফেরা করেন, এসেই গড়িয়ে পড়েন শয্যায়। নিরুপায় হয়ে চা প্রস্তুতপ্রণালী আদ্যোপান্ত চোখের উপর দেখে যেতে হচ্ছে।

চায়ের কাপ হাতে দিয়েই স্বাতীর প্রশ্ন : কেমন হয়েছে বলুন বাবা ?

যে জবাব দিতে হবে, সে তো মজুতই আছে, চা খাওয়া অবধি সবুর করার প্রয়োজন নেই।

খসা হয়েছে মা, চমৎকার ! পাকা হাত তোমার।

প্রশংসা স্বাতী তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে। উচিত প্রাপ্য যেন তার। বলে, 'চা করে বাবাকে কত খাইয়েছি। রান্নাও খাইয়েছি কত রকম।

বক্তব্যে জোর হবে বলে রান্নার কথা বলে ফেলেছে। বলে এখন বিপদ।

এই জিনিষটাই তারণ কানে ধরে নিলেন।

কি কি রান্না জানো তুমি ? একটা-দুটোর আমিও তবে বায়না ধরব মায়ের কাছে।

কিন্তু চায়ের কথায় স্বাতী একেবারে মাতোয়ারা। বেণ্টিক স্ট্রীটের বাসিন্দা বাপের এক চীনা রোগিকে স্বাতী নাকি চা দিয়েছিল একদিন। একচুমুক খেয়ে ভদ্রলোক হেসে খুন : চিনি-দুধের সরবৎ—এর মধ্যে আবার এক টিপ চা দিতে গেলেন কেন ? চীনারা খায় শুধু লিকার—বেশ সুগন্ধ, খেতে মোটেই খারাপ নয়। অভ্যাস হয়ে গেলে তারপরে আর চিনি-দুধের চা মুখে রোচে না—গা গুলিয়ে আসে।

চা যখন সবে নতুন উঠেছে, সেই যে কারা ভাত রান্নার মতো চা সিদ্ধ করে ফ্যান ফেলে চা-পাতা চিনি সহযোগে খেয়েছিল, সে-গল্পও হল। হতে হতে রান্নার কথাটা উঠতেই পারে না আর সেদিন।

খাসা এক খেলা চলেছে মেয়েটার সঙ্গে। বিকালটা তারণের দিব্যি কেটে যায়।

আবার ক'দিন পরে এলো স্বাতী, এসেই সেদিনের রান্নার প্রশ্নের গড়গড় করে জবাব দিয়ে যাচ্ছে : কি কি রান্না জানি, এই তো ? লুচি ভাজতে জানি, আলুর দম, বেগুন-ভাজা, ডিমের ওমলেট সমস্ত জানি —

সঙ্গে সঙ্গে আবদার ধরে : দিই না একটা ওমলেট ভেজে ?

শুনবেই না। কম পাত্তোর ! কয়েকটা ডিম কেনা আছে, চায়ের বাসন আনতে গিয়ে রান্নাঘরে সে জিনিষ দেখে এসেছে। শুধু চা নয়, চায়ের সঙ্গে আজ ডিম-ভাজা। রোয়াক থেকেই বলতে বলতে আসছে, কেমন হয়েছে বলুন বাবা। ডিম ভেঙে আচ্ছা করে ফেটিয়ে নিয়ে কাঁচালঙ্কা কুচিয়ে—

কথা আচমকা বন্ধ হয়ে যায়। ঘরের মধ্যে যেন বাঘ। পূর্ণিমা এসে গেছে কখন —বৃদ্ধ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মারা গেছেন, সেইজন্য সকাল সকাল ছুটি। এসে পূর্ণিমা বাপের পাশে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ ধরে স্বাতীর কাজকর্ম দেখছে, আর হাসছে মিটিমিটি। দরজা খোলারও শব্দ পায় নি, রান্নায় স্বাতী এমন মগ্ন ছিল। কিংবা হয়তো বাড়ি ঢুকে আজ সদর দরজা খোলা রেখে এসেছিল। নতুন রান্না শেখার আনন্দে ঐ তুচ্ছ জিনিষটা মনে ছিল না।

পূর্ণিমা খিল খিল করে হেসে উঠল : নিত্যি নিত্যি ধান খেয়ে পাখি যাও উড়ে, কি হাল তোমার করি দেখ খাঁচার মধ্যে পুরে—

টেনে নিল স্বাতীকে বুকের মধ্যে। বলে, বাবার সঙ্গে এত ভাব তোমার। আমি আসবার আগেই পালিয়ে যাও। কেন শুনি ?

হকচকিয়ে গিয়েছিল স্বাতী গোড়ায়, সে-অবস্থা সামলে নিয়েছে। বলে, ভয় করে ছোড়দি-মণি। আপনি যে আমার উপর চটে রয়েছেন!

সে কী কথা বোন! কে মিথ্যে করে লাগিয়েছে তোমার কাছে? আমার ভাই নিশ্চয়। পিঠোপিঠি ভাইবোন কিনা আমরা—ঝগড়া-মারামারি সেই ছোট্টবেলা থেকে। ওর একটা কথাও তুমি বিশ্বাস কোরো না।

ঠোঁট ফুলিয়ে স্বাতী বলে যাচ্ছে: আমার নাকি অনেক দোষ! সকলের বড় দোষ, আমরা বড়লোক। আমি তার কি করব ছোড়দি-মণি? মা-বাবা বড়লোক হতে পারেন—আমি তো ইচ্ছে করে চেষ্টা করে হই নি, আমার দোষটা কি তাহলে? বলুন।

বেশ মিষ্টি করে কথা বলে কিন্তু মেয়েটি। বাবার মতন পূর্ণিমাও যেন ঢলে পড়ছে তার দিকে।

স্বাতী বলতে লাগল, বড়লোক হয়ে যদি জন্মেই থাকি, চিরকাল বড়লোক থাকতে হবে তার কোন্ মানে আছে? গরিব কেন হতে পারব না, চেষ্টা করলে কী না হয়। শিখিয়ে-পড়িয়ে গরিব করে নেবেন তো কেউ একজন!

পূর্ণিমা বলে, না শেখাতেই তো বেশ খানিকটা হয়ে গেছ ভাই। মুড়ি খেতে পার মেঝের উপর পা ছড়িয়ে বসে, কয়লার উনুন ধরাতে পার—

স্বাতী আহত অভিমানে তারণের দিকে চেয়ে বলে, বাবা, বলে দিয়েছেন?

অপরাধী তারণ মুখ নিচু করে চায়ের কাপে মনোনিবেশ করেছেন। পূর্ণিমা কিছু গম্ভীর এবারে। বলে, শখের গরিবানা নয়—সত্যি সত্যি গরিব আমরা। দেখতে পাচ্ছ কী রকম বিশ্রী এঁদো-ঘর। গরিব হলে এমনি জায়গায় থাকতে হয়। পারবে?

স্বাতী কিছুমাত্র ভীত নয়। ঘাড় দুলিয়ে বলে, পারি কিনা দেখবেন তো পরখ করে। গোড়া থেকেই কেন অপদার্থ ধরে নেবেন? আপনারা তো দিব্যি রয়েছেন, আমিই বা কেন পারব না?

নিজের জন্য স্বাতী সমান একটা ভাগ রেখে দিয়েছে, নইলে তো তারণকে খাওয়ানো যাবে না। সেই প্লেট ধরে পূর্ণিমাকে এনে দিল। বলে, খান আপনি, খেয়ে বলুন।

হাসিমুখে পূর্ণিমা বলে, খেতে হবে তারপরে বলতে হবে—বাবার মতন না খেয়ে আগেভাগে বলা চলবে না?

স্বাতী বলে, এখন তো খেয়েছেন বাবা—বেশ, উনিই বলুন, খারাপ হয়েছে? সত্যি কথাই বলবেন, নইলে শেখা হবে কেমন করে?

তারণ বলেন, হয়েছে চমৎকার, খারাপ বলি কি করে? এই বয়সে মিথ্যে তো বলতে পারব না।

না খাইয়ে ছাড়বে না তো পূর্ণিমা ভাগাভাগি করে নিল স্বাতীর সঙ্গে। বলে, সত্যিকার ওমলেটই তো—দোকানে যেমনটি পাওয়া যায়। নাঃ, পাকা রাঁধুনি হয়ে গেছ তুমি। তা রাঁধুনিঠাকরুন, একবার তবে তো কাশীপুর যেতে হয়। মা দিদি সব ওখানে। তাদের রেঁধে খাইয়ে এসো।

উঠে দাঁড়িয়ে স্বাতী আঁচলটা কোমরে বেড় দিয়ে নিল। যেতে এখনই প্রস্তুত, দৃক্‌পাত নেই। সেকালে ভুবন দিগ্বিজয় করতে বেরিয়েছিলেন তৈমুরলং, আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ন—স্বাতীও তাই যেন। গোটা শহরের সর্বজাতির মন জিতে আসতে পারে সে চা-ওমলেটের প্রতিযোগিতায়।

চলে গেলে পূর্ণিমা নিজেই বলছে, মেয়েটা ভালো—

তারণ সায় দিয়ে বলেন, বড়লোক বলে বিগড়ে থাকিস নে পুনি। বড়লোক হলেই

কি আর পাজি হয় রে? খুব লক্ষ্মী মেয়ে।

তোমার পছন্দ বাবা?

চোখে-মুখে কথা বলে, বানিয়ে বানিয়ে সত্যি-মিথ্যে কতরকম বলে যায়। আমার তো ছেড়ে দিতেই ইচ্ছে হচ্ছিল না। ভাবি, এসে যখন পড়েছে, পুরুত ডেকে কপালে এক থাবড়া সিঁদুর মাখিয়ে মাথায় আঁচলটা তুলে দিয়ে পুরোপুরি ঘরে নিয়ে নিই। পা ছড়িয়ে বসে বসে মুড়ি চিবোক, আর আগডুম-বাগডুম বকে যাক।

বিজয়া দেবীকে পূর্ণিমা চিঠি লিখতে বসল। যে-প্রস্তাব তিনি নিজে নিয়ে এসেছিলেন, এতদিনে তার জবাব। ভেবে ভেবে নিবিষ্ট মনে লিখছে।

তাপস এসে উঁকিঝুঁকি দেয়। তাকে কিছু বলছে না। ছেলেছোকরা কী আবার জানবে, ভাবখানা এমনি।

তাপস বলে, ওদের লিখছিস বুঝি? কি লিখলি?

পূর্ণিমা ধমক দিয়ে ওঠে: যা যা, বই-টই পড় গে যা—অন্যদিন যা করে থাকিস। গুরুজনদের ব্যাপারে থাকতে নেই।

তাপস ঢিব ঢিব করে তার এ-পায়ে ও-পায়ে মাথা ঠোকে। থামে না।

পূর্ণিমা বলে, কি হল রে?

প্রণাম করছি গুরুজনকে। পুণ্যি হবে।

তখন সদয় হয়ে পূর্ণিমা একটুকু বলে দেয়, আমার বরাবরের অমত, জানিস তো তুই—

বাঁচালি ছোড়দি। মুখে বড়লোকদের গালি দিস, কাজের বেলাতেও ঠিক তাই। কথায় আর কাজে ঠিক একরকম, এ জিনিষ বড় একটা দেখা যায় না। তোর উপরে শ্রদ্ধা খুব বেড়ে গেল ছোড়দি।

আরও বারকয়েক প্রণাম ও দু'হাতে পদধূলি-গ্রহণ। কলম ফেলে পূর্ণিমা তখন ভাইকে ধরে ফেলে। বলে, আমার অমতে কি হবে রে? স্বাতী জমিয়ে নিয়েছে বাবার কাছে। বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে বলে, বাবা গীতা ফেলে এখন ওর মুখের মিথ্যেকথা শোনেন। মা'র কাছে নালিশ করতে গিয়ে সেখানেও উল্টো ফল—বললেন, আমি তফাৎ হয়ে আছি, বুড়োমানুষকে একজনে এসে দেখাশুনো করছে, হাসিখুশিতে রেখেছে—মেয়েটাকে নিত্যিদিন সর্বসময়ে যাতে পাওয়া যায় তাড়াতাড়ি সেই ব্যবস্থা কর্। আর দিদিরও মায়ের মতে মত: বাপের বাড়ি কেমন যেন মরুভূমির মতো হয়েছিল, স্বাতী বউ হয়ে এলে জমজমাট হবে। মন খারাপ ঠেকলে চলে যাব তখন।

হতাশকণ্ঠে পূর্ণিমা আবার বলে, মায়া জানে স্বাতী, মায়াজাল খাটিয়ে সকলকে বশ করে ফেলেছে। নইলে এমন হবে কেন? একলা আমি এতজনের সঙ্গে কাঁহাতক লড়ে বেড়াই? অমত আমার ঠিকই—কিন্তু কি করব ভাই, সকলের মতে মত দিতে হল।

ও ছোড়দি, টের পাস নি, মায়া খাটিয়েছে তোর উপরেও—

তাপস আর্তনাদ করে ওঠে: সকলে মিলে মায়াবিনীর খপ্পরে ফেলে দিচ্ছিস, হায় হায়, কী হবে আমার।

পূর্ণিমা বলে, তোর যদি আপত্তি থাকে সেই কথা তবে লিখে দিই। চিঠি এখনো তো ডাকে ছাড়ি নি।

তাপস বলে, তোর কথার উপর কবে আপত্তি করেছি বল্। ছোট্টবেলায় জ্বরজারি হলে অন্য কেউ পারত না, তোর কথায় গাদা গাদা কুইনাইন গিলেছি। এবারে বিনি-জ্বরে কুইনাইন গেলা—

॥ আঠার ॥

গাড়িয়া স্টেশন থেকে সোজা পূবমুখো—

শিশির চলেছে হনহন করে। কাঁধে কন্যা কুমকুম, হাতে অবিনাশ মজুমদারের চিঠি ও নক্সা। মাঝে মাঝে চিঠি খুলে পথের নিশানা মিলিয়ে নিচ্ছে।

চোখ বুঁজে চলে আসবি তেমাথার বটগাছ অবধি। সেখান থেকে ডাইনে মোড় নিবি। যাচ্ছিস, যাচ্ছিস। মাঠের পুল পার হয়ে অল্প একটু এগিয়ে দেখবি পাশাপাশি তিন তালগাছ। একটার গায়ে পেরেক ঠুকে সাইনবোর্ড আঁটা আছে—নব-বীরপাড়া কলোনি। তীরচিহ্ন দেওয়া আছে। খোঁজাখুঁজি করতে হবে না, ঘাড় তুলে বাঁয়ে তাকালেই দেখতে পাবি। পুকুর কেটে সেই মাটিতে জলাজমি ভরাট করে তার উপর ঘর। বাষট্টি ঘর বাসিন্দা আমরা পুকুরের চার পাড় ঘিরে। বীরপাড়া গাঁয়ের মাঝখানটায় বড় দীঘি—খানিকটা সেই জিনিষ আর কি। আমাদের বীরপাড়াকে তুলে এনে ছোট আকারে নব-বীরপাড়ায় বসিয়ে দিয়েছি—

ঠিক দুপুরে কাল বাড়ি ছেড়ে পথে বেরিয়েছে, পুরো রাত্তিরটা ট্রেনে কেটেছে। গোড়ার দিকে কুমকুম বড় জ্বালাতন করেছিল, পথের কষ্টে তারপর নেতিয়ে পড়ল। সকাল হলে জেগে উঠেছে, চারদিক ফালুক-ফুলুক করে দেখছে।

তেমাথার বটগাছ মিলল। ডাইনে এবার। হঠাৎ কুমকুম কেঁদে উঠল। সন্ত্রস্ত শিশির লজেন্স বের করে গোটা দুই একসঙ্গে গুঁজে দিল মুখের মধ্যে। কান্না বন্ধ।

এদিকে যে সর্বনাশ, লজেন্সের ভাণ্ডার প্রায় শেষ। পকেট ভরতি কিনে কাল ট্রেনে উঠেছিল, খাওয়াতে খাওয়াতে আসছে। কতদূর আরও যেতে হবে কে জানে। পৌঁছুলে মজা তখন। মামী গরু কিনে ফেলেছেন, যত ইচ্ছে দুধ খাবি। খাওয়া কি —চান করবি দুধের মধ্যে নেমে, সাঁতার কাটবি। কিন্তু তৎপূর্বে মুখে যদি ঢোকানোর কিছু না থাকে, পথের মাঝে রক্ষে রাখবে না এ মেয়ে।

কাঠের পুল। পথের শেষে—যাঃ, সোয়াস্তি পাওয়া গেল। পাকা সার্ভেয়ারের মতন মামা নক্সা এঁকে দিয়েছেন, হুবহু মিলছে। কুক করে একটু আওয়াজ দিল কুমকুম। অর্থাৎ রসদ ফুরিয়ে এসেছে, তার সিগন্যাল। বোতলের মতন ছিপি এঁটে কান্না আটকে রেখেছে, ফাঁকা পেলেই দুর্দান্ত বেগে বেরিয়ে পড়বে। সেই কান্না এক তুমুল ব্যাপার। রূপকথায় সুতোশঙ্খ সাপের কথা আছে—নাকি চেহারায় সুতোর ভিতর দিয়ে শঙ্খনাদ বেরোয়। কুমকুমেরও তাই। কান্না কানে শুনে কে বলবে দেহ তার এইটুকু মাত্র।

তিন তালগাছ ঐ যে, কিন্তু—। বর্ণনা এ তাবৎ অক্ষরে অক্ষরে মিলে এসেছে, এইবারে তো গোলমাল। বাঁদিকে তাকিয়ে বিস্তর ঘরবাড়ি দেখবার কথা—কোথায়? বাষট্টি ঘর বাসিন্দা, অবিনাশ লিখেছেন—কিন্তু সাঁকখানাও তো নজরে আসে না।

কাঠের পুলের উপর লাঠি হাতে পাইক-দরোয়ান গোছের কয়েকটা লোক। সেখানে গিয়ে প্রশ্ন করে : কলোনি আছে এইখানে কোথায়—

আছে বই কি! এদ্দূরে এলে তো এগিয়ে স্বচক্ষে দেখে এসো। তালগাছের ঐ ওধারে—

হাত তুলে সেই তালগাছই দেখাল বটে। হাসছে ফ্যা ফ্যা করে। ব্যাপারটা রহস্যময় ঠেকে। ইতস্তত করে শিশির এগিয়ে চলল। চতুর্দিকে তাকাচ্ছে। তালগাছতলায় এসে

গেল—কোনরকম সাইনবোর্ড নেই গাছের গায়ে কোথাও।

না-ই থাক সাইনবোর্ড, নিশানা মিলে গেল। ছিল কলোনি, কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। তল্লাট জোড়া ঘরবাড়ি ছিল, এখন ছাই। ছাই আর ছাই। কিছু আধ-পোড়া দরজা-জানলা, চাল-বেড়া এবং ভাঙা টালিও পড়ে আছে এদিক সেদিক। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে গেছে, তার নিদর্শন।

উদ্বেগে শিশিরের মুখ শুকাল। পৈতৃক জমাজমি ও জিনিষপত্র নামমাত্র দামে বেচে দিয়ে মামা সেই টাকায় নতুন করে গ্রাম ও বাস্তুভিটা গড়েছিলেন—অগ্নিগর্ভে গিয়েছে সব। তাঁরাই বা কোথা—কোন্ গতি হল তাঁদের?

পুলের উপরের লোকগুলো চেঁচাচ্ছে: দেখতে পেয়েছ কলোনি? হাঁ করে দাঁড়িয়ে কেন, এগিয়ে আলাপ-সালাপ করো গে যাও।

হো হো—করে উদ্দাম হাসি হাসছে, হেসে এ-ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ে। মানুষের সর্বনাশ নিয়ে বিদ্রূপ করে—ইচ্ছে করে ছুটে গিয়ে থাপ্পড় কসিয়ে দিই জানোয়ারগুলোর গালে। দিতও ঠিক শিশির—তাদের গাঁ অঞ্চলে দিয়েই তো এসেছে। কিন্তু এটা হল ভিন্ন এলাকা—নতুন আগন্তুক সে এখানে। সয়ে যেতে হবে, জোর খাটানো চলবে না।

পায়ে পায়ে শিশির ফিরে চলল। পুলের কাছাকাছি এসেছে। একজন তাদের মধ্যে বলে, পরশুও যদি আসতে মশায়, জমজমাট পাড়া দেখতে পেতে। পুকুরঘাটেই বা কত কত মানুষ—চান করছে, কাপড় কাচছে, বাসন মাজছে—

শিশির বলে, কোথায় আছেন তাঁরা সব?

এ তো মশায় আজব জিজ্ঞাসা। গাছের ডালে মৌমাছির চাক বাঁধা দেখেছেন—সেই জিনিষ। বাঁধুক না চাক মনের মতো করে—বাঁধা হয়ে যাক, মধু এনে জমাক। জমে গেলে মালিক একদিন চাক ভাঙতে এসে পড়বে আগুন আর লগালগি নিয়ে। মৌমাছি কোন দিকে উড়ল সে খবরে কার কোন্ গরজ? আবার জমতে না পারে, তাই আমরা মোতায়েন রয়েছি।

দৈবদুর্ঘটনা নয় বোঝা গেল, মালিক পক্ষই আগুন দিয়েছে। সঠিক কোন খবর এদের কাছে মিলবে না, জানা থাকলেও বলবে না। জিজ্ঞাসা করা মিছে—হাসবে পিত্তি-জ্বালানো ঐ রকমের হাসি।

ক্লান্ত অবসন্ন পায়ে শিশির চলল। কাল দুপুরে মেয়ে ঘাড়ে তুলে বেরিয়েছে, রাত কেটে গিয়ে প্রহর বেলা হতে চলল—ঘোরাঘুরির শেষ নেই তবু। সঙ্গের জিনিষপত্র তবু তো বুদ্ধি করে শিয়ালদা স্টেশনের লেফট-লগেজে রেখে এসেছে। দেহ বইছে না আর। সিন্ধবাদ নাবিকের দশা—কাঁধের মেয়ে কোথায় কেমন করে কোন কৌশলে নামাবে, ভেবে পায় না।

বিপদের উপর বিপদ—মেয়েও এই সময় ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল। আরম্ভেই আকাশ-বিদারী—তার মানে মুখ খালি। পকেটের লজেন্সও একেবারে শূন্য—কী করা যায়, উপায় কি এখন? বাপ হয়ে স্বহস্তে সন্তান খুন করছে, কখনো সখনো শোনা যায়। সে বোধকরি এমনিতারো অবস্থায়। নব-বীরপাড়া কলোনীতে মামার ঘরে উঠেই মেয়ে ছুঁড়ে দেবে মায়ের কোলে, মামী আকণ্ঠ দুধ গেলাবেন, আর শিশির আঃ বলে হাত-পা মেলে শয্যায় গড়িয়ে পড়বে—হয়ে দাঁড়াল উল্টোটি। ডবল জোরে হাঁটছে শিশির—হাঁটা বলে না একে, দৌড়ানো। মেয়ের কণ্ঠখানি ভরাট করবার উপযোগী বস্তু কিছু চাই—সব ভাবনার বড় ভাবনা তাই এখন। অবিলম্বে চাই।

খানিকটা গিয়ে মানুষ পাওয়া গেল। ঝোপ আড়াল করে মানুষটা তিন তালগাছের

দিকে তাকিয়ে আছে। হাতছানি দিয়ে শিশিরকে সে ডাকল : ডাকাত বেটারা কি বলছিল ?

বলছি সব, কান রক্ষে করে নি আগে—। সকাতরে শিশির বলে, লজেন্স কোথা পাওয়া যায় সেইটে আপনি আগে বলুন।

লোকটা চোখ কপালে তুলে বলে, লজেন্স কে রাখতে যাবে ? এদিগরে লজেন্সখেকো মানুষই নেই। ভাত জোটাতে পারে না, তার লজেন্স !

তবে কি রাখে বলুন !

কলোনির ভিতরেই দোকান ছিল, সে তো এখন ছাই। আর আছে—সে হল অনেকটা দূরে এখান থেকে—মুড়ি-বেগুনি ভাজে একজন।

শিশির বলে, দূরে বলে কিছু নেই—দুনিয়ার শেষ মুড়ো অবধি যেতে পারি। মুড়ি-বেগুনি না হয়ে মিঠে জিনিষ কোন রকম ? মুড়ির দোকানে বাতাসাও রাখে—পথটা আপনি দয়া করে বাতলে দিন।

বাচ্চা মেয়ে যেন কত বোঝে—প্রবোধ দিচ্ছে তার পানে তাকিয়ে : সবুর যাদুমণি, মিনিট কতক একটু ক্ষমা দাও। কিছু না পেলে পথের ধুলোবালি আছে—তাই দিয়ে মুখ তোমার পাকাপাকি ভরাট করে দেবো।

চলে আসুন—বলে লোকটা নিজেই আগে আগে চলল। ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে : পথে পথে ঘোরা ছাড়া কাজ কি এখন ? সর্বস্ব খুইয়ে এসে আশাসুখে আবার নতুন বাসা বেঁধেছিলাম, পুড়িয়ে ছারখার করল। পরিবার গাছতলায় বসিয়ে ঘোরাঘুরি করছি, কলোনির কারো কারো সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায়। কোন্ জায়গার উপরে আবার এখন চাল তুলব, সেই হল বড় ভাবনা।

সে দোকানে বাতাসা নেই, তবে জিলিপি পাওয়া গেল। তেলেভাজা গুড়ের রসের জিলিপি। তাই সই, খানিকটা মিঠা হলেই হল। খান দুয়েক জিলিপি মুঠোর মধ্যে গুঁড়িয়ে একসঙ্গে মেয়ের গালে ঠেলে দিল প্রতিহিংসা নেওয়ার মতো। সঙ্গে সঙ্গে কাজ দিল—কান্না বন্ধ, নিঃশব্দ কুমকুম।

কতাবার্তার ফুরসুতে এতক্ষণে। শিশির বলে, আপনিও নিশ্চয় বীরপুর গাঁয়ের মানুষ। অবিনাশ মজুমদার বলে একজন এখানে ছিলেন—

লোকটা সসম্ভ্রমে বলে, একজন কি বলেন, তিনি সর্বজন। বড়দা—কলোনি বলতে যা-কিছু, একধারে তিনিই সমস্ত। বড়দা যেমন, বউদিও তেমনি। সাক্ষাৎ হরগৌরী।

উচ্ছ্বাস থামিয়ে দিয়ে শিশির বলে, আমার মামা-মামী। ওঁদের কাছে এসেছিলাম। কোথায় আছেন, খোঁজ বলতে পারেন ?

লোকটা বলে, বড়দার উপরেই বেশি আক্রোশ, সকলের আগে তাঁর ঘরের বেড়া ভেঙেছে। বেড়া ভেঙে জোর করে ধরে তাঁকে জিপে তুলল। কোথায় নিয়ে পাচার করেছে, কেউ জানে না। কলোনির মানুষজন তখন ঘুমুচ্ছিল, টের পেলে রক্তারক্তি হত। বউদি তার পরে বেহালা না কোথায় আত্মীয়বাড়ি চলে গেলেন, ঠিকানা আমি বলতে পারব না।

সর্বনাশ !

চারিদিকে অকূল সাগর। একলা মানুষ হলে তাড়াতাড়ি ছিল না—না হয় কিছুকাল ভেসে ভেসে বেড়ানো যেত। বিপদ কাঁধের এই ভারবোঝা নিয়ে—নিশ্চল নিঃশব্দ বস্তু হলেও হত, ক্ষণে ক্ষণে ক্ষেপে উঠে এ মেয়ে ধুন্ধুমার লাগিয়ে দেয়।

অমিতাভর নাম মনে পড়ে গেল। নোটবুকে ঠিকানা আছে। কলকাতায় গেলে তার মেসে গিয়ে উঠতে হবে, এই নিমন্ত্রণ ছিল। নিমন্ত্রণটা কিছু পুরানো, বছর পাঁচেক

আগেকার। অমিতাভ তাদের ইস্কুলের এক মাস্টারের শ্যালক, শিশিরের সমবয়সী, ঐ সময়ে সে ভগ্নিপতির বাড়ি বেড়াতে গিয়েছিল। মাছ ধরার বিষম নেশা—ভারি জমে গিয়েছিল শিশিরের সঙ্গে। যতদিন ছিল, এ-পুকুরে সে-পুকুরে রোজই দু'জনে মাছ ধরে বেড়াত। শিশিরের বাড়িতেও গেছে কয়েকবার, তাদের দুটো পুকুরেই বিস্তর মাছ —ছিপ নিয়ে পুকুরপাড়ে বসত। শিশিরের তখনও বিয়ে হয় নি—শিশিরের মা ধর-গিন্নি খুব যত্ন করে খাওয়াতেন তাকে। পাঁচ বছর আগেকার ব্যাপার—অমিতাভ সেই সময় শিশিরের কথা আদায় করে নিয়েছিল, কলকাতায় যায় তো অমিতাভর কাছেই থাকবে। তার পরে আর খোঁজখবর নেয় নি কেউ কারো। কিন্তু নিমন্ত্রণ পাঁচ বছরে তামাদি হয়ে যায়, এমন আইনও কিছু নেই। এক যদি মেস ছেড়ে অন্য কোথাও সে বাসা নিয়ে থাকে। গিয়ে দেখা যাক। কুলহীন সাগরে এই ছাড়া অন্য কিছুই তো নজরে আসে না। হাতঘড়িতে সাতটা তেত্রিশ। দুবার বাস বদল করে তবে শ্যামবাজার। দ্রুত-পায়ে বাস-রাস্তার দিকে চলল। কাজে বেরুনোর আগে গিয়ে অমিতাভকে ধরবে।

কলোনির লোকটা পাছ ছাড়ে নি এখনো। ভ্যানর-ভ্যানর করতে করতে চলেছে—বড়দা বিহনে বড়দার ভাগনেকেই দরদের মানুষ ঠাউরেছে সম্ভবত, মনের যত দুঃখ উজাড় করে ঢালছে। পরশু রাত্রে সেই অগ্নিকাণ্ডের কথা। জমির মালিক উমেশ সর্দার 'ভাই' ছাড়া বড়দাকে ডাকত না—সেই মানুষটার কারসাজি সমস্ত। জমি তৈরি হয়ে গেছে, দেখল— রাত দুপুরে পাইক-বরকন্দাজ পাঠিয়ে ঘরবাড়ি তছনছ করে দিল। এবারে অন্য কোথাও মোটা সেলামিতে বন্দোবস্ত দিয়ে মুনাফা পিটবে।

এত বড় সর্বনাশ মুকিয়ে রয়েছে, স্বপ্নেও কেউ ভাবি নি। বেড়ার উপর দমাদম লাঠি—ডাকাত পড়েছে ভাবলাম, ঘুমের ঘোরে। হাঁক দিচ্ছে: জ্যান্ত পুড়ে মরবি কেন—ঘর থেকে বেরিয়ে আয়। বেড়ার ফাঁকে তাকিয়ে দেখি, কলোনি জুড়ে প্রলয়-তাণ্ডব। ঘরের পর ঘর জ্বলছে দাউ দাউ করে। হাওয়ার তোড়ে আগুন এচালে ওচালে লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ছে। না বেরিয়ে তখন উপায় কি! নিশিরাত্রে চারিদিকে হাহাকার করে কান্নার রোল, হাতে লাঠি-সড়কি দৈত্যদানোগুলো হুল্লোড় করে বেড়াচ্ছে, ক্ষণে ক্ষণে বন্দুকের দেওড়—তার মধ্যে চোখে আধো ঘুম নিয়ে কে কোনদিকে ছিটকে পড়লাম নিশানা করার উপায় ছিল না—

বাস এসে পড়ায় রক্ষে পেল শিশির। এত দুঃখ কান পেতে শোনা যায় না।

খুঁজে খুঁজে শিশির অমিতাভর মেসে পৌঁছল।

॥ উনিশ ॥

কলতলায় অমিতাভ স্নানে এসেছে। শিশিরকে দেখেই চিনল, হৈ-হৈ করে অভ্যর্থনা করে: আসুন, আসুন। এলেন তাহলে সত্যি সত্যি? কত যে আনন্দ হচ্ছে! ঐ আমার ঘর—বসুন গে ভাল হয়ে। আসছি।

হুড়হুড় করে কয়েকটা মগ মাথায় ঢেলে তাড়াতাড়ি অমিতাভ স্নান সারল। মাথা মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকেছে। বামুনঠাকুর সঙ্গে, তার হাতে টাকা দিয়ে বলে, দই রাবড়ি সন্দেশ রসগোল্লা আনিয়ে দিও ঠাকুর। আমার ফ্রেণ্ড। সময় কুলিয়ে ওঠে তো ডিমের একখানা স্পেশাল করে খাইও। খাওয়াদাওয়া সেরে আমার সিটে বিশ্রাম করবেন, কোন রকম অসুবিধা না হয় দেখো।

ঠাকুর বলে, আমরা রয়েছি, অসুবিধা কেন হবে ?

চাকরে লোকের মেস। অমিতাভও চাকরি করত গোড়ায়। আর সন্ধ্যেবেলা ল-কলেজে আইন পড়ত। আইন পাশ করে চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখন আদালতে বেরুচ্ছে। বলে, মক্কেলের বড় আকাল। কপালক্রমে আজকেই একটা পেয়েছি—রাহাজানির একটা কেস। সেই জন্যে ছুটোছুটি।

মাথা মুছে চুল আঁচড়াচ্ছিল। এইবারে কুমকুমকে ভাল করে ঠাহর হল।

এটি কে ?

আমার মেয়ে।

অমিতাভ অবাক হয়ে বলে, বলেন কি! বিয়ে করলেন, মেয়ে হয়েছে—দিব্যি বড়োসড়ো মেয়ে। ভাগ্যবান বলতে হবে। আমাদের বিয়ে করবার কথাই কেউ এখনো বলে না।

শিশির ম্লান হেসে বলে, বিয়ে করলাম, মেয়ে হল, একুশ দিনের মেয়ে রেখে বউ চলে গেল—

চুক্‌চুক্ করে সহানুভূতি জানিয়ে অমিতাভ বলে, বাচ্চা সঙ্গে নিয়েই ঘুরছেন ?

ঘুমিয়ে গেছে কুমকুম। অমিতাভর বিছানায় সন্তর্পণে শুইয়ে দিয়ে শিশির বলল, নিরুপায়। ভাগ্যের সবটা তো শোনেন নি—মেয়ের মা নেই, আমার মা'কে সেই দেখে এসেছিলেন তিনিও নেই। ঘরবাড়ি জমিজমা সমস্ত গেছে। বাচ্চা কোথায় রেখে আসব বলুন, ঘাড়ে নিয়ে ঘুরছি।

কোর্টের সাজপোশাক করছিল অমিতাভ। তৈরি হয়ে গেছে। কথা বলার ফুরসত নেই। বলে, খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নিন এবার, ফিরে এসে সব শুনব। দেখি, সকাল সকাল যদি ফেরা যায়—

ছুটল সে খাবার ঘরে। ঢপাস করে পিঁড়ি পড়ল, তাও শিশিরের কানে আসে। বেশির ভাগই চাকরে লোক—ছুটোছুটি করে সব বেরিয়ে পড়ছে, মেস শূন্য হয়ে গেল। স্নান সেরে শিশিরও মেয়ের পাশে একটু গড়িয়ে নিচ্ছে।

ডিমের স্পেশ্যাল বানিয়ে ঠাকুর এসে ডাকল। কুমকুমকে তুলে নিল শিশির, তাকেও কিছু ভাত গেলানো যাক, পেট পরিপূর্ণ থাকলে পড়ে পড়ে ঘুমুবে সারাক্ষণ। সর্বনাশ করে রেখেছে যে হতভাগা মেয়ে, বিছানা নষ্ট করে দিয়েছে। কান্না ছাড়াও এই এক শয়তানি। প্রাণপণে ঘুম পাড়িয়ে কান্না বন্ধ করলেন তো ঘুমের মধ্যে এই কর্মটি করে বসবে ঠিক। মেয়েজাতের পায়ে শতকোটি প্রণাম—এত ঝামেলা কাটিয়ে হাজার-লক্ষ বাচ্চা যাঁরা বড় করে তোলেন। কী লজ্জা, কী লজ্জা! সংকীর্ণ ঘরে সরু এক তক্তাপোষের উপর তোষক ও চাদরের বিছানা—সারাদিন খেটেখুটে এসে রাত্রে এর উপর ঘুমোবে কেমন করে অমিতাভ ?

রক্ষা এই, মেস নির্জন—মেম্বাররা যে যার কাজে বেরিয়ে গেছে। শিশির তোষক টেনে রোদ্রে দিল। সকলকে খাইয়ে দিয়ে ঠাকুর-চাকর রান্নাঘরে নিজেদের খাওয়াদাওয়া নিয়ে আছে—ফাঁক বুঝে চাদরটা নিয়ে কলতলায় ধুতে বসে গেল।

তবু হল না—চাকরটা কোন্ দরকারে বেরিয়ে দেখে ফেলল : ও কি হচ্ছে বাবু ? নিজের কাপড়ই ভিজিয়ে ফেলছেন, আপনারা কি পারেন এসব ? রেখে দিন—খেয়ে উঠে আমি ধুয়ে দেবো।

শিশির সলজ্জ স্বীকার করে নেয় : সত্যি আমি পারি নে। এসব কাজে বড্ড আনাড়ি! জল কাচা করে বোধহয় যাবে না, সাবান দিতে হবে। মেয়েলোকের কত

ক্ষমতা বুঝতে পারি এবার, দুটো দিনেই আমি তো চোখে অন্ধকার দেখছি।

একটা টাকা চাকরের হাতে দিল। সাবানের দাম ও কাজের বকশিস। পুরো টাকার বাজে খরচা। এমনি আরও কত হবে, ঠিকঠিকানা নেই। একটা বাচ্চার খরচা যা, একটা হাতি পোষার খরচাও বোধহয় তাই।

বলেও সেই কথা: দু' দশদিন বোধহয় থাকতে হবে এখানে। তোমায় আরও খাটাব। মেয়েটা ভারি ওস্তাদ—কী বলব তোমায়—জায়গা বুঝে সময় বুঝে টুক করে কাজ সেরে রাখে। সময় সময় সন্দেহ হয়, এ হল বজ্জাতি—আমায় জব্দ করার জন্য।

অমিতাভ এসে পড়ল। চারটে বেজে গেছে। বলে, এর আগে ফাঁক করতে পারলাম না। বলি অসুবিধে হয় নি তো? হবে না, আমি জানতাম। ঠাকুর অনেকদিনের পুরানো ভালো-মানুষ। চাকরটাও ভালো। মাঝে মাঝে বকশিস দিই, খুব খাতির করে আমায়।

নিজের কথা শিশির সবিস্তারে বলল। বলে, পাকাপাকি চলে এলাম।

এসে পড়েছেন, কী আর বলি। সুখ কোনদিকে নেই। এ হল বারো-উপোসির তেরো-উপোসি বাড়ি আসা। অর্থাৎ একজনে বারোদিন না খেয়ে একবাড়িতে অতিথ হল, তাদের ভাত জোটেনি তেরোটা দিন। সেখানে তবু ঘরবাড়ি জমিজমা বাগান-পুকুর ছিল, যাহোক একটু চাকরিও করছিলেন—

শিশির বলে, চাকরি এখানেও হবে। কথা পেয়েছি একরকম।

পেয়ে যান ভালোই—

একটু থেমে তিক্তকণ্ঠে অমিতাভ বলতে লাগল, বলবেন না এদের কথা। এক কড়ার মুরোদ নেই লাটবেলাট হয়ে দেশ-শাসনে নেমেছে। কথার কোন দাম আছে নাকি? মফস্বলের মানুষ, তাই জানেন না। ধাপ্পাবাজ মিথ্যেবাদী যত সব—

দাম-কাকা আমার কাছে ধাপ্পা দেবেন বলে মনে হয় না। কী জানি!

এইবারে আসল কথা: মামা-মামীর ভরসা করে এসে পড়েছি—তাঁরা নিজেরাই কোথা ছিটকে গেলেন, ঠিকঠিকানা নেই। বাচ্চা নিয়েই যত ঝঞ্ঝাট, বাচ্চা না থাকলে আমি তো মুক্তপুরুষ। কোলে কাঁধে বাচ্চা বয়ে কাঁহাতক পথে পথে ঘোরা যায়! জায়গা দেখে নিতে কিছু সময় লাগবে—তাই বলছিলাম, আপনার মেসে সেই ক'টা দিন যদি সম্ভব হয়। বেশি নয়, দশ পনেরোটা দিন—খরচ-খরচার জন্যে আপাতত আটকাচ্ছে না—

বলে যাচ্ছে শিশির, অমিতাভ ঘাড় নেড়ে কেটে দিল: ঝঞ্ঝাট তো বাচ্চা নিয়েই। মেস জায়গা—এখন চুপচাপ আছে, সন্ধ্যের পর কী হৈ-হল্লা দেখতে পাবেন। পাশা পড়ে আমারই এই তক্তাপোষের উপরে—দুরন্ত আড্ডা। বাচ্চার বন্দোবস্ত করে একা চলে আসুন না, যা হোক করে নিয়ে নেবো। এই সরু ঘরে দুটো তক্তাপোষ পড়বে না—তা আমার তক্তাপোষ ছাতে তুলে দিয়ে মেজেয় বিছানা পেতে দু'জনে শুতে পারব। বাচ্চার তো সে ভাবে চলবে না।

কবিত্ব করে প্রত্যাখ্যানটা কিছু মোলায়েম করে দিচ্ছে: নন্দনের কুসুম ওরা—বিধাতাপুরুষ হালফিল মর্ত্যে পাঠিয়েছেন, গায়ে এখনো স্বর্গের ছোঁয়াচ আছে। আমাদের মতন করে ওদের চলে না—তোয়াজে রাখতে হয়।

শিশির বলে, কুসুম-টুসুম অন্যের বেলা—সাক্ষাৎ কালভুজঙ্গিনী কোলে বয়ে ঘুরছি। গর্ভ থেকে পড়েই গর্ভধারিণীকে শেষ করল। কেন যে ছেড়ে রেখে গেল—সাথী করে নিয়ে গেলেই আপদ চুকত। আমার মা লক্ষ্মী-জনার্দন হেলা করে নাতনি

নিয়ে রইলেন—রাতদুপুরে সন্দেহ সমর্থ মানুষটা কোলে নিয়ে ঘুমোচ্ছেন, দিল অন্ধকারে ছোবল মেরে। মামীমা দুখাল গরু কিনে চালে দোলনা ঝুলিয়ে আদর করে ডাকলেন—তা এ-মেয়ের আগে আগে পুড়েজ্বলে সব ছাই হয়ে যায়—

থামিয়ে দিল অমিতাভ : ছিঃ, এ-সমস্ত কি বলেন! ঠাণ্ডা মাথায় ভেবেচিন্তে দেখা যাক—উপায় কি একটা বেরুবে না? এত বেশি উতলা হচ্ছেন কেন?

চাকরে চা নিয়ে এলো, চা খেতে খেতে পরামর্শ হচ্ছে। হোটেলে গিয়ে ওঠা যায়—কিন্তু সমস্যার সমাধান হচ্ছে কই? এখানে তবু চেনা-জানার মধ্যে। হোটেল হলে সর্বক্ষণ মেয়ে আগলে থাকতে হবে, চাকরির জন্যে হোক বা জায়গার সন্ধানে হোক, মেয়ে ছেড়ে এক-পা বাইরে যাওয়া চলবে না।

কুমকুম পিটপিট করে তাকাচ্ছে নতুন মানুষ অমিতাভর দিকে। প্রায়-অলক্ষ্য ক্ষীণ হাসি ঠোঁটে মাখানো। মন-কাড়া খাসা হাসিটুকু কিন্তু। ঘরগৃহস্থালী ছেলেমেয়ের ধার ধারে না অমিতাভ—মেসের বন্ধনহীন জীবন। মনটা তবু কী রকম হল—কোলে নিয়ে নিল কুমকুমকে।

বলে, এক্ষুনি যে যেতে হচ্ছে তা নয়। আড্ডার অসুবিধে ঠিকই, তা বলে বন্ধু মানুষের দায়-বেদায় দেখব না, এমন তো হতে পারে না। পাশা না হয় লাটুবাবুর ঘরেই পড়বে। তিনি রাজি না হলে—বন্ধ। তবে মেস-জায়গায় বাচ্চার থাকা চলে না, আপনিই সেটা একদিন দু'দিনে বুঝবেন, আমায় কিছু বলে দিতে হবে না।

কুমকুমকে কোলে নিয়েই অমিতাভ উঠল। বাইরে গিয়ে হাঁকডাক করে ঠাকুর-চাকরকে এনে সকলে ধরাধরি করে তক্তাপোষটা বের করে দিল ঘর থেকে। মেজের ঢালাও বিছানায় আজ তিনজন—অমিতাভ, শিশির, আর মাঝখানে কুমকুম।

শিশির বলে, মাঝখানে কেন? মেয়ের গুণের ঘাট নেই—রাতদুপুরে ধারাস্নান করিয়ে দেবে কিন্তু।

অমিতাভ হেসে বলে, বেশ তো, বেশ তো। যা হবার দু'জনার একসঙ্গে হবে। ঘাবড়ান কেন, ঘুমুলে আমি মরে থাকি। স্নান তো ছার, বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে গেলেও আমার হুঁশ হবে না।

শয়তান মেয়ে হাড়বজ্জাত মেয়ে, বোঝা গেল, অমিতাভকেও খানিকটা মায়া করে ফেলেছে। হলে হবে কি—মেসসুদ্ধ মানুষ বিরূপ। বাচ্চা নিয়ে মেসে এসে উঠল—এমন কথা কে কবে শুনেছে! বলি আমাদের বাড়িতে বাচ্চা নেই? দেখা যাক। এই শনিবারে যে-যার বাড়ি গিয়ে একটা-দুটো বাচ্চা ঘাড়ে করে ফিরব। বালখিল্যের মেস হয়ে যাক। ট্যাঁ-ভ্যা দিবারাত্রি, কলতলায় ভিজে-কাঁথার ডাঁই, দুধ খাওয়ানো, কপালে টিপ পরানো, হাঁটি-হাঁটি পা পা হাঁটিয়ে নিয়ে বেড়ানো ছাতের উপর। অমিতাভবাবু পারবেন আমাদের সঙ্গে? অবিবাহিত মানুষ—চেয়েচিন্তে বন্ধুবান্ধব ধরে ওঁকে বাচ্চা জোগাড় করতে হবে। আমাদের এক এক বাড়িতে এক ডজন দেড় ডজন করে মজুত।

মোটের উপর বেশি দিন এখানে নয়। হাসিমস্করা ছেড়ে এর পরে উগ্র বচন ছুঁড়বে। দামসাহেবের অফিসে শিশির নিত্যিদিন যাচ্ছে। দুপুরবেলাটা—কুমকুম তখন ঘুমোয়, জেগে পড়লে ঠাকুর-চাকর দেখাশুনো করে। যত্নআত্তি করে, বকশিসের লোভে খুশি হয়েই করে তারা। চাকরি জোটানো সহজ নয়, যে না সে-ই বলে। দামসাহেবও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছেন তাই। তাঁর যে কোনরকম কারচুপি আছে, মরে গেলেও বিশ্বাস করি নে। এত প্রতিপত্তি থেকেও হালে পানি পাচ্ছেন না,—শিশিরের মুখোমুখি হতে লজ্জা পান হয়তো। বলেন, ঘন ঘন আসার কি দরকার? না এলে ভুলে বসে থাকব,

তাই ভেবেছ ? কত চেষ্টা করছি, দেখতে পাচ্ছ। তা-ও বলি, আজ হোক আর দু'দিন পরে হোক, দেবোই একটা কিছু জোগাড় করে। ব্যস্ত হয়ো না।

শিশির কণ্ঠস্বর কান্নার মতো করে বলে, সে তো জানি কাকা। পদতলে এসে পড়েছি, নিষ্ফলে ফিরব না। কিন্তু আমার এদিকে অদ্যভক্ষ্য ধনুর্গুণ—যা-কিছু আজকেই, দু'দিন পরে আর দরকার থাকবে না। যে-পথে মা গেছেন, আপনার বউমা গেছে, আমাকেও সেই পথে যেতে হবে। বাচ্চা মেয়েটাও যাবে। সামান্য পরিচয়ের এক ভদ্রলোককে ধরে মেসে এসে উঠেছি—তা কি বলব কাকা, মেম্বারগুলো এই মারে তো সেই মারে—

আবদারের সুরে বলে, নয়তো বলে দিন, মেয়ে নিয়ে সমস্যা—আপনার বাড়ি ফেলে আসি ওটাকে। তখন আমি ফুটপাথের উপরেও পড়ে থাকতে পারব। যদ্দিনে খুশি চাকরি দেবেন। হপ্তায় একবার গিয়ে দেখে আসব শুধু মেয়েটাকে।

দামসাহেবের অফিসে যায় শিশির। আর হাওড়া ও শিয়ালদা স্টেশনে গিয়ে ঘোরাঘুরি করে। বিস্তর উদ্বাস্তুর ঘরবসত ঐ দুটো স্টেশনে—খানিক খানিক জায়গা দখল করে পুত্রকলত্র নিয়ে সংসারধর্ম করে। ট্যাং-ট্যাং করে শিশির তাদের মধ্যে চলে যায়, মামার সাঙ্গোপাঙ্গ কারো যদি দেখা মেলে দৈবাৎ, মামার ঠিকানা যদি পাওয়া যায়। প্রবল বৃটিশরাজের সঙ্গে সামনে লড়াই (সহিংস লড়াই, যার ফলে মামার ডান হাতের তিনটে আঙুল উড়ে গেছে, এবং সেই তিন আঙুলের বদলা পুরো একটা শ্বেত মানুষই নিয়েছিলেন শোনা যায়) চালিয়ে এসে স্বদেশি সরকারের আমলে নিঃস্ব নিরন্ন নিরাশ্রয় হয়ে মানুষটাকে পথে উঠতে হল। কিন্তু পরাজয় মেনে নেবার মানুষ নন—অবিনাশ মজুমদারকে যারা জানে, সবাই একবাক্যে বলবে। কখনো হারেন নি তিনি, হারবেন না। আবার কোথাও কলোনি গড়ছেন, কত কত নতুন উদ্যোগে মেতে গেছেন।

এভাবে কতদিন আর চলবে ? আশার আলো কোনদিকে দেখছে না শিশির। মেসের মেম্বাররা সত্যি সত্যি মারমুখি হয়ে উঠছে। সন্ধ্যার জমজমাট আড্ডা বন্ধ। জমিয়ে বসবার ঘর পাওয়া যায় না—তার চেয়ে বড় কথা, আড্ডার মুরুব্বি অমিতাভকে পাওয়া যায় না একেবারে। শিশিরের সঙ্গে বসে মেয়ে নিয়ে দেয়ালা করে ঐ সময়টা। ধমক-ধামক আপাতত ঠাকুর-চাকরের উপর পড়ছে ঃ ডাইং-ক্লিনিং-এর কাপড় আসে নি—সময় কোথা হুজুরদের ? দু-চার পয়সা বকশিস মিলছে, তবে আর কি ! মেসের কাজকর্ম চুলোয় যাক—ভাত ধরে যাচ্ছে, ডাল সিদ্ধ হয় না। ভেবেছ কি তোমরা শুনি ?

দুপুরে খাওয়ার সময় শিশির নিরিবিলি ঠাকুরকে বলে, কী করা যায়—উপায় বাতলাও দিকি।

ঠাকুর বলে, নির্বংশ বড়লোকে অনেক সময় ছেলেপুলে খোঁজে—

সাগ্রহে শিশির প্রশ্ন করে ঃ খোঁজে আছে তোমার এমন কেউ ?

নেই এখন, খুঁজে দেখতে পারি—

একগাল হেসে বলে, যেটা লভ্য হবে, সিকি কিন্তু আমার। মোটা কমিশন ছাড়া পারব না।

হাসি দেখে মনে হয়, নির্বংশ বড়লোক সত্যি সত্যি আছে তার জানার মধ্যে। রাগে শিশিরের ব্রহ্মতালু অবধি জ্বলে ওঠে। সন্তান বিক্রি করবে ভেবেছে ঠাকুর—অদৃষ্টে এতখানিও ছিল ! কিন্তু শহরে নতুন এসে তিলমাত্র মেজাজ দেখানো চলবে না।

ছিঃ-ছিঃ, মেয়ে বিক্রি কেন করব ! কোন ভাল জায়গায় মেয়েটা রাখতে পারি—সেই ব্যবস্থা করে দাও। সাধ্যমতো আমি খরচা দিতে রাজি আছি। এখন অল্পস্বল্প

দেবো, চাকরি হলে তখন ভালরকম দিতে পারব। খুঁজেপেতে দাও তুমি, তোমাকেও খুশি করব।

আজামোজা কথায় ঠাকুরের উৎসাহ মিইয়ে গেছে। উদাস ভাবে বলে, আশ্রম-টাশ্রম আছে শুনেছি, তারা এইরকম রাখে। দেখি খোঁজখবর করে, আপনিও করুন। খুঁজতে খুঁজতে কি আর বেরুবে না ?

দিন দুয়েক পরে শিশির তাগিদ দেয় : মনে আছে আমার কথা ?

ঠাকুর উদাস কণ্ঠে বলে, কতজনকে বললাম, রাজি হয় না। বলে, মাগ্‌গিগণ্ডার বাজার—ভগবান যেগুলো দিয়েছেন, তাই পুষতে আক্কেলগুড়ুম, বাইরের মাল কোন্‌ সাহসে এনে চাপান দিই !

খরচখরচা আমিই তো দেবো—

একমাস-দু'মাস দিয়ে তারপরে যদি সরে পড়েন। সেই সন্দেহ করে। মেয়ে তো রাস্তায় ছুঁড়ে দিতে পারবে না তখন। কাঁচা কথায় কেউ রাজি হয় না।

একটু থেমে ঢোক গিলে বলে, একজনে রাজি আছে। কিন্তু সর্ত দিয়েছে—

আশান্বিত হয়ে শিশির বলে, কি সর্ত শুনি ?

অন্তত তিনটে বছরের খরচা অগ্রিম দিতে হবে। মাসিক পঁচিশ টাকা হিসাবে।

মানুষটা কে, আন্দাজ হচ্ছে। মোটা টাকা হাতে নিয়ে রসুই ছেড়ে ঠাকুর নিজেই বোধহয় লেগে পড়বে। শিশির ঘাড় নেড়ে বলে, না বাপু, অত রেস্ত নেই, পেরে উঠব না।

মেয়ের কাছে শিশির বলে, একটা কথা বলি তোকে কুমকুম—

মেয়ে গড়িয়ে এসে কোলের উপর চড়ে বসে। চোখ বড় বড় করে অপরূপ ভঙ্গিতে তাকিয়েছে।

তুই মরে যা, আমি বাঁচি—

নান্‌ না—

তবে আমিই মরি। মরে বেঁচে যাই—

নান্‌ না, নান্‌ না—

তবে কি হবে ? দু'জনে একসঙ্গে মরি।

কোনটাই কুমকুমের পছন্দ নয়। এদিক ওদিক ঘাড় দুলিয়ে পরম আহ্লাদে বলে যাচ্ছে, নান্‌ না, নান্‌ না। নান্‌ না, নান্‌ না—

আক্রমণটা অতঃপর স্পষ্টাস্পষ্টি। মেম্বাররা হুংকার ছাড়লেন : বলি চাকরি করো তোমরা মেসের, না, শিশিরবাবুর ? সকলের অসুবিধে ঘটিয়ে এমনধারা উপরি রোজগার চলবে না। যাঁর মেয়ে তিনিই সম্পূর্ণ দেখাশুনো করবেন, তোমরা ধারে-কাছে যাবে না। আর নয়তো কেটে পড়ো. নতুন লোক দেখি আমরা।

অমিতাভ মুখ শুকনো করে বলে, দেখছেন ত অবস্থা। আর চলে না। ম্যানেজার আমায় ঘরে ডেকে আলাদা করে বলে দিল। হোটেল ছাড়া তো উপায় দেখছি নে। শিয়ালদার কাছে রয়্যাল বেঙ্গল হোটেল—ম্যানেজারের সঙ্গে বিশেষ জানাশোনা আমার। বলেন তো চিঠি লিখে দিই, সস্তার মধ্যে যা-হোক ব্যবস্থা করে দেবে।

বলতে বলতে অমিতাভ ভ্রূ কুঞ্চিত করে ভাবে একটুখানি। বলে, অখিলবাবুর ওখানে গিয়ে দেখবেন নাকি ? হাতিবাঁধার অখিল ভদ্র—ঘর ভাড়া দেবেন শুনেছিলাম। তাঁর কাছেও চিঠি দিতে পারি। দেখুন ভেবে। সুবিধা না হলে অগতির গতি হোটেল তো আছেই—হাতিবাঁধা থেকেই শিয়ালদার ট্রেনে চেপে পড়বেন। দু' জায়গাতেই দুটো

চিঠি দিয়ে দিচ্ছি।

গিয়ে দেখতে ক্ষতি কি ? ডুবন্ত মানুষের তৃণখণ্ড ধরতে যাওয়ার মতো। অমিতাভর আশ্রয়ে লভ্য তবু হল অনেক—কাঁধের বোঝা নামিয়ে দিব্যি কয়েকটা দিন জিরিয়ে নেওয়া গেল। বোঝা তুলে নিয়ে নতুন উদ্যমে নেমে পড়ো আবার পথে—ঘর খালি করে দাও, ওদের পাশার আড্ডা জমবে আজকের এই সন্ধ্যা থেকেই।

অখিল ভদ্র তিনটে পাকা কুঠুরি তুলেছেন হাতিবাঁধা গ্রামে। গ্রাম বলা ঠিক হল না —পুরোপুরি না হলেও আধা-শহর। আগে পোড়ো-মাঠ ধু-ধু করত, গরু-ছাগল চরে বেড়াত, এখানে ওখানে দু-চার ঘর গোয়ালার বসতি। কলকাতার দুধ-ছানার যোগান হত এই অঞ্চল থেকে। এখন সেইসব জায়গাজমির কাঠার মাপে বিক্রি, দর শুনে পিলে চমকে যায়। জমি পড়েও নেই এক ছটাক। বিক্রি হয়ে গিয়ে টপাটপ ঘড়বাড়ি উঠছে।

অখিল ভদ্র পৈতৃক সূত্রে বিঘেখানেক জমি পেয়েছিলেন—তার মধ্যে দু-কাঠা রেখে বাকিটা ছেড়ে দিয়েছেন। সেই টাকায় আপাতত তিনটে কুঠুরি উঠেছে, ভবিষ্যতে আরও উঠবে সেই আশা। তিনের মধ্যে একটি ভাড়া দেবেন তিনি। অমিতাভকে একটি সাধুসজ্জন ভাড়াটে দেখতে বলেছেন। শিশির সেই ঘর ভাড়া নিতে পারে। অখিলের বউ নিঃসন্তান—সম্পর্ক পাতিয়ে নিয়ে অবরে-সবরে বউয়ের কাছে মেয়ে রেখে বেরুনোও হয়তো অসম্ভব হবে না। ভবিষ্যতের অনিশ্চিত কথা অবশ্য। এবং জিনিষটা সম্পূর্ণ নির্ভর করবে শিশিরের চালচলতির উপর।

যুক্তি মন্দ নয়, চেষ্টা করে দেখা নিশ্চয় উচিত। অতএব মেয়ে ঘাড়ে তুলল আবার —দরে না বনলে ব্যাপারি যেমন গুড়ের কলসি ঝাঁকি মেরে তুলে নেয়। চলল, কোথায় সেই হাতিবাঁধা। অমিতাভ খুব ভাল করে জায়গাটা বাতলে দিয়েছে—মামা অবিনাশ মজুমদার চিঠিতে যেমন নব-বীরপাড়া কলোনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন।

চৌমাথায় বিস্তর হাটুরে চালা—সেইখানে নেমে বাঁয়ের রাস্তা। হাতিবাঁধা মাইল-খানেক পথ সেখান থেকে। হাঙ্গামা নেই, অঢেল সাইকেল-রিক্সা হা-পিত্যেশ করে আছে, চড়ে বসলেই হল। শ্যামবাজার থেকে ঘণ্টা-দুয়েকের পথ—চৌমাথা চিনতে অসুবিধে হয় তো বাস-ড্রাইভারকে বলে রেখো, ঠিক জায়গায় সে নামিয়ে দেবে।

ইত্যাদি বলে দিয়েছে অমিতাভ। পথ অতি যাচ্ছেতাই—বাস ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে যাচ্ছে, তার উপর প্যাসেঞ্জারের অবিরত ওঠানামা। সেই চৌমাথা পেতে দু'ঘণ্টার স্থলে পাক্কা চার ঘণ্টা।

নেমে পড়ে শিশির 'রিক্সা' 'রিক্সা' করে হাঁক পাড়ছে।

হাটুরে চালা থেকে বেরিয়ে এসে একজনে রসিকতা করে : রিক্সা কেন, ট্যাক্সি ডাকুন না। কিংবা এরোপ্লেন। যাবেন কোথা মশায় ?

হাতিবাঁধা—

পথ দেখিয়ে দিয়ে লোকটা বলে, রিক্সা আসে কোন বিয়েথাওয়ার ব্যাপার ঘটলে। আর ইলেকসনের বছরে। জীপও আসে। এখন গরুর গাড়ি—খুব বেশি তো মোষের গাড়ি। তার চেয়ে পায়ে হেঁটে চলে যান। হুমহাম করে সাড়া দিতে দিতে যাবেন কিন্তু, সাপের চলাচল আছে।

মালকোঁচা সেঁটে কুমকুমকে কোলে জাপটে নিল অতএব। চলেছে। কোল খালি লাগে তো কাঁধের উপর। কাঁধ এবং পাঞ্জাবির কাঁধের অংশটা ভিজে ধারা গড়িয়ে পড়ে। নামিয়ে আবার কোলে নিয়ে নিল। হুমহাম করতে বলে দিয়েছে, কিছুমাত্র তার

প্রয়োজন নেই। মেয়েকে গালিগালাজ করতে করতে যাচ্ছে—সেই শব্দ সাপ তাড়ানোর পক্ষে প্রচুর।

হাঁটতে হাঁটতে মিলল অবশেষে হাতিবাঁধা, এবং অখিল ভদ্রের কুঠুরিঘর। গ্রহ নিতান্তই বিরূপ, ভদ্রমশায় বাড়ি নেই।

দাসীগোছের একজন বেরিয়ে এসে বলে, কি দরকার?

ঘরভাড়া দেবেন, শুনলাম।

দাসী ছুটে গিয়ে মাদুর এনে রোয়াকে বিছিয়ে দিল: বসুন। কলকাতা গেছেন, এসে যাবেন এই ন'টার গাড়িতে। গাড়ির আওয়াজ পাচ্ছেন না?

বাড়ি তিন কুঠুরির, কিন্তু অন্দর জেলখানার ঢঙে উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। পাঁচিলের অন্তরালে জনমানবের সাড়াশব্দ নেই। মাদুর পেতে দিয়ে দাসীও সেখানে অন্তর্হিত হল।

আছে বসে শিশির। কোলের মেয়ে মাদুরে শোয়াতে পেরেছে, এই মহাভাগ্য। ঘুমিয়ে গেছে কুমকুম, বাঁচা গেছে। ট্রেনের আওয়াজ তখনই নাকি শোনা যাচ্ছিল—ভদ্রমশায় দর্শন দিচ্ছেন না, স্টেশন কতদূর তবে?

শিশিরেরও ঝিমুনি ধরেছে। এতক্ষণে এসে গেলেন যেন—টর্চের আলো গায়ে পড়ল। অখিল হাঁক দিয়ে উঠলেন: কে ওখানে?

আপনার কাছে এসেছি, অমিতাভবাবু চিঠি দিয়েছেন একটা।

কোন্ অমিতাভ? ও, হ্যাঁ—

চিঠি নিয়ে টর্চের আলোয় পড়ে বললেন, ভাড়া আপনি নেবেন?

মাদুরের প্রান্তে অখিল ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলেন। কুমকুমকে দেখিয়ে বলেন, খাসা মেয়ে। মেয়ে খুব ন্যাওটা বুঝি, কাছ ছাড়ে না? আমারও ছিল, চলে গেছে। ঘর শূন্য, স্ত্রীর চোখের জল শুকোয় না।

অন্তরালবর্তিনী সেই কন্যাবিয়োগ-বিধুরাকে স্মরণ করে মনে মনে শিশিরের পুলক সঞ্চার হল।

ভাড়া কি পড়বে?

দেরি না করে শিশির কাজের কথায় আসে: জানেন তো অবস্থা, সর্বস্ব ফেলে চলে আসতে হয়েছে। ভাড়ার বিষয়ে কিছু বিবেচনা করতে হবে।

অখিল বলেন, মানুষ ক'জন আপনারা?

সেদিক দিয়ে ঝামেলা নেই। এই যা দেখতে পাচ্ছেন। বাড়তি একটি প্রাণীও নয়। আমরা বাদে আর দুটো বাক্স আছে। গেরস্থালির জিনিষপত্তোর সব কেনাকাটা করে নেবো।

চমক খেয়ে অখিল বলেন, আপনার স্ত্রী আসছেন না?

নেই—

দরদ কাড়বার জন্য জোরগলায় অন্দরকে শুনিয়ে বলে, মেয়েটার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মা মারা গেছে। বড় দুর্ভাগা—আমি ছাড়া ত্রিসংসারে দেখাশুনোর কেউ নেই।

মাদুর ছেড়ে অখিল তড়াক করে উঠে পড়লেন: বাড়ির মধ্যে আমার স্ত্রী একলাটি—ছুটো মানুষকে আমি ভাড়া দেবো না। দেখতে তো দিব্যি কাঁচ-কাঁচা—দ্বিতীয় সংসার করে পরিবার নিয়ে আসুন, ঘর আপনাকেই দেবো। অমিতাভর কথা ফেলব না।

বিরক্ত হয়ে শিশির বলে, ঘর ততদিন ফেলে রাখবেন নাকি?

ততদিন মানে ক'দিন? ধরুন এক 'হপ্তা। মাসের আর দশটা দিন আছে—

অমিতাভর বন্ধু আপনি, তা আপনাদের খাতিরে এই দশটা দিনই না হয় খালি রেখে দেবো। চাল-কেরাসিন জোগাড়ে দেরি হয়—বলি, বিয়ের কনের জন্য তো ব্লাকে যেতে হবে না, দশ দিনের বেশি কিসে লাগবে। স্ফূর্তি করে জোড়ে এসে উঠবেন, বউয়ের কাঁখে মেয়ে—আমার স্ত্রীকে বলে রাখব, শাঁখে ফুঁ দিয়ে সে-ই আপনাদের ঘরে তুলে নেবে।

দাসীর উদ্দেশে হাঁক দিলেন ঃ মাদুর তুলে নিয়ে যা রে। কুয়োর পাড়ে রেখে দে এখন, দু-বালতি জল ঢেলে কাল ঘরে তুলিস।

এবং দ্বিতীয় বাক্যের সুযোগ না দিয়ে অখিল ভদ্র পাঁচিলের ভিতর ঢুকে গেলেন।

উঠল শিশির, ঘুমন্ত বোঝা কাঁধে তুলে নিল আবার। নিরর্থক এই এত পথ ঘোড়দৌড় করে বেড়ানো। তবে কুমকুমের বেশ খানিকটা বিশ্রাম হয়ে গেছে। নইলে এত বড় ধকল সয়ে ঐটুকু প্রাণীর ঘুম ভেঙে আর জেগে ওঠার কথা নয়।

রেলস্টেশন কোনদিকে, জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নেই। অখিল ভদ্র যে পথ ধরে এসেছিলেন, সেই পথে চলল। সাপের ভয় নাকি খুব—শব্দসাড়া করে যাবার কথা। শিশির চুপিসাবে চোরের বেহদ্দ হয়ে চলেছে ঃ মা-মনসা, দাও না একখানা মোক্ষম ছোবল ঝেড়ে। এবং দ্বিতীয় ছোবলে মেয়েটাকেও নিয়ে নাও। মরবেই তো তিল তিল করে—তার চেয়ে লহমার মাঝে ঢলে পড়ুক, সে জিনিষ অনেক ভালো।

॥ কুড়ি ॥

স্টেশন। আলো, মানুষজন—স্টেশনে এসে গেছে। কুমকুম জেগে পড়েছে, ওয়েটিং-রুমের একটা বেঞ্চিতে তাকে বসিয়ে দিল। দেয়াল-জোড়া নানাবিধ পোস্টার—চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মেয়ে তাই দেখছে। এক ঘুম ঘুমিয়ে উঠে মেজাজটা রীতিমত ভালো।

গাড়ির খবর নিল। শিয়ালদা যাবার শেষ-গাড়ি চলে গেছে, আর সেই শেষরাত্রের দিকে চারটে-বাইশে। শিয়ালদার কোন হোটেলে উঠবে ভাবছিল, সে আশায় ছাই। রাত্রের মতন স্টেশনেই তবে আস্তানা গাড়তে হয়। এবং পেটও তো মানবে না, ইতিমধ্যেই সোরগোল তুলছে।

নীল পোশাক-পরা পয়েন্টসম্যান টিউবওয়েল থেকে জল ধরে দু'হাতে দু'বালতি স্টেশনবাবুর বাসায় নিয়ে যাচ্ছে। শিশির পাকড়াও করল ঃ মুশকিলে পড়ে গেছি ভাই। তোমাদের স্টেশনে রাত কাটাব।

'ভাই' সম্বোধনে লোকটা আপ্যায়িত হয়েছে। বালতি ভুঁয়ে নামিয়ে দাঁড়াল ঃ বেশ তো—

শিশির বলে, হোটেল আছে কাছাকাছি?

লোকটা ঘাড় নেড়ে দেয় ঃ গাঁ-গ্রাম জায়গা—বাড়ি ছেড়ে কে এখানে হোটেলের ভাত খেতে যাবে?

চুলোয় যাক গে। উপায় ঠাউরে ফেলেছে শিশির, ভাতের আর পরোয়া করে না। দেশ থেকে কলকাতায় আসার সময়কার অভিজ্ঞতা। একটা স্টেশনে লোভে পড়ে সিঙাড়া খেয়েছিল। একখানি মাত্র। তাতেই হল। রাতের মধ্যে কুটোগাছটি দাঁতে কাটার অবস্থা রইল না। সারাক্ষণ চোঁয়াঢেকুর উঠছে—পেট আকণ্ঠ ভরতি, মনে হচ্ছিল।

খাসা জিনিস এই সিঙাড়া। বিস্তর গরিবগ্রবো চলাচল করে, তাদের বিষয় বিবেচনা বলে সদাশয় রেল-কোম্পানি খাবারওয়ালাদের আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন। মাত্র দু-পয়সা মূল্যের বস্তুটি গলা দিয়ে নামিয়ে দিলেই একটি দিবারাত্রির মতো নিশ্চিন্ত। সিঙাড়া এই স্টেশনেও দেখা যাচ্ছে, তবে আর ভাবনা কিসের ?

ভাত না-ই হল। শোওয়ার ব্যবস্থা হতে পারবে তো ?

উৎসাহভরে লোকটা বলে, খুব—খুব। ফার্স্টক্লাস ওয়েটিংরুম খুলে দেবো, ইজিচেয়ারে আরামসে ঘুমোবেন।

দাও তবে ভাই। রাত হয়েছে, শুয়ে পড়ি।

লোকটা হাত পাতল : দুটো টাকা লাগবে। আগাম।

শিশির বলে, টাকা কিসের ? রেল-কোম্পানি ঘর বানিয়ে রেখেছে প্যাসেঞ্জারের জন্যেই তো—

লোকটাও সঙ্গে সঙ্গে মেনে নেয় ; ঠিক, প্যাসেঞ্জারেরই ঘর। আছে তালা দেওয়া। তালা খুলব আমি—ঝাঁটপাট দেবো, ইঁদুর-আরশোলা তাড়াব, আলো জেবলে দেবো ; ঘরের ভাড়া তো চাচ্ছি নে, আমার খাটনির মজুরি। পারেন তো ঐ তালা দেওয়া ঘরে শুয়ে পড়ুন গে। নিখরচায় হবে।

শিশির বিরক্ত হয়ে বলে, থাক, তোমায় কিছু করতে হবে না। স্টেশন-মাস্টারকে বলে ঘর খুলিয়ে নেবো।

দাঁত মেলে লোকটা ফ্যা ফ্যা করে হাসে : তাই বরঞ্চ চেষ্টা দেখুন গে। দু-টাকায় কিন্তু পার পাবেন না। বড়বাবু মানুষ, মস্তবড় ইজ্জত—ওঁর হাতে দিতে হলে নিদেনপক্ষে পাঁচটি টাকা।

এমনি সময় 'নাথুরাম—' বলে কে ডাক দিল। লোকটা ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বলে, বড়বাবু চেঁচাচ্ছে—ফুটবাথের জোগাড় দিয়ে আসি। আপনি ততক্ষণ ভাবতে লাগুন, ঘর বড়বাবুকে দিয়ে খোলাবেন না এই নাথুরামকে দিয়ে। ট্যাঁকের যেমন জোর, সেই মতো ব্যবস্থা। টিপিটিপি খুলে দিতাম আমি, বড়বাবু টেরই পেতো না। টের পেয়ে গেলে আমার হাতে আর থাকবে না, পাঁচের এক গুঁড়ো-পয়সা কমে হবে না তখন।

বালতি তুলে নিয়ে নাথুরাম হন্তদন্ত হয়ে চলে গেল। দু-টাকা কে দিচ্ছে, এক টাকাতেই নিশ্চিত রফা হয়ে যাবে। শোওয়ার দায়েও অতএব নিশ্চিন্ত। আর কুমকুমের মেজাজটিও বেশ খাসা। পোস্টারের ছবি দেখছে, মুখ-ভরা হাসি। আঁকুপাকু করছে বেঞ্চি থেকে নামবার জন্য, নেমে বুঝি পোস্টারের মানুষ আর পাখি হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরবে।

এর মধ্যে পকেটে হঠাৎ হাত পড়ে চক্ষু কপালে উঠে গেল। নিজে তো সিঙাড়া চিবোবে, কিন্তু মেয়ের বেলা সেটা হবে না, তার রসদ গোনাগুনতিতে ঠেকেছে একেবারে। মেজাজ শ্রীমতীর এখন ভাল, কিন্তু মন্দ হতে লহমাও লাগবে না। তখন কি উপায় ?

উপায় ঐ অদূরে দেখা যাচ্ছে—

বেঞ্চি থেকে মেয়ে নামিয়ে দিল। এবং যেটা ভেবেছে—নিমেষে দেয়ালের ধারে চলে গেল সে। দিব্যি হল—নিজ মনে ছবি দেখতে থাকুক, বেঞ্চি থেকে পড়ার ভয়ও রইল না, শিশির অদূরের স্টেশনারি দোকানে ছুটল।

সে দোকানে লজেন্স নেই, অনুকল্পও নেই কিছু। বলে, আটটার গাড়ির মুখে সব খতম। এক এক প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে এক ডজন দেড় ডজন করে বাচ্চা। স্টক কতক্ষণ

-থাকে বললেন।

মোড়ের দিকে হাত ঘুরিয়ে দিল ঃ ওখানে দোকান আছে। অন্দুরে কেউ যায় না, ওরা দিতে পারবে।

চলল শিশির দ্রুতপায়ে। মোড় কিছুতে আসে না। মোড় মিলল তো দোকান আরও খানিকটা এগিয়ে। এত রাত্রে বন্ধ হবার মুখ এবার। লোকজন সব চলে গেছে, এক দরজা মাত্র খোলা। মালিক একাকী দিনের হিসাব মেলাতে গলদ্‌ঘর্ম হচ্ছে। লজেন্সের ফরমাস তার মধ্যে অতলে তলিয়ে যায়।

শিশিরের দিকে মুখ তুলে মালিক শুধায় ঃ কি আপনার ? শুনে নিয়ে ঘাড় কাত করে ঃ দিচ্ছি—। পরক্ষণেই যোগ-বিয়োগের মধ্যে বিস্মরণ হয়ে যায়। মুখ তুলে আবার জিজ্ঞাসা ঃ কি চাইলেন ? ও হ্যাঁ—

অবশেষে ধৈর্য হারিয়ে শিশির বলে, ও—হ্যাঁ রাতভোর চলবে নাকি ? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা হল যে !

লজেন্স আর বিস্কুট দু-পকেট ঠেসে বোঝাই করে শিশির ফিরল। তুমুল সোরগোল এদিকে স্টেশনে ঃ কার বাচ্চা—বাচ্চা ফেলে কে পালাল ?

রহস্যের গন্ধ পেয়ে বিস্তর লোক জমে গেছে।

দেখতে হবে না, বসিয়ে দিয়ে চুপিসারে সরে পড়েছে। এ জিনিষ আখচার হচ্ছে —পথেঘাটে হাটেবাজারে নর্দমায় আঁস্তাকুড়ে খইমুড়ির মতো আজকাল বাচ্চা ছড়িয়ে থাকে। গেল-মাসে কলকাতার ডাস্টবিন থেকে জমাদার একটাকে বের করল, বুকের নিচে তখনো একটু ধুকধুক করছে। সেবারে গাড়ির বাঙ্কে মাস তিনেকের এক বাচ্চা পাওয়া গেল, ঘুম পাড়িয়ে কম্বলে জড়িয়ে রেখে নেমে চলে গেছে। একজিবিসনে গিয়ে লাউডস্পীকারে হরদম শুনতে পাবেন ঃ ছোট ছেলে কার হারিয়েছে, অফিসে এসে নিয়ে যান। সারাবেলা গলা ফাটাচ্ছে, কেউ দাবি করতে আসে না। আরে ভাই, সিকিটা আধুলিটা নয় যে ফুটো পকেট গলে পড়ে গেছে। দাবিই করবে তো হারাতে দিল কেন ?

স্টেশন জায়গা, নানান ধরনের আজে-বাজে লোক। একজনে বলে, এমন ফুটফুটে মেয়ে গো ! কোন্‌ প্রাণে ফেলে চলে গেল।

অন্যে বলে, বেওয়ারিশ মাল—নজরে ধরলে নিয়ে নিতে পারো। কিন্তু নিলেই তো হল না—আখের ভাবতে হবে। যা দিনকাল পড়েছে, একটা পাখির বাচ্চা পুষতেও লোকে বিশ বার আগুপিছু করে। এ তো হল মানুষের বাচ্চা, ফুটফুটে ফর্সা হোক আর কুটকুটে কালো হোক খাবে সমানই।

ভিড়ের দিকে কুমকুম ড্যাব ড্যাব করে তাকায়। ভয় পেয়েছে। দুটো ঠোঁট থরথর করে কাঁপে, তারপর ডুকরে কেঁদে উঠল।

কান্না শিশিরের কানে গেছে। শুনে শুনে এ কান্না মুখস্থ। এক হাজার বাচ্চা একসঙ্গে কাঁদুক, তার মধ্য থেকে কুমকুমের কান্না ঠিক আলাদা করে নেবে। জনতার মন্তব্যও কিছু কিছু কানে যাচ্ছে—দূর থেকে সে চেঁচাচ্ছে ঃ আমার মেয়ে, আমার— আমার—

দুই কনুয়ে ভিড় ফাঁক করে এসে মেয়ে ঝটিতি বুকের উপর তুলে নিল।

চেনা আশ্রয় পেয়ে মেয়ে নির্ভয়ে এবার দুনো তেদুনো জোর দিল। চোখ বুঁজে প্রাণপণ শক্তিতে কাঁদছে। লজেন্স মুখে ঢোকাল শিশির, অন্য সময়ের অব্যর্থ প্রতিষেধক—থুঃ করে ফেলে দিল মুখ থেকে। লজেন্স ছেড়ে তখন বিস্কুট, তারপর

লজেন্স বিস্কুট দুই বস্তু একসঙ্গে। কোন কিছুই কাজে এলো না। মেয়ে কাঁধে তুলে শিশির স্টেশনের এদিক-ওদিক দ্রুত পায়চারি করছে। কপালের উপর চোখের উপর থাবা দেয় আর ঘুমপাড়ানি ছড়ার সুরে গুঞ্জরণ করে : ঘুম আয়, ঘুম আয়—কান্না থামা ওরে হতভাগী মেয়ে। তোর দু'খানি পা জড়িয়ে ধরি। মাথা খারাপ করে দিস নে। ক্ষেপে গিয়ে এর পরে বলের মতন লাইনের উপর ছুঁড়ে মারব, মাথা ছাতু-ছাতু হয়ে ঘিলু ছিটকে পড়বে—

কিছুতে কিছু নয়। ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজাল এমনি সময়—গাড়ি আসছে। ঘণ্টার আওয়াজ মন্ত্রের কাজ দিল—মেয়ে চুপ। ঘাড় তুলে ফালুকফুলুক তাকাচ্ছে ঘণ্টা বাজানোর দিকে। হুড়মুড় করে ট্রেন এসে পড়ল—উল্টোদিকের গাড়ি, শিয়ালদা থেকে যাচ্ছে বনগাঁয়। হৈ-রৈ, ফেরিওয়ালার হাঁকডাক, প্যাসেঞ্জারের ওঠানামা, ইঞ্জিনের ফ্লাশলাইটে দিনমান চতুর্দিকে—কান্নাটান্না এর মধ্যে কোথায় চলে গেছে, অবাক হয়ে দেখছে শিশু। আরও ভাল করে দেখতে পাবে বলে মেয়ে কোলে শিশির রেলিঙের গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

হঠাৎ নারীকণ্ঠ : শিশির যেন ওখানে ? আরে শিশিরই তো—

মুখ ফেরাল শিশির। মমতা—পূরবীর জেঠতুত বোন। একবার মাত্র দেখা হয়েছিল। ভারি আমুদে, সর্বক্ষণ মাতিয়ে রাখত। কলকাতার কাছাকাছি কোনখানে মমতার শ্বশুরবাড়ি—শোনা ছিল বটে কথাটা। বিস্তারিত খবর নেয় নি শিশির। নেবার কখনো প্রয়োজন হতে পারে, মনে আসে নি। এই তল্লাটে এসে পড়েছে—মমতা নামে শ্যালিকা সম্পর্কিত একজনেরা কাছাকাছি কোথাও থাকে, ঘুণাক্ষরে কথাটা মনে এলো না।

মমতা অবাক হয়ে বলে, রাতদুপুরে স্টেশনে কেন ভাই ?

পূরবী আর মমতা একই বাড়ির মেয়ে—পূরবীর বাপ আর মমতার বাপ বৈমাত্রের ভাই। পৃথক হয়ে দুই ভাই পৈতৃক বাড়ির নিজ নিজ অংশ উল্টোমুখো ঘুরিয়ে নিলেন—সদর দরজা একজনের পূর্বদিকে, অন্যের পশ্চিমদিকে। মামলা চলছে পাঁচ-সাত নম্বর—বাড়িতে দু-ভায়ের মুখ-দেখাদেখি বন্ধ—যা-কিছু দেখাসাক্ষাৎ কোর্টের এলাকায়, হাকিমের এজলাশে। পূরবীর বিয়ের সময় দূর দূর জায়গার আত্মীয়কুটুম্ব এলো, কিন্তু মমতার শ্বশুরবাড়ি একখানা পোস্টকার্ডের চিঠি দিয়েও জানানো হয়নি। তেমনি আবার দ্বিরাগমনে শিশির-পূরবী জোড়ে এসেছে—পাড়ার সব বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে খাওয়াচ্ছে, কেবল একই বাস্তুভিটায় জেঠশ্বশুরের ঘর থেকে একটি বেলার ডাক পড়ল না।

এই সময়টা দৈবক্রমে মমতা এলো বাপের বাড়ি—গরুর-গাড়ি থেকে নেমেই ছুটতে ছুটতে গেল ওবাড়ির বর দেখতে। কারো আহ্বানের অপেক্ষা রাখে না। গিয়ে পড়ে পূরবীর মা'র সঙ্গে কলহ করে : বিয়ের একটু খবর পর্যন্ত দিলে না কাকিমা। বেশ করেছ—তোমাদের কাজ তোমরা করেছ। তার জন্যে আমি পূরবীর বর দেখব না বলে রাগ করে থাকতে পারি নে। মা পথ আগলে দাঁড়াল—বলে, যাচ্ছিস ঝাঁটা খেয়ে ফিরবি। তা ঐ তো ঝাঁটা রয়েছে কাকিমা, তুলে নিয়ে যা কতক দিয়ে দাও। তবু শুনব না কাকিমা, ঝাঁটা খেতে খেতে জামাই দেখব—জামাইয়ের সঙ্গে আলাপসালাপ করব।

হাসিখুশি মেয়ে, পূরবীর চেয়ে বয়সে অনেক বড়। সেই তখনই তিনটে ছেলে-মেয়ের মা—রঙ্গরসে তা বলে এতটুকু ভাঁটা পড়ে নি। জামাই দেখে ফিরবার সময়

পুরবীর মা'র হাত দুটো ধরে বলেছিল, পুরুষে পুরুষে লড়ালড়ি, মেয়েদের কোন ব্যাপার নয়। মামলার কাজ অন্দরে কেন ঢুকতে দেবে? জামাই যদ্দিন থাকে অন্তত সেই ক'টা দিন রোজ আমি আসব—কেমন? ঘাড় নাড়লে শোনার মেয়ে নই আমি—'হাঁ' বলে দাও কাকিমা, আর কি করবে।

টানতে টানতে পুরবীকেও এক একদিন নিজেদের ঘরে নিয়ে আসত। খিলখিল করে হেসে বলত, মজাটা দেখিস নি বুঝি? ওদিকে তোর বাবা এদিকে আমার বাবা চোখ পাকিয়ে পড়লেন। কিন্তু চোখ পাকানোই শুধু করবার কিচ্ছুটি নেই। ছিলাম ও'দের মেয়ে—এখন পরঘরি, পরের ঘরের বউ। নামের শেষের উপাধি পর্যন্ত আলাদা হয়ে গেছে। একটু গরম কথা বলেছেন কি সঙ্গে সঙ্গে চিঠি চলে যাবে: বড্ড মন কেমন করছে—। তারপরে আর দেখতে হবে না—হপ্তার মধ্যে গরুর-গাড়ি নিয়ে বাড়ির দরজায় এসে হাজির। বাবা বলে তবে আর ডরাব কেন বল্।

শ্বশুরবাড়ির সেই ক'টা দিন হাসি-ঠাট্টায় ভরিয়ে রেখেছিল মমতা—বড় শ্যালী হয়ে ছোটবোনের বরের সঙ্গে যতটা মানায়। তারপরেও শিশির কয়েকবার গিয়েছে—মমতাকে দেখে নি, শ্বশুরবাড়িতে ছিল সে তখন। দেখা এতদিন পরে—নিশিরাত্রে স্টেশনের উপর মেয়ে কোলে এই অবস্থায়।

কুমকুমকে দেখিয়ে মমতা বলে, পুরবীর মেয়ে?

অশ্রুতে ভেজা-ভেজা গলা। বলে, আহা রে, এমন মোমেরপুতুল মেয়ে দুটো দিনও ভাল করে নেড়েচেড়ে গেল না হতভাগী!

হাত পাতল মমতা, আর কী আশ্চর্য—কুমকুম ঝাঁপিয়ে পড়ল কোলে। যেন মুকিয়ে ছিল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে অবধি একনাগাড় পুরুষমানুষের সাথেসঙ্গে রয়েছে—স্ত্রীলোকের কোলের আলাদা স্বাদ—স্ত্রীলোক হাত বাড়িয়েছে তো বর্তে গেল একেবারে।

মমতার পায়ের ধুলো নিয়ে শিশির বলে, এমন হয় না কিন্তু বড়দি, অচেনা মানুষ কেউ ওকে নিতে পারে না।

ঘুমটুম কোথায় গেছে মেয়ের, এতটুকু আড়ষ্ট ভাব নেই। হাসছে, মুক্তোর মতন দাঁত কয়েকটা ঝিকঝিক করছে।

মমতা বলে, অন্তর্যামী কিনা—এরা সব জানে, সব বোঝে। আপন-পর চিনিয়ে দিতে হয় না।

কচি মুখে চুমু খেয়ে বলে, চিনে ফেলেছ আমায়—উঁ? মাসি হই তোমার।

কুমকুমও পালটা কি যেন অবোধ্য আওয়াজ করে।

দেখলে? চিনেছে, 'মাসি' বলে ডাকল। তোমরা বোঝ নি, আমি ঠিক বুঝে নিয়েছি।

তারপর হেসে উঠে মমতা বলে, কিন্তু এটা কি হল ভাই? আমায় গড় করলে, কর্তাটি যে আশায় আশায় পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে বাদ দিলে কোন্ বিবেচনায়?

তাড়াতাড়ি প্রণাম সেরে শিশির কৈফিয়তের ভাবে বলে, ঠিক বুঝতে পারি নি বড়দি। মানে, দেখি নি তো এর আগে।

মমতা তবু রেহাই দেবে না: কী বুঝেছিলে বল তবে। রাত্রিবেলা বড়দি পরপুরুষ নিয়ে চরে বেড়াচ্ছে? মস্ত ধারণা দেখছি তো বড়দি'র ওপর।

কোণঠেসা হয়ে পড়েছে শিশির। মমতার স্বামী সুনীলকান্তি কথা ঘুরিয়ে দিল:

তুমি এখানে কোন্ কাজে, সেটা তো জানলাম না।

শিশির বলে, একটা বাড়ির খোঁজে এসেছিলাম। হল না। কলকাতায় ফিরব, তা ট্রেন সেই ভোররাত্রের আগে নেই।

মমতা বলে, ট্রেন এক্ষুনি যদি আসে তাহলেও যাওয়া হবে না। পেয়েছি যখন, ছাড়াছাড়ি নেই। বাড়ি আমাদের কাছে। কষ্ট হবে জানি, তাহলেও থেকে যেতে হবে।

(কষ্ট বই কি ! স্টেশনে মশার কামড়ে পড়ে পড়ে আরাম করতাম, সেই মহাসুখে বাগড়া দিচ্ছ বড়দি।)

সুনীলকান্তিও জুড়ে দেয় : নিতান্ত বিনয়ের কথা ভেবে না। কষ্ট সত্যিই। আর কিছু না হোক, না-খাওয়ার কষ্ট। নেমন্তন্ন-ফেরত আমরা—খেয়েদেয়ে বাড়ির সব অকাতরে ঘুমুচ্ছে। হয়তো বা মুঠো দুই মুড়ি-চিঁড়ে আর এক গ্লাস জল সেবন করে রাতের মতন শুয়ে পড়তে হবে।

(করুণাময় ঈশ্বর—পচা সিঙাড়ার স্থলে অযাচিত চিঁড়ে-মুড়ি ফলার জুটিয়ে দিলে !)

মমতা বলে, ওর অফিসের বন্ধুর মেয়ের বিয়ে। মাসের এই শনিবারটা অফিস বন্ধ। দুপুরবেলা বেরিয়েছিলাম—এখন সেই বিয়েবাড়ি থেকে ফিরছি। বাড়িতে আছেন আমার বুড়ো শাশুড়ি আর ছেলেপুলেরা সব। আর আমার ননদ আছে, সে-ও ছেলে-মানুষের মধ্যে পড়ে।

স্টেশনের বাইরে এসে পড়েছে তখন। এদিক-ওদিক তাকিয়ে মমতা ব্যাকুল ভাবে বলে, একটা রিক্সাও তো দেখা যায় না, কি হবে ?

সুনীলকান্তি বিশেষ আমল দেয় না : হবে আবার কি ! এইটুকু তো পথ—হেঁটে চলে যাব।

মমতা বলে, আমরা না হয় হাঁটলাম—কিন্তু জামাই ? জামাই হেঁটে যাবে সে কেমন ?

শিশির হেসে বলে, জামাইকে খোঁড়া ভেবেছেন বড়দি ! হাঁটিয়ে দেখুন আগে, তারপরে বলবেন। মেয়ে আমায় দিন বড়দি, আপনার কষ্ট হবে। পাড়াগাঁয়ে মানুষ, বোঝা কাঁধে চলা-ফেরা আমাদের অভ্যাস।

সোনার পদ্ম মেয়ে, তাকে বোঝা বলছ—ছিঃ ! পূরবী উপর থেকে দেখছে, মেয়ের হেনস্থা হলে সে কষ্ট পাবে।

মায়ের প্রাণ মমতার—সত্যিই সে চটে উঠেছিল। হেসে পরক্ষণে জিনিষটা লঘু করে করে নেয় : খুকু, তোমার নিন্দে করছে, বোঝা বলছে তোমায়। আর যেও না বাবার কোলে—কখনো না। ওমা, চোখ বড় বড় করে কেমন তাকিয়ে পড়েছে দেখ। বুড়ো-মানুষের মতো কান পেতে শোনা হচ্ছে। কী দুষ্টু—কী দুষ্টু রে বাবা ! মেয়ে নিতে চাইলে শিশির—নাও না, নাও দিকি কেমন পারো !

শিশির হাত পাতল। মেয়ের দৃকপাত নেই, দেখতেই যেন পাচ্ছে না। মুখ গুঁজে পড়ল মমতার বুকে। চাঁদ উঠে গেছে, বড় উজ্জ্বল জ্যোৎস্না। আপাতত নিশ্চিন্ত শিশির হাসি-গল্পে ওদের সঙ্গে গ্রামপথে চলেছে।

বাড়ি এসে পেঁছিল। পথ সামান্য, আধ মাইলও বোধহয় হবে না। কুসুমডাঙা গ্রাম—শহর হয়ে উঠছে, গাঁয়ের চেহারা তবু আছে বেশ এখনও।

জেগে আছিস রে ভোলা ?

দরজায় নাড়া দিতেই বুড়ো চাকর খিল খুলে দিল। বলে, কেউ ঘুমোয় নি খুড়ি-মা ছাড়া। কুরুক্ষেত্র করছে, দেখ গিয়ে।

হুল্লোড় কানে এলো। অন্যদিন কত আগে এরা ঘুমিয়ে পড়ে—আজকে মমতা বাড়ি ছিল না, মজাটা বড্ড জমেছে সেই জন্যে। মানুষের ইদানীং লড়াইয়ের মন-মরজি —ছেলেপুলেদেরও নতুন এক খেলা হয়েছে, লড়াই-লড়াই খেলা। দুই দলে ভাগ হয়ে ঘোরতর লড়াই করছে—রণক্ষেত্র মমতার শোবার ঘর। পাঁচ ছেলেমেয়ে মমতার—ননদিনী ঊর্মিলাকে বলে গিয়েছিল, সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে ছেলেপুলেদের সঙ্গে সে-ও শুয়ে পড়বে, হুটোপাটি না করে ঘুমোবে তাড়াতাড়ি। আর ভোলার উপর ভার ছিল, আলো জেবলে বাইরের ঘরে জেগে বসে থাকবে। ভোলার কাজ ভোলা ঠিকই করছে, কিন্তু কাণ্ড দেখ ঊর্মিলার—

মমতাই তখন আবার ননদের হয়ে বলে, যা বাঁদর ছেলেমেয়ে—সামলানো সোজা নয়। আমিই বলে হিমসিম খেয়ে যাই—এক ফোঁটা পিসিকে ওরা গ্রাহ্য করে কিনা !

সামলাবে কি—ঊর্মিই তো পালের গোদা। সেনাপতি এক পক্ষের। তুমুল বিক্রমে মার-মার রবে অস্ত্র নিয়ে শত্রুদল আক্রমণ করেছে। অস্ত্র পাশবালিশ এবং শত্রু হল জয়া, কেয়া আর পুনু অর্থাৎ পুণ্যব্রত—মমতার বড় ও মেজমেয়ে এবং ছোট ছেলে। ঊর্মির দলে অন্য দুটি—বড় ছেলে দেবু অর্থাৎ দেবব্রত, সর্বশেষ মেয়ে স্বপ্না। অস্ত্রের পিটুনি খেয়ে শত্রুপক্ষ রণক্ষেত্র থেকে পিঠটান দিয়েছে—একেবারে ঘরের বাইরে। ঠিক এমনি সময়ে মমতারাও সেই বারাণ্ডায়—

না ঘুমিয়ে লড়াই এখন রাত দুপুরে ?

রণক্ষেত্রে সেনাপতি পিছনে থাকে, এদের আইনটা ভিন্ন। আক্রমণে সকলের আগে স্বয়ং সেনাপতি। সেনাপতি ঊর্মিলা। শত্রু-তাড়নার ঝোঁক দাদা ভাজ ও আগন্তুক কুটুম্বমানুষটির সামনাসামনি একেবারে। হৃষ্টপুষ্ট শ্যামবর্ণের মেয়ে—আঁচল ফেরতা দিয়ে কোমরে বেঁধেছে, ঝুঁটি করে চুল বাঁধা, কাচের চুড়িগুলো খুলে রেখে দু-হাতে মাত্র দুগাছা গালার চুড়ি। স্বদেশী জেনানা-রেজিমেণ্ট হলে সেনাপতির সাজসজ্জা এমনি প্যাটার্নের হবে নিশ্চয়। ভোলা দরজা খুলে দিয়েছে, কথাবার্তা হল ভোলার সঙ্গে—সংগ্রামরত অবস্থায় এই সব সামান্য ব্যাপার কানে যাবার কথা নয়। থমকে দাঁড়িয়ে ঊর্মি জিভ কাটে।

তার উপরে মমতার টিপ্পনী : রণরঙ্গিণী সেজেছ ঠাকুরঝি—কুটুম্বকে ধরে নিয়ে এলাম, ভয় পেয়ে না পালায়।

ঊর্মিলা চকিতে এক নজর শিশিরের মুখ চেয়ে ছুটে পালাল। সৈন্যসামন্তরাও যাচ্ছিল, মমতার কোলে কুমকুমকে দেখে লুব্ধভাবে ঘুরে দাঁড়ায়।

জয়া বলে, কোথায় পেলে ও মা ? আমি একটু নেবো, আমার কোলে দাও।

জয়ার পিঠোপিঠি দেবু। বয়সে ছোট হলেও বেটাছেলে। সেই কর্তৃত্বে জয়াকে হটিয়ে দেয় : তুই নিবি কি রে ! একটা পাশবালিশ নিয়ে টলমল করিস—তোর জন্যেই তো হেরে মরলাম। আমায় দাও মা—

দাবীদার সব ক'টি, পাঁচ ছেলেমেয়ের কোনটি বাদ নেই। এমন কি তিনবছুরে মেয়ে স্বপ্নাও দেখ ঐ গুটিগুটি হাত বাড়িয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। ক্ষণকাল পূর্বে প্রচণ্ড লড়াই হয়ে গেছে—জওয়ান-জওয়ানীদের এখনও সেই লড়াইয়ের মেজাজ। কুমকুমের দখল নিয়ে দ্বিতীয় লড়াই বেধে যাওয়ার উপক্রম। এ হাত ধরেছে তো ও ধরেছে পা—বাহ

কেটে মমতা সরে যায় তো ছেলেমেয়েরা ছুটে এসে মাকে ঘিরে ধরে আবার।
কুমকুম মেয়েটাও বড় কম পাত্র নয়—দিব্যি মজা পেয়ে গেছে, হাসে কেমন খুটখুট করে।

অদূরে পুকুর। ধুতি-গামছা ও হেরিকেন নিয়ে সুনীলকান্তি বলে, হাত-পা ধুয়ে নেবে চলো। ক্লান্ত আছ—যা-হোক দুটি মুখে দিয়ে শুয়ে পড়বে।

তবু শিশির দাঁড়িয়ে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তৃপ্তিভরে দেখছে। *মেয়ে নিয়ে দুর্ভাবনার* অন্ত ছিল না। কষ্টে বিরক্তিতে এমনও মনে এসেছে—আপদ-বালাই *কাঁধ থেকে ছুঁড়ে* ফেলে দিই, আছাড় মেরে কান্না থামিয়ে দিই চিরকালের মতো। সেই মেয়ে অকস্মাৎ সাত রাজার ধন মাণিক—মাণিক একটুকু কাছে নেবে বলে হুড়োহুড়ি ছেলেপুলেদের মধ্যে—

রণবেশ খানিকটা সামলে দলপতি ঊর্মিলাও এইবারে এসে পড়ল, লজ্জা করে বেশি-ক্ষণ অন্তরালে থাকতে পারে নি। মুগ্ধ চোখে কুমকুমের দিকে তাকিয়ে বলে, টানাটানি করছে—তাতে যেন ওর বেশি মজা। দেখ বউদি, ঠোঁট টিপে হাসে কেমন চেয়ে দেখ। ভারি হাসকুটে মেয়ে, কাঁদতেই জানে না।

মমতা গাল টিপে বলে, আড্ডাবাজ মেয়ে। রাত দুপুর হয়ে গেছে, ঘুমের নামগন্ধ নেই চোখে।

উনুনে ধরিয়ে ভোলা ওদিকে রান্নাঘর থেকে ডাক দেয়ঃ এসো বউদি, হয়ে গেছে—

কী করছে দেখ একটুখানি কোলে নেবার জন্য। না, গণ্ডগোলে কাজ নেই, কেউ তোমরা পাবে না—

নিজ সন্তানদের তাড়া দিয়ে মমতা ঊর্মির কোলে মেয়ে দিল। বলে, ধরো ঠাকুরঝি। তোমার সাগরেদদের কাছে দিও না—কাড়াকাড়ি করে ফেলে মারবে। ভাত আছে হাঁড়িতে, ভাজা-মাছ ক'খানা একটু ঝোল করে দিই তাড়াতাড়ি—

কুমকুম ঊর্মির কোলে, মমতা রান্নাঘরে ঢুকে গেছে। দেবু খোশামোদ করেঃ দাও ছোটপিসি। ফেলে দেবো না, কক্ষনো না, দিয়ে দেখোই না একবার—

পিসির সঙ্গে একই দলে এতক্ষণ জীবনপণে লড়াই করেছে, তা বলে খাতির নেই। না—বলে ঝঙ্কার দিয়ে ঊর্মি পাক দিয়ে পিছন ঘুরল। সেদিকে জরা। মেয়ে নিয়ে উঠানে নামল তো সেখানেও ভিখারির মতন সব ঘিরে ধরেছে। একফোঁটা স্বপ্নাটা আবার তিড়িং-তিড়িং করে লাফাচ্ছে হাত বাড়িয়ে একটু ছুঁয়ে নেবার জন্য।

হেরিকেন উঁচু করে ধরে সুনীলকান্তি ডাক দেয়ঃ দাঁড়িয়ে কি দেখ? চলে এসো।

দাঁড়িয়ে শিশির দু-চোখ ভরে মেয়ের সমাদর দেখে। কোল থেকে মেয়েকে ঊর্মি মুখের সামনে তুলে ধরে বক-বক করছেঃ হাসলে তুমি মাণিক পড়ে, কাঁদলে তুমি মুক্তো ঝরে। তা কাঁদতেই তো জান না—মুক্তো আমাদের কপালে নেই। মাণিকই কুড়োবো তবে, কুড়িয়ে কুড়িয়ে পাহাড় জমাব।

কেয়াকে বলে, এই, ঠোঁট ফুলোচ্ছিস কেন? কী হবে কোলে নিয়ে? তার চেয়ে মাণিক কুড়িয়ে কুড়িয়ে তোল।

পনু বলে, মাণিক কোথায় ছোটপিসি?

দেবু বয়সে বড়, তায় পুরুষছেলে। বলে, দূরে বোকা! মাণিক না হাতী—মাণিক বুঝি মুখ থেকে পড়ে? পিসি এমনি এমনি বলছে।

ঊর্মি জোর দিয়ে বলে, সত্যি রে সত্যি। ঝাঁপাঝাঁপি না করে মাটির উপর নিচু হয়ে দেখ, দুটো-চারটে পেয়ে যাবি। রাত্তের বেলা না-ও যদি পাস, দিনমানে কাজ ঠিক পাবি।

এমনি সব কানে শুনতে শুনতে শিশির সুনীলকান্তির সঙ্গে পুকুরঘাটে চলল।

(কান্নায় কুমকুম কি পরিমাণ দক্ষ, সে খবর এরা কি করে জানবে? স্টেশনে মমতা যেই হাত বাড়িয়ে নিল, একটি বারও কাঁদে নি তারপর। ভুলে গেছে কান্না। থাপ্পড় কষিয়ে দিলেও বোধহয় কাঁদবে না। আমার মায়ের কোলে বসেও অমনি দুলে দুলে হাসত। মেয়েরা জাদু জানে, পলকে শিশু বশকরে নেয়। দশাসই পুরুষমানুষ— তাকেও একেবারে শিশু বানিয়ে ফেলে। পূরবী নিজে মানুষটা একফোঁটা—নিতান্ত এক শিশু বিবেচনা করে কত আমায় তাড়না করত!)

পায়ে ঠোক্কর খেল শিশির। সুনীলকান্তি বলে, আলো ধরে তো যাচ্ছি—দেখে পথ চলো ভাই।

হেসে শিশির বলে, আলোটা নিভিয়ে দিন বরঞ্চ। জ্যোৎস্নায় চারিদিক দিনমান— আলো এর মধ্যে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। দাঁড়িয়ে থাকার কী দরকার, বাড়ি চলে যান বড়দা। চান-টান সেরে আমি যাচ্ছি।

হাত-পা ধুতে এসেছিল, নিশ্চিন্ত আনন্দে শিশির অবগাহন-স্নান করল বেশ খানিক-ক্ষণ ধরে। বাড়ি ফিরে দেখে, রোয়াকে সতরঞ্চি পেতে কুমকুমকে বসিয়ে দিয়ে ঊর্মিলা ঠাঁই করছে শিশিরের জন্যে। মমতার পাঁচ ছেলেমেয়ে চতুর্দিক ঘিরে খেলা দিচ্ছে। এই একটু আগের সে কুমকুম নেই এখন—জ্যোৎস্নার মধ্যে যেন কোন রাজবাড়ির মেয়ে। কাজল পরিয়েছে চোখে, পাউডার বুলিয়েছে মুখে! পথের ধুলোময়লা-মাখা জামা ছাড়িয়ে বোধহয় স্বপ্নারই জামা একটা পরিয়ে দিয়েছে। পেটেও পড়েছে নিশ্চয় উত্তম কিছু—নইলে এতক্ষণ ধরে এত হাসি-স্ফূর্তি আসে না। ঘর-গিন্নি মারা যাবার দিন থেকেই ভোগান্তি—তাহলেও, বলতে নেই, স্বাস্থ্য মেয়ের অক্ষুণ্ণই আছে। একটুখানি এই যত্ন পেয়েছে—পালিশ-করা সোনার মতন অমনি ঝকমক করছে।

শিশির ডাকল: কুমকুম—

তাকিয়েও দেখে না মেয়ে। নতুন সঙ্গীদের নিয়ে মত্ত।

ঝড়ঝাপটা কাটিয়ে জাহাজ যেন বন্দরে নোঙর করেছে, রাত্রিটা আজ নিশ্চিন্তে ঘুমানো যাবে। কী আরাম, কী আরাম!

॥ একুশ ॥

স্বাতী এলো শ্বশুরঘর করতে।

এঁদো গলির ভিতরের সেই এঁদো-বাসাবাড়িতে নিতান্ত সাদাসিধে ভাবে—নিম্নবিত্ত গৃহস্থঘরের বউ যেমনধারা আসে। একটা ট্রাঙ্ক আর একটা স্যুটকেস মাত্র সঙ্গে—তৃতীয় জিনিষ নেই। গলির মোড়ে গাড়ি রেখে ড্রাইভার একাই দু-হাতে জিনিস দুটো পেঁাছে দিল।

ফুলশয্যা-বউভাত ঐ বাড়িতেই। গলিটা ঘিরে নিয়ে মানুষজনের বসবার জায়গা হল। মানুষ আর ক'জনই বা—বেশি লোক ডেকে সামাল দেয় কে! তারণ অথর্ব হয়ে পড়েছেন। প্রতিক্ষণ যাঁর কথা মনে পড়ছে, তিনি পূর্ণ মুখুজ্জে। সর্বকর্মে ধুরন্ধর —এ বাড়ির বড় সুহৃৎ ও শুভাকাঙ্ক্ষী। কলিকাতায় নেই তিনি, সুজাতার বিয়ের পর কাশীবাসী হয়েছেন। তিনি উপস্থিত থাকলে কাউকে কিছু দেখতে হত না। চিঠিতে তারণ সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছিলেন—কয়েকটা দিন এসে তাপসের বিয়ে দিয়ে

যাওয়ার জন্য। অত দূরে থেকে আসার নানান ঝামেলা। লিখেছিলেন অবশ্য, চেষ্টা করে দেখব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠল না। খাটাখাটনি-দৌড়ঝাঁপ কে করে—বিয়ের বর হয়েও তাপসের রেহাই হল না। সে আর পূর্ণিমা ভাইবোনে মিলে সমস্ত করল। শুভকর্ম চুকে গেল কোনরকমে।

হপ্তাখানেক পরে কিছু জিনিষপত্র এসে পড়ল কুটুম্ববাড়ি থেকে। বউভাতের দিন বিজয়া দেবী এসে মেয়ের সুবিধা-অসুবিধা লক্ষ্য করে গেছেন। ভালবেসে বিয়ে করেছে, কষ্ট সহ্য করতে মেয়ে গররাজি নয়। তবু ভিন্ন একভাবে মানুষ হয়েছে চিরকাল—মায়ের প্রাণ টনটন করে উঠল, নিতান্ত নইলে নয় এমনি কয়েকটা ফার্নিচার ও কিছু কাপড়-চোপড় পাঠিয়ে দিলেন। ভেবেচিন্তে কম-সম করেই পাঠিয়েছেন।

একটা দুটো রেখে বাকিগুলো পূর্ণিমা ফেরত দিতে চাইছে? জায়গা কোথা? কি স্বাতী, তোমার কি মত বলো।

স্বাতী উৎসাহ ভরে বলে, বটেই তো! জায়গা কোথা ছোড়দি?

কিন্তু যদি রাগ করেন?

স্বাতী নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বলে, আমরা নাচার। মায়ের কোন বিবেচনা নেই। এই জিনিষ ঘরে ঢোকাতে গেলে আমাদের তবে তো পথের উপর নেমে পড়তে হয়।

বিজয়া দেবী সেই বিকালেই চলে এলেন। মুখ কালো করে পূর্ণিমাকে বল্লেন, জিনিষ ফেরত না দিয়ে আমার বাড়ি গিয়ে দু-ঘা জুতো মেরে এলে পারতে। সে তবু বাড়ির মধ্যে গোপন থকেত, পথের লোকের কাছে জানান দেওয়া হত না।

পূর্ণিমা বলে, আপনি বড্ড রেগে আছেন মা। বসুন আগে, বলছি—

বসলেন না বিজয়া দেবী, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চলছে: যে জিনিষ পাঠিয়েছিলাম সব ক'টা স্বাতীর। নজর ফেলে দেখতে পারতে পুরানো জিনিষ—নতুন একটাও নয়। মেয়েটা ঘরে নিয়ে এলে, মেয়ের জিনিষ ক'টা নিতে পারবে না?

পূর্ণিমা পুনরায় বলে, বসুন মা, ঠাণ্ডা হোন—

ঘাড় বাঁকিয়ে বিজয়া দেবী বললেন, যা বলবার আছে বলো তুমি। শুনে যাই।

আমি একলা কিছু করি নি, আপনার মেয়ের কাছে জিজ্ঞাসা করে নিয়েছি। ছাতে আছে স্বাতী—ডেকে দিচ্ছি, তার মুখেই শুনে নিন।

মেয়ে কি বলবে—ঘাড় তুলে উল্টো কিছু বলবার তাগত আছে তার? বাড়ির ছেলে তাপসেরই বড় আছে! খবর কোনোটাই অজ না নেই। রোজগার করো বলে সকলকে কেঁচো করে রেখেছ তুমি।

এমন এমন শক্ত কথা, তবু পূর্ণিমা রাগ করে না। শান্ত হাসি-ভরা কণ্ঠে বলে যায়, আপনার বড্ড মনে লেগেছে মা, লাগবারই কথা। । কিন্তু নিরুপায় হয়েই করতে হল। এক-এক চিলতে ঘর—পা ফেলবারই জায়গা হয় না দেখতে পাচ্ছেন। এর মধ্যে জিনিষ এনে ঢোকালে মানুষের আর জায়গা থাকে না। মেয়ে এতদিন পালন করেছেন, মেয়ের জিনিষপত্তোর আরও কিছুদিন রাখতে হবে, যতদিন না বড় জায়গার সুবিধে হচ্ছে।

জায়গা তো হাতেই আছে, তার জন্যে আকাশ-পাতাল খোঁজাখুঁজি করতে হবে না। আমাদের নিউ আলিপুরের একটা ফ্ল্যাট খালি হয়েছে, তার পরে আর নতুন ভাড়াটে আসতে দিই নি। আজ কিছু স্পষ্ট স্পষ্ট কথা বলি, কিছু মনে করো না মা। এই ঘরে আটকে রেখে তাপসের ভবিষ্যৎ তোমরা নষ্ট করছ। চিকিচ্ছের চেয়ে ডাক্তারের ঠাট-ঠমক লাগে বেশি। বড়লোক পেসেন্ট যদি দৈবাৎ এখানে এসে পড়ে, কী ভাববে বল

দোষ। বাইরের মানুষ যারা একটাকা-দু'টাকার ডাক্তার ডাকে তারাই আসবে শুধু এখানে।

বিজয়া দেবী হঠাৎ চুপ করে গেলেন। চুপ করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে পূর্ণিমাকে দেখছেন। মুখভাবের একটুও বদল নেই, শক্ত মেয়ে বটে। বললেন, হুকুম যদি হয়, জিনিষগুলো নিউ আলিপুরের ফ্ল্যাটে পাঠিয়ে দিতে পারি। ভাল বই মন্দ থাকবে না সেখানে।

পূর্ণিমা বলে, হুকুম আমি দিলে হবে না। থাকবে আপনার মেয়ে-জামাই—তাদের কি মত জেনে নিন।

আমার মেয়ে—তার মতামত কি জিজ্ঞাসা করে জানতে হবে? জামাইর মতও আলাদা কিছু হবে না। অন্ধকূপে ইচ্ছে করে কে পড়ে থাকতে চায়? তবু কার ঘাড়ে ক'টা মাথা—তোমার সামনে তাই প্রকাশ করে বলতে যাবে। পাঁচখানা বড় বড় ঘর সেই ফ্ল্যাটে—শুধু মেয়ে-জামাই কেন, বেয়াইকে নিয়ে সবসুদ্ধ তোমরা থাকতে পারবে। আরামে থাকবে, এঁদো-বাড়িতে পচে মরবার কি দরকার।

পূর্ণিমা চুপ করে আছে।

বিজয়া দেবী অধীর কণ্ঠে বলেন, হ্যাঁ-না যা-হোক কিছু বলো। হুকুম শুনে চলে যাই।

পূর্ণিমা বলে, তাপস নেই, সে তো জানেন। পুরী থেকে ফিরুক—থাকতে হয়, ওরাই তো থাকবে। ওদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আপনাকে পরে জানাব।

রাগে গরগর করতে করতে বিজয়া দেবী চলে গেলেন।

॥ বাইশ ॥

কী ঘুম ঘুমাল শিশির—কত দিনের পরে। চড়া রোদ চারিদিকে। বাড়ির মানুষ উঠতে কারো বাকি নেই। ছেলেপুলের কলরব—কুমকুমও উঠে পড়ে ওদের সঙ্গে জমিয়ে নিয়েছে, হাসির ফুলঝুরি ছড়াচ্ছে।

বাইরে এসে দেখে, দাওয়ায় জলচৌকির পাশে জলের ঘটি, নিমের দাঁতন। সুনীলকান্তিকে দেখে বলে, মরে ঘুমিয়েছি বড়দা।

মুখ ধোওয়া সারা হতেই মমতা চা ও চিঁড়ে-ভাজা নিয়ে হাজির। শিশির উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, আপনার বাড়ি আনন্দনিকেতন। কী ভাল যে লাগল! সকালের দিকটা এখন বিস্তর ট্রেন—যাই এবারে বড়দি।

মমতা বলে, এক্ষুনি কেন ভাই। রবিবারে উনি আজ বাড়ি থাকবেন, থেকে যাও আজকের দিনটা। ধকল যাচ্ছে তো খুব, বিশ্রাম হবে।

শিশির বলে, যা বলেছেন। বড্ড কাতর হয়ে পড়েছি, বিশ্রামের দরকার। কিন্তু শুয়ে-বসে থেকে মনের উদ্বেগ যাবে না। বাতাসে ভাসছি, চেষ্টাচরিত্র করে মাটিতে পা রাখবার ব্যবস্থা করি—সেই সময় এসে দু-চারদিন থেকে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নেব।

মমতা জেদ ধরে বসল: রাত্রে একরকম উপোস গেছে। এবেলাটা অন্তত খেয়ে যাবে। তাছাড়া বাচ্চারাও কষ্ট হবে। কোথায় নিয়ে নিয়ে তুলবে—চান-খাওয়া ঠিকমতো হয় কি না হয়—

এতেই দরদ তবু তো বড়দির মুখ দিয়ে এমন কথাটা বেরুল না, রেখে যাও বাচ্চাকে

কয়েকটা দিন। একফোঁটা মেয়ে কতই বা তোমাদের খাবে! না হয় মূল্য ধরে দিতাম।

যাই হোক, প্রস্তাবটা মন্দের ভাল, সন্দেহ কি! দুপুরের ভোজও এখান থেকে চুকিয়ে গেলে সারাদিনের মত নিশ্চিন্ত। এবং কুমকুমের হাঙ্গামাও পুরো একটা বেলা কাটিয়ে যাওয়া যাবে।

কুটুম্বর আপ্যায়নে সুনীলকান্তি নিজে বাজার করে আনল। গাঁয়ের মানুষ শিশির, খায়-দায় ভাল—মেসের ঠাকুরের ঘ্যাঁট খেয়ে এই ক'দিনেই অরুচি হয়ে গেছে, কুটুম্বর বাড়ি আজ মুখ বদলানো যাবে। সিগারেট ধরিয়ে সুনীলকান্তি তক্তপোষে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল। বলে, তোমার ঠিকানাটা দিয়ে যেও। রোজই তো কলকাতা যাই, মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ হতে পারবে।

শিশির বলে, পাকা ঠিকানা কোথায় পাব বড়দা। তবে আর বলছি কি! মেসে ছিলাম একজনের বন্ধু হয়ে। তা আমায় যা-হোক করে সহ্য করত, কুমকুমকে সহ্য করল না। বাচ্চা থাকলে তাদের পাশার আড্ডার অসুবিধে হয়।

সকরুণ নিশ্বাস ফেলে ঃ কপাল ঠুকে আবার পথে বেরিয়েছি। যত বিপদ ঐ বাচ্চা নিয়ে। খালি হাত-পা হলে ভাবনাটা কি ছিল আমার!

এহেন সুস্পষ্ট ইঙ্গিতও সুনীলকান্তি বুঝে উঠতে পারে না। বাজারে মাছের বড় আকাল, সর্ষের তেল একেবারে মিলছে না, এইসব দুঃখ তোলে।

শিশির নিজের কথা বলে চলেছে, কেউ কিছু না বললেও মেসে অবশ্য থাকা চলত না। পাড়াগাঁয়ের মানুষ আমরা হট্টগোল সইতে পারি নে। বাসা করবই—আজ হোক আর দু'দিন পরে হোক। চাকরি একটা হবো-হবো করছে—ভেবেছিলাম চাকরিতে ঢুকে ঘোরাঘুরির দায়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে বাসায় উঠব। সেইটে হলে ভাল হত। ঠাণ্ডা প্রকৃতির বিশ্বাসী একটা মেয়েলোকের খোঁজ রাখবেন তো বাসার জন্য। কুমকুমকে যত্ন-আত্তি করবে, সংসারের সমস্ত ভার নিয়ে নেবে। ভুলবেন না বড়দা।

চাকরিব কথায় মুচকি হেসে সুনীলকান্তি বলে, হবো-হবো বুঝি চাকরি—নিয়ে নেবার অপেক্ষা? আছ তোমরা বেশ!

শিশির নিঃসংশয় কণ্ঠে বলে, দাস-কাকা স্বয়ং মুরুব্বি। এস, সি, দাম—রিহ্যাবিলিটেশন অফিসার। কণ্ট্রাক্টের লোভে বহু কোম্পানি এসে তেল দেয়। ওঁর কথায় যে-না সেই চাকরি দেবে। মফস্বলে পড়েছিলাম বলে গড়িমসি হয়েছে—নইলে কবে হয়ে যেত। এবারে আর অজুহাত নেই। দাম-কাকার অফিসেও ক'দিন গিয়েছি। বড্ড ব্যস্ত থাকেন, মানুষজনের আসা-যাওয়া—ভাল করে দুটো কথাই বলা যায় না। রবিবারে আজ বাড়ি আছেন—ভাবছি, শিয়ালদা নেমে সোজা তাঁর বাড়ি চলে যাব।

দেখতে পাবে, আলমারিতে সারি সারি চাকরি সাজিয়ে রেখেছেন। বাড়ি গেলে পছন্দ করে নির্ঘাৎ একটা নিয়ে আসতে পারবে।

হেসে ওঠে সুনীলকান্তি। হাসতে হাসতে ` `, পাড়গাঁয়ের সরল বুদ্ধির মানুষ—হিংসা হয় তোমাদের দেখে। দুনিয়া যদি এই বিশ্বাসের মর্যাদা দিত!

শিশির দৃকপাত করে না ঃ চাকরি দাম-কাকা দেবেনই। আচ্ছা, দেখবেন। চাকরি দেবেন কি আমাকে—যে-বাবার ছেলে আমি, তাঁরই নামে দিতে হবে। মেয়ে নিয়ে বিপাকে পড়েছি, কোনখানে রাখবার জায়গা পাচ্ছি নে, চাকরি না করে বাসা করি কোন্ ভরসায়—এ-সমস্ত অনেক বলেছি, পুরোপুরি বিশ্বাস করেন না বোধহয়। কলকাতায় বরাবর একলা এসেই তো দেখাসাক্ষাৎ করি—ভাবছি, কুমকুমকে নিয়ে তুলব আজ দাম-কাকার বাড়ি। চাক্ষুষ দেখিয়ে মোক্ষম দাওয়াই প্রয়োগ করে আসব।

স্টেশন অবধি রিক্সায় যাবে। ভোলা স্টেশনে গিয়ে রিক্সা নিয়ে এলো। খাইয়ে-দাইয়ে কুমকুমকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল, কাঁচা ঘুমে জাগিয়ে তুলে ঊর্মি রিক্সায় বাপের কোলে বসিয়ে দিল।

শিশিরের চোখে পলক পড়ে না : বাইরে আসুন ও বড়দি, একবারটি এসে দেখে যান। দেখুন, কী কাণ্ড ! আমার এই অস্থিত-পঞ্চক অবস্থা —আর ইনি যেন লাট-সাহেবের কন্যে, এমনিভাবে সাজানো হয়েছে। চলেছি চাকরির দরবারে—দরবারটা হল, চাকরির অভাবে বাচ্চা মেয়ের বিষম কষ্ট। এই কুমকুম কোন পুরুষে যে কষ্ট পেয়েছে, কে মানবে ? উল্টো ফল হবে বড়দি।

কপালের টিপ মুছে আঁচড়ানো চুল ছড়িয়ে দিল।

খবরদার !—গর্জন উঠল। গর্জন করতে গিয়ে হেসে ফেলে মমতা : দেখ ভাই, আমার ঠাকুরঝির কাণ্ড। আকুলিবিকুলি করছে-—ছটফট করছে কাটা-কবুতরের মতো। যত্ন করে সাজিয়েছে, সাজ ভেঙো না মেয়ের।

শিশির বলে, হ্যাংলা ভাব একটা দেখাতেই হবে দাম-কাকার সামনে। আচ্ছা, আপনাদের চোখের উপর কিছু করব না। ট্রেনের মধ্যে হতে পারবে। গায়ে এমন চকচকে জামা চলবে না তো—আসার সময় যে জামা গায়ে ছিল, দিব্যি সেটা ময়লা হয়ে আছে। যাক গে, এখানে কিছু নয়, অঢেল সময় আছে, ট্রেনের কামরায় নতুন করে সাজানো যাবে। আমাদের পাড়াগাঁয়ের আদি অকৃত্রিম সাজ।

ছুটির দিন বলে সতীশ দাম মাছ ধরতে গেছেন কোথা। সন্ধ্যায় ফিরবেন। সেই অতক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। কুমকুম আবার নিজ-মূর্তি ধরেছে কলকাতায় এসে। মুখে ছিপি এঁটে রাখো টফি দিয়ে—খোলা পেলেই কান্না। কান্না, কান্না, কান্না। এহেন কন্যা নিয়ে ভদ্রলোকের বাড়ি তোলপাড় করা যায় না—সারা বিকাল এ-রাস্তায় ও-রাস্তায় ঘুরেছে। ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছে হয়তো কোন বাড়ির রোয়াকের উপর। সেই বাউণ্ডুলে অবস্থা।

পথে ঘুরতে ঘুরতে ভাবছে, যদি দৈবাৎ মামা অবিনাশের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। সংসারে কত অভাবনীয়ই তো ঘটে। মামা না-ই হলেন—মামার গাঁয়ের কোন একজন, মামার কোন একটি সাগরেদ : আরে আরে, শিশির না ? শিশির তুমি এখানে—মামা-মামী তোমার জন্যে উতলা। মেয়ে বুঝি ! দেশে চিঠি লিখেছিলেন—মেয়ে নিয়ে কলকাতায় ভেসেছে, তা-ও জানেন ওঁরা। গাইগরু পুষেছেন এই মেয়ে দুধ খাবে বলে, নতুন কলোনিতে আলাদা একটা ঘরও বানিয়ে রেখেছেন।

কারো সঙ্গে দেখা হয় না। তেমনি কপাল কিনা শিশিরের !

মেয়ে ঘাড়ে করে ক্লান্ত অবসন্ন পায়ে এ-পথে সে-পথে ঘুরছে। আর চোখের জলে বারম্বার ডাকছে মামাকে। সংকটে পড়ে মানুষ যেমন ঈশ্বরকে মনে মনে ডাকে। সেই মামা তো ঈশ্বরই—আশৈশব যতটুকু তাঁর দেখা আছে, আর যতদূর শুনেছে তাঁর সম্পর্কে। স্বাধীনতার জন্য জীবনভোর লড়লেন, তারপরে যেদিন সেই বস্তু এসে গেল, অদৃশ্য গলিঘুঁজির জগৎ থেকে পিলপিল করে কারা সব বেরিয়ে এসে মসনদে কর্তা হয়ে উঠে পড়ল। তাদের স্বদেশপ্রেমে সভাক্ষেত্র সরগরম, তাদের ছবি আর বিবৃতির ভিড়ে খবরের কাগজে তোমাদের জন্য দু'ছত্র জায়গা হয় না। অন্তিমক্ষণে নিজের ভিটের উপর আত্মজনের মধ্যে শেষ নিশ্বাস মোচন করবে, সেটুকু সম্বলও ঘুচিয়ে দিল স্বাধীনতা এসে। হারো না যে মামা, চিরকাল গরব করে এসেছ ?

কে যেন সেই মামারই কণ্ঠে বুকের ভিতর থেকে বলে ওঠে, প্রতাপের বিরুদ্ধে আমরা

কাড়েছি—প্রতারণার সঙ্গে পারি নি বটে। রাজর্ষলিপসু অধৈর্য অদূরদর্শী যাদের একদা নেতার মাল্য দিয়েছিলাম, কিংবা পতিত জায়গা-জমির কাগজে-কলমে মালিক বলে যে লোকটাকে তোয়াজ করতে গিয়েছিলাম—রেহাই কেউ করল না, নিজ নিজ মুনাফার মওকা খুঁজেছে আমাদের মূল্যে। তা বলে হার-জিতের কথা এরই মধ্যে আসে কি করে? দেশের অদৃষ্টে অনেক দুর্দৈব—আদর্শ ও আত্মমর্যাদা নিভে গেলে যে অন্ধকার ঘেয়ে আসে, তাই।

দাম-কাকা কতক্ষণে ফেরেন সেই হল কথা। অতঃপর রাত্রিবাসের ভাবনা। মেস থেকে তাড়াল সর্বনাশী হতভাগী মেয়েটার কারণে। রয়্যাল বেঙ্গল হোটেল কোন্ মুলুকে তাই এবার খুঁজে বের করো। তারা জবাব দিলে স্টেশন ছাড়া গতি নেই।

ফিরলেন অবশেষে সতীশ দাম। অতিশয় ক্লান্ত, তাহলেও শিশিরকে ডেকে সমাদরে ড্রইংরুমে নিয়ে বসালেন। একদিক দিয়ে কিন্তু ভালো হয়েছে—সাজিয়ে-গুজিয়ে ঝুমকুমকে ঊর্মি চকচকে ঝক-ঝকে করে দিয়েছিল, বেল্লান্ত ঘোরাঘুরির ফলে সেই মেয়ের মনে হবে পঞ্চাশ বছর গায়ে তেল পড়েনি, একশ' বছর পেটে অন্ন যায় নি—পুরোপুরি একটি ঝাড়ো-কাক। ব্যাখ্যা করে বোঝাবার কিছু প্রয়োজন হল না। খুব আদর-যত্ন করলেন দামসাহেব—বাবুর্চিকে ডেকে পুডিং আনালেন ঝুমকুমের জন্য, ধরে ধরে খাইয়ে দিল সে। চায়ের নাম করে শিশিরকেও প্রচুর খাওয়ালেন। এবং বড় একটা কেক সঙ্গে দিয়ে দিলেন মেয়ের জন্য। কাজের কথাবার্তাও হল। দুটো দিন বড় ব্যস্ত —এই দু' দিন বাদ দিয়ে বুধবারে অফিসে এসো একবার।

কথাবার্তা দস্তুরমতো আশাপ্রদ। শিশুর কষ্টে দামসাহেব বিচলিত, মনে হল। ঠিক এই জিনিষটাই চেয়েছিল সে। মেয়ের জন্য উৎপাত অশান্তির সীমা নেই, তবে চাকরির দিক দিয়ে খানিকটা সুবিধা করে দিল বটে! এ-সমস্ত ভালো, রাত্রিবাসের চিন্তা এইবারে। খোঁজ করো কোন্ অঞ্চলে রয়্যাল বেঙ্গল হোটেল—শিয়ালদার কোন্ দিকে।

হোটেল-ম্যানেজারকে অমিতাভর চিঠি দিল। ম্যানেজার বলে, মুশকিলে ফেললেন। ঘর একটাও খালি নেই। একলা হতেন, দোতলার হলে একখানা তক্তাপোষ ঢুকিয়ে দিতাম একটা। মেয়ে ঘাড়ে করে এসেছেন, সে তো হবার জো নেই।

চিঠিতে অমিতাভ অধিকন্তু সুপারিশ করেছে হোটেল-চার্জের বিষয়ে কিছু বিবেচনা করতে। চুলোয় যাক সে-কথা—মোটেই মা রাঁধে না তায় তপ্ত আর পান্তা! শিশির বলে, অমিতাভবাবু তো শতকণ্ঠে আপনার প্রশংসা করেন—কলকাতা শহরে হোটেলের অন্ত নেই, ম্যানেজারও অগুন্তি। কিন্তু সুশিক্ষিত হৃদয়বান ম্যানেজার আপনি একমাত্র —দ্বিতীয় জন মিলবে না। মেঘ থমথম করছে, বৃষ্টি নামবে হয়তো এখুনি। এই অবস্থায় কোথায় যাই বলুন—বাচ্চা তাহলে বেঘোরে মারা পড়বে।

ইত্যাদি আমড়াগাছি অন্তে ম্যানেজার, দেখা গেল, চিন্তা করছে। ভেবেচিন্তে বলে, আমি ঐ ছোট কামরায় থাকি, ওখানেই থাকুন আজ রাত্রের মতো। বারান্দায় দারোয়ানের খাটিয়ায় কোনরকমে আমি কাটিয়ে দেবো। হোক তাই, কী করা যাবে! কাল তিনতলায় একটা ঘর খালি হবার কথা আছে। না হলেও, কী ব্যবস্থা করা যায় দিনমানে ধীরেসুস্থে ভেবে দেখা যাবে।

সকালবেলা সেই ম্যানেজারের ভিন্ন মূর্তি, চড়া মেজাজ। ঝাঁজের সঙ্গে বলল, ঘর-টর খালি হবে না মশায়।

শিশির করুণ কণ্ঠে বলে, তাহলে উপায়? আপনি আরো কী সব ভেবে দেখবেন বলেছিলেন।

ভেবেছি। রাত্রে অন্তত বার দশেক ঘুম ভেঙে উঠে ভাবা হয়েছে। অন্যত্র জায়গা দেখুন আপনি, রয়্যাল বেঙ্গলে সুবিধা হবে না। ঘরের মধ্যে দুয়োর এঁটে শুয়েছেন মশায়, আমি বিশ হাত দূরে বাইরের বারান্দায়—কান্নার গুঁতোয় আমাকেও মুহুর্মুহু ঘুম ভেঙে উঠে বসতে হয়েছে। তেতলার ঘর খালিও যদি হয়, আপনাকে সে-ঘর দিতে পারব না। সাফ কথা।

কুমকুমকে দেখিয়ে বলে, একফোঁটা তো মেয়ে—কান্না শিখেছে বটে! দমে কেমন করে কুলোয় কে জানে। এই মাল যতক্ষণ আছে, হোটেলে আপনাকে রাখতে পারব না। একটা লোকও তাহলে থাকবে না, হোটেল উঠে যাবে। এক্ষুনি অবিশ্যি যেতে *বলছি নে। সবাই কাজেকর্মে বেরিয়ে যাবে, এখন ততটা ভয় করি নে। ইচ্ছে হলে পুরো দিনমানটাই থেকে যেতে পারেন। কিন্তু রাত্রিবেলা, ওরে বাবা! রাত্রের আগেই* দয়া করে অব্যাহতি দিতে হবে।

জজের মতন রায় দিয়ে ম্যানেজার মাথা ঝুঁকে একটা হিসেব নিয়ে পড়ল। সকাতরে শিশির চেয়েই আছে, ঘাড় তুলে তাকায় না। তারপর হঠাৎ উঠে কোন্ কাজে সিঁড়ি বেয়ে উপরে চলে গেল। অর্থাৎ রায় যা দিয়েছে, কোনরকম আপিল তার উপরে চলবে না।

বিকালবেলা শিশির জামা-জুতো পরে মেয়ে আবার কাঁখে তুলল। অফিসে হিসাব মিটিয়ে দিতে গেছে। চলে যাচ্ছে বলেই বোধহয় ম্যানেজারের নরম সুর। বলে, মালের বন্দোবস্ত করে একলা চলে আসুন, আপনার মতন ভদ্রলোককে মাথায় করে রাখব। বন্দোবস্ত একটা তো করতেই হবে—সর্বক্ষণ মেয়ে সামলাবেন তো চাকরি-বাকরি করবেন কখন? আবার তা-ও বলি, বন্দোবস্ত বড় সহজে হবে না। পয়সাকড়ি দিয়ে লোক রাখলেন—চেল্লাচেল্লিতে মাথা খারাপ হয়ে কোনসময় বাচ্চার হয়তো গলা টিপে ধরবে। (বাপ হয়ে আমারই হাত নিশপিশ করে, মাইনের লোকে গলা টিপবে কী এমন কথা!) এক হতে পারে যদি বিয়ে করেন। তাই করে ফেলুন—

মুখের দিকে তাকিয়ে ম্যানেজার জোর দিয়ে বলে, এছাড়া উপায় দেখিনে মশায়। মাইনের ঝি দিয়ে হবে না—এত ধকল সাত-পাক-ঘোরা বউ-ই নেবে শুধু। আপনার অবস্থা দেখে মনটা বড় খারাপ হল, সারারাত খালি ভেবেছি। বাজারে সব জিনিষ অমিল, বিয়ের কনে কেবল যত খুশি পাওয়া যায়। আপনার এইটুকু বয়সে আজকাল তো একটা বিয়েই হয় না—বাহাদুর লোক আপনি, এরই মধ্যে এক পাট সংসারধর্ম চুকিয়ে-বুকিয়ে এসেছেন। তা একবারেই হাল ছাড়বেন কেন, দেখুন আবার একটা চান্স নিয়ে—

॥ তেইশ ॥

ঠুন-ঠুন করে রিক্সা এসে পড়ল, রিক্সার উপর শিশিরের কোলে কুমকুম। ছেলে-মেয়ে কে কোনদিকে ছিল, ঘিরে এসে দাঁড়াল। সকলের পিছনে খানিকটা দূরে ঊর্মি।

আর কুমকুমের কাণ্ড দেখ এদিকে। রিক্সা থামানোর সবুর সয় না, মেয়ে আঁকু-পাকু করছে নেমে পড়বার জন্য। স্টেশনে নেমেও আচ্ছা একচোট কেঁদেছে, চোখ ভিজে-ভিজে এখনো। ভিজে দুটো চোখের দৃষ্টি ছেলেপুলে সকলকে ছাড়িয়ে পিছনে যে মানুষ তারই দিকে। ঊর্মিও ছুটে তখন রিক্সার কাছে চলে আসে। কুমকুম

ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। খিলখিল করে কী হাসির ঘটা! ভিজে চোখের উপর হাসি ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছে।

মমতা কি কাজে ছিল, সাড়া পেয়ে বেরিয়ে এলো। শিশির বলে, মেয়ে সঙ্গে নিয়ে এদেশ-সেদেশ করে বেড়িয়েছি—কান্নাকাটিও করে। আপনাদের কাছে ছিল পুরো দিনও নয়—তার ভিতরেই কী মায়া করেছেন, ধুন্ধুমার লাগাল এখান থেকে গিয়ে। এতদূর আগে দেখি নি কখনো। হোটেলের ম্যানেজার সারা রাত্তির কাল দু'চোখ এক করতে পারে নি। বাঘ মানুষের রক্তের স্বাদ পেলে আর কিছুতে তৃপ্তি পায় না শুনেছি—হাউ-মাউ-খাউ করে হামলা দিয়ে বেড়ায়। এ জিনিষও প্রায় তাই। ফেরত এনেছি, সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা—কান্না-টান্না গিয়ে হাসির লহর বয়ে যাচ্ছে ঐ দেখুন। আপনারা বিশ্বাসই করেন না, কাঁদতে পারে এ মেয়ে।

মমতা হেসে উঠে ঊর্মিকে দেখায়ঃ ধরেছ ঠিক। মায়াবিনী আছে একটি এ বাড়িতে—আমার ঐ ননদটি। ছেলেপুলে পলকের মধ্যে বশ করে ফেলে। দুঃখের কথা কি বলি ভাই, আমারই পেটের ছেলেমেয়ে সব পর করে নিয়েছে। পিসির পিছু পিছু তারা সর্বক্ষণ—শতেকবার ডেকে তবে কাছে আনতে হয়। তোমার কুমকুমের উপরেও ঠাকুরঝি মায়া খাটিয়েছে।

শিশির উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলঃ সংসারে এখনো মায়া-মমতা আছে, সুখ আছে, শান্তি আছে, ভুলে গিয়েছিলাম বড়দি। সে জিনিষ একফোঁটা মেয়ে দিব্যি কেমন ধরে ফেলল—আমায় চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে তবে ছাড়ল। কাঁদে, আর কাটা-কবুতরের মতো আছাড়ি-পিছাড়ি খায়—কি করি, উপায় খুঁজে পাই নে। শেষটা মনে হল, বড়দি'র ওখানেই ফেরত নিয়ে দেখি। ঠিক তাই। অবোলা শিশু মুখে তো বলতে পারে না, ভালবাসার জায়গা ছেড়ে এক পা নড়ব না—কান্না দিয়ে বোঝায়।

মতলবটা ঠারে-ঠোরে ব্যক্ত করে মমতার দিকে তাকায়। মমতা কি বলে, প্রতীক্ষা করে আছে। মমতার দৃষ্টি তখন অন্য দিকে। রিক্সা করে শুধুমাত্র মেয়ে আনে নি, এক গাদা জিনিষপত্র কেনাকাটা করে এনেছে। রিক্সাওয়ালা সেগুলো নামিয়ে রাখছে। মস্ত এক হাঁড়ি ভর্তি রাজভোগ—

সোল্লাসে মমতা বলে, চাকরি হল বুঝি?

হয় নি ঠিক এখনো—

মমতা মুষড়ে গিয়ে বলে, মিষ্টি দেখে ভাবলাম চাকরি হয়ে গেছে, মিষ্টিমুখ করাতে এসেছ আমাদের।

শিশির বলে, চাকরি হয় নি বটে, কিন্তু না হয়ে আর উপায় নেই। এতাবৎ অফিসে গিয়ে কাঁদাকাটা করতাম, দাম-কাকা হুঁ-হাঁ দিয়ে যেতেন। কাল মেয়ে সশরীরে বাড়ি নিয়ে তুললাম। মেয়ে নয়, আমার পাশুপত অস্ত্র—মোক্ষম কাজ দিয়েছে।

রসিয়ে-রসিয়ে শিশির সেই গল্প করছেঃ

সতীশ দামের ড্রইংরুমে সোফার উপর কুমকুমকে বসিয়ে দিয়েছে। দেশ-ভুঁই ছেড়ে পাকাপাকি এসেছি কাকাবাবু, কোন্ ঘরটা নেবো দেখিয়ে দিন। বলি, আর তাকিয়ে-তাকিয়ে মনোভাবের আন্দাজ নিই। আজকে দাম-কাকা মস্তবড় পজিসনের লোক, দেড়খানা মুখের অন্ন জোগানো তাঁর পক্ষে কিছুই নয়। বাড়িতে জায়গাও ঢের—নিচের তলায় দুটো-তিনটে ঘর, বারো মাস খালি পড়ে থাকে। আসল বিপদটা হল, একটা গেঁয়ো লোক বোঁচকাবুঁচকি নিয়ে উঠবে, আপনলোক বলে যার-তার কাছে পরিচয় দিয়ে বেড়াবে, কাকার তাতে মাথা কাটা যায়। অথচ যে-মানুষের ছেলে আমি—

সেকালের কথা মনে করে মুখের উপর দরজা বন্ধ করতেও পারেন না। মুখ শুকিয়ে আমশিপানা হয়েছে দেখলাম—

মিষ্টি ছাড়াও আরো নানান জিনিষ—তিন রকমের বেবি-ফুড তিন কৌটো, কেক, টফি এক বাক্স, কুমকুমের জামা-জুতো। টফির বাক্স তুলে ধরতে ছেলে-মেয়েরা ঘিরে দাঁড়াল। শিশির মুঠো-মুঠো টফি দিচ্ছে ওদের হাতে। গল্প চলেছে সমানে :

দাম-কাকার তো আমশিপানা মুখ। মুখ দেখে কষ্ট হল। সোফা থেকে মেরে তুলে নিয়ে এক হপ্তার সময় দিয়ে চলে এলাম : কষ্টে-সৃষ্টে এই সাতটা দিন কাটিয়ে দেবো, তারপরে কিন্তু ছাড়াছাড়ি নেই কাকা। ট্যাঁক ফাঁকা। দেশ থেকে সামান্য যা-কিছু নিয়ে বেরিয়েছিলাম, বর্ডারের মুখে সবই প্রায় কেড়েকুড়ে নিল। কাছায় বাঁধা নোট ক'খানা ছিল, মেস-খরচা দিয়ে তা-ও খতম হয়ে গেছে। হপ্তার ভিতরে চাকরি হল তো হল—নইলে আপনার বাড়ি ছাড়া গতি নেই। কাকার এমন অট্টালিকা থাকতে সত্যি তো আর পথে পড়ে মরতে পারি নে। শাসানিতে ভয় ধরে গেল দাম-কাকার—পরশু দিন যেতে বলেছেন। ঐ দিনে নির্ঘাৎ কিছু হয়ে যাবে।

মমতা ভর্ৎসনা করে বলে, কী তোমার বুদ্ধি-বিবেচনা! ট্যাঁকের ঐ অবস্থা—এত সব কিনে খামোকা টাকাগুলো নষ্ট করে এলে কেন?

অবস্থা সত্যি কি আর খারাপ?

হাসতে-হাসতে শিশির বলে, দাম-কাকাকে ধাপ্পা দিয়ে এলাম। নয় তো চাড় হবে কেন? মামার কলোনিতে ঘরবাড়ি হবে বলে সর্বস্ব ঘুচিয়ে এক কাঁড়ি টাকা হুণ্ডি করে নিয়ে এসেছি। কলোনি পুড়ে গিয়ে ঘর বাঁধতে হল না—সে টাকা পুরোপুরি মজুত। রীতিমত ধনীলোক আমি। খোঁজ নিন গে, রাজরাজড়ার ট্যাঁকও এত দূর ভারী নয় এই স্বাধীন ভারতে।

হেসে বলছে শিশির, মমতার মুখে কিন্তু একফোঁটাও হাসি নেই। বলে, রাজরাজড়া হও, যা-ই হও, টাকা নষ্ট করা ঠিক নয়। কাঁচা বয়সে এই পথে-পথে ঘোরা চিরকাল কখনো চলবে না। মামার কলোনিতে না হয়েছে, ঘর তো হবেই কোন একদিন—

লুফে নিয়ে শিশির বলে, হতেই হবে। কোন একদিন হবে বলে ঠেলে রাখলে হবে না—এক্ষুনি, দু-দশ দিনের ভিতর। মেসে ছিলাম। হাটুরে হট্টগোলে থাকা অভ্যেস তো নেই—ক'টা দিনেই প্রাণ ওষ্ঠাগত। ঠাঁই না পেয়ে আবার সেইখানে যেতে হচ্ছে। চাকরি হোক ভাল না হোক ভাল, জুতমত একটা ঘর পেলেই বাসা করে ফেলব। করতেই হবে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে।

কথা তোলবার ফাঁক এসে গেছে—এ সুযোগ শিশির ছেড়ে দিল না। বলে, মরিয়া হয়ে ঘর খুঁজছি, বাসা করবই। যে ক'টা দিন বাসা না হচ্ছে—আপনার কাছে একটু দরবার নিয়ে এসেছি বড়দি।

মমতা বলে, সেটা বুঝেছি। বাচ্চার জন্যে জামা-জুতো, কৌটো-কৌটো বেবি-ফুড—আমাদের গরিব ঘরের ছেলেপুলে সাদামাটা গরুর দুধ খায়, রাজার কন্যের কৌটোর দুধ ছাড়া চলে না।

হাসিমুখে উপহাসের ঢঙে বলে যাচ্ছে। শিশির হাঁ-হাঁ করে ওঠে : ছি-ছি, একলা কুমকুমের জন্য এনেছি বুঝি! যা দিনকাল, কখন কোন্ জিনিষের আকাল এসে পড়ে ঠিক-ঠিকানা নেই। অভাব হলে বড়রা অনাহারে থাকতে পারে, ছেলেপুলে তা পারবে না। তাদের জন্যে দুধের জোগাড় কিছু অন্তত রাখতে হয়।

মমতা চুপচাপ। এ তো ভারি মুশকিল—আরজি ঠিক ঠিক পৌঁছে গেছে, রায়

তবে কি জন্য বেরোর না ? শিশির বলে, কাল থেকে মেয়েটা যা কাণ্ড লাগিয়েছে—এবাড়ি ছাড়া কোনখানে তাকে ঠাণ্ডা রাখা যাবে না, মরেই যাবে কাঁদতে-কাঁদতে। অসুবিধা আপনাদের বুঝতে পারছি বড়দি—

কাতর সুরে ইনিয়ে-বিনিয়ে বলে যাচ্ছিল। মমতা থামিয়ে দেয় : অসুবিধা কী আর এমন। আমার ছেলেমেয়েরা রয়েছে, তাদের সঙ্গে থাকবে। (রায় মিলে গেছে—ঈশ্বর তুমি করুণাময়!) যদ্দিন ঊর্মি আছে, ছেলেপুলে নিয়ে আমার সংসারে ঝামেলা নেই। এই যে এনে নামিয়ে দিলে—টের পাচ্ছ এ বাড়িতে আছে তোমার মেয়ে ? পাঁচ-পাঁচটা ছেলেমেয়ে আমার—সাড়াশব্দ পাও ?

সন্ধ্যার পর অফিস-ফেরতা সুনীলকান্তি এসে পৌঁছল। রায় পাওয়া গেছে, নির্ভয় এখন শিশির। বাড়ির কর্তাকে তবু একবার সরাসরি বলা দরকার—না বললে দোষের হয়।

হাতমুখ ধুয়ে একটা রাজভোগ গালে ফেলে সুনীলকান্তি বারান্দায় এসে বসল।

শিশির বলে, চাকরি হয়ে যাচ্ছে বড়দা।

হয়ে যাক, তারপরে বোলো। কঞ্জুসের বাড়ির ভোজ খাওয়া—না আঁচালে বিশ্বাস নেই!

এবারে ঠিক হবে। এই হপ্তার ভিতরেই। বাসা খুঁজছি। ঘর পাওয়া এত মুশকিল কলকাতায়! পেলেই বাসা করে ফেলব। সেই ক'টা দিন কুমকুমকে এখানে রেখে যাচ্ছি।

সে কেমন করে হয়! সুনীলকান্তি আকাশ থেকে পড়ে : বৃহৎ সংসার আমার, আর এই তো সামান্য একটু জায়গা।

শিশির বলে, আমি থাকছি নে, ভোরে উঠে চলে যাব। বাচ্চার জন্যে কত আর জায়গা লাগবে! এখানে আদর-যত্ন পেয়ে কী রকম যে গছে গেছে—

সুনীলকান্তি কথা পড়তে দেয় না : ও কিছু নয়। ছেলেপুলের মজাই তো এই। বাচ্চা পোষা—যে খাঁচায় রাখবে, সেখান থেকে নড়তে চাইবে না। আমার এখানে ভাই নানান অসুবিধা, অন্য জায়গা দেখ।

বড়দি কিন্তু বললেন, অসুবিধা কিছু হবে না।

ও, পারমিশন হয়ে গেছে। তবে আর আমায় কি জন্যে বলছ ?

মুখ কালো করে সুনীলকান্তি ঘরে ঢুকে গেল। এবং মুহূর্ত পরেই বচসা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে। শব্দ-সাড়া করে হচ্ছে গোপন কিছু নয়।

এই বাজারে একটা পাখি পোষা যায় না—কোন্ আক্কেলে তুমি হাঁ বলে দিলে? কী দুটো ছাই-ছাতু হাতে করে এসেছে, আর বড়দি করে দুবার মিষ্টি বচন ঝেড়েছে—গলে অমনি জল!

মমতা অভিমানের সুরে বলে, আমার বাপের বাড়ির সম্পর্ক বলেই তুমি এই রকম করছ।

সুনীল বলে, সম্পর্ক তো ঝগড়া বিবাদ আর মামলা-মোকদ্দমার! —তোমার বাবা আর ওর শ্বশুরের মধ্যে মুখ দেখাদেখি ছিল না—কোন্ খবরটা না জানি আমি ?

বাড়ির এত জায়গা থাকতে কলহের ক্ষেত্র এই ঘরটা কেন হল ? এবং দাম্পত্য কলহ, ফিসফিস করে না হোক, কিঞ্চিৎ চাপা গলায় কেন হল না ? ইচ্ছা করেই শিশিরকে শোনাবার জন্য। কিন্তু শুনছে না শিশির—নিরুপায়, নিরুপায়—শুনে কোন সুরাহা হবে ? মারো আর ধরো আমি পিঠ করেছি কুলো, বকো আর ঝকো আমি কানে দিচ্ছি

তুলো। তোমরাও যদি বিদেয় করো, মেয়ে তাহলে গঙ্গার জলে অথবা চলন্ত ট্রেনের চাকার নিচে ছুঁড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কলহ করে যতই গলা ফাটাও, শুনতে আমি পাব না। কান অকস্মাৎ কালা হয়ে গেছে।

খুব ভোরে উঠে মমতার সঙ্গে দু-এক কথা বলে শিশির পালাবে। সুনীলকান্তি দেরিতে ওঠে, সে উঠে পড়বার আগেই। মেয়ে রেখে বেরিয়ে যেতে পারলে ভাল-মন্দর দায়ী তারপর ওরাই। এক কথায় তখন আর তাড়ান চলবে না।

মনে মনে এমনি এক মতলব ভেঁজে রেখেছিল। কিন্তু গ্রহবৈগুণ্যে আজকে সুনীল ভোর থাকতে উঠে পড়ল। শিশিরের বুকের মধ্যে ধড়াস-ধড়াস করছে। না, মোলায়েম সুর। কুমকুমকে জাগিয়ে তুলে কাঁধে নিতে বলছে না। বলে, আরে ভাই, ঝামেলার কী দরকার? মামার কলোনি না-ই যখন পেলে দেশে-ঘরে ফিরে যাও না আবার। মাথার দিব্যি কে দিয়েছে। বলি পাকিস্তানে কি মানুষ থাকে না। এসে পড়েছ মেয়ে নিয়ে, এত করে বলছ—আত্মীয়ের বিপদকে দেখা নিশ্চয় উচিত। কিন্তু ছা-পোষা মানুষ, আমার দিকটাও দেখবে তো। এই মাসটা কেবল রাখছি—মাসের উপরে আধখানা দিনও আর নয়। বাসা হোক চাই না হোক, মেয়ে নিয়ে যেতে হবে। শুনতে কটু লাগছে তোমার, কিন্তু দাতাকর্ণ না-ই যদি হতে পারি কি করা যাবে বল।

এত দূর নেমেছে, রাত্রে শুয়ে শুয়েও তবে স্বামী-স্ত্রীর কলহ চলেছে। শিশির ভক্তি ভরে বড়দার পায়ে প্রণাম করল।

॥ চব্বিশ ॥

এক্সপোর্ট সেকশনের বড়বাবু নটবর হোড় ছাতা ও কাঁধের চাদর যথারীতি বেয়ারার হাতে দিয়ে চেয়ার নিলেন। ছাতার গায়ে চাদর বিড়ে করে পাকিয়ে বেয়ারা আলমারিতে ঢোকাল। দুর্গা-খাতা বের করে নটবর ভক্তিভরে মাতৃনাম লিখছেন। শ্রীদুর্গা-শ্রীদুর্গা—এমনি একশ' আটবার। উপর থেকে নিচে আবার নিচে থেকে উপরে দু'বার গুণে নিঃসংশয় হলেন, একশ-আটই বটে। খাতা কপালে ঠেকিয়ে তুলে রাখলেন, আবার কাল লাগবে। পকেট থেকে পানের কৌটো বের করে ড্রয়ারে ঢোকালেন।

কাজের মানুষ, এক মিনিটের অপব্যয় ধাতে সয় না। বেয়ারাকে বললেন, ভবতোষবাবুকে ডাক। ভাইজাগের ফাইলটা হাতে নিয়ে আসবেন।

পুরানো বহুদর্শী বেয়ারা—একা ভবতোষ নয়, অনিল, দ্বিজদাস, হীরেনবাবু মাখন—বাছাই-করা বাবু ক'টিকে যথাযথ ফাইল সহ দর্শন দেবার কথা বলে এলো। বাবুগণ ততোধিক বহুদর্শী—বিনা ফাইলে শূন্য হাতে এসে পড়ল সকলে—এদিক থেকে, ওদিক থেকে এক-আধটা চেয়ার টেনে কাছাকাছি বসে পড়ল।

ভবতোষ কেবল দাঁড়িয়ে। বলে, পানের কৌটো কোথায় দাদু? ছাড়ুন।

বিনা বাক্যে নটবর কৌটো বের করে ধরেন। যার যেমন অভিরুচি খিলি নিয়ে নিল। নিত্যিদিন এই রকম করে চলে, খিলি দানে নটবরের কৃপণতা নেই। অফিসসুদ্ধ লোকের যেন দাবি জন্মে গেছে নটবরের খিলির উপর।

নটবর শুধান: তারপর ভবতোষ, মাছুড়েদের খবর কি? চারে তো ঘাই মারছে, বড়শিতে গাঁথল কিছু?

প্রশ্নটাও মামুলি। ইদানীং রোজই এইরকম প্রশ্ন। স্ত্রীলোক যে ক'টি অফিসে

কাজ করছেন, তাঁদের নিয়ে রং-তামাসা। সত্যি-মিথ্যে কিছু টাটকা খবর নটবর সংগ্রহ করে এনেছেন, সেই মাল ছাড়বার মুখে গৌরচন্দ্রিকা। তারই লোভে ভিড় করে এসেছে নটবরের বশংবদ সাগরেদগুলি।

ভবতোষ খোশামোদ করে বলে, আমরা কি জানি দাদু, খালি চোখে কতটুকুই বা দেখা যায়! লং-সাইটের চশমায় নতুন কি দেখে এসেছেন বলুন তাই।

নটবর চেয়ারের উপর দুই পা তুলে আসনপিঁড়ি হয়ে বসলেন। কৌটো থেকে এতক্ষণে দুটি আঙুলে আলগোছে দুই খিলি তুলে মুখে ফেললেন। কপকপ করে চিবোচ্ছেন।

এইবার—গৌরচন্দ্রিকা শেষ হয়ে কথারম্ভ এইবারে। উৎকর্ণ হয়ে আছে মানুষ ক'টি—

রসভঙ্গ অকস্মাৎ। ডেপুটি-ম্যানেজারের আরদালি এসে হানা দিল: সাহেব সেলাম দিয়েছেন।

যমরাজের ডাকও এর চেয়ে জরুরি নয়। তটস্থ হয়ে নটবর উঠে পড়লেন। চিবানো পান থুঃ-থুঃ করে ফেলে দিয়ে মুখ মুছে পলকের মধ্যে সাহেবের কামরায়।

টেবিলের বিপরীত দিকে অচেনা এক ছোকরা বসে আছে। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে এক নজর তার দিকে চেয়ে যথারীতি হাত কচলে নটবর উপরওয়ালার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন: স্যার—

সাহেব বললেন, চাটুজ্জের জায়গায় লোকের কথা বলছিলেন—এঁকে নেওয়া হল। শিশিরকুমার ধর। মফস্বলে ছিলেন, করতেন মাস্টারি। অভিজ্ঞতা কিছুই নেই, গোড়া থেকে তৈরি করে নিতে হবে।

গোবেচারা চেহারা—মফস্বলের লোক, সেটা বলে দেবার দরকার ছিল না। সেই লোক আচমকা উদয় হয়ে তা-বড় তা-বড় উমেদারের কান কেটে ছেড়ে দিল—এত বড় জিনিষ অমনি হয় না। পিছনে তদ্বির রীতিমত। দেখতে যত হাবাগবাই হোক, লোকটা তদ্বির-সম্রাট।

ডেপুটি সাহেব আবার বলেন, ঠিক যে চাটুজ্জের কাজটুকু, তা নয়। ফ্যাক্টরির সঙ্গে আমাদের অফিসের যোগাযোগ ঠিকমতো থাকে না। অর্ডার বুক করে দেখা যায় মালের অকুলান! মিস্টার ধরের বিশেষ কাজ হবে এইটি। মাঝে মাঝে ফ্যাক্টরিতে চলে যাবেন। খোঁজখবর নিয়ে জানাবেন, তারিখ-মতো কোন্ কোন্ জিনিষের সাপ্লাই হওয়া সম্ভব, কখন কোন্ আইটেম তৈরির উপর জোর দিতে হবে। আপনি পুরানো লোক—ভার দিচ্ছি, আপনাকেই শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে।

সবেগে ঘাড় নেড়ে নটবর সায় দিলেন: শিখতে মানুষের ক'দিন লাগে। ঠিক হয়ে যাবে স্যার, কোন চিন্তা নেই। আজকে হল দোসরা তারিখ—আসছে মাসের দোসরা এই মানুষটিকে একটিবার বাজিয়ে দেখবেন। চৌকোস করে দেবো। পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে নুন খাচ্ছি, কত নিরেশ তরিয়ে দিলাম।

ডেপুটি হেসে বললেন, সে তো জানিই। সেই জন্যেই তো আপনাকে ডেকে আপনার হেপাজতে দিয়ে দিচ্ছি।

অতএব এতদিনে চাটুজ্জে মশায়ের জায়গায় উপযুক্ত লোক মিলল। দেহ রেখেছেন তিনি পাক্কা দেড়টি বছর। এমন চাকরিটা খালি পড়ে আছে এতকাল, ত্রিভুবন তোলপাড় হয়েছে বুঝতেই পারছেন। ভিতর থেকে, বাইরে থেকে। নটবরের নিজের সেকশন—আদাজল খেয়ে লেগেছিলেন তিনি শালার ছেলেটির জন্য। ভাগনেকে যা-হোক করে

ঢুকিয়ে নিয়েছিলেন—শ্বশুরবাড়ি তার জন্য মুখ দেখানোর জো নেই, শালা-শালাজ খোঁটা দেয়। বিস্তর রকমে লড়ে দেখেছেন নটবর, কিছুতে কিছু হল না। ভারি নাকি শক্ত কাজ, চাটুজ্জের স্থলে তাঁরই মতন ভারিক্কি লোকের আবশ্যক—

হত কিনা দেখে নিতাম আজ যদি হার্বার্ট সাহেব ঐ চেয়ারে সশরীরে থাকতেন। নেটিভের মধ্যে চিনতেন শুধু এই অফিসের লোকগুলো। চাকরি খালি হলে অফিসের লোকেই ভাই-ব্রাদার এনে সাহেবের সামনে ঠেলে দিত, সাহেব যাকে খুশি নিয়ে নিতেন। এখনকার এই দেশি সাহেবদের হরেক জানাশোনা, একশ গণ্ডা খাতির-উপরোধের দায়। উপযুক্ত লোকই বাছাই হল শেষ পর্যন্ত—ভারিক্কি চাটুজ্জের স্থলে চ্যাংড়া ছোঁড়া, মফস্বলের মাস্টার, কলকাতা শহর সম্ভবত এই প্রথম তার চর্মচক্ষে পড়েছে। নিগূঢ় রহস্য আছে, সন্দেহ কি!

কিন্তু মুখের চেহারায় মনোভাব তিলেক প্রকাশ পাবে না। তাহলে আর পঁয়তাল্লিশ বছরের চাকরি কিসের? একমুখ হাসি। ডেপুটির কামরা থেকেই সাহস দিতে-দিতে শিশিরের হাত জড়িয়ে ধরে বেরুলেন: কিছু ভেবো না ভাই। আমি যখন রয়েছি, ভুলচুক সেরে-সামলে নেবো। কোন দায় ঠেকতে হবে না। পঁয়তাল্লিশ বছরের চাকরি আমার—কেয়ার-টেকার হয়ে ঢুকেছিলাম, সেকশনের বড়বাবু এখন। উপরওয়ালার কী খাতির, দেখলে তো চোখের উপর। আমার হাতে সঁপে দিলেন—কত বড় আস্থা থাকলে এ জিনিষ হয়। হচ্ছেও এই প্রথম নয়। গরু-গাধা যা হোক একটা ঢুকিয়ে নিয়ে আমার উপরে ফেলে দেন—দাদাবাবু, এটাকে ঘোড়া বানিয়ে দিন।

জিভ কেটে তাড়াতাড়ি বলেন, তোমায় বলছি নে ভায়া। তুমি তে মানুষ হে—পুরোদস্তুর মানুষ। লেখাপড়া কদ্দুর করেছ?

শিশির সবিনয়ে বলে, বি-এ পাশ করে এম-এ ক্লাসে ভর্তি হয়েছিলাম। দেশ ভাগা-ভাগির গোলমালে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে হল।

বিস্ময়ে নটবরের আর্তধ্বনি বেরিয়ে পড়ে: ওরে বাবা, ওরে বাবা! বিদ্যের গৌরীশঙ্করে চড়ে বসে আছ, এভারেস্ট ছুঁই-ছুঁই অবস্থা। আজেবাজে মানুষ নও, ষোলআনা শিক্ষিত মানুষ তুমি—ঘাড় নুইয়ে সেলাম করা উচিত। তা দেখ, বিপরীত হয়ে গেল—পয়লা দিনেই 'তুমি' ডেকে বসলাম।

শিশির বিনয়ে গদ্‌গদ হয়ে বলে, তাই তো ডাকবেন। পদমর্যাদা, বয়স সব দিক দিয়েই কত উঁচুতে আপনি। আপনাকে ডেকে নিয়ে আপনার আশ্রয়ে আমাকে দিয়ে দিলেন। কপাল-গুণে চাকরিটুকু হয়েছে, আপনার দয়া না থাকলে বরবাদ হয়ে যাবে।

॥ পঁচিশ ॥

মহরম পরবের দু-দিন ছুটি—এই ক'টা দিন বাদ দিয়ে ছুটির পরদিন থেকে শিশির কাজে বসবে। সারাক্ষণ তাকে নিয়ে আলোচনা। বাইরে থেকে এসে হুট করে সেকেণ্ড-ক্লার্কের চেয়ারে বসল—ভিতরের রহস্যটা কি? অফিসময় ফুসফুস গুজগুজ। রহস্যভেদ করে ফেল দিকি, খুঁটোর জোরটা কোথায়। ডিটেকটিভ লাগানোর মতন কেস—শার্লক হোমস কি রবার্ট ব্লেক। ছোকরার সঙ্গে কথাবার্তায় একেবারে কিছুই আস্কারা হয় না—যেমন বিনয়ী, তেমনি লাজুক। দশবার দশ রকম প্রশ্নে পরে শিষ্ট-শান্ত একটি জবাব মেলে। নাকি দুঃখ শুনে কর্তাদের দয়া হয়েছে—সেই জন্য নিয়ে নিলেন।

দয়া ? চক্ষু কপালে তুলে নটবর বলেন, দয়ার বশে চাকুরি দিয়ে দিল, এমন অহৈতুকী দয়া তো কলিযুগে হয় না। সত্যযুগে হয়তো হত! আর চাকরিও যেমন-তেমন নয়, এক্সপোর্টের মেজবাবু। যে-না-সেই এর জন্যে হাজার টাকা অন্তত বাজে খরচা করবে।

এদিক-ওদিক একবার সতর্ক চোখে দেখে নিলেন, নিতান্ত অন্তরঙ্গ ছাড়া বাইরের কেউ আছে কিনা। ঠাণ্ডা সুরে মিনমিন করে বলেন, হতে পারে হাবা-গবা গেঁয়ো মানুষ, লেখাপড়াই খানিকটা শিখেছে, মাথায় সারবস্তু কিছু নেই। তা যদি হয়, নিশ্চিন্ত। গেঁয়ো গরু নিয়ে বাস করায় বিপদ নেই। আরও এক রকম হতে পারে তায়ারা—অতিশয় ঘড়েল মানুষ, বাইরে যেমন দেখা যায় ভিতরটা তার উল্টো। পরিচয় পাকাপোক্ত না হওয়া পর্যন্ত গুণে-গেঁথে হিসেব করে কথা বলবে। কুচ্ছো নিতান্তই করতে হয় তো নিজেদের নিয়ে কোরো, কর্তাদের ছুঁয়ে কদাপি কিছু বলবে না।

ঢোঁক গিলে দম নিয়ে আবার বলেন, হাল আমলের আলগা-মুখ ছেলেছোকরা তোমরা—মনে যেটা এলো, মুখে বলে খালাস। সাহেব-কর্তারা ছিল, বাংলা কথার মার-প্যাঁচ বুঝত না। এখন সব দেশি কর্তা, কোন কথাটা হয়তো কানে গিয়ে পৌঁচেছে ' ...ই সিট বসিয়ে দিল অফিসের মধ্যে—কান পেতে সবিস্তারে শুনে নিয়ে কর্তাদের কাছে ...নে দিক করে লাগাবে।

এতখানি কেউ অবশ্য বিশ্বাস করে না। দ্বিজদাস বলে, চর ...র বলুন দিকি ? আপনার কি দাদু ? কড়া লাগাম আপনার মুখে, ভুলেও কখনো বেরোয় না।

তোমরাও লাগাম আঁটো—ভালোর তরে বলছি। গোলামি কাজ করবে অ... টেনড্যান্স-বুলি ছাড়বে—ক্ষতি বই তাতে লাভ হয় না। মুখে লাগাম কষে আছি বলেই ...শর উঠতে আমি এইখানে। কিন্তু সঙ্গদোষেও সর্বনাশ হয়—কার মুখের কথা কোন্ না... দরবারে উঠবে, কে বলতে পারে ?

নানান আলোচনা শিশিরকে নিয়ে আচমকা এমনি দ্বিতীয়-কেরানি হয়ে বসার দরুন। উপমা দিয়ে বলা যায়, অফিসের নিস্তরঙ্গ তড়াগে উপরওয়ালারা সহসা এক পাথর ছুঁড়ে মেরেছেন।

বীথি চুপিসারে পূর্ণিমাকে বলে, স্পাই ঢুকিয়ে দিয়েছে নাকি আমাদের কথাবার্তা চালচলনের নোট নেবার জন্য। এ তো বড় বিপদ হল পূর্ণিমা-দি।

পূর্ণিমা বলে, তা আবার আমাদেরই সেকশনে। দাদুর হুকুম হয়েছে, হলঘরের কোণে তার জন্যে নতুন টেবিল পড়বে। তোমার সিটের সামান্য দূরে।

বীথি বলে, বয়কট করব আমরা ভদ্রলোককে। কথা বলব না কেউ, কাছে যাব না, মেলামেশা করব না—

পূর্ণিমা বলে, ঠিক উল্টো। বেশি করে মেলামেশা করব। ডেকে ডেকে কথা বলব। গায়ে গড়িয়ে ভাব জমাব।

দু-চোখে অগ্নিবর্ষণ করে বীথি বলে, মানে ?

নটবরবাবুর রটনা বেদবাক্য বলে ধরে নিও না। আমি ভার নিচ্ছি। চরের উপরে চরবৃত্তি করে হাড়হদ্দ জেনে পাকা খবর দেবো তোমাদের।

শিশিরের বড় ইচ্ছে করে, সুনীলকান্তির বাড়ি অবধি গিয়ে মুখের উপর সুখবরটা শুনিয়ে আসে : বলেছিলেন বড়দা, দাম-কাকার আলমারিতে চাকরি থরে থরে সাজানো থাকে, বের করে দিয়ে দেবেন একটা। তাই সত্যি সত্যি দিলেন কিনা দেখুন। যে সে

চাকুরি নয়, এক্সপোর্ট সেকশনের সেকেণ্ড ক্লার্ক। বিশ বছর অবিরাম কলম চালিয়েও লোকে এই উঁচুতে উঠতে পারে না—দাম-কাকা যেন মেঘলোক থেকে আলগোছে আমায় চুড়োর উপর নামিয়ে দিলেন।

ইচ্ছেটা এমনি, কিন্তু সাহসে কুলোয় না সুনীলকান্তির মুখোমুখি হতে। কষ্ট করে সুনীল অত ভোরে উঠে পড়েছিল, স্পষ্টাস্পষ্টি তাকে কথা শোনানোর জন্য : *মমতার খাতিরে রাখছি বটে তোমার কন্যে, কিন্তু এক মাসের উপর আধখানা দিনও ফাউ দেবো না। চাকরি হল, এর উপরে একটা ঘরের ব্যবস্থা হলেই অকুতোভয়ে গিয়ে পড়বে —কুমকুমকে তুলে নিয়ে গটমট করে চোখের ওপর দিয়ে এসে রিক্সায় চাপবে। এবং শুনিয়ে আসবে : এক মাসের বেশি হয় নি তো বড়দা, দেখুন দিকি হিসাবপত্তোর করে।*

অমিতাভর সেই মেসেই আছে। চাকরে লোকেরা মেস করে রয়েছে—বেকার অবস্থা ঘুচে শিশিরেরও চাকরি হওয়ার দরুন মেসে খাতির বেড়ে গেছে। পুরোপুরি দলের শয়ে গেল সে এবারে। আছে অমিতাভর সঙ্গে একই সিটে। লাটুবাবু রিটায়ার করে বছে—ভবেন—সেই সিট নিয়ে শিশির পুরো মেম্বার হতে পারবে। বেশি নয়—মাস শিশিরের - ভিতর এসে যাবে সেই সৌভাগ্য।

ভুলচুক সে—থাকছে কিনা সে অতদিন! এক মাসের উপর আধেলা দিনও দয়া করবে আমার—কেয়ার-নোটিশ দিয়ে দিয়েছে। শিশিরের পাত্তা না পেলে তখন স্ত্রীর উপরে খাতির, দেখলে তে[াকরি হল, ভাবনা এবারে দুশমন কুমকুমটাকে নিয়ে। রাত্রের ঘুম এ জিনিষ হয় সে হরে নিয়েছে

আমার উপরে ঠাকুরকে সেই পুরানো প্রস্তাব মনে করিয়ে দেয় : পঁচিশ টাকা হিসাবে জিভ ুরের ন'শ টাকা আগাম পেলে বাচ্চার সমস্ত ভার নেবে বলেছিলে?

পুরো ঠাকুর নারাজ। বলে, চাকরি-বাকরি করেন না তখন, উটকো মানুষ কখন আছেন কখন নেই—সেইজন্যে কথা একটা ছুঁড়ে দিয়েছিলাম। জানি, বিশ মণ তেল পুড়বে না, রাধাও নাচবে না। এখন চাকরি হয়েছে, আপনার মেয়ে আমাদের ঘরে থাকবে কেমন করে?

শিশির বলে, তা হলে যেমন ঘরে থাকতে পারে, তেমনি কোন একখানে নিয়ে ওঠাও। সে ঘরে আমি সুদ্ধ যাতে থাকতে পারি। তুমি কর্তা হয়ে থাকবে। ঐ পঁচিশ টাকাই মাইনে।

তার মানে বাবু, ঘর দেখে দিতে বলছেন এই শহরে। ঘরের গতিক জানেন না। ঘর দিন একখানা, আর আকাশের চাঁদ পেড়ে দিন। মানুষ চাঁদ ফেলে বাসের ঘর নিয়ে নেবে। ঘরের অভাবে বাবু, কলকাতার অর্ধেক ছোঁড়াছুঁড়ি বিয়ে করতে পারছে না। ছোঁড়ারা রোয়াকবাজি করে, ছুঁড়িগুলো সিনেমার ছবি দেখে বেড়ায়।

ঠাকুর আরও বলে, চার দেয়াল আর মাথায় ছাত—দৈবে-সৈবে ঘর মিলে গেল তো পিঁপড়ের মতন লাইন দিয়ে লোক ঢুকে পড়বে। মেঝের উপর এক প্রস্থ, তাদের উপর দিয়ে চৌপায়া-তক্তাপোশ পেতে এক প্রস্থ—আবার কড়ি থেকে মাচান ঝুলিয়ে মই বেয়ে তার উপরে উঠে ঠাঁই নিচ্ছে—এমনও দেখা আছে বাবু।

ভেবে-চিন্তে শিশির মমতার নামে চিঠি দিল একটা : বড়দি, নিজে গিয়ে পদতলে প্রণাম করে সুখবর জানানোর কথা, কিন্তু এর পরে আর ছুটিছাটা নেই চাকরিতে বসে সময় একটুও পাব না। দায়িত্বের কাজ—ডেপুটি-ম্যানেজার গোড়াতেই বলে দিলেন। প্রয়োজন হলে অফিসের পরেও খাটতে হবে। রবিবারেও বেরুতে হতে পারে। কুমকুমকে আপনাদের আশ্রয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত আছি, এই ক'দিন অহোরাত্রি আমি বাসা খুঁজে খুঁজে

বেড়াচ্ছি। লেন, বাই-লেন, পাকা-ঘর, বস্তি-ঘর খুঁজতে কোথাও বাদ রাখছি নে। লাখ লাখ বাড়ি এত বড় শহরে—আমি চাচ্ছি পুরো বাড়ি নয়, একখানা দু-খানা ঘর। সে জিনিষ এত দুর্লভ, ধারণা ছিল না। বাসার একটা সুরাহা হলেই শ্রীচরণে হাজির হব, তিলার্ধ আর দেরি করব না।

শিশিরের টেবিল বরঞ্চ বীথিরই খানিকটা কাছাকাছি, পূর্ণিমা থেকে অনেকখানি দূরে। দায় যখন স্বেচ্ছায় কাঁধ বাড়িয়ে নিয়েছে—সেই দূর থেকে পূর্ণিমা আড়চোখে বারম্বার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। পয়লা দিনটা এমনি চোখের দেখা দেখে ভাব বুঝে নিল। বোঝবার কি আছে ছাই—সর্বক্ষণই তো ঘাড় গুঁজে কাজ করে যাচ্ছে। কাজ ছাড়া কোন-কিছুতে কৌতূহল নেই। এতগুলি লোক এক ঘরে—কারো পানে চোখ তুলে তাকায় না একবার। তিন-চারটে যুবতী মেয়ে আশে-পাশে ঘুর-ঘুর করছে, তাদের পানেও না! এই মানুষ চরবৃত্তি করবে নাকি—স্বচক্ষে দেখবার আগে বীথি কত রাগ করেছিল, দেখার পরে আর রাগ নেই।. করুণা আসে হাঁদারাম মানুষটার উপর।

দ্বিতীয় দিনও অবিকল এমনি। টিফিনের সময়টা—হয় ক্লান্তি, নয়তো ক্ষিধে পেয়ে গেছে—দু'দিনের মধ্যে বোধকরি এই সর্বপ্রথম ফাইল থেকে মুখ তুলল। সবাই সিট ছেড়ে যাচ্ছে দেখে সে-ও বেরুল। আর তক্কে তক্কে রয়েছে তো পূর্ণিমা—কোন্ দিক দিয়ে সাঁ করে এসে তার পাশটিতে দাঁড়ায়।

আসুন শিশিরবাবু, পরিচয় করা যাক। নাম জানলাম কি করে বলুন দিকি? পারলেন না। জ্যোতিষ জানি আমি, মানুষের মুখ দেখে পড়ে ফেলি।

হাসিমুখে তাকিয়ে থেকে মুহূর্ত পরে নিজেই আবার বলে দেয়, অ্যাটেনড্যান্স-খাতায় নাম দেখে নিয়েছি। কিন্তু শুধু নামে তো পরিচয় হয় না—

পরিচয় না হয় করা যাচ্ছে, কিন্তু বড্ড বেশি কাছ ঘেঁষে আসে। বিপন্ন শিশির সরে গেল তো কথাবার্তার মাঝে অন্যমনস্কভাবে আরও খানিক এগিয়ে আসে পূর্ণিমা। কী কাণ্ড রে বাবা, এক-অফিস লোক কিলবিল করছে—সে বিবেচনাতেও সমীহ করবে না? চাকরি করা মেয়েগুলো কী!

পূর্ণিমা প্রশ্ন করে? থাকেন কোথা আপনি?

(তা বই কি! ঠিকানা বলি, আর সেই অবধি ধাওয়া করো। কিছুই অসম্ভব নয় তোমাদের পক্ষে।) ভাসা-ভাসা রকমে অনিচ্ছুক কণ্ঠে শিশির জবাব দেয়ঃ বেলগাছিয়ার দিকে।

অনেক দূর থেকে আসেন। ট্রামে-বাসে যা ভিড়—কষ্ট হয় না?

হয়ই তো। কাছে-পিঠে একটা ঘর পেলে সুবিধা হত। কিন্তু কে খুঁজে দেয়? পাড়াগাঁয়ের মানুষ, জানাশোনা নেই তো তেমন।

গাঁয়ের মানুষ, সেটা আর বলে দিতে হবে না। মুখে বেশ স্পষ্ট করে লেখা আছে। হেসে পড়ল পূর্ণিমা। শিশিরের সরে-যাওয়া এবং পূর্ণিমার কাছ ঘেঁষে এগুনো—সেই খেলা নিঃশব্দে চলছে। হেসে পূর্ণিমা বলে, আর সরবেন কোথা? কংক্রিটের নিরেট দেয়াল—ওর মধ্যে ঢুকে যেতে পারবেন না।

না, না—করছে শিশির বেকুব হয়ে গিয়ে। তবে তো যাদুমণি অন্যমনস্কতা নয়—ইচ্ছে করেই ঘাড়ের উপর পড়া। মেয়েরা সব কী হয়ে যাচ্ছে, লজ্জা-শরম পুড়িয়ে খেয়েছে—হাটে-মাঠে রুজিরোজগারে বেরুনোর ফলে এমনি দশা।

পূর্ণিমা ভরসা দেয়ঃ আমি ঘর দেখে দেবো। আমাদের অনেক জানাশোনা।

(যখন দেবে, তখন দেবে। মানুষজন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। আপাতত রেহাই

দিয়ে নিজ কর্মে কেটে পড়ো দিকি !)

দিচ্ছে রেহাই—বয়ে গেছে ! বলে, আসুন না—ক্যান্টিনে ঢুকে চা খেয়ে নেওয়া যাক একটুখানি ।

শিশির ঘাড় নেড়ে প্রাণপণ শক্তিতে বাধা দেয় : আজ্ঞে না, চা আমি খাই নে—

মোটেই না ?

যৎসামান্য । না খাওয়ার মতন । ভর দুপুরে চা আমার একদম সহ্য হবে না। মারা পড়ব ।

না খেলেন । চায়ের বাটি সামনে রেখে আলাপ-পরিচয় হবে । চা ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে থাকবে, ফেলে দেবেন তারপর ।

কমলি নেহি ছোড়ে গা । হাত বাড়িয়েছে—সর্বনাশ, আরে সর্বনাশ, ধরবে নাকি ? হাত ধরে হিড় হিড় করে টানবে সর্বচক্ষুর সামনে ?

ফুটবল খেলায় খুব দক্ষ শিশির । বিপক্ষ দল ঘিরে ফেলেছে, বল নিয়ে সুকৌশলে তার মধ্য থেকে কাটান দিয়ে বেরিয়ে বিস্তর খেলায় দর্শকের হাততালি পেয়েছে । সেই খেলা আজও খেলল—দু-পা দ্রুত এগিয়ে কিঞ্চিৎ বাঁয়ে ঘুরে পূর্ণিমার কবল থেকে সুড়ুৎ করে একেবারে নিজের সিটে । নির্ভয় নিরাপদ আসন । টিফিনের সময়টা, মতলব ছিল, এদিক-সেদিক একটু চক্কোর দিয়ে বেড়াবে—সেটা হল না দুর্ধর্ষ বেহায়া রমণীটির জন্য ।

ভবতোষকে নটবর চোখ টিপে কাছে ডাকলেন : শোন হে শোন । ছিপ ফেলে বসে থাকার কথা বলতাম, তাব উপর দিয়ে যাচ্ছে এখন । মাছেরা সব সেয়ানা হয়ে গেছে, চারে এসে টোপ গিলতে চায় না । মা-লক্ষ্মীরা মরীয়া হয়ে জলে নেমে তাড়া করেছে, তাড়া খেয়ে মাছ তখন দিশা করতে পারে না ।

বিস্ময়ের ভান করে ভবতোষ বলে, বলেন কি দাদু ?

একটার অবস্থা আজ স্বচক্ষে দেখলাম । লং-সাইটের চশমা পরে নির্ঝঞ্ঝাট বুড়ো-মানুষ একটেরে বসে থাকি—নজরে কোন কিছু এড়ায় না । বাপ রে বাপ, অফিসের চৌহদ্দির মধ্যেই কাণ্ডবাণ্ড—ছুটি হওয়া অবধি সবুর সয় না ?

রসের আন্দাজ পেয়ে এদিকে-ওদিকে আরও কিছু কান খাড়া হয়েছে । নটবর বলেন, টিফিন খেতে যাচ্ছে—বাঘিনী হয়ে সেই সময় হামলা দিয়ে পড়ল। ম্যান-ইটার অব কুমায়ুন । ক্ষুধার্ত মানুষ খেয়ে-দেয়ে পেট ঠাণ্ডা করে আসুক, সেটুকু ফুরসৎ দেয় না । বুঝে-সমঝে শিকারটি পাকড়েছে ঠিক। জংলি পল্লীগ্রামের আমদানি—রূপ দেখে ড্যাবড্যাব করে চেয়ে থাকে । জানে না, ওটা হল শিশি-কৌটোর রূপ । অফিসে আসার সময় রূপসী হয়ে আসে, তালিতুলি দিয়ে পাঁচটা অবধি কোনরকমে টিকিয়ে রাখে রূপ । সন্ধ্যার পরে কি সকালবেলা দৈবাৎ যদি দর্শন হয়ে যায়, সংসারে বৈরাগ্য এসে যাবে ।

হাসাহাসি রঙ্গ-রসিকতা চলল কিছুক্ষণ ধরে । এদের চরও একটি-দুটি দাদুর সাগরেদের দলে ভিড়ে আছে । হতে পারে সে চর ভবতোষই । অথবা অন্য কেউ । টুক করে বীথিকে সে বলে দিয়েছে ।

ছুটির পর পূর্ণিমা বাড়ি চলেছে, বীথি গিয়ে তাকে ধরে ফেলল : বুড়োটা কি বলেছে শোন । ছিটেফোঁটা কাজকর্ম করবে না, সারাটা দিন কাটে কী নিয়ে !

পূর্ণিমা দাঁড়িয়ে পড়ল : আমায় নিয়ে বলেছে ?

টিফিনের সময় তুমি বুঝি শিশিরবাবুকে পাকড়েছিলে ?

প্রচণ্ড এক নিশ্বাস ফেলে পূর্ণিমা বলে, প্রেমে হিয়া জরজর । চুপচাপ থাকি কেমন

করে বলো !

মানেটা তাই বটে। তবে বাঘিনী মূর্তি ধরে হামলা দিয়ে পড়েছিলে—

আহা রে, নিরীহ গন্ডল একটি ! দাদুর দয়ার শরীর, দুঃখে প্রাণ কেঁদেছে।

পরের দিন পূর্ণিমা খড়কে-ডুরে পরে অফিসে এসেছে, এ শাড়ি কিশোরী মেয়েকে হয়তো মানায়—তবু। এবং শাড়ির সঙ্গে ঝকমকে ব্লাউজ। নটবর চশমা খুলে বারম্বার তাকাচ্ছেন।

এক সময় ফাইল হাতে করে পূর্ণিমা নিজেই তাঁর টেবিলে এলো। অজুহাত—একটা জরুরি পরামর্শ নিতে এসেছে যেন। কিন্তু কাজের কথার আগেই নিজের কথা। ফিক করে হেসে বলে, শাড়িটা কেমন দাদু ?

ভাল—

ঘুরে ঘুরে পছন্দ করে কেনা। ডুরে শাড়ি আর এই হলদে-কালো ছিটের জামায় ঠিক যেন ডোরা-কাটা এক বাঘিনী। এই বেশ ভাল লাগে আমার। আপনি ভয় পেলেন না তো দাদু ?

সঙ্গে সঙ্গে যে জিনিষটা জানতে এসেছে সেই প্রশ্ন। এবং উত্তরটা নিয়েই ফর-ফর করে নিজের জায়গায় গিয়ে কাজের মধ্যে মগ্ন হয়ে গেল। অর্থাৎ জানান দেওয়া হল : তোমার নিন্দে শুনেছি—যত খুশি বলো গে, গ্রাহ্য করি নে। জানানো হয়ে গেছে—বেপরোয়া মেয়েমানুষ দেরি করতে যাবে কেন আর ?

নটবর সরাসরি এর পর শিশিরকে ডাকলেন : শোন ভায়া, পাড়াগাঁ থেকে এসেছ, শহরের হালচাল কিছু জান না। অফিসের কাজেও নতুন। কন্দর্পের মতো সুঠাম চেহারা—আমি তোমার বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী, হিতকথা বলবার জন্য ডেকেছি।

শিশির বিগলিত কণ্ঠে বলে, সে আমি জানি। মাথার উপরে কেউ আমার নেই—ডেপুটি সাহেব আপনাকে ডেকে সেই যে আমায় সঙ্গে দিয়ে দিলেন, তখন থেকে অভিভাবক বলে আপনাকে জ্ঞান করি। কি আদেশ আছে বলুন, যথাসাধ্য করব।

বিনয়ের কথাবার্তায় নটবর বিষম খুশি। শহুরে নয় বলেই এমনি। বললেন, তোমায় সতর্ক করে দেওয়া। ছেলেধরার নজর পড়েছে—সামাল, খুব সামাল ভায়া। নইলে পরে পস্তাবে। বিস্তর অঘটন ঘটায় ওরা।

ছেলেধরার নজর, শোনা যায়, বাচ্চা ছেলেপুলের উপরে। এত বয়স পেরিয়ে এসে তার উপরেও কেন সেই নজর—শিশির বিমূঢ়ভাবে নটবরের পানে তাকিয়ে পড়ে। এবং তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে পূর্ণিমার সিটের দিকে—

নটবর বলেন, দেখ, বিশ্বাস হল তো ? দৃষ্টি দিয়ে রক্ত শুষে নিচ্ছে তোমার। রক্ষে নেই। আহা, কোন্ মায়ের বাছা গো ! বাঁচতে চাও তো চাকরি ছেড়ে পালাও আমাদের অফিস থেকে। তা ছাড়া উপায় দেখি নে।

॥ ছাব্বিশ ॥

বিজয়া দেবী রাগ করে চলে গেলেন। সেই সময়টা তাপস কলকাতায় নেই, রোগী দেখতে পুরী চলে গিয়েছিল। বড়লোক রোগী, অপূর্ব রায়ের পুরানো ঘর, ডাক্তার রায় মারা যাবার পর থেকে তাপস দেখে আসছে। বায়ু-পরিবর্তনে পুরী গিয়ে রোগের কী সব নতুন লক্ষণ দেখা দিতে লাগল। ভয় পেয়ে তাঁরা তাপসকে টেলিগ্রাম

করেছিলেন।

ফিরে এসে তাপস স্বাতীর কাছে সব শুনল। পূর্ণিমাকে বলে, স্বাতীর মা এসেছিলেন শুনলাম। কি বলে দিয়েছিস ছোড়দি ?

এতগুলো দিন অতীত হয়েছে, পূর্ণিমার মনের গরম তবু কাটে নি। বলে, ভুল হয়ে থাকে তো যা বলবার বলে দে গে তুই।

তাপস বলে, শেষ জবাবটা নাকি আমারই জন্যে অপেক্ষা করে আছে। তোর কথাই যেন সব নয়। এত উন্নতি আমার কদ্দিন থেকে—কিসে এত বড় হয়ে গেলাম, বল্ দিকি। কেন এমন পর হলাম ? স্বাতী এসেছে কার কথায়—হাঁ-না আমি কিছু বলতে গিয়েছি ?

পূর্ণিমা বলে, স্বাতীকে এর মধ্যে জড়াবি নে। ঐ তোর হয়েছে তুরুপের তাস—ওর নাম করে সব ব্যাপারে জিতে যাবি। খুব ঠাণ্ডা মাথায় এই ক'দিন ভেবে দেখলাম—আগে যেমনধারা ছিল, তেমনটি আর চলবে না। মা কিছুই অন্যায় বলেন নি। ডাক্তার-মানুষ তুই এখন, রোগিপত্তর বাড়িতেও এসে পড়তে পারে। পারে কেন, আসবেই। শুধু গুণ থাকলে হয় না, ঠাটবাট চাই। মা সত্যি কথাই বলেছেন, ভেক নইলে ভিখ মেলে না। নিউ আলিপুরের ফ্ল্যাটে তোরা চলে যা।

তুই যাবি তো সেখানে ? তুই ঘাড় নাড়ছিস, আমি তবে যেতে যাব কেন রে ? স্বাতীই বা কেন যাবে ?

বিবেচক শাশুড়ির হিতকথা কিছুতেই সে কানে নেবে না। বেশি বলতে গেলে উল্টো মানে করে ঃ বুঝেছি, বুঝেছি ছোড়দি, দু-চক্ষে দেখতে পারিস নে তুই আর এখন। এক-অন্নে রাখবে নে, পৃথক করে দিচ্ছিস।

স্বাতীকে বলতে গেলে সে কেবল হাসে ঃ আমি ওসব বুঝি নে ছোড়দি। থোড়-ছেঁচকি কি ভাবে রাঁধতে হয় বলে দিন—ঐ অবধি বুঝব, তার উপরে নয়।

অবশেষে—যে ভয় করা গিয়েছিল—একদিন সত্যিই ডাক্তার ডাকতে এই বাড়ি অবধি হানা দিল। ঠিকানা ডাক্তারখানা থেকে পেয়েছে—মোড়ের উপর মোটর রেখে গলিতে ঢুকে বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছে। বার দুয়েক এ বাড়ির সামনে দিয়েই গেছে, কিন্তু এহেন স্থানে ডাক্তার অপূর্ব রায়ের জামাই থাকে, ভাবতে পারে নি। দুই ভদ্রলোক—চালচলন ও বেশভূষাতেই মালুম হয় দস্তুরমতো ওজনদার ব্যক্তি। রোগীর বাড়াবাড়ি অবস্থা, ডাক্তারকে সঙ্গে করেই নিয়ে যাবেন। তাপস তখন স্নান করছে। বাইরের ঘরে তারণের শয্যার পাশে নড়বড়ে চেয়ারে আড়ষ্ট হয়ে তাঁরা অপেক্ষা করতে লাগলেন।

তারপর থেকে তারণই জেদ ধরলেন ঃ না, এ জিনিষ চলবে না। ঐ দরের মানুষ এঁদো-ঘরে জবুথবু হয়ে বসে রইলেন—লজ্জায় আমারই তখন মাথা কাটা যায়।

তাপস বলে, বাড়ি খুঁজছি বাবা। অনেককে বলে রেখেছি। জানো তো, এ বাজারে বাড়ি পাওয়া কত কঠিন।

ওসব জানি নে আমি। এইটে জানি, এভাবে প্রাকটিস চলবে না তোর—চলতে পারে না।

একটু ভেবে তারণ আবার বলেন, কুটুম্বর ফ্ল্যাটে উঠতে আপত্তি, অন্য বাড়িও পাওয়া যাচ্ছে না। এই বাড়িই তবে খানিকটা ভদ্রস্থ করে নে। পুরো বাড়ি হয়ে না উঠলে এই বাইরের ঘরটা অন্তত। এইখানে চেম্বার করে আপাতত বসতে থাক্।

বাবার তাড়া খেয়ে তাপস আর কিছু বলতে পারে না। বাইরের ঘরের কলি ফিরিয়ে দেয়ালে ডিসটেম্পার করে কিছু ভাল ফার্নিচারে সাজিয়েগুছিয়ে নেওয়া হবে, বাপে আর মেয়ের পাকাপাকি প্ল্যান করে ফেলেছে। স্বাতীর মতামত নেই, তবে বসে থাকে

এইসব পরামর্শের মধ্যে। এবং চরবৃত্তি করে তাপসের কাছে চুপিসারে ফাঁস করে দেয়।

সন্ধ্যার পর সকলে একত্র হয়। তাপস পূর্ণিমাকে বলে, বাইরের ঘর জুড়ে ডাক্তারসাহেব তো জাঁকিয়ে বসছেন। বৃদ্ধ বাপটির কোথায় জায়গা হবে শুনি?

পূর্ণিমা বলে, জায়গার অভাব কি? বারান্ডার ঘরে—আমি যেখানটা আছি।

আর তুই? কপালগুণে কিছুদিন উপরের ঘরে প্রোমোশান হয়েছিল—স্বাতীকে নিয়ে এসে আমাদের ঠেলেঠুলে উপরে তুলে দিয়ে আবার নিচে পুনর্মূষিক হয়ে এলি। সে ঘরও বাবাকে দিয়ে দিচ্ছিস, তোর জায়গা কোথায় শুনি?

পূর্ণিমা বলে, বাঃ রে, অমন সুন্দর রান্নাঘর রয়েছে। একটা ক্যাম্প-খাট কিনব, সারাদিন গোটানো থাকবে। খাওয়া-দাওয়া আমাদের সন্ধ্যের পরেই তো চুকে যায়—খাট খুলে নিয়ে তোফা তার উপর গড়িয়ে পড়ব।

তাপস বলে, খাটের হাঙ্গামাই বা কেন, তোফা মেজের উপর তোফা মাদুর বিছিয়েও তো নেওয়া যায়। কিংবা তোফা রাস্তার ফুটপাথে?

পূর্ণিমা বলে, মানুষে থাকে না বুঝি?

থাকে বই কি! কিন্তু তুই নোস, থাকব আমি। বাইরের ঘর যদি আমার ডাক্তারি চেম্বার হয়, রান্নাঘরই তখন বেডরুম। আবার তোকে উপরের ঘরে গিয়ে উঠতে হবে।

বুঝিয়ে-সুঝিয়ে হয় না তো পূর্ণিমা এবার নিজমূর্তি ধরে: জানিস তো, কথার উপর কথা বললে আমার মেজাজ ঠিক থাকে না। যখন যে ব্যবস্থা করেছি, বরাবর সেই মতো হয়ে এসেছে। এবারও আমার কথায় হবে, এর মাঝে তোর ফোড়ন কাটতে হবে না।

তাপস নিরস্ত হয় না। দিনকাল বদলেছে—বড় হয়েছে সে, পাশ করে উপায়ক্ষম হয়েছে। তাড়া খেয়ে তর্ক করে: বরাবরের মতন হল এবারে কই? স্বাতীর মায়ের জবাব আমার মত ছাড়া যখন হয় না, সমস্ত কিছু এবার থেকে তাহলে আমার মতেই হবে।

জবাব খুঁজে না পেয়ে পূর্ণিমা চুপ করে যায়। ভাই-বোনের বচসা ওদিকে তারণের কান অবধি গেছে। তিনি চেঁচাচ্ছেন বাইরের ঘর থেকে: শুনে যা তোরা। রান্নাঘরে কেন যাবে পুনি? ঠাঁই নাড়ানাড়ির দরকার হবে না, যেখানে যেমন আছিস তেমনি সব থাকবি। আমি আর ক'দিন—বাইরের ঘর খালি করে দিয়ে যাব।

পূর্ণিমা বকে ওঠে: কু-ডাক ডেকো না বাবা, মানা করে দিচ্ছি। যাবার এখনো ঢের ঢের বাকি। দিচ্ছে কে যেতে? স্বাতী সবে এসেছে, পাকাপোক্ত হোক সংসারে——এখনই যাই-যাই করলে ওর কি মনে হবে বলো তো?

স্বাতী কি কাজে এসেছিল, ননদের কথা শুনে হাসিমুখে ঘাড় দুলিয়ে সায় দেয়।

তারণ বলেন, মরণের কথা কে বলছে! সে হলে তো চুকেই যেত। কিন্তু সে জিনিষ তোর আমার ইচ্ছেয় তো হবে না। কাশী চলে যাব আমি—পাপপঙ্কে পড়ে থেকে দম আটকে আসে। পূর্ণ-দা চিঠি দিয়েছেন।

পূর্ণ মুখুজ্জের চিঠি আসছেই অবিরত নতুন কিছু নয়। কাশীবাস করেও তিনি পাড়ার সুহৃৎ তারণকে তিলেকের তরে ভুলতে পারেন নি। প্রায়ই চিঠি লেখেন। সংসাররূপ নরককুণ্ডের প্রতি ঘৃণাপ্রকাশ এবং তারণকে কাশীবাসের জন্য আহ্বান। প্রবাদে বলে কাশীধাম মর্ত্যলোকের বাইরে। সেটা যে কতদূর সত্যি কাশীতে একটা চক্কোর দিলেই মালুম হবে। এমন খাঁটি মালাই এবং ভেজালহীন মিষ্টান্ন মর্ত্যলোক হলে মিলত না। দামের দিক দিয়েও সত্যযুগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বেগুনের সাইজ

মিঠে-কুমড়োর মতো। রাজপুত্রের চেহারার সোনামাছ গঙ্গা থেকে সদ্য উঠে এসে মেছুনির পাটায় শুয়েছে। এর উপরে নিখিল-ভারতবর্ষের প্রবীণ বহুদর্শী দাবাড়েরা ঘাটের চাতালে চাতালে দিগ্বিজয়ের চ্যালেঞ্জ দিয়ে বসেছেন। তুরীয়ানন্দের তবে আর বাকি কতটুকু রইল—কেন মিছে সংসারজ্বালায় জর্জর হওয়া? বার্ধক্যে বারাণসী—ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা বুঝেসুজেই বিধান দিয়ে রেখেছেন।

শেষ চিঠি যা পূর্ণ লিখেছেন, সত্যি সত্যি তাতে মন টেনেছে। উতলা হয়েছেন তারণ কাশীবাসের জন্য। খোলাখুলি প্রস্তাব। পূর্ণকেও বাতে ধরেছে, চলাচলে অসুবিধা হয়! তবে বাসা ঠিক দশাশ্বমেধঘাটের উপরে—দুই বন্ধু একবাড়িতে একসঙ্গে থাকলে ভাবনার কিছু নেই। গঙ্গাস্নান করো, মালাই-মিষ্টি খাও, রিক্সা করে ইচ্ছা মতন বাবা-বিশ্বনাথ মা-অন্নপূর্ণা দর্শন করে এসো—আর দাবা খেল অহোরাত্রি। কুসমি যখন রয়েছে, যাবতীয় ঝামেলা সে-ই পোহাবে। আর কাশীধামে মরলে তো দেখতে হবে না—পাপপুণ্য ধর্মাধর্ম কোন কিছুরই হিসাব নেবে না চিত্রগুপ্ত—সরাসরি একেবারে শিবলোকে। হেন সুযোগ যে হেলা করে, সে ব্যক্তি মানুষ নয়—নররূপী গাধা। তাদের জন্যেও ব্যবস্থা রয়েছে গঙ্গার ওপারে ব্যাসকাশীতে—মরে গেলে গর্দভলোক।

লিখছেন: সারাজীবনই তো খাটলে। সার্থক খাটনি—ছেলে মানুষ হয়ে গেছে। একটি মেয়ে অবিবাহিত—সে-ও নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে, অন্য কারো পরোয়া করে না। বউঠাকরুন আসতে চান তো তাঁকেও নিয়ে এসো—কেন তাঁকে পাপপঙ্কে রেখে আসবে। তোমার নিজের পেন্সন আছে, ছেলে নিশ্চয় কিছু কিছু পাঠাবে। পুনি বিয়েথাওয়া করল না—তারও কর্তব্য আছে বাপ-মায়ের উপর, সে-ই বা কেন দেবে না।

এ সমস্ত সন্ধ্যারাত্রের আলোচনা। ভোরবেলা অপ্রত্যাশিত ভাবে এক বিপদের খবর এলো। ভাল করে তখনো ভোর হয় নি। স্বাতীর ছোটভাই দেবাশিস এসে উপস্থিত। স্ট্রোক হয়েছে বিজয়া দেবীর। অপূর্ব রায় থাকতেও একবার হয়েছিল—সেবারে মৃদু আক্রমণ। এবারে কী হয়েছে—এরা ছেলেমানুষ, কী জানে আর কী বোঝে! তাপসকে এক্ষুনি যেতে হবে, সে গিয়ে না পড়লে কিছু হচ্ছে না।

মহাব্যস্ত হয়ে পূর্ণিমা তোলপাড় লাগাল। স্বাতীকে ডাক দেয়: দেরি কেন গো? যে অবস্থায় আছ ঐ বেশে অমনভাবে গাড়িতে উঠে পড়ো। তাপসকে বলে, ওষুধপত্তোর যা নেবার নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়—

তিষ্ঠাতে দেয় না, তাড়িয়ে তুলল গাড়িতে। দেবাশিসকে ডেকে বলে, অফিস আছে, অডিটের মুখে এখন কামাই করা চলবে না—নইলে আমিও যেতাম। তা ছাড়া, আনাড়ি মানুষ আমি—অসুখের ব্যাপারে করতেও পারব না কিছু। মন উতলা রইল, অফিস থেকে ফোন করব।

॥ সাতাশ ॥

বিজয়া দেবীর অসুখে পূর্ণিমা উদ্বেগ বোধ করছে। অত সব কড়া কথা শোনাল সেদিন—নিজেকে মনে মনে গালি দিচ্ছে, ঘাড়ে যেন ভূত চাপল—রাগের মুখে লঘু-গুরু জ্ঞান থাকবে না, এ কেমন কথা। অফিসে গিয়েই সে ফোন করল।

স্বাতী ধরেছে। বলল, ভালই আছেন মা, যতদূর ভয় হয়েছিল, তেমন কিছু নয়।

ব্যস্ত হবার কিছু নেই ছোড়দি। নার্স রয়েছে—কথাবার্তা একেবারে মানা। লোকজন দেখলে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন—আমাদের অবধি কাছে যেতে দিচ্ছে না।

তাপসকে পেলে সঠিক অবস্থাটা জানা যেত। কিন্তু সে এখন ডাক্তারখানায় রোগি-পত্তরের ভিড়ের মধ্যে। সেখানে ডাকাডাকি করা উচিত নয়।

টিফিনের সময়টা আবার পূর্ণিমা ফোন করল। তাপস এবারও নেই। ডাক্তারখানায় রোগি দেখে তারপর কলে বেরিয়ে গেছে, এখনো ফেরে নি। এমন কম বয়সে এত অল্প সময়ের মধ্যে প্র্যাকটিস দিব্যি জমিয়েছে। ফোন ধরেছে এবার দেবাশিস। পূর্ণিমা বলে, যাব একবার তোমাদের ওখানে, মাকে দেখে আসব। দেবাশিস বলে, একটু ধরুন, জিজ্ঞাসা করে আসি। ফিরে এসে বলে, সেরে গেলে তখন আসবেন। এখন নয়। দেখতে আসা ডাক্তারে একেবারে বারণ করে দিয়েছেন।

হার্টের অসুখে তাই নিয়ম বটে। দেখতে গিয়ে বেশির ভাগই ক্ষতি করা হয়। তা পূর্ণিমা যাবে—কিছুতে ওরা সেটা চায় না। কারণ বোঝা যাচ্ছে—সেই যে ঝগড়া হয়েছিল, পূর্ণিমাকে দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়বেন তিনি। দেখাসাক্ষাৎ মানা—সেই জন্যেই পূর্ণিমাকে এত করে শোনাচ্ছে। যাই হোক ভাল আছেন তিনি, যত সাংঘাতিক ভাবা গিয়েছিল তেমন কিছু নয়—স্বাতীর কাছে শুনে অবধি অনেকখানি নিশ্চিন্ত।

ছুটির মুখে পূর্ণিমা শিশিরের টেবিলে ঝুঁকে এসে দাঁড়াল: সেদিন আপনি মিথ্যে কথা বলেছিলেন।

থতমত খেয়ে শিশির বলে, কি বলেছি?

আপনি থাকেন নাকি বেলগাছিয়ায়। ডাহা মিথ্যে!

চটে গিয়ে শিশির বলে, কোথায় থাকি তবে?

অফিসে—

অফিসে বুঝি থাকতে দেয়! দারোয়ানদের কাছে জিজ্ঞাসা করে দেখুন না।

এই অবোধের সঙ্গে কথা বলে ভারি সুখ। পূর্ণিমা বলে, সন্দেহ থাকলে তবে তো জিজ্ঞাসা। আমার নিজের চোখে দেখা। একলা আমিই বা কেন, সবাই দেখে। ছুটির পর বাড়ি ফেরার সময় দেখি টেবিলে বসে কাজ করছেন, পরের দিন এসেও অবিকল সেই-ভাবে দেখা যায়। অফিসে থাকেন মানে শুয়ে ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করেন, এমন কথা বলছি নে—সারারাত্রি সমস্ত সকাল নিশ্চয় কাজ করে যান।

রসিকতাটা এতক্ষণে বুঝি হৃদয়ঙ্গম হল। কৈফিয়তের সুরে শিশির বলে, কাজের মোটে শেষ নেই—

নেই তায় রক্ষা। শেষ হয়ে গেলে মনিবে কি মাইনে দিয়ে রাখবে? চাকরি চলে যাবে। এক সঙ্গে অত কাজ করে না—চলুন, বেরিয়ে পড়ি।

সুরটা আদেশের মতো। চকিতে শিশির একবার হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে।

পূর্ণিমা বলে, ছুটির মিনিট সাতেক বাকি এখনো। ওতে কিছু যায় আসে না। এ অফিসে আসে সবাই যেমন দেরি করে, সকাল সকাল চলে গিয়ে সেটা পুষিয়ে নেয়।

'না' বলা শিশিরের পক্ষে অসম্ভব। আবার চোখ তুলে ওদিকে দেখে নটবরের গৃধ্রবৎ সুতীক্ষ্ন দৃষ্টি। থতমত খেয়ে জড়িত কণ্ঠে বলে, আজ্ঞে—

পূর্ণিমাও দেখে নিয়েছে নটবরকে। অন্তরাত্মা জ্বলে ওঠে। এর পরে আর দ্বিধা-সঙ্কোচ নেই। শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, ক্ষিধে পেয়ে গেছে। রেস্তোরাঁয় গিয়ে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক আগে।

অপাঙ্গে দেখে নিল, শুধুমাত্র দৃষ্টি নয়—নটবরের কানও এদিক পানে বাড়ানো,

সিকিখানা কথা ফসকে না যায়। খিলখিল করে হেসে কথা শেষ করে : খেয়েদেয়ে তারপরে কি করা যাবে? নৌকো নিয়ে গঙ্গার উপর ঘুরব—কেমন?

শিশির স্তম্ভিত। সত্যি সত্যি বলছে এইসব, না কানে ভুল শুনছে? বলছে তাকেই তো, না লোক ভুল করেছে।

গলা নামিয়ে পূর্ণিমা এবারে উপদেশ ছাড়ছে : বেশি খেটে মুনাফা নেই। এক গুণ সারলেন তো চার গুণ এসে পড়বে। সেকশনে বেশি কাজ হচ্ছে বলে নামযশ নেবেন নটবরবাবু। আপনার কানাকড়িও নয়। কাজে ফাঁকি দিয়ে বরঞ্চ কর্তাদের যদি তোয়াজ করতে পারেন, ধাঁ-ধাঁ করে উন্নতি। নটবরবাবু সারাদিনের মধ্যে দশ-পনেরটা সই ছাড়া কিছু করেন না। পরনিন্দা পরচর্চাতেই দিন কেটে যায়—সময় কোথা? এক লাইন ইংরিজি লিখতে কলম ভাঙে, তবু ডিপার্টমেণ্টের বড়বাবু হয়ে গ্যাঁট হয়ে আছেন। কিসের গুণে জানেন?

বলছে মুখে আর ঝুঁকে পড়ে দু'খানা হাতে ফসফস করে শিশিরের ফাইলপত্তর গুছিয়ে দিচ্ছে। এবারও নিচু গলা—বিড়বিড় করে বলে, কোন্ গুণে বড়বাবু হওয়া যায় শিখে নিন—সামনে ঐ আদর্শ বড়বাবুটি হাজির। জি-এম মুস্তফি সাহেবের বাড়ির বারান্দায় একাদিক্রমে বিশ বছর দাঁতন করেছেন উনি। দাঁতন শেষ করে চাকর সঙ্গে নিয়ে বাজার করতে যেতেন। মুস্তফি-গিন্নি ওঁর কেনাকাটা বড় পছন্দ করতেন। মুস্তফি সাহেব রিটায়ার করলেন, তারই মাস ছয়েক আগে দাদুর তপস্যার সিদ্ধি। আর, সব অফিসেরই নিয়ম হল একবার উঠে পড়লে তারপরে আর নামতে হয় না।

চলল দু'জনে। শিশির নিজের ইচ্ছেয় ঠিক যাচ্ছে না, তাকে যেন বগলদাবা করে নিয়ে যাচ্ছে। সোজাসুজি দরজা দিয়ে বেরিয়ে সুখ হয় না—যাচ্ছে ঘুরপথে নটবরের টেবিলের সামনে দিয়ে। নটবর এই সময়টা একটু ব্যস্ত—লাটুবাবু এসে আড়াল করে দাঁড়িয়েছেন, হাতে একতাড়া কাগজ—সইয়ের জন্য কতকগুলো এগিয়ে ধরেছেন, আর হাত-মুখ নেড়ে বোঝাচ্ছেন কি-একটা জিনিষ। পাছে নজর এড়িয়ে যায়—পূর্ণিমা সেখানটা থমকে দাঁড়াল একমুহূর্ত, বাঁ-হাত দিয়ে শিশিরের ডান হাতটা চেপে ধরল। নটবর চোখ তোলেন না, খসখস করে সই মেরে যাচ্ছেন। চোখ তুলতে হবে না, পূর্ণিমা জানে—বিনি চোখেই উনি দেখতে পান। হাসতে হাসতে শিশিরকে নিয়ে এবারে সে বেরিয়ে পড়ল।

লাটুবাবু অন্তরঙ্গের মধ্যে পড়েন না, লোকাভাবে তবু নটবর তাঁকেই সাক্ষি মানেন : দেখলেন মশায়? অফিসের ভিতরেই বেলেল্লাপনা—অরাজক অবস্থা চলেছে। স্ত্রীলোক ঢোকানোর এই পরিণাম। দিব্যি ছিল—রান্নাঘরে রাঁধাবাড়া নিয়ে। থাকত। স্ত্রী-শিক্ষার নামে কতকগুলো নচ্ছার ছুঁড়ি দেগে ছেড়ে দিয়েছে—ভেড়াকান্তগুলোর মাথায় হাত বুলিয়ে চরেফিরে খাচ্ছে এখন—

নটবরও উঠে পড়লেন। লাটুবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, যাচ্ছেন নাকি দাদু? সই আরো আছে, এই ক'টা সোর দিয়ে যান।

বিরস মুখে নটবর বলেন, কাল হবে। পাঁচটা না বাজতে সবাই উঠে পড়ে, আমারই বা কোন্ দায় পড়েছে? পঁয়তাল্লিশ বছর একটানা খেটে এসেছি, আর নয়। আপনারও মশায় ঘরবাড়ি নেই? চলে যান। ছোঁড়াছুঁড়িদের দেখে শিখে নিন। যা-কিছু বাকি থাকে, কাল করব।

ছুটলেন বুড়োমানুষটা—রেসের ঘোড়া কোথায় লাগে!

ছুটির মুখটায় অফিসপাড়ার রাস্তায় বিষম ভিড়। বাইরে এসেই দু'জনে আলাদা

হয়ে গেছে, হতে বাধ্য হয়েছে। দিব্যি খানিকটা ফাঁক রেখে চলছে। বাঁচল শিশির, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল রে বাবা।

কিন্তু কতক্ষণ! চিলের মতন আচমকা পূর্ণিমা শিশিরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চরম অবস্থা। সংকোচে আত্মরক্ষার তাগিদে শিশির দেহে যেন এতটুকু হয়ে গিয়ে পিছলে পড়বার চেষ্টা করে। কিন্তু সাধ্য কি! সেদিনের সেই টিফিনের সময় বেকুব হয়ে গিয়ে পূর্ণিমা আজ রীতিমত সতর্ক। হাতে হাত জড়িয়ে নিয়েছে সকলের আগে। দেখি যাদু, পালাও কেমন করে! হাতে হাত বেঁধে একেবারে গায়ের উপর। শহুরে মেয়ের এত কাছাকাছি এই প্রথম—অফিসে ঢোকার পর থেকে ক'দিন এই যা চলছে। লজ্জা করছে, তবু একটা স্নিগ্ধ সুরভি মনের মধ্যে নেশা ধরিয়ে দেয়। মুক্তি লহমার মধ্যে আদায় করে নিতে পারে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে মেয়েটাকে। ইচ্ছা করছে না, সেটা বর্বরতা বলে মনে হয়।

দরকারও হল না। মিনিট কতক পরে হাত ছেড়ে দয়াবতী নিজেই দূরে সরে গেল। আগের মতন ব্যবধান রেখে চলেছে।

কথা বলল পূর্ণিমা। কলকাকলী কোথায় উপে গেছে, কলহ দস্তুরমতো। তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে বলে, আমি জঘন্য—তাই নয়?

শিশির আকাশ থেকে পড়েঃ সে কী কথা!

খুব কুরূপ-কুৎসিৎ?

শিশির প্রবল ঘাড় নাড়েঃ না-না-না—

কাছে যাচ্ছিলাম, আপনি অত সংকুচিত হচ্ছিলেন কেন তবে? গায়ে গা ঠেকে যায় পাছে—এই না?

বাঃ রে, তা কেন হবে!

পূর্ণিমার কণ্ঠস্বর ধাপে ধাপে ঝাঁঝালো হচ্ছে। ঘাড়ের ঝাঁকুনিতে শিশিরের আমতা-আমতা প্রতিবাদ উড়িয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। বলে, প্রেমে পড়ে গেছি হয়তো ভাবলেন। প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি।

শিশির বলে, আজ্ঞে না। দু'টো দিনেরই বা পরিচয়—আহাম্মকের মতো অমন আজব ভাবনা ভাবতে যাব কেন? তা ছাড়া আপনারা হলেন সভ্যভব্য রমণী, আমি পাড়াগাঁ থেকে আসছি—

আরো বিস্তর বলতে যাচ্ছিল শিশির, ঘাড় নেড়ে পূর্ণিমা স্বীকার করে নেয়ঃ খাঁটি সত্যি। কথাগুলো মনে করে রাখবেন, তা হলে আর সংকোচ আসবে না, সহজ হয়ে মিশতে পারবেন।

একটু থেমে আবার বলে, মনে রাখবেন পাঁচ-সাত বছর পুরুষ নিয়ে ঘর করছি। ঘর-গেরস্থালি নয়, যা মেয়েরা একটিমাত্র পুরুষের সঙ্গে করে। পুরুষের দঙ্গল নিয়ে ঘরের মধ্যে পাশাপাশি বসে কাজ করি। কাপুরুষ লুব্ধ ভণ্ড কপটই তাদের মধ্যে বেশি। রামায়ণের সীতা একবার অগ্নিপরীক্ষা দিয়েছিলেন—আর আগুনের মধ্য দিয়ে অহরহ চলাফেরা আমাদের, শতেকবার অগ্নিপরীক্ষা। প্রেম পায়ে-পায়ে ঘোরে—টাকায় বড়, প্রতিষ্ঠায় বড়, বিদ্যাবুদ্ধিতে বড়, চেহারায় চমকদার, কতজনে এমন ছোঁক-ছোঁক করে বেড়িয়েছে। এত সব সমুদ্রে বাতিল করে দিয়ে খানাখন্দে নিশ্চয় ডুবে মরতে যাব না। তাহলেও যেচে ঘনিষ্ঠতা করছি, পালাতে গেলে গ্রেপ্তার করি। কেন বলুন তো?

আকাশ-পাতাল হাতড়ে জবাব খুঁজে পায় না শিশির। চুপ করে থাকে।

পূর্ণিমা বলে, আমি বলি তবে। খোলাখুলি বলছি। আলাপ করতে এসেছিলাম

গোড়ায় আক্রোশ নিয়ে। মুখে হাসি ছিল, আর মনে মনে ছুরি শানাচ্ছি—কেমন করে জব্দ করব আপনাকে।

শুষ্কমুখে সভয়ে শিশির বলে, আক্রোশ কেন? অপরাধটা কি আমার?

হুট করে এসে চাটুজ্জের চেয়ার দখল করলেন—উপর থেকে এনে বসিয়ে দিল। তার আগে অফিস-বাড়ির ছায়াও মাড়ান নি কোন দিন। এর চেয়ে বড় অপরাধ কি আছে? ভাল লাগে এ জিনিষ? কেন রটনা হবে না, উপরওয়ালার চর আপনি—চাকরির ছলে আমাদের মধ্যে থেকে গুপ্তকথা উপরে রিপোর্ট করবেন বলে পাঠিয়েছে?

শিশির বলে, কী সর্বনাশ! দেশ ছেড়ে এসে পথে-পথে ঘুরছি—অসহায় অবস্থা। কর্তাদের তাই দয়া হল। এ ছাড়া অন্য কারণ তো খুঁজে পাই নে।

মুশকিল সেইখানে। বড়লোকে দয়া করে, সহজে কেউ বুঝতে চায় না। দয়াটা অকারণ নয়, তারপরে অবশ্য বোঝা গেল। দামসাহেব মাঝে ছিলেন। দাম প্রসন্ন থাকা মানে অঢেল কণ্ট্রাক্ট। তাঁর খাতিরে একটা চাকরি কিছুই নয়। ভিতরের বৃত্তান্ত ফাঁস হয়ে গেল তো আপনার সর্বনাশ অন্যদিক দিয়ে। কেউটেসাপ সন্দেহ করেছিল, এখন জেনে ফেলেছে নির্বিষ ঢোঁড়া।

দু'জনে পাশাপাশি চলেছে এখন।

হেসে উঠে পূর্ণিমা আবার বলে, ভাঁটে ছিলেন, উপরওয়ালার লোক বলে সবাই ভয় করত। ভয় ঘুচে গেল। নরম মাটি কেঁচোয় খোঁড়ে—ভাল মানুষ, নরম মানুষ পেয়ে নটবরবাবু আপনাকে নাজেহাল করছে। এত অন্যায় চোখ মেলে দেখা যায় না—গিয়ে পড়ি মাঝে-মাঝে, আপনাকে উদ্ধার করে আনি। রাগে পড়ে নটবর-দাদু অকথা-কুকথা রটাচ্ছেন। কানে আপনার একটু-আধটু নিশ্চয় উঠেছে। সাগরেদদের নিয়ে ফুসফুস গুজগুজ করেন, চোখেও ঠিক দেখেছেন।

তটস্থ হয়ে শিশির ঘাড় নাড়েঃ আমি কিছু জানি নে তো।

পূর্ণিমা বলে, তাই বটে! 'পুত্তলিকার চক্ষু আছে দেখিতে পায় না, কর্ণ আছে শুনিতে পায় না।' আমি পুতুল নই বলে চোখে কানে আমার সমস্ত পড়ে। যে জিনিষ ও'রা ঠারে-ঠোরে বলতে চান, আমি তাই অভিনয় করে চোখের উপর দেখিয়ে আনলাম। অভিনয়—সত্যিকার কিছু নয়। এ জিনিষ চলবেই মাঝে-মাঝে বুড়োমানুষটার খাতিরে। ঐ যে, দেখুন না—

চোখের ইঙ্গিত দেখাল। মোড় ঘুরে এসে নটবরকে দেখা যাচ্ছিল না, বেশ খানিকটা দূরে সেই মূর্তির পুনশ্চ উদয়। আহা রে, অফিস অন্তে বুড়োমানুষ বাড়ি গিয়ে কোথায় বিশ্রাম করবেন - তা নয়, গুপ্তচরের মতন পিছন ধরেছেন। অফিসের নৈতিক আবহাওয়া ঠিক রাখার দায় যেন ঐ মানুষটার উপর।

মুহূর্ত মাত্র দেরি নয়, পূর্ণিমা হাত জড়িয়ে ধরল শিশিরের। কানের কাছে মুখ এনে অধীর বিরক্তিতে বলে, জ্বালাতন—জ্বালাতন! একটা জায়গায় যাওয়ার বড় দরকার—তা দাদুকে নিরাশ করে যাই কি করে! ও'র মুণ্ডু ঘুরিয়ে রাতের ঘুম নষ্ট করে তবে যাব।

বলে, আর উচ্ছ্বসিত হাসি হাসে। হাসিতে ঢলে-ঢলে পড়ছে। নটবর একদৃষ্টে তাকিয়ে পথ চলছেন। হোঁচট খেয়ে রাস্তায় গড়িয়ে পড়তেন আর একটু হলে—কোন গতিকে সামলে নিলেন। আর শিশিরেরই বা কী অবস্থা! পারলে এই রমণীর হাত ছাড়িয়ে বিদ্যুৎ-গতিতে ছুটে পালাত।

হঠাৎ বুঝি পূর্ণিমার খেয়াল হল, রাস্তায় মাত্র নটবরের দুটি চক্ষু নয়—বিস্তর চক্ষু

তাদের দিকে। যেন শূলের ফলা দিয়ে খোঁচাচ্ছে।

পূর্ণিমা বলে, চলুন এই রেস্তোরাঁর ঢুকে পড়ি। দাদুর ধৈর্যের পরীক্ষা করব—বেরুনো অবধি দাঁড়িয়ে থাকেন, না বিরক্ত হয়ে বিদেয় হয়ে যান।

প্রতিবাদে শিশির কিছু বলবে, তার কি অবসর দিল ছাই! লেখাপড়া-জানা শহুরে মেয়ে কেমনধারা চিজ, কিছু কিছু শোনা ছিল বটে—হাতে কলমের অভিজ্ঞতা এই প্রথম। পুতুল-নাচের পুতুল বানিয়ে ইচ্ছা মতন নাচাচ্ছে—দিশা করতে দেয় না।

রেস্তোরাঁর সকলে বসে খাচ্ছে-দাচ্ছে, সে জায়গায় নয়—নিয়ে তুলল ছোট্ট কেবিনের ভিতর। নিজে একটা চেয়ার নিয়ে শিশিরকে পাশেরটা দেখিয়ে দিল পূর্ণিমা: বসুন—

ছোঁড়া-বয়টা মিটিমিটি হেসে মেনুর কার্ড শিশিরের দিকেই এগিয়ে দিল। এসব জায়গায় খেয়েছে কি কখনো—কার্ড হাতে হতভম্ব হয়ে থাকে সে। বুঝেসুঝে পূর্ণিমাও চুপ করে আছে। কী করে দেখা যাক, কী অর্ডার দেয় পাড়াগেঁয়ে জ্ঞানবুদ্ধি অনুরায়ী।

চা আর—। বিপন্ন মুখে শিশির পূর্ণিমার দিকে তাকাল। সমাধান আসে না। ঠোঁট টিপে হাসছে মনে হয়। শিশিরকে অপদস্থ করে মজা দেখবে।

চুলোয় যাক গে। চা আর—। গোড়ার চারটে পদ পড়ে গেল সে পর পর। খাদ্য তো বটেই—ঐ ঐ নামে যা দেবে, খাওয়া যাবে নিশ্চয়।

এতগুলি নাম শোনার পর এতক্ষণে দেবীর বুঝি কানে ঢুকল। শিশিরের হাত থেকে মেনু-কার্ড ছিনিয়ে নিয়ে বলে, নিয়ে এসেছি আমি, অর্ডার আমিই দেব।

যা বলবার বলে বয়কে বিদায় দিয়ে শিশিরের দিকে অতঃপর পরিপূর্ণভাবে তাকায় পূর্ণিমা।

কলহের সূত্রপাত নাকি আবার—নিরিবিলি জায়গাটা নিয়েছে কোমর বেঁধে ঝগড়া করবে বলে?

পূর্ণিমা বলে, ছটফট করছেন না—ভাল লাগছে তাহলে?

তা লাগছে—। তারপরে শিশির মরিয়া হয়ে বলে ফেলে, কিন্তু গরমও লাগছে। মানে এই খুপরি থেকে বাইরে গিয়ে এসলে হত না?

না। পূর্ণিমা সজোরে ঘাড় নাড়ে: আমার খাওয়া মাটি হয়ে যাবে। পুরুষের সামনে মেয়েরা মন খুলে খেতে পারে না?

শিশির যেন পুরুষ নয়—কথা সেইরকম দাঁড়াচ্ছে কি না? একবার ঐ যে পুত্তলিকা বলেছিল, ঠিক ঠিক সেই বস্তু ধরে নিয়েছে। প্রতাপ আমার জানো না রমণী। বিদেশে-বিভুঁয়ে মরে আছি— মড়ার কথা বলতে নেই, যা বলছ সয়ে যাচ্ছি।

হঠাৎ পূর্ণিমা বলে, চায়ে বসিয়ে কাজকর্ম পণ্ড করছি নে তো আপনার?

কাজ আর কি! মেসে অনেক রাত করে ফিরি। যে-ঘরে থাকি, পাশার হুল্লোড় সেখানে। তার মধ্যে শোওয়া কেন বসবারও জায়গা থাকে না। রাত ন'টা সাড়ে-ন'টা অবধি আড্ডা চলে, আড্ডা ঠাণ্ডা হয়ে গেলে তবে মেসে যাই।

পূর্ণিমা অবাক হয়ে বলে, কী সর্বনাশ! ঐ রাত্রি অবধি পথে পথে ঘোরা—

পথে ঘুরি বটে, তবে উদ্দেশ্যও থাকে। ঘর খুঁজে বেড়াই। ঘর আমার চাই-ই—এই মাসের ভিতর। এক-একদিন শিয়ালদা অথবা হাওড়া স্টেশনে চলে যাই। আমার অঞ্চলের মানুষ দেশভুঁই হারিয়ে এদিক সেদিক ছুটোছুটি করছে—স্টেশনে চেনা মানুষ যদি বেরিয়ে পড়ে, তাদের ধরে একটা আস্তানার যদি জোগাড় হয়।

একটু থেমে কাতরস্বরে পূর্ণিমাকে বলে, বলেছিলেন ঘর খুঁজে দেবেন—ভুলে যাবেন না সেটা। তাড়াতাড়ি দরকার—কাল হয়ে যায় কালকেই গিয়ে উঠব, পরশু অবধি দেরি করব না। এমনি অবস্থা। মেস ছাড়বার জন্য পাগল হয়েছি—দূরে বলেই নয়, পাড়া-গাঁয়ে নিরিবিলি-থাকা মানুষ, মেস জায়গা আদপে সহ্য হয় না আমার। তার উপর ঐ আড্ডা। বলব কি আপনাকে—আড্ডার আতঙ্ক হয়েছে। স্বপ্নে দেখি ঐ পাশাখেলা—'কচে বারো' হুঙ্কার শুনে কেঁপে ঘেমে ঘুম ভেঙে লাফিয়ে উঠি বিছানার উপর।

বলছে হাসির ঢঙে, কিন্তু না হেসে পূর্ণিমা ক্রুদ্ধস্বরে বলে, সোজাসুজি বলতে পারেন না, খেটেখুটে এসেছি, বিশ্রাম এবারে, আড্ডা চলবে না। চক্ষুলজ্জায় বাধে—উঁ? দেখুন, আপনাদের মত নিপাট ভালোমানুষগুলো দু'চক্ষের বিষ আমার।

কথার উত্তাপে শিশির কৌতুক বোধ করে। কৈফিয়তের সুরে বলে, মেস-জায়গা, সবাই প্রধান—কার কথা কে কানে নিতে যাবে। তা ছাড়া নিজে আমি মেম্বার নই, একজন মেম্বারের ফ্রেণ্ড হয়ে তার সিটে আছি। সিটের মালিক নিজেই হল পয়লানম্বরের আড্ডাধারী। তবু তো ন'টা দশটার মধ্যে শেষ করে দেয়। চালাত যদি সকালবেলা অবধি, আর পাশার বদলে ঢাকের বাজনা জুড়ে দিত, তাহলেই বা কি করতে পারতাম?

পূর্ণিমা বলে, লেগে পড়ছি ঘর দেখতে। নইলে তো আপনি মারা যাবেন। কেমন ঘর চাই, খুলে বলুন। ক'টা ঘর—মানুষ ক'জন আপনারা?

একলা। সেদিক দিয়ে সুবিধা আছে। যেমন-তেমন একটা ঘর হলেই চলবে।

নির্জলা মিথ্যা বলল। কিন্তু সামান্য পরিচয়ে যুবতী রমণীর কাছে গোটা মহাভারত কেন শোনাতে যাবে? মিথ্যাটা এখনই হাতে-নাতে ধরে ফেলবে কেউ যদি খপ করে বাঁ-দিককার পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেয়। হাত ঢুকিয়ে মমতার পোস্টকার্ডখানা বের করে আনে। পোস্টকার্ড আজকেই এসেছে অফিসের ঠিকানায়। মমতার চিঠিতে শিশির ঠিকানা দেয় নি—সুনীলকান্তি পাছে মেস অবধি হামলা দিয়ে পড়ে। কিন্তু মারাত্মক বোকামি করে বসে আছে, এখন সেটা মালুম হচ্ছে। চাকরির কথায় সুনীল ঠাট্টা-তামাসা করত, তারই জবাবে শিশির বাহাদুরি করে জানিয়েছিল—শুধু চাকরি পেয়েছে, তা-ই নয়, সুবিখ্যাত হার্মান প্লাম্বার্সের চাকরি। ব্যস, ঠিকানা পেয়ে গেল ঐ থেকে—মেসের না হোক অফিসের ঠিকানা। ঠিকানা চেপে রাখতে পারলে বেশ খানিকটা সামলানো যেত। কলকাতা শহর বৃহদরণ্য বিশেষ—এখানে কোন্ শাখায় কে বাসা বেঁধেছে, খুঁজে বের করা কঠিন। মেয়ে জিনিষ খানাখন্দে ছুঁড়ে ফেলবার নয়—এক মাসের জায়গায় দু'-তিন মাস হলেও ঘরে রাখতে বাধ্য হত। গালিগালাজ করত নিরুদ্দেশ শিশিরের উদ্দেশে, তবু না রেখে উপায় ছিল না। বাহাদুরি দেখাতে গিয়েই মাটি হল সমস্ত।

নিশ্বাস ফেলে শিশির আরও জুড়ে দিল: কেউ নেই আমার। মা ছিলেন, তিনিও চলে গেলেন। মুক্তপুরুষ আমায় বলতে পারেন। মা মরার পর সর্বস্ব ফেলে হিন্দুস্থানে এই ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছি। ঘর তাড়াতাড়ি চাই। দালাল ধরলে হয়তো হয়। আমি তো কায়দা-কৌশল জানি নে—আপনি যদি জুটিয়ে দেন দয়া করে। এখন যা অবস্থা, পথে পড়ে না মরি কোনদিন।

মিথ্যা পুনশ্চ। একলা মা নন, মায়ের আগে পূরবী চলে গেছে পথের কণ্টক একটি ফেলে। যার জন্যে নাস্তানাবুদ হচ্ছি। এক-একটা দিন যায়, আতঙ্কে হিসাব করি মাস পুরতে ক'টা দিন বাকি আর।

এত সব বলা যায় না শহুরে শিক্ষিত মেয়ের কাছে। তার বয়সে কলেজই ছাড়ে না

কত জন—ক্লাস-রেজিস্টারে ছাত্র নাম বজায় রেখে ফুর্তিফার্তি করে বেড়ায়। আর শিশির ইতিমধ্যে একপ্রস্থ সংসারধর্ম করে মেয়ের বাপ হয়ে বসেছে রীতিমত। এসব বলে হাস্যাস্পদ হবার মানে হয় না। আজব দর্শনীয় বস্তু ভেবে পূর্ণিমা ড্যাব-ড্যাব করে তাকাবে তার দিকে, হাসতে হাসতে হয়তো বা মূর্ছিত হয়ে পড়বে।

খাবার এসে গেল। বাঁচোয়া—কথার ছেদ পড়ে সেইদিকে মনোযোগ এখন। সর্বনাশ, ছুরি কাঁটা দিয়ে গেছে আবার! আজব স্বভাব শহুরে মানুষের। দু-দুখানা পা দিলেন ঈশ্বর—মোজায় মুড়ে সযত্নে বস্তুদুটো রেখে দাও, পায়ের কাজের দায় ট্রাম-বাস-ট্যাক্সিতে নিয়ে নিয়েছে। পঞ্চঅঙ্গুলি সহ এমন এক-একখানি হাত—তা আঙুলে যেন বিষ মাখানো, খাদ্যের সঙ্গে কদাপি ছোঁয়া না লাগে, জটিল এই সব যন্ত্রপাতি সহযোগে গলাধঃকরণ করো—

বেকুব হবার ভয়ে শিশির শুধু চায়ের বাটি তুলে নিয়ে মুখে ঠেকাল। এই জিনিষটা মুখে তোলবার এখন অবধি কল বেরোয় নি।

পূর্ণিমা বলে, কি হল, খাবার কিছুই যে ছোঁন না। খাসা কাটলেট করে এরা, খেয়ে দেখুন।

চালাক মেয়ে—শিশিরের এহেন অরুচির কারণ ধরে ফেলেছে ঠিক। এবং সহানুভূতিশীলাও বটে। মুখ বিকৃত করে বলে উঠল, মাগো, কী নোংরা! কাঁটা-চামচে ধোয় না ভাল করে। হাতেই খাওয়া যাক—কি বলেন?

বাঁচিয়ে দিলে রে বাবা! বেলা ন'টায় নাকে-মুখে চাট্টি খেয়ে সেই বেলগাছিয়া থেকে ঝুলতে ঝুলতে এসেছে, দেহ চনমন করছে ক্ষিধেয়—হেন অবস্থায় কতকগুলো উত্তম উত্তম খাদ্য সামনে নিয়ে ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকা! ছুঁতে পারছিল না কাঁটা-চামচের ভয়ে। সেসব দয়াবতী স্বহস্তে সরিয়ে দিল। পূর্ণিমা হাতে খাচ্ছে, শিশির তো খাবেই। তাহলেও কিছু ভয়ে রয়ে গেছে—ধীরে ধীরে রুচিসম্মত ভাবে খেতে হবে। গ্রাম্যরীতির গোগ্রাসে খাওয়া দেখলে হেসে ওঠে না কি করে পাশের এই সতর্ক মেয়ে-চৌকিদার।

ডান হাতের কব্জিতে ঘড়ি বাঁধা—খেতে খেতে পূর্ণিমা ঘড়ি দেখছে। পরম আগ্রহে শিশির বলে, তাড়া আছে বোধহয়?

না, তাড়া কিসের—

পরীতে হরণ করে গাছের মাথায় কি ঘরের চালে কিংবা দূর-দূরান্তরে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে তোলে—পাড়াগাঁয়ে গল্প চলিত আছে। এ-ও খানিকটা তাই—অফিস-ফেরতা মানুষটাকে ছোঁ মেরে রেস্তোরাঁর এই খোপে এনে তুলেছে। অব্যাহতি পেলে বেঁচে যায়। কাজও আছে—বেহালার দিকে ঘুরবে আজ।

পূর্ণিমা নিজেই তারপরে একটু একটু করে বলছে, আমার ভাই ডাক্তার। তার শাশুড়ির হার্টের অসুখ—সেকেণ্ড স্ট্রোক হয়েছে ভোররাত্রে—

শিশির উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, আরে সর্বনাশ, ভয়ানক ব্যাধি!

ভয়ানক কিছু হয় নি, শুনতে পেলাম। মাইল্ড এ্যাটাক। অফিসের জন্য নিজে যেতে পারি নি, ফোন করে জানলাম। যেতে ওরা মানা করছে, তাহলেও বোধহয় যাওয়া উচিত। কি বলেন?

আশান্বিত হয়ে শিশির বলে, নিশ্চয় নিশ্চয়। মাইল্ড বলে হেলা করবার জিনিষ নয়। ভুক্তভোগী আমি, আমার মা ঐ রোগে গেছেন। যাচ্ছেতাই রোগ—টুক করে প্রাণ টেনে নেয়, চিকিচ্ছেপত্তোরের সময় দেয় না একটু।

পূর্ণিমা দ্বিধান্বিত ভাবে বলে, এ রোগে কথাবার্তা বলা বারণ। গেলে কথাবার্তা বলবেন তো তিনি। আর একটু ইয়ে অর্থাৎ কথা-কাটাকাটি হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। দেখলে উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারেন। এইসব কারণে ভাবছি—

একটু ভেবে নিজেই আবার বলে, তবু একবার যাওয়া উচিত। আমার নিজেরই ভাল লাগছে না, তাছাড়া আমার ভাজ মুখে যা-ই বলুক, মনে মনে ভাববে—দেখ, মায়ের এতবড় অসুখে দেখতে এলো না। রোগীর কাছে না-ই বা গেলাম, বাইরে থেকে খবরাখবর নিয়ে আসব।

শিশির মহোৎসাহে সায় দেয় ঃ যাবেন বই কি! রোগীকে জানতে দেবেন না, আপনি গেছেন। তাহলে উত্তেজনার কারণ ঘটবে না।

দাম এবং যথোচিত টিপ্‌স্‌ মিটিয়ে বাইরে এলো তারা। এদিক-ওদিক উঁকি দিয়ে পূর্ণিমা বলে, নেই দাদু—এতক্ষণ কি আর থাকেন! দিব্যি এক মজা করা গেল। ওমা, বৃষ্টি হয়ে গেছে দেখি এর মধ্যে—বুড়োমানুষ বৃষ্টিতে হয়তো ভিজেছেন। কাল এর শোধ তুলবেন। সাঙ্গোপাঙ্গদের কলম ছুঁতে দেবেন না বোঝা যাচ্ছে। সারাদিন এই নিয়ে চলবে।

জলে ডুবে, আগুনে পোড় খেয়ে, হাতির পদতলে নাস্তানাবুদ হয়ে এরা তো এক-এক প্রহ্লাদ মার্কা মেয়ে—অপবাদে এদের মজা লাগে। শিশিরের আত্মারাম কাঁপছে, উপরওয়ালার কানে উঠে নতুন চাকরি খতম হয়ে না যায়। 'পড়েছি মোগলের হাতে খানা খেতে হয় সাথে' —নিতান্ত শহর জায়গা না হলে রমণীর পাশ থেকে সাঁ করে ছুটে পালাত।

নমস্কার! কাল দেখা হবে আবার অফিসে—

বাস এসে গেল, উঠে পড়ে পূর্ণিমা হাসিমুখে তাকিয়ে আছে। যাচ্ছে চলে, তখনো ভয় ধরিয়ে যায় আগামী দিন মনে করিয়ে দিয়ে।

নিরিবিলি পেয়ে শিশির পকেট থেকে মমতার চিঠি বের করল। অফিসে কাজের ভিড়ের মধ্যে তাড়াতাড়ি একবার চোখ বুলিয়ে পকেটে রেখেছিল। ভিতরের অর্থ তলিয়ে দেখছে এইবার। চিঠি নয়, যেন আদালতের সমন। এই রবিবারে কুসুমডাঙা যেতে হবে কন্যা-দর্শনে। না গেলে, ভয় দেখিয়েছে—সুনীলকান্তি এসে পড়ে ধরে নিয়ে যাবে। পুলিশ দিয়ে অ্যারেস্ট করানোর মতো।

কুমকুমের প্রশংসা দিয়ে চিঠির আরম্ভ ঃ এমন মেয়ে হয় না। ভালো আছে সে, খেলাধুলো হাসিখুশিতে বেশ আছে, তার জন্যে চিন্তা নেই। শান্তশিষ্ট এমন মিশুক মেয়ে আমরা দেখি নি। তুমি যে একেবারে ডুব মেরে বসেছ, কারণটা কি? কিসের লজ্জাসংকোচ বুঝি না। এ বাড়ির কর্তাটিও অফিসের চাকরি করে। রেলে মাত্র ঘণ্টা-খানেকের পথ—রবিবারেও আসার সময় হয় না, আমরা কেউ বিশ্বাস করি নে। এই রবিবারটা দেখব আমরা, না এলে ও তোমার অফিসে গিয়ে পড়বে—

অফিসের অনিলবাবুর বাড়ি বেহালায়। শিশিরের পাশেই তাঁর সিট—ঘরের জন্য তাঁকেও সে ধরেছে। অনিল বলেছেন, যাবেন আমার বাড়ি, দুজনে মিলে পাড়া ধরে ধরে খুঁজব।

আজকে ঠিক করেছে, বেহালার দিকে যাবে। শহরের ভিতর কোন আশা নেই, শহরতলিতে কপালক্রমে যদি মিলে যায়—

ঘর মেলে তো রবিবারেই মেয়ে নিয়ে আসবে—চামার লোকদের সঙ্গে তারপরে কিছুমাত্র আর সম্পর্ক নেই। মেসের ঠাকুরের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে, ঘর জুটিয়ে দিলে সে

এসে কুমকুমের ভার নেবে। মাইনে অবশ্য মেসে যা পায় তার ডবল। তাহলেও মানুষটা ভাল—ক'টা দিন নেড়েচেড়ে কুমকুমের উপর মায়াও পড়েছে ঠিক। নইলে শুধু টাকার লোভে রাজী হত না।

॥ আঠাশ ॥

নিউমার্কেটের কাছে পূর্ণিমা নেমে পড়ল। প্রথম এই কুটুম্ববাড়ি যাচ্ছে—খালি হাতে যাওয়া শোভন নয়। রোগীর কাছে কি নিয়ে যাওয়া যায়? ফলটল নেওয়া—সে বোধহয় হাসপাতালে চলে। কত বড়লোক ও'রা—পথ্য-ওষুধ নিশ্চয় পর্বতপ্রমাণ জমেছে এতক্ষণে। সেখানে কয়েকটা ফল হাতে করে যাওয়া হাস্যকর।

ফল নয়, ফুল। ভেবেচিন্তে পূর্ণিমা ফুল কিনল—বাণ্ড বাঁধিয়ে নিল দাঁড়িয়ে থেকে! ফুলই মানায় বড়লোক রোগীর পাশে। হাতঘড়িতে দেখল সাড়ে-সাতটা। এত রাত্রে রোগী দেখতে যাওয়া ঠিক নয়। তবে রোগীর সামনে যাচ্ছে না—বাড়িতে একটিবার হাজিরা দেওয়া, সম্মুখে জিজ্ঞাসাবাদ করে যাবতীয় খবরাখবর জানা। এর জন্য রাত করে যাওয়ায় দোষ হবে না। রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়েই দেরি। একজনকে আহ্বান করে নিয়ে কিছু না খাইয়ে বিদেয় করা যায় কেমন করে? একটা কাজ হয়েছে অবশ্য। বুড়ো-মানুষ নটবর আশায় আশায় পিছু নিয়েছিলেন প্রত্যাশা তাঁর ষোল আনা পূর্ণ হয়েছে। যা-কিছু দেখবার চর্মচক্ষে দেখে নিয়ে গেলেন। সেকশনে কাল কিছুমাত্র কাজকর্ম হবে বলে মনে হয় না। ফুসফুস-গুজগুজ এমনিতেই চলে থাকে—কাল একেবারে প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা।

ট্যাক্সি নিল একটা। বিলাসিতাটুকু বাধ্য হয়েই করতে হয়—বাসে-ট্রামে আরও কতক্ষণ নিত বলা যায় না। ঢুকে পড়ল ডাক্তার অপূর্ব রায়ের বাড়ি। এ-বাড়ি এই প্রথম এসেছে সে।

নিচের তলায় জনমানব নেই। করিডরে একটা আলো জ্বলছে শুধু। পূর্ণিমার বুকের মধ্যে কেঁপে ওঠে। খুব সম্ভব, বাড়াবাড়ি অবস্থা—উপরতলায় রোগীর শয্যা ঘিরে আত্মীয়জন বিমর্ষমুখ হয়ে বসে আছে, এমনি একটি ছবি মনে এসে যায়।

পায়ে পায়ে উপরে উঠছে। গোটা তিনেক ধাপ উঠেছে, একটা চাকর উপরতলা থেকে দ্রুত নেমে এলো। অবাক হয়ে তাকিয়ে পড়ে। এ-বাড়ির চাকর-বাকর অনেকেই তারণের বাড়ি গেছে। এ-লোকটা সম্ভবত নতুন, পূর্ণিমাকে চেনে না।

বলে, উপরে তো নয়—উপরে কেন যাচ্ছেন?

কথার সুরটা বিশ্রী লাগে। সন্দেহ করেছে কিছু যেন।

পূর্ণিমা বলে, মাকে দেখতে যাচ্ছি—

লনে আছেন তিনি—

কেমন করে পূর্ণিমা বিশ্বাস করবে! বুঝতে পারেনি লোকটা। তখন বিশদ করে বলে, বিজয়া দেবীর কাছে এসেছি—তিনি উপরে নেই?

বাড়ির পিছনে লন। সেইদিকে লোকটা আঙুল দেখাল: ওখানে রয়েছেন দেখুন গে। সকলে মিলে মার্কেটে গিয়েছিলেন, এক্ষুনি ফিরলেন। তারপরে আর উপরে ওঠেন নি।

হার্টের অসুখে ভোরবেলা যাঁর এখন-তখন অবস্থা, সেই মানুষ মার্কেটে ঘুরে এসে

লনে বসে গুলতানি করছেন, চিকিৎসার এমন হাতে-হাতে ফল বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু এক ধাপ উপরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লোকটা বলছে, পথ আটকে আছে। নেমে অগত্যা করিডরে আসতে হল। লন সেখান থেকে নজরে আসে।

একটা উৎসব হয়ে গেছে, একনজরে বোঝা যায়। চাঁদোয়া-টাঙানো লনের উপর, নিচু-টেবিল ও চেয়ার ইতস্তত ছড়ানো। ঐখানে নিমন্ত্রিতেরা বসেছিল। খানাপিনাও হয়েছিল—প্লেট-চামচে, ছুরি-কাঁটা, কাপ-ডিস টবের পাশে পড়ে আছে, চাকরটা সেই-গুলো ধোওয়ার কাজে লেগে গেল। ফুলের তোড়া একটা সে হাতে করে এনেছে—কত তোড়া কতদিকে চাঁদোয়া থেকেই ঝুলছে দশ-বারোটা।

থমকে দাঁড়াল পূর্ণিমা। জিজ্ঞাসা করে: আজ বুঝি অনেক লোকজন এসেছিল?

মুখ তুলে চাকরটা বলে, বেশি আর কী! ছোট পার্টি—দিদিমণি আর জামাইবাবুর বন্ধুরা শুধু। ছ'টার মধ্যেই সারা হয়েছে। ও'দের বিয়ের বছর পুরল কিনা আজ।

তাই বটে, আজকের এই তারিখেই তাপস আর স্বাতীর বিয়ে হয়েছিল। পূর্ণিমার খেয়ালে আসে নি। কী যেন হয়ে গেছে সে, অফিস আর টাকাকড়ি আর ঘরসংসার—তার বাইরে কোন-কিছু জানতে নেই। আনন্দলোক থেকে সে নির্বাসিত। কোনরকম চপল প্রসঙ্গ তার সামনে কেউ আনে না। বাবা থেকে শুরু করে সকলে মিলে দেবী বানিয়ে দিয়েছে, তুচ্ছ কথা তুলবে কোন্ ভরসায়! ভয় পায়।

আরও কয়েক পা এগুল পূর্ণিমা। লনে উঁকিঝুঁকি দেয়। উৎসব অন্তে আলো নেভানো, একদিকে শুধু একটা ল্যাম্পস্ট্যাণ্ড মৃদু আলো বিকিরণ করছে। রহস্য-ঘেরা আলো-আঁধারি ভাব। তাসের টেবিল পড়েছে সেইখানটায়—ও'রা তা খেলছেন। বিজয়া দেবী স্বয়ং, স্বাতী, তাপস এবং চতুর্থ ব্যক্তি—কে উনি আমুদেস্বভাব সুবেশা মহিলাটি? —দিদি অণিমা। কাশীপুর থেকে অণিমা পর্যন্ত নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছে—শুধু অণিমা কেন, রঞ্জুও। চারজনে ওরা তাসে মত্ত। বিজয়া দেবী আর জামাই পার্টনার, বিপক্ষ দলে অণিমা আর স্বাতী। তারণের বাড়ীর বউমানুষ যে স্বাতী, সে-স্বাতী এখানে নয়। উচ্ছল, হাস্যমুখী! অণিমা পর্যন্ত এ-বাড়ী এসে ভিন্ন মেজাজ নিয়েছে। ছোট্ট রঞ্জু অবধি—দাসী গোছের এক মেয়ে তাকে কোলে নিয়ে ঘুরছে।

যেন এক ভিন্ন জগৎ, স্বপ্নরাজ্য—এর মধ্যে পূর্ণিমার স্থান নেই, তাকে কেউ ডাকবে না। তার দৃষ্টিতে সমস্ত বুঝি জ্বলে-পুড়ে যাবে! জ্যোৎস্নাভরা এই রাত্রি সকলে মিলে আনন্দ করে কাটাবেন। ভোরবেলা দেবাশিষকে পাঠিয়ে মেয়ে-জামাই নিয়ে আসা হয়েছে—পূর্ণিমা না এসে পড়ে, বারম্বার ও'রা নিষেধ করে দিয়েছেন।

রঞ্জুকে নিয়ে মেয়েটা এইদিকেই আসে যেন। ফুল ভালবাসে রঞ্জু—তারণের বাসায় কয়েকটা বেলফুলের চারা হয়েছে, রঞ্জু এসেই আঁকুপাঁকু করে, তার জন্য কুঁড়ি পর্যন্ত তুলে দিতে হয়। আজ কত সুন্দর তোড়া গেঁথে এনেছে রোগীর জন্য—রোগীই যখন নেই, এ-জিনিষ রঞ্জুকে দিতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু ধরা দেওয়া চলবে না এখন এই অবস্থায়। বিনা নিমন্ত্রণে আগ বাড়িয়ে চলে এসেছে—সে বড় লজ্জার। এমনও ভাবতে পারে, ডিটেকটিভ-পুলিশের মতন চুপিচুপি খোঁজ নিতে এসেছে—অসুখটা সত্যি কিনা। মাথাকাটা যাবার ব্যাপার।

সরে পূর্ণিমা একটা থামের অন্তরালে দাঁড়ায়। রঞ্জুকে নিয়ে মেয়েটা করিডরে উঠল, সেখানে কাকাতুয়া দেখাচ্ছে। এ-জায়গা থেকে তাসের টেবিল একেবারে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তাসখেলার সঙ্গে গল্পগুজব, হাসাহাসি। কী একটা কথা নিয়ে মা-মেয়ে এবং অণিমার মধ্যে হাসির পাল্লা চলেছে যেন। বিজয়া দেবীর অবস্থা দেখ—শেষ-রাত্রে এত-

বড় রোগের প্রচণ্ড আক্রমণ, সারাদিন নাকি শয্যাশায়ী, সন্ধ্যার আগেই সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ—পার্টি সেরে মেয়ে-জামাই নিয়ে মার্কেটে ঘুরে মহানন্দে জিনিষপত্র কেনাকোটা করে ফিরলেন, খুব সম্ভব এই বিশেষ দিনে জামাই-মেয়ের জন্য উপহারের জিনিষ। অণিমা ও রঞ্জুকে ওঁরাই হয়তো কাশীপুর থেকে গাড়িতে তুলে নিয়ে এসেছেন। নিমন্ত্রণ পেয়ে নিজ থেকেও অবশ্য চলে আসতে পারে।

আর পূর্ণিমা দেখ, সকালবেলায়-পরা অফিসের কাপড়-চোপড়ে নিঃসঙ্গ দূরে দূরে দাঁড়িয়ে আছে। চাকরটা হাঁ-হাঁ করে সিঁড়ির পথ আগলে দাঁড়াল—চোরই ভেবেছিল হয়তো। পূর্ণিমা নিজেকে—উৎসব-দিনে ঢুকে পড়ে বেকুব করেছে, সকলের চোখ এড়িয়ে পালাতে পারলে হয়। নিউ মার্কেটে সে-ও গিয়েছিল ফুল কিনতে। দেখা হয়ে যেতে পারত—ভাগ্যিস তা হয় নি। লজ্জায় পড়ে যেতেন গুরুস্থানীয় মহিলা, কৈফিয়ৎ রচনা করতে গলদঘর্ম হয়ে যেতেন। পূর্ণিমার অবশ্য আর্থিক লাভ কিছু ছিল—ফুল কেনা এবং এই ট্যাক্সি করে আসার খরচা বেঁচে যেত।

ফুল নিয়ে কি করে এখন? পয়সার জিনিষ নষ্ট করতে মন চায় না, রঞ্জুর হাতে বাক্সটা দিতে পারলে হত। সেটা যখন সম্ভব নয়, সন্তর্পণে একটা বেতের চেয়ারে রেখে দিল। রঞ্জুর হাতে যাবার কোনই সম্ভাবনা নেই—তবু ফুল জিনিষ পথের ড্রেনে ফেলে দেওয়া চলে না, রঞ্জুর নামে এইখানে রেখে যাচ্ছে। ঠাকুরের নামে লোকে পুষ্পাঞ্জলি দেয়, সে আর ঠাকুর হাতে করে তুলে নিতে যান? দিয়ে যায় এই পর্যন্ত, দিয়ে পরিতৃপ্তি। তারপরে হয়তো বা সে জিনিষ গরু-ছাগলেই খেয়ে ফেলল।

এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে ফুড়ুৎ করে পূর্ণিমা বেরিয়ে পড়ল। রাস্তায় এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। দ্রুত পায়ে চলেছে।

বাড়ি ঢুকল।

আলো নেভানো। ভানু, ভানু—করে ডাকছে।

হার্মান কোম্পানীর চাকরি হবার পর ভানুমতীকে রেখেছে। কুসমির ছোট বোন ভানুমতী। কুসমিকে আর পাওয়া যাবে না, পূর্ণ মুখুজ্জের সঙ্গে কাশীবাস করছে সে। মহানন্দে আছে, চিঠি লিখেছিল সে-ও কাশীধাম থেকে: চমৎকার জায়গা। রাবড়ি ও পঁ্যাড়া অতিশয় সুস্বাদু, দামেও সস্তা। এবং বাবা-বিশ্বনাথ ও মা-অন্নপূর্ণার চরণাশ্রয়ে পরকাল নিয়েও কিছুমাত্র উদ্বেগের হেতু নেই—দেহরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিবলোকে গমন…

এমনি সব লিখেছিল কুসমি—পূর্ণ মুখুজ্জে যা লেখেন, হুবহু তাই। ছোট বোন ভানুমতীর কথা লিখেছিল: বর কারখানায় কাজ করে, মজুরি সামান্য। দুঃখ-কষ্টে আছে তারা। ভানুকে রেখে দাও—কতই বা কাজকর্ম তোমাদের, স্বচ্ছন্দে সে পারবে।

ভানুমতী সেই থেকে আছে। রাত্রে সে বাড়ি চলে যায়। কিন্তু এত সকাল সকাল তো চলে যাবার কথা নয়—

ডাকাডাকিতে তারণই উঠে আলো জেলে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে দোর খুললেন। তিথিটা পূর্ণিমার কাছাকাছি, বাতের ব্যথা বেড়েছে। বরের অসুখের নাম করে ভানুমতীটা আজ সন্ধ্যার পরেই সরে পড়ল। দেহের কষ্ট, তার উপরে নিঃসঙ্গ একাকী থেকে তারণ রাগে টং হয়ে আছেন। গজর-গজর করছে: যে-যার মজা নিয়ে আছে, আমার দিকে কে চেয়ে দেখে? পূর্ণ-দা ভাগ্যবান মানুষ, পুণ্যস্থানে গিয়ে আছেন। কত জন্মের মহাপাপে পড়ে পড়ে নরকভোগ আমার!

কটমট করে বারম্বার তাকাচ্ছেন মেয়ের দিকে। বাতের ব্যথা এবং বাড়িতে একলা

পড়ে থাকা—এর জন্যও অপরাধ নিশ্চয় পূর্ণিমার। তার উপর তৃতীয় অপরাধ, অন্য দিনের চেয়ে কিছু বেশি রাত্রি হয়েছে বাড়ি ফিরতে।

শান্তকণ্ঠে পূর্ণিমা বলে, শুয়ে পড়ো গে বাবা, তেল মালিশ করে দিচ্ছি, ব্যথা কমে যাবে।

কাপড় ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে বাপের হাঁটুতে কবিরাজী বাতের তেল মালিশ করতে বসল। এই কাজ সেরে এখুনি আবার রান্নায় যেতে হবে। ও-বেলার রান্না বাবা মুখে দেন না। একলা হলে রান্নার পাটে যেতোই না আজ। কিন্তু বাবা এক্ষুনি যে খিদে খিদে করে উঠবেন।

তেল মালিশ হচ্ছে, আরাম পেয়ে তারণ বকাবকি থামালেন এতক্ষণে। চোখ বুঁজেছেন। চোখ জ্বলে একবার বললেন, আলোটা নিভিয়ে দে পুনি।

উঠে গিয়ে পূর্ণিমা সুইস তুলে দিল। ঘর অন্ধকার। ডাক্তার অপূর্ব রায়ের বাড়ির তাসখেলা এখনো বোধহয় চলছে।

॥ উনত্রিশ ॥

গভীর নিশীথে নিদ্রাহীন শয্যায় পূর্ণিমার দুচোখে ধারা বয়ে যাচ্ছে। প্রতারণা আজকেই প্রথম নয়—সেই কবে থেকে এ-জিনিষ পেয়ে আসছে। সারা দিনমান সকলের সামনে এত প্রতাপ, কিন্তু তার মতন নিঃসম্বল নির্বান্ধব কে আছে দুনিয়ার ভিতরে?

বালিশ ভিজে যায় চোখের জলে—এত করে চোখ মোছে, থামে না। ট্যাক্সি করে সেই একদিন বাবা গড়ের মাঠে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে নিয়ে হাজির করলেন। কন্দর্পকান্তি তিন তরুণ পুরুষ এসে দাঁড়াল—সারারাত্রি না ঘুমিয়ে স্বয়ম্বর-সভার রাজকন্যার মতো ভাবছি, এই তিনের কোন্ জনের গলায় মালা দিতে বলবে। হায় রে হায়, মালা নিতে আসে নি তারা—বাবা আর পূর্ণ জেঠার অশেষ তাঁদিরে অফিসের দরজার পাশে তারা চেয়ার দিয়ে দিল—ঘরের বনিতা নই আমি, বাইরের খদ্দের টেনে ধরার ফাঁস-কল। সুশ্রী সুন্দর জীবন্ত কল একটা। ঘরের মানুষও কলে পড়বার গতিক দূর-দূর করে তখন আবার বিদেয় করে বাঁচে প্রতারণা চাকরির শুরু থেকেই চলছে।

সকালবেলা তাপস এসেছে। কাল ব্যস্ত হয়ে যে পোশাকে বেরিয়ে গিয়েছিল, ঠিক ঠিক সেই পোশাক। ভাবখানা, কাল দিনমান এবং সমস্তটা রাত্রি যেন এই পোশাকেই ছিল সে, শ্বশুরবাড়িতে দ্বিতীয় একপ্রস্থ পোশাকও নেই।

কণ্ঠে যতদূর সম্ভব উদ্বেগ এনে পূর্ণিমা প্রশ্ন করে: মা আছেন কেমন?

তাপস বলে, এই চোটটা সামলে যেতে পারেন। তবে নিশ্চিত হয়ে বলবার সময় আসে নি। রোগ বড় বেয়াড়া—কোন অবস্থাতেই ঠিক করে কিছু বলা যায় না। দিব্যি ভালো দেখা যাচ্ছে, খারাপ হয়ে পড়তে তারপর একটা মিনিটও লাগে না।

পূর্ণিমা ভাইকে তাড়া দিয়ে ওঠে: কু-ডাক ডাকিস নে তাপস। ভারি একেবারে ডাক্তার হয়ে গেছিস! খারাপ কেন হতে যাবেন—পর পরই ভালো হয়ে উঠবেন এখন। কত কষ্ট পাচ্ছেন, আহা! শুইয়ে রেখেছিস তো, না উঠে উঠে বেড়াচ্ছেন?

এ-পাশ ও-পাশ করতে দিই নে ছোড়দি। হার্টের উপর এতটুকু চাপ না পড়ে।

পূর্ণিমা বলে, কতবার ভেবেছি দেখে আসি গিয়ে। অফিস থেকে দু-বার ফোন করেছি। তুই ছিলি নে—একবার স্বাতী ধরল, একবার দেবাশিস। দু'জনেই মানা

কয়া—দেখাশনুো নাকি একদম বারণ। তেমন অবস্থায় কি করে যাওয়া যায়! বড় উদ্বেগের মধ্যে কেটেছে। তুই না এলে অফিসে গিয়েই আবার ফোন করতাম।

বলছে পূর্ণিমা আর তাপসের মুখভাব লক্ষ্য করছে। নিখুঁত চালিয়ে যাচ্ছে, তারই ছোটভাই তো—সেদিনের এতটুকু তাপস পূর্ণিমারই সমান অভিনয় শিখে গেছে। খারাপ রোগী সম্পর্কে ডাক্তারের যেমনটি হওয়া উচিত, সেই সুরে তাপস বলে, না গিয়ে খুব ভাল করেছিস ছোড়দি। গেলেই দুটো-একটা কথাবার্তা না হয়ে যায় না। রোগের পক্ষে বিষময় হত। এসব রোগীর কাছে ভিজিটর গিয়ে অনিষ্টই করে।

পূর্ণিমা বলে, তার উপরে আমি হেন ভিজিটর। সেদিন এই ঝগড়াঝাঁটি করে গেছেন। আমারও কী রকম মেজাজ চড়ে গেল, গুরুজন বলে রেহাই করি নি। তাই আরও সংকোচ হল, সংকোচ কেন ভয়ই বলব—ভয় হল যে, আমায় দেখে উত্তেজনা বাড়বে। এ-জিনিষ থাকতে দেবো না। অসুখ থেকে সেরেসুরে উঠুন, তারপরে একদিন গিয়ে মাপ চেয়ে আসব। কি বলিস?

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, তাপসের উদ্বেগ ভরা মুখে সোয়াস্তির ছাপ এবারে। তা বলে ধরা দেবে না। মেজাজ দেখিয়ে সে বলে, না ছোড়দি, সেরে গেলেও না। ওদের বাড়ি কোনদিনই তোর যাওয়া হবে না—যেতে দেবো না তোকে। বড়লোক নই বলে বাড়ি বয়ে এসে শক্ত কথা শুনিয়ে যায়—কিসের সম্পর্ক তাদের সঙ্গে? ডাক্তার মানুষ—অসুখে-বিসুখে ডাক এলে ছুটে গিয়ে পড়তে হয়, আমাদের পেশার নিয়ম এই। তার উপর তুই যেরকম তাড়া লাগালি, না গেলে রক্ষে রাখবি নে—ভয়ে ভয়ে তাই চলে গেলাম। সুস্থ হবার পরে একটা দিনও আর ওদিকে নেই। স্বাতী কি করবে জানি নে, আমার কথা আমি বলে দিলাম।

এ-সমস্ত কী কথার ঢং! গুরুজনের নামে এইরকম বলে বুঝি!

আগেও পূর্ণিমা এমনিধারা ধমক দিয়েছে। হাসি-হাসি মুখ—মনে মনে গরব: ছোড়দির তিলেক অসম্মান ভাই আমার সহ্য করতে পারে না। তাপস সত্যি সত্যি ছিল সেই মানুষ। আজ তাপস অভিনেতা হয়েছে। এবং পূর্ণিমাও কম অভিনেত্রী নয়। কথাগুলি অবিকল সেই আগেকারই বটে, কিন্তু মুখের উপরের সে-প্রসন্নতা কোথায় আজ?

পূর্ণিমা বলে, অতবড় রোগীকে ফেলে এসেছিল কোন্ বিবেচনায়? কম সময়ের জন্য হলেও উচিত হয় নি। নিজেই তো বলছিস, লহমার মধ্যে কত কি ঘটে যেতে পারে। কী হয়েছে আমাদের যে, দায়িত্ব ফেলে দেখতে এসেছিস? ঘণ্টা দুই পরে অফিসে আমায় তো টেলিফোনেই পাবি। উদ্বেগটা ততক্ষণ না হয় চেপে রইলি।

তাপস বলে, তোদের দেখাটাই শুধু নয়—অবরে-সবরে রোগীপত্তর আসেও তো এ-বাড়ি।

আর যেন না আসে—

তাপস বলে, যায় সবাই ডাক্তারখানাতেই। নিতান্ত সংকট-অবস্থায়—অতক্ষণ সবুর না সইলে তবে বাড়ি অবধি চলে আসে। একজন-দু'জন আসে কালেভদ্রে—

এখন থেকে ডাক্তার রায়ের বাড়ি যাবে তারা। সুবিধা রোগীদের—অষুধের জন্য ডাক্তারখানায় তো যাবেই, কাছাকাছি ডাক্তারকে পেয়ে গেলে ছুটোছুটির দায় বাঁচবে।

তাপস বলে, শ্বশুরবাড়ির ঘরজামাই হতে বলছিস ছোড়দি?

একটু থেমে আবার বলে, এ-বাড়ির ভাড়া তুই দিয়ে থাকিস। বুঝেছি, তোর ভাড়ার বাড়িতে আমায় আর থাকতে দিবি নে। তাড়িয়ে দিচ্ছিস।

ও'দের নিউ আলিপুরের ফ্লাট নিয়ে নে তবে। ফ্লাটের ভাড়া তুই এখন স্বচ্ছন্দে দিতে পারবি। খবর রাখি সব—সে-সঙ্গতি হয়েছে তোর। অবশ্য জামাইয়ের কাছ থেকে ভাড়া যদি নিতে চান তোর শাশুড়ি।

একটু হাসি চিকচিক করে পূর্ণিমার মুখে। বলে, সঙ্গতি হয়েছে—সে আমি জানি। এত কর্মপিটিসন—রোজগার তবু এরই মধ্যে ভাল দাঁড়িয়েছে। এ তো খুশির কথা রে—দশের মাঝে দেমাক করে বলবার কথা।

তাপসের মনের মেঘও খানিকটা কাটল। বলে, বাহাদুরি আমার তেমন কিছু নেই ছোড়দি। ডাক্তার রায়ের রোগীপত্তর কিছু পাওয়া গেল—অতবড় একটা ডিস্পেনসারি হাতের মধ্যে, সেদিক দিয়েও সুবিধা হয়েছে।

বাহাদুরি যারই হোক, রোজগার মন্দ হচ্ছে না মোটের উপর। একটা কথা বলব তোকে তাপস, কিছু যদি মনে না করিস।

তাপস রাগ করে বলে, রক্ষে কর ছোড়দি। এমন কেষ্টবিষ্টু কিছু হই নি যে, আমার কাছে ভূমিকা করতে হবে।

পূর্ণিমা বলে ফেলল, কিছু কিছু তুই যদি সাহায্য করিস ভাই।

এমন খুশি তাপস কখনো হয় নি। বলে, সে-কথা কতবার ভেবেছি ছোড়দি। কিন্তু তোর হাতে টাকা তুলে দেবো, অতখানি বুকের পাটা আমার নেই। কানে পড়লেই সংসারের এটা-ওটা কিনে আনি, টের পাস কিনা জানি নে। কিনলাম, তারপর বাড়ি এনে নামানোর মুখে বুক ঢিবঢিব করে। ভানুমতীর কাছে খবর নিই, বাড়ি আছিস কিনা তুই। না থাকলে নিশ্চিন্ত। থাকলে তখন আবার শুধাই, মেজাজটা আছে কেমন? তিনটে বছরের বড় হয়ে যা ভয়টা ধরাস তুই ছোড়দি, ছোট বয়সে বাবা-মা'কে এত ভয় করি নি। কত তোর চাই, বলে দে—

মৃদু হেসে পূর্ণিমা বলে, আমার জন্যে নয়—আমি টাকা কি করব? দিদিকে দিতে বলছি। কত আশা নিয়ে বড়লোকের বউ হয়ে গিয়েছিল—এখন ঐ ঘর-ভাড়ার ক'টি টাকার উপরে নির্ভর। আর সামান্য যা-কিছু আমি দিয়ে উঠতে পারি। এ-বাজারে সত্যিই কুলায় না। মা আছেন ওখানে, তার জন্যেও তোর আমার যথাসাধ্য দেওয়া উচিত।

তাপস বলে, দিই নে বুঝি? যখনই দরকার পড়ে, দিদি আমার কাছে চলে আসে। মা থাকে নিয়ে যায়।

বটে! আমায় কোনদিন ঘুণাক্ষরে তো বলিস নি।

তাপস বলে, বলবার জো আছে! পই-পই করে মানা করেছে, তোর কানে কিছুতে না যায়। এ-বাড়ি যখন আসে, মরে গেলেও পয়সাকড়ির কথা তুলবে না। গিয়ে পড়বে সেই ডাক্তারখানা অবধি—

পূর্ণিমা ফোড়ন দেয়: কিংবা তোর শ্বশুরবাড়ি—

তাপস প্রতিবাদ করে না। হাসতে হাসতে বলে, আমি একা নই ছোড়দি, তোকে সবাই ডরায়। সিংহরাশিতে বোধহয় জন্মেছিস, মা-কে জিজ্ঞাসা করব। সিংহের মতোই তরাস লাগে তোর কাছাকাছি দাঁড়ালে।

ঠিক এই জিনিষটাই পূর্ণিমা ভেবেছিল, এবারে পরিষ্কার হয়ে গেল। পূর্ণিমার অগোচরে নতুন এক আনন্দের সংসার গড়ে উঠেছে ওদের। তাপস স্বাতী অণিমা রঞ্জু আছে তার মধ্যে—মা তরঙ্গিণী এবং বিজয়া দেবীও নিশ্চয় বাদ নেই। সেখানে প্রবেশাধিকার নেই কেবল পূর্ণিমার। এবং যেহেতু তারণ পূর্ণিমার সঙ্গে থাকেন,

সঙ্গদোষে তিনিও বাইরে আছেন এখন অবধি।

ছেলেমানুষ ভানুমতী ফ্যান গালতে পারে না। সাহসই করে না—গা-হাত-পা পুড়িয়ে ফেলে পাছে। পূর্ণিমাও মানা করে দিয়েছে। ভানুমতী ডাকতে এসেছে : ভাত নামাবে এসো দিদিমণি—

তাপসকে পূর্ণিমা বলে, দেখতে এসেছিলি আমাদের—দেখা তো হয়ে গেল। রোগীপত্তর কেউ আসে নি, তা-ও দেখলি। তবে আর কি, চলে যা। আমি এবারে খেতে বসব।

তাপস বলে, আমিও খাব।

পূর্ণিমা অবাক হয়ে বলে, এখন খাবি কি রে? কবে তুই খেয়ে থাকিস এমনি সময়?

তাপস জেদ ধরে বলে, আজকে খাব। বাড়ি থাকতে দিবি নে, সে তো জবাব দিয়ে দিলি—ক্ষিধের মুখে খেতেও দিবি নে এক-মুঠো?

পূর্ণিমাও তেমনি। বলে, তোর তো চাল নিই নি—

ভানুমতীর ভাত খেয়ে নেবো। আবার সে রেঁধে নেবে।

নাছোড়বান্দা। পূর্ণিমার সামনাসামনি পিঁড়ি পেতে একটা থালা টেনে নিয়ে বসল। অফিস করতে হয় না—এত সকাল সকাল ভাত সে কোনদিন খায় না। ছুতো করে খানিকক্ষণ ছোড়দির সামনে বসে খাওয়া। খারাপ লাগছে খুব। ছোড়দির মুখভাব আজ যেন ভিন্ন রকম, কথাবার্তা বাঁকাবাঁকা। কণ্ঠস্বর তিক্ত—কেমন যেন অশ্রু-ভেজা মনে হয়। খায় আর ক'টাই বা গ্রাস— গ্রাস তুলতে গিয়ে ছোড়াদির মুখের দিকে বারবার তাকিয়ে পড়ছে।

অফিসে এসেছে পূর্ণিমা। হাসিখুশি সে মানুষটি আজ নয়—যন্ত্রের মতো আপন মনে কাজ করে যাচ্ছে। কাজ নিয়ে একবার-দু'বার নটবরের টেবিলে আসতে হয়েছে। যা ভাবা গিয়েছিল—অফিসের, এবং সেই সঙ্গে বাংলাদেশের নৈতিক আবহাওয়া নিয়ে নটবর রীতিমত বিচলিত। পারিষদবর্গ নিয়ে সেই বিষয়ে ঘোরতর শলাপরামর্শ চলছে। পূর্ণিমাকে সামনে দেখে সঙ্গে সঙ্গে চুপ। মেয়েটা বড় ক্যাটক্যাট করে বলে—ভয় লাগে ওটাকে।

না, আজকে অন্য দিনের মতো নয়। কাজের বাইরে পূর্ণিমা সিকিখানা কথাও উচ্চারণ করে না। আশেপাশে যারা আছে, চোখ তোলে না তাদের দিকে। কাজ সেরে চলে গেলে নটবর মন্তব্য করেন : ভিজে বেড়ালটি—মাছখানা উল্টে খেতে জানেন না! আর রাস্তায় সে-মূর্তি যদি দেখতে!

ভবতোষ বলে, হাতে-নাতে ধরে ফেলেছেন, তাই আজ আলাদা ঢং নিয়েছে। কথা বলার মুখ নেই। দেখলেন না, ঘাড়ই তুলতে পারছে না।

ইস্কুলে হলে রাস্টিকেট করত। অফিসের মুশকিল, দোষ খোঁজে এখানে কেবল ফাইলের মধ্যে। ফাইল ঠিক আছে তো জাহান্নমে যাও না—দশটায় সেই জায়গা থেকে এসে হাজিরা দিও।

বীথির চর আছে—ভবতোষই হয়তো। অথবা দ্বিজদাস। প্রায়ই দেখা যায়, টিফিনের সময়টা সে নতুন নতুন সংবাদ আহরণ করে আনে। আজ টিফিনে পূর্ণিমা বেরিয়েছিল কয়েক মিনিটের জন্য—ক্যান্টিনে বসে নিঃশব্দে এক কাপ চা খেয়ে সিটে ফিরে এসেছে। এসেই যে কাজে লেগেছে, তা নয়। চুপচাপ বসে হাতের নখ খুঁটছে।

স্বর্গলোকের কথা জানি নে, দুনিয়ার উপরেও এক-একটা দেব-দেবী থাকেন—বিষম একা তাঁরা। সকলের সব হতে আছে, তাঁদের বেলা শূন্য। আনন্দের মেলামেশার

বাইরে তাঁরা। রোদ্র-ঝড় মাথায় নিয়ে পবিত্র মন্দির-প্রাঙ্গণে কল্পতরু রূপে খাড়া আছেন তলায় আঁচল পেতে বাঞ্ছা প্রকাশ করলেই পূরণ হয়ে যাবে। বাঞ্ছা-পূরণের আনন্দে জয়ধ্বনি দিয়ে ভক্তদল যে-যার সুখের ঘরে ফিরে চলল, জনহীন মন্দির থমথম করে তারপরে। কচিৎ বা টিকটিকি একটা টিকটিক করে কোনদিকে ক্ষীণ আওয়াজ তোলে, শুকনো পাতার মধ্যে কোন একটা সরীসৃপ হয়তো খসখস করে চলে গেল। দেবতার প্রাণবান সঙ্গী এমনি দু'-চারটি।

তারণকৃষ্ণের বড় গর্বের তালুকদার-বাড়ি—সেই বাড়ির লাগোয়া ভাঙা মন্দিরে পূর্ণিমা ঠিক এমনি জিনিষ দেখেছিল, প্রায় এই কথাগুলোই মনে হয়েছিল তখন। টিফিনের সময়টুকুতে অফিসের মধ্যে নিয়মশৃঙ্খলা তেমন থাকে না—আসছে-যাচ্ছে মানুষ, গল্পগাছা করছে। কিন্তু পূর্ণিমা যেন একাকী রয়েছে পাথর হয়ে নির্জনতা বুকে চেপে ধরে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

বীথি পাশে এসে ঘুন ঘুন করে বলে, দাদুর ওখানে আসর-গুলজার। কী সব বলাবলি হচ্ছে শুনেছ পূর্ণিমা-দি ?

পূর্ণিমা আজ একেবারে নিস্পৃহ : বলবারই তো কথা।

বীথি বলে, শুনেছ তুমি সব ?

শুনি নি, কিন্তু দোষ আমার। বুড়োমানুষ সমস্তটা দিন অফিস করেছেন—ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত। রেস্তোরাঁয় ঢোকবার সময় শিশিরবাবুর সঙ্গে ওঁকেও ডাকা উচিত ছিল। তাহলে সারাক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছটফট করতে হত না। খাওয়া হত, আমাদের ভিতরের কথাবার্তা পাশে বসে শুনতেন। মেজাজ ঠিক থাকত।

বীথি গরম হয়ে বলে, বেয়াদপি কথা কেন বলবেন আমাদের জড়িয়ে ? কোন্ অধিকারে ? গার্জেন নাকি উনি ?

পূর্ণিমা বলে, বয়সের বিবেচনায় খানিকটা তাই বই কি। অফিস নিয়ে সারাজীবন কাটালেন, অফিস ছাড়া কিছু জানেন না। ঘরসংসারের উপর লোকের যে মায়া থাকে, অফিসের উপরে ওঁর তাই। গৃহস্থঘরের মেয়ে ঘর ছেড়ে পাশাপাশি বসে অফিস করবে, সে-আমলে ওঁরা ভাবতেও পারতেন না। মেয়েদের অন্যভাবে দেখে এসেছেন বরাবর। দিনকাল বদলে গেছে, তা বলে মানুষের অভ্যাস রাতারাতি পাল্টে যায় না। জিনিষটা মুখে মুখে মেনে নিলেও ভাল মনে নিতে পারেন নি। নইলে সত্যি সত্যি তো আক্রোশের কারণ নেই আমাদের উপর।

মেটের উপর তাতিয়ে তোলা গেল না। কী যেন হয়েছে পূর্ণিমার—বড় ঠাণ্ডা মেজাজ, অতিমাত্রায় বিচারশীল। সেই একদিন ডুরে-কাপড়ে বাঘিনী হয়ে নটবরকে ক্ষেপিয়ে দিয়েছিল, প্রত্যাশা ছিল আজকেও তেমনি একটা-কিছু হবে। কিন্তু কান পেতে শুনলই না কথা।

রসভঙ্গে রাগ করে বীথি নিজ টেবিলে ফাইল নিয়ে বসল।

আর শিশিরও ওদিকে নিজ ভাবনায় ডুবে রয়েছে। মমতার চিঠি পড়তে পড়তে আধ-মুখস্থ হয়ে গেছে—সাদামাঠা কথাগুলোর নিচে গূঢ় অর্থ কি কি থাকা সম্ভব ? কাল বেহালার দুটো পাড়ায় বাড়ি ধরে ধরে ঘুরেছে। এর আগে ঠাকুরপুকুর যাদবপুর নারকেলডাঙা উল্টোডাঙা—এমনকি সুদূর কেষ্টপুর অবধি হয়ে গেছে। গঙ্গা পার হয়ে একদিন সালকে এবং সাঁতরাগাছি গিয়েছিল। আস্ত বাড়ি নাও, আলাদা কথা—খুচরো ঘর একক পুরুষকে কেউ ভাড়া দেবে না। কেননা, অন্য সংসারের সঙ্গে মিলেমিশে এক-কল এক-পায়খানা নিয়ে থাকতে হবে—তারা সব মেয়েছেলে নিয়ে আছে। ঘর চাই তো

বউ নিয়ে এসো। না থাকে বউ বিয়ে করে ফেল একটা—সেটা কিছু কঠিন কর্ম নয়। ঠিক যে-কথা হাতিবাঁধার অখিল ভদ্র বলেছিল। মানেটা দাঁড়াচ্ছে, পুরুষ হলেই দুশ্চরিত্র—এবং ভিন্ন সংসারের যে-রমণীরা থাকবেন, তাঁরাও; স্ত্রী আনতে হবে পুলিশ-কনস্টেবলের কাজে—বর এবং আশপাশের রমণীদের পাহারা দেবে, দু'পক্ষ যাতে একত্র পড়তে না পারে। সেই স্ত্রীকে যদি প্রশ্ন করা হয়, আরও কড়া জবাব বোধহয় মিলবে: পুলিশ-কনস্টেবল কেন হতে যাব—রোজা-গুণীন। বরের ঘাড়ে পেত্নী না লাগে, সেজন্য মন্তোর পড়ে অষ্টবন্ধন সেঁটে রাখব।

মমতার চিঠির জবাব দিয়েছে শিশির। অশুভস্য কালহরণম্—শাস্ত্রবাক্য মেনে মাঝের দুটো রবিবার সময় প্রার্থনা করেছে। মামলায় নির্ঘাৎ জেল-দ্বীপান্তর—হেনক্ষেত্রে উকিল যেমন সাবকাশ নিয়ে নিয়ে মামলা পিছিয়ে দেয়, তবু যে-ক'টা দিন বাইরে রাখা যায় আসামিকে। লিখেছে: শ্রীচরণ দর্শনের জন্য মন অতিশয় ব্যাকুল বড়দি, কিন্তু সামনের রবিবারে মেসের এক বন্ধুর বাড়ি বউভাত, সে কিছুতে ছাড়বে না—গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবে। তার পরের রবিবারে আমরা চাঁদা তুলে বুড়ো ম্যানেজারকে ফেয়ারওয়েল দিচ্ছি। দুটো রবিবার বাদ দিয়ে একুশে সকালবেলা নিশ্চয় গিয়ে হাজির হব। পত্রপাঠমাত্র জবাব দেবেন, আপনাদের কুশল সংবাদের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত আছি।

জবাবের প্রতীক্ষায় আছে। ছুটি মঞ্জুর হলে যে হয়। তিন সপ্তাহ প্রায় হাতে পাওয়া যাচ্ছে, তার মধ্যে কত কী হতে পারে—দুনিয়া উল্টাতে পারে, বাসাও জুটে যেতে পারে। না জুটলে কী আর উপায়, যেতে হবে মুখ শুকনো করে। না গিয়ে রক্ষে নেই, ভাগ্যে যা-ই ঘটুক। নইলে সুনীলকান্তিই হামলা দিয়ে পড়বে—সে বড় বিশ্রী। মুখে অনুনয়-বিনয় এবং প্রয়োজনস্থলে নয়ন অশ্রুময় করে বলবে, বিস্তর চেষ্টা করেছি, কিন্তু পেরে উঠিনি বড়দি। দয়ার বোঝা আরও একটি মাস টানতে হবে। মাসান্তে আর খাতির-উপরোধ নেই। হাত পেতে না নিই তো রাস্তায় ছুঁড়ে দেবেন। চাকরি পেয়ে গেছি—ফুড়ুত করে কোনখানে যে উড়ে পালাব, তেমন উপায় নেই।

ইত্যাদি চিন্তায় অন্তর জর-জর—তার উপরে বাড়তি আতঙ্ক, কোন্ সময়ে নটবর এত্তেলা পাঠান সামনে হাজির হয়ে হিতোপদেশ শোনবার জন্য। এবং দ্বিতীয় আতঙ্ক, সর্বচক্ষুর সামনে পূর্ণিমা কখন টেবিলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে—আমার নাসিকা থেকে অর্ধেক ইঞ্চি দূরে তার পাউডার-চর্চিত মুখ। স্পোর্টসে টাগ-অব-ওয়ার দেখা আছে—দুই দলে দড়ি টানাটানি করে। শিশিরকে দড়ি বানিয়ে এক বৃদ্ধ আর এক রমণীর টানাটানিটা দেখুন মানসনয়ন মেলে। কে হারে, কে জেতে। বৃদ্ধ ডেকে সামাল করবেন: খবরদার, ওটি রমণী নয়—কুম্ভীর, ভুল করে কুম্ভীরের কবলে পোড়ো না বাপু! আর রমণীটি ছেঁদো কথাবার্তায় না গিয়ে হ্যাঁচকা টানে সিট থেকে টেনে তুলে নিয়ে রওনা দেবেন। এবং কাল যেমনধারা হয়েছিল—থপ-থপ করে ক্লান্ত পায়ে অনুসরণ করবেন বৃদ্ধটি। দামসাহেবকে ধরে এত কষ্টে চাকরি জোটাল—গতিক যা দাঁড়াচ্ছে, টিকবে না এ জিনিব কপালে। ডিরেক্টর বা ম্যানেজারের তরফ থেকে কিছু ঘটবার আগে নিজেই কোনদিন দুত্তোর বলে ইস্তফা দিয়ে পালাব।

ভয়ে ভয়ে আছে শিশির। টিফিনের সময় অবধি হাঙ্গামা নেই—বেশ ভালই গেল। টিফিন সেরে জায়গায় এসে বসেছে। নটবরের কাছ থেকে, স্লিপ নয়—কী আশ্চর্য, মানুষটি নিজে এসে টেবিলের পাশে দাঁড়ালেন। ঠিক যে জায়গায় পূর্ণিমা এসে পড়ে। শিশির গোড়ায় দেখে নি—ঘাড় নিচু করে কি-একটা হিসাব নিয়ে ব্যস্ত ছিল। দেখতে পেয়ে তটস্থ হয়ে উঠে দাঁড়াল।

নটবর অমায়িকভাবে বলেন, বোসো, বোসো—কাজ ছেড়ে ওঠাউঠি কী আবার ! একটা কথা বলতে এসেছি—

শিশির বলে, আমায় ডেকে পাঠালেন না কেন ?

বরাবরই তো ডেকে থাকি।

হেসে কাঁধে হাত রেখে নটবর বলেন, পিওন পাঠিয়ে ডেকে বলার কথা নয় ভায়া, এ জিনিষ নিজে এসে বলতে হয়।

কথার ধরনে শিশির উদ্বিগ্ন হল। এ রকম ভঙ্গিমা আর কখনও দেখে নি। কী না জানি বক্তব্য !

নটবর বলেন, রবিবার দুপুরে আমার ওখানে খাবে। ঠিকানা জান না বোধহয়—লিখে পাঠিয়ে দিচ্ছি। মেডিকেল কলেজের সামনে নেমে গলির মধ্যে মিনিট তিনেকের পথ।

হেসে বলেন, অবাক হচ্ছ কেন ? অফিসে তো কথাবার্তা হয় না—আলাপ-পরিচয় করব। আমি কায়স্থ, তুমিও কায়েতের ঘরের ছেলে। চাই কি সম্পর্কও বেরিয়ে পড়তে পারে।

শিশির ঘাড় নাড়ল। কুসুমডাঙায় সুনীলকান্তির বাড়ি যাবার দায় এই রবিবারে। সময় প্রার্থনা করে চিঠি দিয়েছে সেখানে—মঞ্জুর হবে কি না হবে ঠিক নেই। তবু সেই কথা বলে কাটান দিল। ঘাড় নেড়ে বলে, সে তো ভাগ্যের কথা। কিন্তু এ রবিবার পারি নে। এক আত্মীয়ের বাড়ি যাব, ঠিক করে রেখেছি। কলকাতার বাইরে। যেতেই হবে, বিশেষ দরকার।

তাহলে পরের রবিবার। এই তাহলে পাকা রইল, কেমন ?

নটবর চলে গেলেন। ভদ্রলোক নতুন পলিসি নিয়েছেন দেখা গেল। পিওন পাঠিয়ে ডাকাডাকি অথবা রাস্তায় পিছু পিছু দৌড়ানো নয়—বাড়ি নিয়ে খাইয়ে-দাইয়ে দিবস-ব্যাপী হিতোপদেশ শোনাবেন। যাক গে, সময় তো দিন দশেক পিছিয়ে নেওয়া গেছে।

একটা ফাঁড়া আপাতত কাটল। এর পরে দুই নম্বর—ভীষণতর ফাঁড়া। সারাক্ষণ শিশির ভয়ে ভয়ে আছে। পাঁচটা বাজতে পনেরো মিনিট—ঘাড় গুঁজে কোন দিকে না তাকিয়ে গভীর মনোযোগে কাজ নিয়ে বসল। পূর্ণিমা এসে কাগজপত্র টেনে সরিয়ে ধ্যান-ভঙ্গ করবে, সেই লোভেই বোধকরি ধ্যানে বসেছে।

বেশ কিছুক্ষণ কাটল। অফিস জনশূন্য। ঘড়ি দেখল—পাঁচটা কুড়ি। উঁকি দিয়ে দেখে চলে গেছে পূর্ণিমা। শিশিরের সম্পর্কে হঠাৎ নিস্পৃহ হয়ে গেল—ব্যাপারটা কি ?

পরের দিনও এই। ছুটির মুখে নিজেই সে পূর্ণিমার কাছে চলে গেল।

পূর্ণিমা কিছু অবাক হয়ে বলে, কি শিশিরবাবু ?

ঘরের ব্যবস্থা কিছু করতে পারলেন ?

মৃদু হেসে পূর্ণিমা বলে, অত কি সোজা ! হলে আপনাকে বলব—

ঘোড়ার ডিম ! নির্ঘাৎ ভুলে বসে আছে। শিশিরের মরণ-বাঁচন অবস্থা—অন্যের কোন্ দায় পড়েছে, কেন তা বুঝতে যাবে ?

॥ ত্রিশ ॥

ফুরসত পেলে তাপস বাবা ও ছোড়দিকে দেখতে আসে। শাশুড়িকে নিয়ে নাকি এখনো মুশকিল—খাসা আছেন দিব্যি আছেন, পরক্ষণেই সংকট-অবস্থা। সর্বদা কাছাকাছি থাকতে হয়।

পূর্ণিমা সায় দিয়ে বলে, ছেলে দুটি ছোট ছোট—জামাই হয়ে তুই-ই তাঁর বড়ছেলে। তার উপরে ডাক্তার। তুই দেখবি না তো দেখবার কে আছে ওঁদের ?

তাপস অধীর কণ্ঠে বলে, শ্বশুরবাড়ি ঘরজামাইয়ের মতন পড়ে আছি—বাড়ি আসতে পারছি নে—

পরক্ষণে বলে, সেরেসুরে হলেও এ বাড়ি আর থাকা হবে না। এ পাড়ায় থেকে কাজকর্ম হবে না। তুই ঠিক ধরেছিলি ছোড়দি, এতদিনে আমি সেটা বুঝেছি।

কাজে নেমে এখন বোঝা যাচ্ছে, এত দূরে এই পাড়ায় থেকে প্রাকটিশ জমানো অসম্ভব। প্রতিযোগিতা সাংঘাতিক। ফী বছর গাদা-গাদা ডাক্তার বেরিয়ে আসছে; রোগী বাড়ছে না—সালফা জাতীয় সর্বরোগহর নানা ওষুধ বেরুনোর ফলে কমছেই বরঞ্চ দিনকে দিন। অসুখ করেছে তো ডাক্তারখানা থেকে এক পাতা ট্যাবলেট কিনে খেয়ে নিল। খেয়ে সেরেও যায়। নিতান্ত যার সারল না, সে ই ছোটে ডাক্তারের কাছে। ছুটোছুটির অবস্থাই তখন। অলিগলি খোঁজাখুঁজির ধৈর্য থাকে না, সময়ও থাকে না। বহুদর্শী প্রবীণ ডাক্তার অপূর্ব রায় জীবিত থাকলে তবু না হয় প্রত্যাশা করা যেত, কিন্তু তাপস নতুন ডাক্তার—কলেজের গন্ধ অঙ্গ থেকে ছাড়ে নি, অপূর্ব রায়ের জামাই বলে কপালের উপর শিং গজিয়েছে তা-ও নয়। এমন ডাক্তারের জন্য লোকে আঁকুপাঁকু করতে যাবে কেন ? বিশেষ করে রকমারি ডাক্তারের দঙ্গল যখন দশ দিকে হাত বাড়িয়ে রয়েছে রোগী ধরবার জন্য। শ্বশুরবাড়ি কয়েকটা হপ্তা থেকে স্থানমাহাত্ম্য বুঝতে পেরেছে—প্রাকটিশ অন্তুতপক্ষে জবর দাঁড়িয়েছে। কল এসে রাত্রেও কড়া নাড়ে। শাশুড়ির অবস্থা বিবেচনায় তাপস যেতে চায় না, কিন্তু হাতের লক্ষ্মী ঠেলে দিতে বিজয়া দেবীরই ঘোরতর আপত্তি। বকাবকি করেন, উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। অতএব নিউ আলিপুরের ফ্লাট ভাড়া নেবে, বলে দিয়েছে সে। তবে চুক্তি হল, মাসে মাসে ভাড়া নিতে হবে—আপত্তি করলে তক্ষুনি ফ্লাট ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে। অমন বাসা অমিল, উপায় কি—প্রাকটিশ তো গড়ে তুলতে হবে !

সবিস্তারে সমস্ত শুনিয়ে তাপস বলে, তুই অনেক আগেই বলেছিলি ছোড়দি। বাবাও বলেছিলেন। তখন আমি বুঝতে পারি নি, আপত্তি করেছিলাম।

পূর্ণিমা দেমাক করে বলে, তিন বছরের বড় বলে মোটে যে মানতে চাস নে ! কত পাকা-বুদ্ধি ধরি, বোঝ এবারে।

বিজয়া দেবীর অসুখের নামে ভোরবেলা সেই ওরা বেরিয়ে গেল, এ বাড়ি আর কোনদিন ফিরবে না। আসবে কুটুম্বের মতন, খবরবাদ নিয়ে চলে যাবে। যেমন এই আজ এসেছে—ইদানীং যে নিয়মে চলছে।

দু-দুটো রবিবার কাটান দিয়েও সুরাহা কিছুমাত্র হল না। ঘর মরীচিকাবৎ—খবর পেয়ে শিশির ছুটোছুটি করে যায়, তারপর কপালে ঘা দিয়ে ফিরে আসে। দুই রবিবার চলে গিয়ে পুনশ্চ রবিবার এসে গেল। করার্ত রবিবার—আজকে যেতেই হবে, না যাবার

কোন-কিছু কারণ থাকতে পারে না।

মেসের ঠাকুরকে বলে সকাল সকাল চাট্টি ডাল-ভাতের বন্দোবস্ত করে নিয়েছে। কপালে কি আছে বলা যায় না, পেট ভরতি করে যাওয়াই ভাল। ভরা পেটে সারা দিনমান লড়ে যাওয়া যাবে। কালীঘাটের ও দক্ষিণেশ্বরের দুই কালীমাতার উদ্দেশে দুই মুখো প্রণাম সেরে মনে মনে 'ত্রাহি মাং মধুসূদনঃ' আউড়ে দমদম স্টেশনে গিয়ে সে সাড়ে-দশটার লোকাল গাড়ি ধরল।

কামরার অন্য প্রান্ত থেকে ভবতোষ চেঁচিয়ে উঠল: শিশিরবাবু যে! আসুন, আসুন—এখানে জায়গা আছে।

অফিসের ভবতোষ, নটবরের একতম পারিষদ।

পাশে বসিয়ে ভবতোষ প্রশ্ন করে: কোথায়?

আত্মীয় আছেন এদিককার এক গ্রামে।

গ্রাম কোথায় এদিকে? কাঠার দরে জমি বিক্রি—আর কি এখন গ্রাম রয়েছে! বিলকুল শহর। কোথায় বাড়ি আত্মীয়ের, কোন্ স্টেশনে নামবেন?

নাম শুনে ভবতোষ হৈ-হৈ করে উঠল: কুসুমডাঙার সুনীলকান্তি হালদার—খুব জানি তাঁকে। খুব—খুব। তিনিও ডেলি-প্যাসেঞ্জার,—একশ এগারো নম্বরের যাত্রী। হরবখত আমাদের দেখা হয়। একশ এগারো নম্বর বুঝলেন না—কামরার বাইরে এক-এক এক লেখা দেখুন। তার মানে থার্ড ক্লাস। সময়ের অপব্যয় করি নে আমরা—দু বেঞ্চির মাঝে কোঁচার কাপড় টান-টান করে তাস খেলতে খেলতে যাই। যাবার সময় খেলি, ফেরার সময় খেলি—খাতির না জমে যায় কোথায়। সুনীলকান্তি-বাবুকে বলবেন তো আমার নাম—চেনেন না চেনেন তখন বুঝবেন।

সারাক্ষণ নিজের কথা। অফিসের গল্পও আছে: আগে ভাই বেলুড়ের এক কারখানায় চাকরি করতাম। থাকলে এদ্দিনে অঢেল উন্নতি হত। আটটায় সময় হাজিরা, বাড়ি থেকে কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে-পাঁচটায় বেরুতাম। ট্রেন বদলাবদলি, শিয়ালদা টু হাওড়া ট্রাম—অত সকালে না বেরুলে লেট হয়ে যায়। বাড়ি ফিরতেও রাত আটটা বাজে। দেখি, ছেলেপুলে বাপ চিনতে পারছে না। কাছে আসে না, ধরতে গেলে কেঁদে পড়ে। বউ বলে, দেখল কবে তোমায় যে চিনবে? যখন বেরিয়ে যাও ওরা ঘুমিয়ে থাকে, যখন ফেরো ওরা ঘুমিয়ে পড়ে। ছুটিছাটার দিনে বাড়ি দেখতে পাবে, তাও তো নয়। তা সত্যি। অফিস করে করে এমন অবস্থা ভাই, রবিবারের দিনটা বাড়িতে শুয়ে বসে কাটাব তা যেন গায়ে জল-বিছুটি মারে। এই আজকেই যেমন—

আজকের ব্যাপার বলছে। ভোর-রাত্রে কলকাতা অভিমুখে বেরিয়ে পড়েছিল। উদ্দেশ্য সিনেমার টিকিট কাটা।

একটা সুবিখ্যাত ছবির নাম করল—খবরের কাগজের পুরো পাতা জুড়ে যার বিজ্ঞাপন চলেছিল। সে টিকিট জোগাড় করা চাট্টিখানি কথা নয়। লাইন দিয়েছিল তখনও রাস্তার আলো নেভায় নি। অসাধ্য-সাধন করে এই ফিরছে—

ভবতোষ সগৌরবে টিকিট বের করে দেখাল। একলা একজনের টিকিট। বউ আসে না—সংসার আর ছেলেপুলে ছাড়া বোঝে না অন্য কিছু। স্বামীটি তার একেবারে বিপরীত। সে এই দেখতেই পাচ্ছেন। মাইনের টাকার সেভেন্টিফাইভ পার্সেন্ট বউয়ের হাতে দিয়ে দায়িত্ব শেষ। অফিস-টাইমে আর রাত্রিবেলা চাট্টি করে ভাত দেবে এই চুক্তি, তা ছাড়া তোমরা মরলে না বেঁচে রইলে জানি নে। খেতে যাচ্ছি এখন বাড়িতে—আড়াইটের শো, নাকে-মুখে গুঁজেই আবার ছুটব। মাস্থলি টিকিটের

সুবিধা যতবার খুশি ওঠানামা করো—বাড়তি মাশুল লাগে না। সিনেমার টিকিট পেয়ে গেল তাই—নইলে করতে হত ঠিক সেই জিনিষ। ইতিপূর্বে বহুদিন করেছে। খেয়েদেয়ে পান চিবিয়ে চিবোতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়ির কামরায় বৈঠকখানা করে বসল। চলে গেল শিয়ালদা অবধি, কত লোক উঠছে নামছে—ফিরল আবার শিয়ালদা থেকে। পুনশ্চ শিয়ালদামুখো। এই চলল যতক্ষণ না অফিসের ছুটির সময় হয়ে যায়। নিত্যদিনের রুটিনে পড়ে গেল—গুটগুট করে এইবারে বাড়ি ফেরা।

নটবরবাবুর কথাও উঠল। ভদ্রলোকের বিশাল সংসার। দুটো নাতনী একেবারে মাথায় মাথায়—বিয়ে দিলেই হয়, পাত্র জুটছে না। শিশিরের উপরেও তাক পড়েছে—তার সম্বন্ধে কতদূর কি জানা আছে, ভবতোষকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন সেদিন। গাঁয়ের ভালমানুষ ছেলে, কোন কুহকিনীর পাল্লায় পড়ে যাবে—পুরোপুরি কবলে পড়বার আগে ভাল ঘরের পাত্রী দেখে সুব্যবস্থা করে দেওয়া সকলের উচিত।

কথাবার্তার মধ্যে নিজ স্টেশনে এসে ভবতোষ নেমে পড়ল। হাত বাড়িয়ে বাড়ি দেখিয়ে দিল—লাইন থেকে দূরবর্তী নয়। শিশির পরের স্টেশনে নামবে।

ঠিক দুপুর। হাতঘড়িতে দেখল বারোটা দশ। সুনীলকান্তিদের বাইরের উঠোনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, বুক ঢিবঢিব করছে। কোনদিকে কেউ নেই। রবিবারের দিন মেয়েদেরও কাজকর্মে ঢিলেমি। রান্নাই শেষ হয় নি মনে হচ্ছে—ছ্যাঁত-ছোঁত আওয়াজ রান্নাঘরের দিক থেকে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে রোয়াকে উঠে পড়ল। দেবুটা দেখতে পেয়েছে। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে 'মেশোমশায়' 'মেশোমশায়' কলরব করে উঠল।

ভাইবোন সবক'টি ছুটে আসে। আজকে শিশিরের শূন্য হাত। বিষম দুশ্চিন্তার মধ্যে আছে, তবু খেয়াল করা উচিত ছিল, বড়রা যে ব্যবহারই করুক বাড়ির ছোট ছোট ছেলেপুলের তাতে কী? এদের হাতে দেবার মতো কিছু আনা উচিত ছিল। খারাপ লাগছে খুব।

মমতাও এলো। রান্না করছিল, বাটনা বাটছিল বোধহয়, আঁচলে হাত মুছতে মুছতে এলো। বলে, পথ ভুলে যাও নি, দেখা যাচ্ছে। উঃ, আমরা না হয় পর, নিজের মেয়েটা অবধি ভুলে বসেছিলে। চিঠি লিখে তবে আনাতে হল।

সেই চরম ক্ষণ। চুক্তির মাস শেষ হয়ে গেছে—মেয়ে ঘাড়ে চাপিয়ে হয়তো বা ধুলো-পায়ে সঙ্গে সঙ্গে বিদায় করে দেবে। ছেলেপুলে সবক'টাকে দেখা যাচ্ছে, কুমকুম নেই। তাকে কোথায় রেখেছে—কী অবস্থায় আছে মেয়েটা? মাস শেষ হয়ে গেছে দেখে আদাড়ে-ভাগাড়ে ছুঁড়ে দেয় নি তো?

ছেলেমেয়েদের মমতা জিজ্ঞাসা করে: কুমকুমকে দেখতে পাচ্ছি নে—গেল কোথায় সে?

বড় মেয়ে জয়া বলে, দীঘির ঘাটে গেছে বাবাকে ডাকতে। পিসি নিয়ে গেছে।

আদিখ্যেতা দেখ একবার!

শিশিরের কাছে মমতা অনুযোগ জানায়: তোমার বড়দা একঘণ্টা দেড়ঘণ্টা জলে গিয়ে পড়েছে—এতখানি বয়স হল, ছেলেমি ভাব তবু গেল না। ঠাকুরঝিকে তাই বললাম, একটিবার যাও ভাই—ডেকে তুলে আনো। রোদ্দুরের মধ্যে এতটা পথ—তা-ও ঠাকুরঝি মেয়ে ঘাড়ে করে চলে গেছে। তোমার মেয়ের সর্বক্ষণের বাহন—কোল থেকে লহমার তরে নামাবে না।

জয়াকে বলে; মেশোমশাইকে বারান্ডায় বসিয়ে জল-গামছা দিগে যা। হাত-পা

শুয়ে ঠাণ্ডা হোক, জামা-টামা ছাড়ুক। যে পেয়াদা পাঠিয়েছি, এক্ষুনি ওরা এসে পড়বে।

সত্যি তাই, অনতিপরেই ঊর্মিলা এসে গেল। কলকল করে সে বলে, যা করে ওঠাতে হল! ডুবসাঁতার দিচ্ছে, চিৎসাঁতার দিচ্ছে—উঠতে কি চায়?

মমতা বলে, রোদ্দুরের মধ্যে কুমকুমকে কেন নিয়ে গেলে বলো তো? এতগুলি এরা রয়েছে, খেলাধুলো করত—

ঊর্মিলা অসহায়ভাবে বলে, চেষ্টা করি নি? কোল থেকে নামলই না বউদি। জোর করে নামাতে গেলাম তো ভ্যাক করে কেঁদে পড়ল।

নামাতে তোমার বয়ে গেছে। তোমায় আর জানি নে—এত বইতেও পারো! দেখে রাখছেন সব বিধাতাপুরুষ, বিয়ের পর ফি বছর একটি করে দেবেন। বাচ্চা বয়ে বেড়ানোর সুখ ভাল করে মিটিয়ে দেবেন, কত বইতে পারো দেখা যাবে তখন।

মিটিমিটি হেসে ঊর্মি বলে, যাও—

শিশির এসেছে, ঊর্মি জানে না। জামা খুলে গেঞ্জি গায়ে এতক্ষণে সে এদিকে এলো। ঊর্মির কোল থেকে কুমকুম বাপের দিকে পিটপিট করে তাকায়। চিনেও যেন চেনে না।

কাছে এসে শিশির মেয়ের দিকে হাত বাড়াল : এসো—

আসবে কি আসবে না—কুমকুমের দোমনা ভাব। এলো শেষটা নিতান্ত নিরুৎসুক ভাবে—বয়স্ক লোক হলে বলতাম নিতান্তই কর্তব্যের অনুরোধে।

মেয়েকে আদর করে শিশির বলে, মহারাণী হয়েছ তুমি—শুনতে পাচ্ছি। সিংহাসনে সর্বক্ষণ বসে থাকো, পায়ে মাটির ছোঁয়া লাগতে দাও না—

কুমকুম আঁকুপাঁকু করছে বাপের কাছ থেকে আবার ঊর্মির কোলে যাবার জন্য।

মমতা হেসে বলে, কুমকুমকে দুষছ কেন ভাই, তার কি দোষ? ঠাকুরঝি কোল থেকে নামতে দেয় না। মেয়ে যেন মিষ্টিমিঠাই, নামিয়ে রাখলে পিঁপড়েয় ধরে যাবে।

যে কাণ্ড কুমকুম করছে, দিতেই হল ঊর্মির কাছে! মেয়ে নিয়ে লজ্জিত ঊর্মি রান্নাঘরে পালায়! স্নান সেরে সুনীলকান্তি গামছা মাথায় ঘাট থেকে ফিরল। স্ত্রীর উদ্দেশে হাঁক পাড়ছে : রোজই তো কাক-স্নান সেরে ভাত খেতে বসি, ছুটির দিনে আরাম করে দুটো-পাঁচটা ডুব দেবো তা-ও তুমি পেয়াদা পাঠাবে! দুনিয়ায় দুটো মানুষকে আমি সবচেয়ে ভয় করি—অফিসের কৃষ্ণমাচারী আর বাড়িতে ওই ঊর্মিলা। চেঁচামেচি করে জল থেকে ঘাটে উঠিয়ে তবে ছাড়ল।

উঠানে নেমে শিশির প্রণাম করতে যায়।

হতে দিল না সুনীলকান্তি : থাক, থাক। পথের উপরে কি—ভিজে কাপড় ছেড়ে ভদ্রলোক হয়ে যাই, তখন। এসে গেছ তা হলে! তোমার দিদিকে বলছিলাম তাই—ও চিঠির পরে না এসে পারবে না।

শিশিরের হাত জড়িয়ে ধরে পাশাপাশি চলল। বলে, হ্যাঁ, ঘাট মানছি। ছোট-ভাইয়ের ক্ষমতার আন্দাজ করতে পারি নি, ভুল বলেছিলাম সেদিন।

শিশির সবিস্ময়ে বলে, কার কথা বলছেন বড়দা?

তোমার—আবার কার? মফস্বল জায়গা থেকে নিঃসহায় নিঃসম্বল এসেছ—সেই মানুষ চট করে চাকরি বাগিয়ে ফেললে—আজেবাজে ফক্কুড়ি চাকরি নয়, হার্মান স্লাম্বার্সের চাকরি—

শিশির বলে, আমি কিছু করি নি বড়দা। ক'জনের সঙ্গেই বা চেনাজানা—আমার

-কী ক্ষমতা !

শিশিরকে থামিয়ে দিয়ে সুনীলকান্তি আগের কথার জের ধরে বলে যাচ্ছে, হার্মান কোম্পানির চাকরি—তা-ও নেমে এলো উপরতলা থেকে। আমরা চাকরি জুটিয়েছিলাম নিচের মানুষের পায়ে তেল দিয়ে দিয়ে, সবাই এই পথে যায়—তোমার বেলা দরখাস্ত করতে হল না, খোদ ডেপুটি ম্যানেজার হাত ধরে নিয়ে সেকশনে বসিয়ে দিল। চাকরি দিয়ে কৃতার্থ হয়েছে এমনিতরো ভাব।

শিশির প্রশ্ন করে : এত সমস্ত কোথা শুনলেন ?

পরক্ষণে মনে পড়ে গেল। বলে, আমাদের অফিসের ভবতোষবাবু বলেছেন বোধহয়। ও'রা বাড়িয়ে বলেন, অতদূরে বিশ্বাস করবেন না। তাছাড়া যা-ই কিছু হয়েছে, একফোঁটাও আমার বাহাদুরি নেই। দাম-কাকা সব করেছেন।

রাখো তোমার দাম-কাকা। ভুঁইফোঁড় কাকা-জেঠা মামা-মেশো আমাদেরও গুজন গুজন আছে। সকলেরই থাকে। মুখে আধখানা মিষ্টি কথার উপর কাউকে তো কখনো উঠতে দেখলাম না।

সুনীলকান্তি ভিজে কাপড় ছাড়ছে। বারান্দায় শিশির মোড়া টেনে নিয়ে বসল। বিস্ময়ের পারাপার নেই। সেই একদিন প্রত্যুষে উঠে পালাচ্ছিল শিশির। পারে নি, সুনীলকান্তিও ঘুম ভেঙে উঠে ধরে ফেলল। কড়া শাসানি দিয়েছিল : এই মাসটা কেবল রাখছি তোমার মেয়ে। বাসা হোক আর না-ই হোক, নিয়ে যেতে হবে। সেই মানুষটার মুখেই আজ মোলায়েম কথার ফুলঝুরি ফুটছে। কিসে কি হল—চাকরি হয়েছে বলেই সম্ভবত এই পরিবর্তন। চাকরি করে করে সুনীলকান্তিদের ধারণা হয়েছে, পৃথিবীর মধ্যে সেই মানুষ সবচেয়ে কৃতী যে চাকরি জোটাতে পারে। সেই নিরিখে শিশির আজ সার্থক-পুরুষ ওদের চোখে। সেইজন্যে সমাদর।

সমাদরের নানা পরিচয় মিলতে লাগল। চুল আঁচড়ে চটিজুতো ফটফট করে সুনীলকান্তি এসে ডাকে : ওঠো, খেতে যাই—

খেয়ে এসেছি বড়দা।

সুনীল আকাশ থেকে পড়ে : খেয়ে এসেছ কি রকম ? এত সকাল সকাল খেয়ে বেরুনোর হেতুটা কি ? এ বাড়িতে চাট্টি ভাত জুটবে না, এই তোমার ধারণা ?

উত্তরোত্তর অধিক গরম হচ্ছে। শান্ত করবার জন্য শিশির বলে, তা কেন বড়দা। সেবারে কি খাই নি ? স্টেশন থেকে ধরে এনে কত আদরযত্ন করলেন—

সেবারে আর এবারে ! তখন ছিলে বেকার। ঠাঁই না পেয়ে পথে পথে ঘুরছ। এবারে চাকরে মানুষ—হার্মান কোম্পানির অফিস-এ্যাসিস্টান্ট।

কায়দা পেয়ে তাড়াতাড়ি শিশির শুনিয়ে রাখে : ঠাঁই কিন্তু এখনো পাই নি বড়দা—

মমতা মাঝখানে এসে পড়ে বলে, অত ঝগড়াঝাটি কিসের ? খেয়ে এসো থাকো, গাড়ির ঝাঁকাঝাঁকিতে সে কি এতক্ষণ পেটে বসে [illegible]। আবার খাবে।

শিশির ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বলে, আলবৎ খাবো। বড়দা'র যখন মনে লেগেছে—একশ'বার খাবো। পাড়াগাঁয়ের মানুষ আমরা খাওয়াকে ডরাই নে।

মমতা বলে, মনে তো লাগবারই কথা। আমার চিঠিটা ডাকে ফেলে দিয়ে উনি বললেন, এ চিঠির পর না এসে পারবে না—এই রবিবারে আসবে ঠিক দেখো। কাল অফিস-ফেরতা শিয়ালদা বাজার থেকে ইলিশমাছ নিয়ে এলেন—ভেজে রাখা হয়েছে, একটি টুকরো কাউকে মুখে তুলতে দিলেন না। বললেন, যার নাম করে এনেছি সে আগে খাবে, তারপর সকলে তোমরা। কখন তুমি এসে পড়ো—সকাল থেকে ঠায়

বাড়িতে। বললেন, দু'জনে একসঙ্গে চানে যাব। বেলা হয়ে যাচ্ছে দেখে শেষটা আমিই ঠেলেঠুলে পাঠালাম।

কী কথা শুনি, এ কোন আজব কাণ্ড রে বাবা! চাকরি পাওয়া যেন রণবিজয় করে আসা—দিগ্বিজয়ী বীরের খাতির দিচ্ছে। এগিয়ে এসে শিশির সুনীলকান্তির সামনা-সামনি দাঁড়ায়ঃ ঘাট হয়েছে—এই নাক মলছি, কান মলছি বড়দা। মিটল রাগ? দু'পায়ে নইলে আছাড় খেয়ে পড়ব।

রান্নাঘরের দাওয়ায় পাশাপাশি ঠাঁই—মমতা দেওয়া-থোওয়া করছে। ছেলেপুলেরা কলরব করে ভিতরে খাচ্ছে। একনজর উঁকি দিয়ে দেখে শিশির। ঊর্মি সেইখানে, ছেলেপুলেদের মধ্যে। কুমকুমকে কোলের উপর বসিয়ে খাওয়াচ্ছে—ভাত মেখে দলা পাকিয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে আগডুম-বাগডুম বকে এক এক দলা মুখে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। দুটো চোখ সর্বক্ষণ কিন্তু ডাইনে-বাঁয়ের চোর-ডাকাতগুলোর দিকে। বেসামাল হলে আর রক্ষে নেই—অপছন্দের জিনিষটা টুক করে অন্যের পাতে ছুঁড়ে দেবে, অথবা নিজের থালার তলায় বেমালুম লুকিয়ে ফেলবে। ভাল জিনিষটা ছোঁ মেরে অন্যের পাত থেকে তুলে নেবে। ডান হাতের এইসব, বাঁ হাতও নিশ্চল নয়—এ ওকে চিমটি কাটে, অধিক রাগের কারণ হলে খিমচানিও দেয়। এ-পাশে ও-পাশে চোখ পাকিয়ে এইসব সামলাচ্ছে ঊর্মি। পারেও বটে মেয়েটা! কুমকুম যা আদরযত্নটা পাচ্ছে—পূরবী থাকলে কী হত জানি নে, ঠাকুরমা ধর-গিন্নির কাছে এর সিকির সিকিও পায় নি। ইচ্ছা থাকলেও বুড়োমানুষের ক্ষমতায় কুলিয়ে উঠত না। এক মাসের উপর আছে এখানে, রোজই কি এমনি আদর পেয়ে আসছে? না, আজকেই শুধু? চাকরি পাওয়ার পর শিশির এই প্রথম এলো, চিঠি লিখে আনিয়েছে মেয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য—কিন্তু সম্পর্কটা তিক্ত ভাবে শেষ হোক এমন ইচ্ছা নয়। কিঞ্চিৎ চিনির প্রলেপ দিয়ে দিচ্ছে।

অপরাহ্নে চা খাচ্ছে সুনীল মমতা আর শিশির, এ গল্প সে-গল্প হচ্ছে। সুনীলের মেজাজ বড় প্রসন্ন। সুযোগ, এই কথাটা এইবারে পেড়ে ফেলবে নাকি? বাসা মেলেনি বড়দা, বাচ্চাটা আরও একমাস রাখতে হবে। শেষ কথা বলে যাচ্ছি, এর পরে আর আপিল চলবে না—বাসা হোক চাই না হোক, মেয়ে তোমরা ঘাড়ে চাপিয়ে দিও, ঘাড় না পাতলে রাস্তায় ছুঁড়ে দিও তখন। সত্যিই তো পরের বোঝা কদ্দিন আর টেনে বেড়াবে! আশ্রম-টাশ্রম আছে শুনেছি অনাথ ছেলেমেয়েদের জন্যে—বাসা না জুটলে তারই কোন একখানে রেখে দেবো। আরও একটা মাস সময় চাইছি বড়দা।

প্রস্তাব পড়বার আগে গলা খাঁকারি দিয়ে নিল। বুক ঢিবঢিব করছে। মমতা মেয়েমানুষ, মন কোমল। তারই নাম ধরে শুরু করে দিলঃ এই সন্ধ্যের গাড়িতে চলে যাচ্ছি দিদি—

মেয়েলোকের যেমনধারা বলা স্বাভাবিকঃ রাতটুকু থেকে যাও না। সকালবেলা ও'র সঙ্গে বেরিয়ে সোজা একেবারে অফিসে চলে যেও।

না দিদি, মেসে বলে আসি নি, রাতের খাবার নষ্ট হবে। সকালেও নিশ্চয় চাল নিয়ে নেবে। দু-দুটো মিল বরবাদ। এ বাজারে সেটা ঠিক হবে না।

আবার কবে আসবে বলে যাও—

আসব বইকি—আসতেই তো হবে—

কণ্ঠস্বরে মধু ঢেলে দিয়ে শিশির বলে, বিদেশ-বিভুঁয়ে আপনজন বলতে আপনারাই। না এসে যাব কোথায়?

সুনীলকান্তি টিপ্পনী কেটে বলে, এই যেমন এসেছ। চিঠি লিখে হুমকি দিয়ে তবে

আনেতে হল। চাকরি আমিও করি, সময়ের অজুহাত আমায় দেখাতে যেও না।

ভূমিকা ভালই হল, আসল কথা এইবারে। মনে মনে শিশির দুর্গানাম জপছে: দুর্গে দুর্গতিনাশিনী—। কেশে গলা সাফ করে নেয়। বলে, একটা কথা বলব দিদি, কিছু যদি মনে না করেন।

মমতা সঙ্গে সঙ্গে বলে, সবকিছু বলতে পারো একটা জিনিষ ছাড়া। বললে রাখতে পারব না ভাই।

বলবার আগেই বুঝে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কেটে দিল জানা কথা। শিশিরের মুখ শুকিয়ে এতটুকু। মেয়ে নিয়ে শহরে এসে পড়ল, সেই গোড়ার দিনগুলো ফিরে আসছে আবার। আজকের এই সন্ধ্যা থেকেই। তখন তবু চাকরির হাঙ্গামা ছিল না, সর্বক্ষণ খেদমত করতে পারত। এবারের কি উপায় ?

এত সমস্ত চকিতে মনের উপর খেলে যায়। হেসে মমতা কথা শেষ করল: কুমকুমকে দেবো না। সে তুমি যা-ই বলো। ননদ শাসাচ্ছে—ধর্মঘট করবে, সংসারের কুটোগাছটি ভাঙবে না তা হলে। একলা আমাকে সব করতে হবে। সে তো পেরে উঠব না ভাই। ছেলেপুলেরাও কেঁদেকেটে অনর্থ করবে। মেয়ে এখানে থাকুক—অযত্ন হবে না।

কান দিয়ে শুনে গেল শিশির, কিন্তু মাথায় ঢোকে না। বলছে কি! কল্পতরুর তলায় যেন বসে পড়েছে, মনের বাঞ্ছা ফল হয়ে টুপ করে কোলের উপর পড়ল।

জবাব না পেয়ে মমতা সবিস্তারে বোঝাচ্ছে: মেয়ের কোনরকম কষ্ট হবে না, বলছি আমি। পাঁচ ছেলেমেয়েরা আমার খেলাধুলো করে বেড়ায়, নতুন আর একটি সাথে-সঙ্গে ঘুরছে। এই যে এতক্ষণ এসেছ—সাড়াশব্দ পাও কিছু ?

শিশির বলে, দেখছি তাই বড়দি, যত দেখি অবাক হয়ে যাই। কান্নায় কান্নায় পাগল করে তুলত, এ বাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে চুপ। এদ্দিন পরে এলাম—তা মেয়ে আমার কাছে আসতেই চায় না। সাধ্যসাধনা করে কোলে তুললাম তো সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়ল। যারা জানেন আপনারা—মেয়ে আর আমার কিসের, আপনারাই নিজের করে নিয়েছেন।

মমতা বলে, সে যদি বলো, মায়াবিনী আমার ননদটি। ছেলেপুলে বশ করতে ওর জুড়ি নেই। দেখলে না, তোমার কোলে গিয়ে মেয়ে ছটফট করতে লাগল—কে যেন চাবুক মারছে, নেমে পড়ে ঊর্মির কোলে গেল। গিয়ে একেবারে ঠাণ্ডা। জোঁকের মতন গায়ে লেগে রইল।

হাসতে হাসতে বলে, আগে তবু যা-হোক পেরেছ—এবারে যে স্বাদ পেয়ে যাচ্ছে, ও মেয়ে সামাল দেওয়া বড্ড কঠিন হবে। পারবেই না তুমি।

সুনীলকান্তি বলে, তা বললে তো হবে না। বাসা পেয়ে গেলে তখন কি আর মেয়ে আমাদের কাছে ফেলে রাখবে ? আমরাই বা সে কথা কেমন করে বলব ?

শিশির মুখ শুকনো করে বলে, কত খোঁজাখুঁজি করছি বড়দা, বাসা কিছুতেই পাই নে।

পাওয়া শক্ত, তা বলে পাচ্ছে না কি আর লোকে ? খরচা করলে কলকাতা শহরে বাঘের দুধ অবধি মেলে। আর তোমার তো পুরো বাড়ি নয়—সামান্য একটা-দুটো ঘর—

একটা-দুটো ঘর বলেই তো বেশি মুশকিল। একলা পুরুষ আর বাচ্চা মেয়ে শুনে ঘর দিতে কেউ রাজি হয় না। মেয়েলোক নেই বলে আস্থা করতে পারে না, এই আমার ধারণা হয়েছে। অন্যায়টা দেখুন—মা নেই বলেই কি বাচ্চাকে অনাথ-আশ্রমে চালান

করতে হবে ?

জানলায় পাশে দাঁড়িয়ে ঊর্মি আদ্যোপান্ত শুনল। কুমকুমকে বুকে চেপে ধরে মুখের উপর মুখ নিয়ে এসেছে। বলে, ষড়যন্ত্রটা শুনলে কুমকুম ? বাসা খুঁজছে তোমার বাবা—বাসা করে নিয়ে চলে যাবে।

কুমকুম বলে, হুঁ—

হুঁ কী রে বজ্জাত পাষণ্ডী মেয়ে ? আমরা কেউ যাবো না তো সেখানে, কষ্ট হবে না তোমার ?

হুঁ—

তবে মানা করে দাও। বাবাকে গিয়ে বলো, যাবো না তোমার বাসায়। যাবো না, না—না—না—

শেখানো কথা কুমকুম বলে, না-না-না—

মনের আনন্দে ঊর্মি এবার মমতাকে ডাকে : ও বউদি, কুমকুম কি বলে শোন। তার মতামতটা নেবে তো একবার।

বিজয়গর্বে ঊর্মিলা কুমকুমকে নিয়ে বাইরে ওদের তিনজনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মজা পেয়ে গেছে কুমকুম, ঘাড় দুলিয়ে অবিশ্রান্ত হাততালি দিচ্ছে : না—না—না—

ঊর্মিলা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেয় : বাসা করলে ও যাবে কি না যাবে, তাই বলছে। যাবে কুমকুম ?

না—না—না—

ঐ খেলারই খেলুড়ে হয়ে শিশির কচি মেয়ের কাছে অনুনয়বিনয় করে : হ্যাঁ, যাবে তুমি কুমকুম। যাবে বই কি! লজেন্সের পাহাড় বানিয়ে তার উপর বসিয়ে রাখব।

না—না—না—

হাতজোড় করল শিশির : বকব না কখনো। ভালবাসব। আদর করব। তোমার পিসি কক্ষনো তেমন পারবে না।

কুমকুম অবিচল। জাপানি পুতুলের মতো এদিক-ওদিক ক্রমাগত ঘাড় নেড়ে যাচ্ছে। আর চিকচিকে দাঁত মেলে হাসি। এই হাসির সঙ্গে মাণিক ঝরে পড়ে বোধহয়—মাটিতে খুঁজে দেখলে পাওয়া যাবে।

বিজয়িনীর ভঙ্গিতে ঊর্মি মিটিমিটি হাসে। হাল ছেড়ে দিয়েছে যেন শিশির—তেমনি একটা হতাশ ভাব।

মমতা বলে, দেখলে তো ? দিনরাত্রের সিংহাসন ছেড়ে মেয়েকে আর নড়াতে পারবে না। বাসা করে মেয়ে নিয়ে তুলবে তো ঠাকুরঝিকেও নিয়ে যাবে।

চমক লাগে শিশিরের। কথার কোন গূঢ় অর্থ নেই তো ? নটবরের নিমন্ত্রণের মতো অন্য কিছু নেই তো কুমকুমের সমাদরের পিছনে !

॥ একত্রিশ ॥

কলকাতায় ফিরছে শিশির ট্রেনের মধ্যেও মাঝে মাঝে ঐ চিন্তা। কুমকুমের জন্য ঝাড়সুদ্ধ সকলের মায়া উথলে উঠছে, সেদিনের উগ্রভাবী সুনীলকান্তি দুর্লভ ইলিশ মাছ কিনে আনে এবং অস্নাত অপেক্ষা করে বসে থাকে—একসঙ্গে এত অঘটন এমনি এমনি ঘটে না। চাকরি পেয়ে বিয়ের বাজারে হঠাৎ বিষম চাহিদা হয়েছে—হায় রে

স্বদেশ, পুরুষের সকল গুণের সেরা গুণ হল চাকরি। জঙ্গলের লতায় লতায় টুকটুকে মাকাল-ফল ঝোলে, কাকে শালিখে বুলবুলে ঠোকরায়—শিশিরেরও তেমনি নটবরের গৃহে নিমন্ত্রণ, কুসুমডাঙার সমাদর এবং পূর্ণিমার—। পূর্ণিমা বাজপাখির মতো ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকে একগাদা খরচ করল। বহুদর্শী নটবর যা বলেন, সে কি ষোলআনা মিথ্যে? তা দিব্যি হয়েছে—এই কাড়াকাড়িটা এবার কুমকুমের উপর গিয়ে পড়ুক। আছে সে কুসুমডাঙায়—ধরো, অসুবিধা ঘটল সেখানে। কানে শুনে নটবর আহা-ওহো করে উঠলেন: নিয়ে এসো আমার বাড়িতে, আমার নাতনি ছেলেপুলে চোখে হারায়—থাকুক সেখানে। এবং ধরা যাক, কোন এক সূত্রে পূর্ণিমাও জেনে ফেলেছে: আমার কাছে দিন না এনে—। বছরে মোটমাট মাস বারোটি—তিন জায়গায় চার মাস করে ভাগে পড়ল। কুমকুম, তোর বড্ড মজা রে—কুসুমডাঙায় চার মাস, শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে চার মাস, ভবানীপুরে চার মাস কুটুমভাতা খেয়ে খেয়ে বেড়াবি। আদর-আহ্লাদের প্রতিযোগিতা—কারণ যার উপর কুমকুমের সকলেরবেশি টান, আমি তো সেইদিকেই ঝুঁকব।

সকৌতুকে আরও ভাবছে, চাকরি পেতে না পেতে তিন উমেদার। সবুর করো, চেনা-জানা বাড়ুক, কত দিক থেকে আরও কত এসে পড়বে! সেকালের স্বয়ম্বর-সভায় পাত্রেরা নানারকম লক্ষ্যভেদ করে রাজকন্যা জিতে নিত, আমার বেলা কন্যাদের পরীক্ষা—কে আমার কুমকুমকে বেশি করে মায়ায় টানতে পারে। কনে-পছন্দ নয়, মা-পছন্দের ব্যাপার—বরের গার্জেন রূপে কুমকুমই সে কাজ করবে।

কামরার এক পাশে অর্ধেক চোখ বুঁজে শিশির মনের খুশিতে এইসব আবোল-তাবোল ভাবছে। উমেদারের পর উমেদার—পরীক্ষা চলতে থাকুক তাদের নিয়ে। মেয়ে তার মধ্যে বড় হয়ে উঠবে। ইস্কুলে দেবো, বোর্ডিং-এ থাকবে—আমার আর ভাবনা কি তখন?

দমদম স্টেশন থেকে ট্যাক্সি নিয়ে শিশির মেসে ফিরল। বাসে চড়ে আসতে ইচ্ছে হল না, কিঞ্চিত নবাবির শখ হয়েছে! ঘরে ঢুকে দেখে, আড্ডা স্তিমিত—দুটো বাজি শেষ করে ছক গুটিয়ে ফেলছে এবারে।

শিশির বলে, এ কি, এখনই ইস্তফা?

ক'টা বেজেছে?

হাতে ঘড়ি—তবু শিশির আন্দাজি বলে ন'টা—

অমিতাভ আপত্তি করে বলে; আবাব এখন বসলে বাজি শেষ হতে বিস্তর রাত হয়ে যাবে।

শিশির বলে, বা রে, ছুটোছুটি করে ফিরলাম—আমি যে একদান খেলব।

সমস্ত আড্ডা তাকিয়ে পড়ে তার দিকে: আপনি খেলবেন—জানেন আপনি খেলা?

পাড়াগাঁয়ের মধ্যবিত্ত ঘরের মানুষ—তাস-দাবা-পাশা জানি নে তো দিন কাটত আমার কেমন করে?

কারো অপেক্ষায় না থেকে ছক-গুঁটি নিজেই সে সাজিয়ে ফেলল: বসে পড়ুন, কে কোন্ দিকে বসবেন।

জানে খেলা সত্যিই—ভালো না হলেও চলনসই।অমিতাভ বলে, তবে পালিয়ে বেড়ান কেন? সাংঘাতিক লোক আপনি—খেলুড়ে অভাবে আড্ডা বন্ধ হয়েছে, তবু কখনো ধরাছোঁয়া দেন নি।

খেলা ভাঙতে সাড়ে-দশটার উপর। বরাবর শিশির চুপচাপ থাকে, আজকে তারই গলা প্রচণ্ড। দানের মুখে এমন চিৎকার দেয়, মুঠোর পাশাও বুঝি থরথর কাঁপে। এত স্ফূর্তি কোনদিন কেউ দেখে নি।

অমিতাভ বলে, কি হয়েছে, বলুন দিকি? কোথায় আজ বেরিয়েছিলেন, সারাদিন ছিলেন কোথা?

মেয়ে দেখতে—

কথাটা বলল কুমকুমকে ভেবে, এরা ধরে নিয়েছে বিয়ের কনে দেখতে গিয়েছিল সে। তা-ও অবশ্য পুরোপুরি মিথ্যে নয়।

অমিতাভ কিঞ্চিৎ অভিমানের সুরে বলে, বললেন না একবার? তা দেখলেন কেমন, হল পছন্দ মেয়ে?

মেসের জনৈক শ্রীপতিবাবু বললেন, পাকাপাকির আগে আমার ভাগনীকে একটি বার দেখুন না। অতি সুশ্রী মেয়ে, বি-এ পড়ে, তিলসোনার মিত্তির বাড়ির মেয়ে—রীতিমত বনেদি ঘর।

দেখতে পারি। কিন্তু আমি নয়, দেখবে আমার মেয়ে।

অমিতাভ সবিস্ময়ে বলে, কোন্ মেয়ে? কুমকুম ছাড়া মেয়ে কোথায় আপনার?

হ্যাঁ, কুমকুম পছন্দ করবে।

সকলের হাসি দেখে শিশিরও হেসে বলে, মাস তিন চার থাকবে কুমকুম কনের কাছে। তারপরে যদি দেখা যায়—আঁকড়ে আছে কুমকুম, ছেড়ে আসতে চাচ্ছে না, সেই কনে সে পছন্দ করেছে বুঝব। পরীক্ষায় কনে পাশ হয়ে গেছে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে শিশির আর অমিতাভ পাশাপাশি শুয়ে পড়েছে। তক্তাপোষ সরিয়ে দিয়ে মেজের উপর বড় কষ্টের শোওয়া—জায়গা এত সংকীর্ণ, পাশ ফিরতে গেলে গায়ে গায়ে ঠেকে যায়। অমিতাভকে ভাল বলতে হবে—সামান্য পরিচয়সূত্রে এত কষ্ট করছে এতদিন ধরে। তবে আর বেশিদিন নয়—ইদানীং প্রায়ই বলছে কোন একটা ব্যবস্থা করতে। এবং তার জন্য দোষ দেওয়া যায় না।

দেখা গেল অমিতাভর হাতেও পাত্রী মজুত। পাশাপাশি শুয়ে আরম্ভ করল: মজাটা দেখছেন—বাংলাদেশে চলনসই মাঝারি মেয়ে নেই, সবই পয়লানম্বরি। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনেও দেখুন—সুন্দরী, সুশ্রী, সুদর্শনা, লেখাপড়া এবং নৃত্যগীতবাদ্যে পটিয়সী, রন্ধন ও গৃহকর্মে নিপুণা, সর্বগুণসম্পন্ন। চুলোয় যাক গে। যা বলছি—আমার এক ভাইঝি, মামাতো ভাইয়ের মেয়ে—এলাহাবাদ থাকে তারা, বর্ণনা কিছু দেবো না, কোন এক ছুটিছাটায় মেয়ে এনে দেখিয়ে যাবে। শ্রীপতিবাবু হোন আর যিনিই হোন, এই মেয়ে না দেখা পর্যন্ত কোনখানে পাকা-কথা দেবেন না। আমার অনুরোধ রইল।

অমিতাভ ঘুমিয়ে পড়ল। পাত্রীর ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কিতে চিন্তিত হয়ে পড়ছে শিশির। অবস্থা দিনকে-দিন সঙ্গীন হচ্ছে। তাদের সিঁদুরে আমগাছে বৈশাখের গোড়াতেই আম সিঁদুরবর্ণ হয়ে ঝোলে, পাখ-পাখালি এসে ঠোকরায়। সেই ডাঁসা অবস্থায় সমস্ত আম পেড়ে ফেলতে হয়, নয় তো ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলে। শিশিরের উপরেও তেমনি ঠোকর পড়েছে। আঙুলে গুণে পাত্রীগুলোর গুণগরিমা হিসাব করছে:

মেসের শ্রীপতিবাবুর ভাগনী—ভদ্রলোক ইতিমধ্যেই দিন চারেক রাবড়ি ও মিষ্টি খাইয়েছেন, উদ্দেশ্য তখন সে জানত না। প্রবীণ মানুষটাকে তিক্তকথায় ঘাড় নেড়ে দিতে চক্ষুলজ্জা লাগে। অমিতাভর ভাইঝি—বন্ধুলোক অমিতাভ, অসময়ে বড্ড উপকার

করেছে, তার ভাইঝি বাতিল করা কৃতঘ্নতা। সুনীলকান্তির বোন ঊর্মি—করো বরখাস্ত, কুমকুমেরও অমনি পত্রপাঠ বিদায়। নটবরের নাতনি—যতই হোক সেকশনের মাথা নটবর, অফিস-মাস্টার বিগড়ে থাকলে মনিবের কান ভাঙিয়ে চাকরির ক্ষতি করবে। এবং পূর্ণিমা—বড় গোলমেলে ব্যাপার ঐখানটা—পূর্ণিমা উমেদারই কিনা সঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

মোটের উপর অগোণে এসপার-ওসপার করা উচিত, যত দেরি হবে ঝামেলা বাড়বে ততই। শেষকালে হয়তো খেরো বাঁধা পাকা-খাতা বানাতে হবে পাত্রীর লিস্টি রাখবার জন্য। নতুন আইনে একের অধিক বিয়ে করলে জেলে নিয়ে পোরে। সেকালে খাসা ছিল—যতজনকে খুশি তুষ্ট করা চলত।

সকৌতুকে ভাবতে ভাবতে শিশিরও এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

কিন্তু অফিসের মধ্যে পূর্ণিমা মৌন, বিষণ্ণ—ঘাড় গুঁজে নিজমনে কাজ করে যাচ্ছে। শিশির যতবার তাকিয়েছে, ঐ এক অবস্থা। হঠাৎ পূর্ণিমা এ কেমন হয়ে গেল!

বাইরে যাচ্ছিল শিশির। দেখল, পূর্ণিমা ফোনের কাছে। ফোনে অসুখের খবর জিজ্ঞাসা করছে। এই অসুখবিসুখের জন্যেই বোধকরি পূর্ণিমার মন খারাপ। শিশির কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

ফোন রেখে পূর্ণিমা বলে, আমার ভাইয়ের শাশুড়ির বিষম হার্টের অসুখ। কোন-দিন বাড়ে কোনদিন বা একটু কম থাকে। আজ ক'দিন বিষম বাড়াবাড়ি চলছে।

বলে ফিক করে হেসে পড়ল। ক'দিনের মধ্যে পূর্ণিমার মুখে হাসি এই দেখা গেল। তাজ্জব কিন্তু, আত্মীয়ের অসুখ বেড়েছে বলে হাসি। সহসা পূর্ণিমা যেন সম্বিৎ পেয়ে যায়। শিশিরকে বলে, ঘর? অনেককে বলে রেখেছি। ব্যস্ত হবেন না, জুটে যাবে একটা। খোঁজখবর পেলেই জানাব।

শিশির আহত কণ্ঠে বলে, ঘরের জন্য কে বলছে? ঘর ছাড়া অন্য কথা যেন থাকতে নেই!

বিনি-কাজে কেউ কথা বলেছে, আমার তো কই মনে পড়ে না। দেখতে মানুষ বটে আসলে মেশিন, হাত-পা নাড়াচাড়া মানেই কাজ—সকলে এই জেনেবুঝে রেখেছে আমার সম্বন্ধে।

শিশির বলে, আমি যা জানি সে জিনিষ উল্টো। হাত ধরে হিড়হিড় করে রেস্তোরাঁয় টেনে একগাদা খরচ করা—কাজ নয় সেটা, খেলা। বুড়ো নটবরকে ধোঁকা দেওয়া।

প্রশ্ন ঘুরিয়ে পূর্ণিমা বলে, আপনার তো বেশ কথা ফুটেছে—

শহরের গুণ যাবে কোথা! বোবাও এখানে বকবক করে। কিন্তু যে জন্যে এসেছি—আজকে আমি আপনাকে রেস্তোরাঁয় নিয়ে যাবো। রেস্তোরাঁই বা কেন—

ভবতোষের কাছে যে নাম-করা ছবির কথা শুনেছে, সেই প্রসঙ্গ তোলে: চলুন ছবিটা দেখে আসি গে—

পূর্ণিমা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। নিঃশ্বাস ফেলে তারপর বলে, বিশ্বাস করুন শিশিরবাবু, কোনরকম আমোদ-আহ্লাদে আমায় কেউ ডাকে না। দোষ দিই নে সেজন্য। ভরসা পায় না। ঐ সব তুচ্ছ জিনিষের অনেক উপরে আমার বিচরণ। আপনার সঙ্গে সামান্য চেনা-জানা, আপনি সেই জন্যে ডাকতে পারলেন।

সেদিন অবশ্য কিছু নয়। সিনেমার টিকিট.বাঘের দুধ নয় যে চিড়িয়াখানায় গিয়ে পয়সা ফেললেন আর পোয়াটাকে দুয়ে এনে বাটিতে করে দিয়ে দিল। বিস্তর কাঠখড়

পেমেন্টের আবশ্যক। আগেভাগে গিয়ে লাইন দেবেন অথবা বুকিং-অফিসের সঙ্গে বন্দোবস্ত রাখবেন। ইচ্ছামাত্রেই এ জিনিষ হয় না।

তা ছাড়া পূর্ণিমারও বাধা আছে। ভানুমতীকে ভাল করে তালিম দিতে হবে, বাপের কাছাকাছি সর্বক্ষণ যাতে সে হাজির থাকে। এবং তারণের কাছেও বলে আসতে হবে একটা-কিছু। ধরুন: অফিস থেকে দেরিতে ফিরব আজ বাবা, কোম্পানির সে আমলের এক ডিরেক্টর বিলেত থেকে এসেছে—দেখতে চায় এদের হাতে ফ্যাক্টরি কেমন চলছে। আমাকে ওদের সঙ্গে থাকতে হবে। বাড়ি ফিরতে ন'টা-দশটাও হয়ে যেতে পারে।

চিরকালের পীঠভূমি ছেড়ে দেবী যাচ্ছেন অস্থানে সিনেমা-দর্শনে—কম হাঙ্গামা! ঘড়ি দেখে শিশির ব্যস্ত হচ্ছে: দেরি হয়ে গেল—চলুন, চলুন।

পূর্ণিমা বলে, দাঁড়ান পান খেয়ে যাই? ঐ গলিতে পানের দোকান আছে একটা শ্যামবাজার-বেলেঘটো থেকে লোকে গাড়ি করে পান খেতে আসে।

অগত্যা যেতে হল সেই সুবিখ্যাত দোকানে—পান কিনল, মশলা চেয়ে নিল, চুন নিল বোঁটার আগায় করে। অথচ পূর্ণিমার দু'পাটি দাঁত সাদা চিক-চিক করে, পানের ছোপ দাঁতের উপর কোন দিন কেউ দেখে নি। পানের উপর ঝোঁক আছে, সিনেমার পথে প্রথম এই জানা গেল।

সিনেমা-হলে সত্যি-সত্যি অবশেষে প্রবেশলাভ—সরকার হেনো করেছেন তেনো করেছেন, দুধ-মধুর গঙ্গা-গোদাবরী বইয়ে দিচ্ছেন, ইত্যাদি গৌরচন্দ্রিকা সমাধা হয়ে মূলে ছবিরও বেশ খানিকটা তখন এগিয়ে গেছে। শিশির মনে মনে ফুঁসছে: মেয়েলোক নড়ানো আর পাহাড় নড়ানো একই কথা—দেখ দিকি, অফিস থেকে এইটুকু পথ আসতে কত সময় লাগিয়ে দিল!

পূর্ণিমার কিন্তু ভারি সোয়াস্তি। লাউঞ্জ প্রায় নির্জন—ছবি দেখার মানুষরা ঢুকে পড়েছে, যারা এসে হলের সামনে গুলতানি করে তারাও আর নেই। চেনা মানুষের মুখোমুখি পড়বে, বড্ড ভয় ছিল: দেখ দেখ, পূর্ণিমা হেন মেয়েও সিনেমা দেখতে আসে—দুনিয়ায় এর চেয়ে বড় বিস্ময় আর কি? কেউ কোন দিকে নেই—চুপিসাড়ে এবারে অন্ধকার ঘরে নিজেদের সিটে গিয়ে বসে পড়া। টর্চ ধরে সিট দেখিয়ে দিল। পরিপূর্ণ হল—নিঃশব্দ এবং একেবারে নিভৃত। জগৎসংসার শূন্যে মিলিয়ে গেছে, পর্দার ছবির পানে সকলের দৃষ্টি—ছবিরা হাসে কাঁদে, তাই নিয়ে মজে আছে হল-ভরা মানুষ।

তাই কি? বেশি দূরে নয়, দূরে হলে নজরই চলত না—সামনের সারিতে ঐ যে দুটি। ছবি দেখতে এসেছে মনে হয় না—টিকিট কেটে ঢুকেছে দুখানা সিট নিয়ে বসতে পাবে বলে। ফিসফিসানি অবিরত। ছবি থেকে পূর্ণিমার নজর ফিরল ঐদিকে। পার্শ্ববর্তী শিশিরও কি আর দেখে নি? কখনো মাথায় মাথা রাখছে, হাত বেড় দিয়ে ধরছে একে অন্যকে। গায়ের উপর গড়িয়ে পড়ে কখনো বা—কী করছে আর কী না করছে! ওরে হতভাগী এবং ওরে হতভাগা, চার দেয়ালের একটা নিরালা ঘর নেই তোদের? অথবা এই জিনিষই হয়তো চেয়েছে ওরা—সকলের চোখের উপর দিয়ে চুরি করায় যে বাহাদুরি তাই হয়তো চেখে চেখে উপভোগ করছে। অন্ধকার ঘর, মানুষজন অস্পষ্টমূর্তি, মধুর একটা স্বপ্নের আবহাওয়া চারিদিক ছেয়ে আছে। অন্ধকারে কে দেখবে, ভাবছে হয়তো ওরা। কিংবা ভেবেছে, পর্দার দিকে সকলের দৃষ্টি—হলের ভিতর অন্য দ্রষ্টব্য কিছু থাকতে পারে, সে খবর কেউ জানে না। সেই কতকাল আগে বিশাখা যে সব উপাখ্যান বলত, তারই একটা যেন চোখের উপর চলে এসেছে।

ইন্টারভ্যালে আলো যেই জ্বলেছে, পূর্ণিমা আঁতকে উঠল। বাঘ দেখেছে না ভূত

দেখেছে—তারও চেয়ে ঢের-ঢের সাংঘাতিক, সামনের লাইনের সেই মনুগণকে চেনা যাচ্ছে এবারে আলোয়। দম যেন আটকে আসে—ব্যাকুল হয়ে পূর্ণিমা শিশিরকে বলে, বাইরে চলুন, শিগগির—

শিশিরের ইচ্ছা নয়। ভবতোষ বাড়িয়ে বলে নি, ছবিটা দস্তুরমতো ভালো। গড়িমসি করে শিশির বলে, এক্ষুণি তো আবার আরম্ভ হবে। বাইরে কোথায় যাব, বৃষ্টি হচ্ছে শুনছেন না—

কথা নয়, হাত ধরে টান এবারে। উঠতে হয় শিশিরকে, পিছু-পিছু চলতে হয়। হলের ভিতর এখন আলোর বন্যা—মহিলার সঙ্গে হাত-টানাটানি করা চলে না।

লাউঞ্জে বেরিয়ে এলো। সন্ধ্যাবেলা মেঘ করেছিল বটে। শহরে কে আর আকাশে তাকাতে চায়—এক-আধবার দৈবাৎ নজরে এসেছিল, গ্রাহ্য করে নি। ছবি দেখবার সময় আন্দাজ পেয়েছে, বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়-বাতাস। সে-যে এমন প্রলয়ংকর কাণ্ড কে ভাবতে পেরেছে! খুব বেশি তো ঘণ্টা দেড়েক ছিল হলের ভিতর—ইতিমধ্যে পিচ দেওয়া বড়-রাস্তাটা পুরোপুরি নদী হয়ে গেছে, খরবেগে স্রোত বইছে। সে নদীর জলে নৌকো না-ই থাক, এখানে-ওখানে অর্ধেক-ডোবা মোটরগাড়ি। ইঞ্জিনে জল ঢুকে অচল—পথের ছোঁড়াগুলোর নতুন রোজগারের পথ হয়েছে, সেই সব গাড়ি ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাওয়া। বৃষ্টি সমানে চলেছে। কলকাতা শহরের রাস্তাঘাটের আশ্চর্য ইঞ্জিনিয়ারিং কৌশল—আকাশে মেঘ উঠলেই জলে ডুবে যাবে, বৃষ্টি পড়া লাগে না। কিন্তু আজকের যা ব্যাপার—অক্টারলোনি মনুমেণ্টই ডুবে না যায় জলের নিচে।

আর এই লাউঞ্জে এসেই শেষ নয়—রাস্তার জলের মধ্যে পূর্ণিমা, দেখ, নেমে পড়ছে। শিশিরকে ডাকে, চলে আসুন—

হঠযোগীর মতন জলের উপর দিয়ে হাঁটার প্রক্রিয়া পূর্ণিমার হয়তো জানা আছে, শিশির জানে না। সবিস্ময়ে সে বলে, ছবি দেখবেন না? ভাল ছবি তো।

রুখে ওঠে পূর্ণিমা: না, দেখব না। না যাবেন তো বলে দিন, একলা চলে যাচ্ছি।

এত বড় পাগল জানা ছিল না। বৃষ্টি বাঁচানোর জন্য মাথার উপর শাড়ির আঁচল তুলে দিয়ে জল ভাঙতে ভাঙতে পূর্ণিমা চলল। এমনি সাধারণ অবস্থায় একলা ছাড়লে দোষ ছিল না—ট্যাক্সি ডেকে দিলে কিংবা দু'-পা এগিয়ে বাসস্ট্যাণ্ড অবধি গেলে ভদ্রতার চরম হত। ট্রাম-বাস-ট্যাক্সির এখন তো কথাই ওঠে না। যানবাহনের মধ্যে রিক্সা—তাদেরও আজ বিরাট মরশুম, রাস্তার শেষ অবধি তাকিয়েও রিক্সাওয়ালার টিকি দেখা যায় না।

পায়ের জুতো হাতে করে নিয়ে বেজার মুখে শিশিরও অগত্যা জলে নামে। কী রকম অধঃপতন তার! গাঁয়ে ছিল জবরদস্ত জোয়ানপুরুষ – এখানে নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বলে কিছু নেই, পোষা কুকুরের মতন রমণীর পিছু-পিছু চলল।

রমণী বটে—তাই বলে ললিত লবঙ্গলতা হয়ে হেলে-দুলে চলা নয়। যেন হিংস্র জন্তুতে তাড়া করেছে পূর্ণিমাকে, হাঁটুভর জল হলেও তীরের বেগে ছুটেছে। শিশির তাল রেখে পারে না—প্রাণপণ করেও পিছিয়ে পড়ে।

একটা গাড়ি-বারান্দা পেয়ে সেইখানে পূর্ণিমা শিশিরের অপেক্ষায় দাঁড়াল। উপরে আচ্ছাদন বটে, কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে জলের মধ্যে। শিশিরের মতন জুতো খুলে হাতে নেয় নি, জলতলে জুতোর অবস্থা বোঝার জো নেই। গায়ের কাপড়-চোপড় মাথার আঁচল ভিজে লেপটে আছে—বেশ কেমন বউ-বউ দেখাচ্ছে। পাড়াগাঁয়ের বউটি পুকুরে

ডুব দিয়ে ভিজে কাপড়ে যেন ঘাটের উপর উঠে দাঁড়িয়েছে। নতুন চেহারায় দেখছে পূর্ণিমাকে।

একটা ছবি। জাঁকিয়ে জগদ্ধাত্রীপুজো হত ঝুমঝুমপুর পোদ্দারদের বাড়ি। কোন এককালে পোদ্দাররা জমিদার ছিলেন, সেই থেকে চলে আসছে। কুমকুম হয় নি তখনো, পূরবীকে পুজো দেখিয়ে আনবে। মাকে বলে নি—মা জানলে ঠিক আপত্তি উঠবে। বিলপারে ঝুমঝুমপুর—যাবে কেমন করে সেখানে? ডোঙা জোগাড় করল। ডোঙা জিনিষটা সহজলভ্য শিশিরদের অঞ্চলে। তালগাছ ফেড়ে ভিতরের শাঁস ফেলে দিয়ে ডোঙা বানায়—সেই ডোঙায় চেপে টুক-টুক করে লোকে বিলের এপার-ওপার করে। শহরের ফ্যাসান-দুরস্ত মেদের ঢিবি নয় পূরবী, ডোঙায় এই প্রথম চেপেছে তা-ও নয়। ডোঙার উপর কাঠের পুতুলের মতন বসে থাকবার নিয়ম। কিন্তু নিয়ম কে মানতে যাচ্ছে— একবার এদিক, একবার সেদিক ঢলে ঢলে পড়ে পূরবী, যৌবনের বোঝা সামলাতে প্যারে না যেন ঐটুকু দেহে। ফল পেতে দেরি হল না – কাত হয়ে জল উঠে ডোঙা ডুবল। মারাত্মক কিছু নয়—এখন এই শহরের রাস্তায় যা জল, বিলের জল কিছু বেশি হয়তো এর চেয়ে। এবং সাঁতারে দুজনাই দক্ষ। ঠেলে-ঠুলে ডোঙা আরও কম জলে নিয়ে জল সেঁচে ফেলে সেই ডোঙাতেই ফিরল তারা। ভিজে-জবজবে কাপড়চোপড় গায়ের সঙ্গে যেন আঠা দিয়ে আঁটা। অপথ-কুপথ কাদা-জল ভেঙে বাড়ি ফিরছে। কাছাকাছি মানুষজনের সাড়া পেলেই ঝুপ করে ঝোপঝাড়ের অন্তরালে পূরবী বসে পড়ে তেমনি জিনিষ আজও। ঠিক এইরকম, হুবহু এই ছবি —

পূর্ণিমা বলে, কি দেখছেন অত করে?

মাথায় ঘোমটা—বেশ দেখাচ্ছে আপনাকে।

আবার চলল। এবারে পাশাপাশি। পূর্ণিমা বলে, জুতো হাতে নিয়েছেন কেন? খালি পায়ে যাওয়া ঠিক নয়। রাস্তায় কত কি থাকে—পায়ে ফুটে বিষাক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে।

শিশির ভ্রূভঙ্গি করে বলে, খুব বেশি তো জীবনটা যাবে। কী আর এমন! জীবনের চেয়ে জুতোজোড়া বেশি আক্রা।

বৃষ্টির আর শেষ নেই। এক একবার প্রবল হয়ে নামে—বেশ কমে যায়, কিন্তু একেবারে থামে না। রাস্তার জল আরও বেড়েছে। উপরের আকাশের জল—আর মনে হচ্ছে, ঝাঁঝরির মুখে একটি ফোঁটাও নর্দমায় না নেমে নিচের পাতালের জল চক্রাকারে পাক দিয়ে উপরে উঠে আসছে। ওল্ড টেস্টামেন্টের মহাপ্লাবনের ব্যাপার—আকাশ ফুটো, পাতালও ফুটো, দুদিকের জল এসে জমেছে।

হঠাৎ শিশির প্রশ্ন করে: আপনাদের শহরের লোক নৌকো রাখে না কেন?

হাঁটতে হাঁটতে কিছু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল পূর্ণিমা। শিশিরের দিকে তাকিয়ে পড়ে বলে, কেন?

ছোট ডিঙিনৌকো কিংবা তালের ডোঙা? ছাতের উপর উপুড় করে রেখে দিল, বর্ষার সময়টা নামিয়ে নেবে। এ তো নিত্যিদিনের ব্যাপার। মোটরগাড়ি মাস আষ্টেক চলে, বর্ষার চারমাসের জন্য নৌকো।

এতখানি পথ এসে রিক্সা অবশেষে একটা পাওয়া গেল। পাশের এক বাড়িতে প্রকাণ্ড এক দঙ্গল নামিয়ে দিয়ে সদ্যমাত্র খালি হয়েছে। হাঁটতে পারছে না আর পূর্ণিমা, জল ঠেলে ঠেলে পা ভেঙে আসছে। উঠে পড়ে রিক্সার দখল নিয়ে নিল। শিশিরকে ডাকে: আসুন—

আমি কোথা যাব? আপনি দক্ষিণে যাবেন, আমার তো ঠিক উল্টোদিকে—বেলগাছিয়ায়।

পূর্ণিমা বলে, যাবেন কি করে? রিক্সা পেলেও এই দুর্যোগে অতদূর কেউ নিয়ে যাবে না। জল ভেঙে পায়ে হেঁটে যেতে রাত কাবার হবে।

শিশির বলে, পায়ে হাঁটব কেন? বড় রাস্তার ধারে গিয়ে দাঁড়াই গে—গাড়ি তো আসবেই এক সময়।

বৃষ্টি ধরবে, জল সরে যাবে, গাড়ির চলাচল শুরু হবে—সে আর এ রাত্রের মধ্যে নয়। কপাল ভালো হলে সকালের দিকে পেতে পারেন। ভিজে কাপড়-জামা নিয়ে জলের মধ্যে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

শিশির উড়িয়ে দেয়ঃ পাড়াগাঁয়ের লোক—ভিজে শুকনো একসমান আমাদের কাছে। জল আমরা ডরাই নে।

আমরা ডরাই। এই অবস্থায় সারা রাত্রি থাকলে নির্ঘাৎ নিউমোনিয়ায় ধরবে।

ক্লান্ত পূর্ণিমা আর পারে না। ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, তবু দাঁড়িয়ে রইলেন?

তা বটে! আপনাকে একলা ছাড়া ঠিক নয়—

রিক্সাওয়ালাকে উদ্দেশ করে শিশির বলে, চলো তুমি, আমি সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছি। তুমি হাঁটবে তো আমিই বা কেন পারব না? কম কিসে তোমার চেয়ে?

এবারে কলহ দস্তুরমতো। পূর্ণিমা বলে, আসল কথা কি বলুন তো? পাশে বসতে ঘৃণা – গায়ে দুর্গন্ধ বুঝি আমার?

শিশির হেসে ব্যাপারটা লঘু করতে চায়ঃ আসল কথা হল, দুয়ের ভারে রিক্সা ভেঙে পড়বে। পুরুষছেলে একলা আমি হাঁটতে চাচ্ছি, রিক্সা ভাঙলে পুরুষ-মেয়ে দু'জনকেই হাঁটতে হবে তখন।

পূর্ণিমা বলে, বর্ষার দিন বলে আজ চারগুণ ভাড়া। রিক্সা মানুষ নয়—সেইজন্যে আক্কেল-বিবেচনা আছে। চারগুণ ভাড়া দিয়ে বোঝা যত খুশি চাপান, ভাঙবে না। এই রিক্সা চেপেই তো জন-আণ্টেক এসে নামল—কী হয়েছে, একটা ইস্কুপও ঢিলে হয় নি।

নেমে এসে পূর্ণিমা হাত ধরল শিশিরের। হেন ব্যাপার আগেও হয়েছে—প্রতিকার কিছু নেই। জাঁতিকলে-পড়া ইঁদুর যেন শিশির—টেনে তাকে রিক্সার উপর তুলল।

চলল রিক্সা ঠুনঠুন ঘণ্টি বাজিয়ে। খারাপ লাগে না। বৃষ্টির জন্য মাথার উপর ঢাকা তুলে দিয়েছে। দু'জনে উঠে বসতে সামনে একটা ক্যাম্বিসের পর্দা খাটিয়ে দিল গায়ের উপর দিয়ে—বৃষ্টি গায়ে লাগবে না। সংকীর্ণ এক বস্তার ভিতর দু'জনকে পুরে যেন মুখ এঁটে দিল। ভালই লাগে।

কৌতূহল অনেকক্ষণ মনের মধ্যে তোলপাড় করছে, শিশির প্রশ্ন করেঃ হঠাৎ এমন ছুটোছুটি করে বেরিয়ে এলেন—ছবি তো খারাপ নয়, কি হয়েছিল?

চেনা লোক ওখানে—

শিশির বলে, চেনা হলে তো ডেকে নিয়ে আলাপ-সালাপ করি আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক। পাওনাদার হলে অবশ্য আলাদা কথা।—পালাই।

পূর্ণিমা বলে, আমার ছোটভাই বউ নিয়ে সিনেমায় এসেছে—সামনের সারির সেই দুটি। আমায় দেখে না ফেলে—মুখ ঢেকে তাই পালিয়েছি।

একটু থেমে আবার বলে, দেখেই ফেলেছে ঠিক। নইলে ইণ্টারভ্যালে তারাই বা মুখ ফিরিয়ে থাকে কেন? কী লজ্জা, কী লজ্জা!

কিন্তু লজ্জার কিছু থাকলে তো সেই তরুণ দম্পতির, আবছা অন্ধকারে সিনেমা-হলকে যারা নিভৃত প্রকোষ্ঠ বানিয়ে নিয়েছিল। পূর্ণিমার কেন জল ভেঙে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে হয়—ব্যাপারটা শিশিরের মাথায় আসে না। সিনেমা দেখার মধ্যে লজ্জার কি আছে? তার জন্য পালাতে হবে কেন?

আমার হয়। শুধু তো দিদি নই, দেবী আমি। সকলে মিলে দেবী বানিয়েছে। দেবী আবার সিনেমা দেখবে কি, সংসারের মঙ্গল করে বেড়াবে। মরণদশা হল, কলেজে পড়তে গেলাম—তখন থেকেই মঙ্গল করে আসছি। চিরকাল আমায় মঙ্গল করে যেতে হবে।

হাহাকারের মতো শোনায়। কণ্ঠ বুঝি অশ্রুভারে বুঁজে আসে। বলে, দেবীর কত খাতির-সম্মান! শতেক মুখে প্রশংসা, সবাই তার মুখাপেক্ষী। নিজের বলে কিছু থাকতে নেই, সর্বজনের পালয়িত্রী সে। দু'হাত ভরে সবাই তার কাছ থেকে নেবে, কিন্তু আমোদ-উৎসবে সে বাদ। ভাবখানা যেন রুক্ষ নজর লেগে উৎসব জ্বলেপুড়ে যাবে।

দুর্যোগ-রাত্রে হঠাৎ পূর্ণিমার কী যেন হয়েছে, বিস্তর দিনের জমানো ব্যথা উজাড় করে বলে যাচ্ছে। শিশির কতক বোঝে, কতক বোঝে না। এরই মধ্যে কেমন করে ঠাহরে এলো, বাড়ির গলির কাছাকাছি এসে পড়েছে। পর্দার বাইরে মুখ নিয়ে পূর্ণিমা গলিতে ঢোকবার নির্দেশ দিয়ে দেয়।

শিশিরকে বলে, রাতটা আমাদের বাড়িতে থেকে যান, তা ছাড়া উপায় কি! বেলগাছিয়া যাওয়া অসম্ভব, এ বৃষ্টি রাতের মধ্যে ধরবে না।

গলিপথটুকুতেও আবার সেই দেবীর উপাখ্যান। বলে, যে গাঁয়ে আমাদের তালুক ছিল, ছোটবেলা একবার সেখানে যাই। পুরানো অট্টালিকা মন্দির রাসমঞ্চ দোলমঞ্চ গ্রামের এখানে সেখানে। একটা ভাঙা মন্দির দেখেছিলাম, চেহারাটা স্পষ্ট মনে আছে। অশ্বত্থগাছ মন্দিরের গা বেয়ে উঠে চারিদিকে শত শত ঝুরি নামিয়েছে, নাটার জঙ্গলে এঁটে আছে জায়গাটা। দিনদুপুরেও অন্ধকার থমথম করে, ঝিঁঝিঁ ডাকে। বিগ্রহও ছিলেন সে মন্দিরে—নিরম্বু তাঁর দিন কাটত। পুজোআচ্চা পড়ে পড়ুক, দূর থেকে একটা প্রণামও কেউ করত না। আর আমি যে দেবীর কথা বললাম, তাঁরও এখন সেই দশা। আমি জানি, আমি জানি।

ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে পূর্ণিমা চুপ হয়ে যায়। বাড়ির দরজায় এসে গেছে।

॥ বত্রিশ ॥

রিক্সা সবে এসে দাঁড়িয়েছে, ঘণ্টি একটু বেজেছে কি না বেজেছে, বাইরের ঘরের দরজা খুলে গেল। খুললেন তারণকৃষ্ণ, ভানুমতী নয়। ভানুমতীর নিশ্ছিদ্র নিরেট ঘুম। তারণের ঠিক বিপরীত—ঘুম দস্তুরমতো সাধ্যসাধনা করে আনতে হয়। আজ তার উপরে মনের উদ্বেগ—এত রাত্রি হয়েছে, এমন দুর্যোগ, মেয়েটা এখনো বাড়ি ফেরে না কেন?

দোর খুলে তারণ দাঁড়িয়েছেন। রিক্সার পর্দাটা খুলে দিয়ে পূর্ণিমা ও শিশির নেমে পড়ল। তাড়াতাড়ি পূর্ণিমা পরিচয় দিচ্ছে: আমাদের সঙ্গে কাজ করেন বাবা—

শিশিরকুমার ধর। অনেক দূরে বেলগাছিয়া থাকেন। বৃষ্টিতে ট্রাম-বাস বন্ধ, সেই জন্যে বললাম—

কথা শেষ হওয়া অবধি তারণ সবুর মানলেন না। শিশিরও পদতলে প্রণাম করছিল, কিন্তু কোথায় কি—এমনি তো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেন, ছিটকে হাত পাঁচ-সাত দূরে গিয়ে পড়লেন তিনি। পদধূলি নিতে শিশির হাত বাড়িয়েছিল—সে যেন হাত নয়, কেউটে-সাপ। বাগে পেলে ছোবল দিত পায়ে, সরে গিয়ে বড় রক্ষে হয়েছে। ত্রিসীমানার মধ্যে নেই আর তারণ, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে গেলেন।

পূর্ণিমার মুখ আরক্ত হল। কিন্তু অতিথি কিছু মনে না করে—হাসির ছায়া মুখের উপর এনে সহজ কণ্ঠে বলল, বাড়িতে দু'জন আমরা—বাবা আর আমি। বাবা শয্যাশায়ী, দাঁড়াতে পারেন না—উঠে কোন রকমে দরজা খুলে আবার গিয়ে শুয়ে পড়লেন। সে যাক গে, কাপড়-জামা ছেড়ে ফেলুন আগে। আমি আসছি।

সাঁ করে ভিতরে চলে গেল। সামলে নিতে একটু অন্তরাল প্রয়োজন। চলে গেল উপরে—নিজের ঘরে। ক্ষণপরে পাট-ভাঙা শাড়ি আর গামছা হাতে করে ফিরল।

কলঘর দেখিয়ে দিল: ঢুকে পড়ুন। শাড়ি পরতে হবে আপনাকে। বাবার একটা লুঙি-টুঙি হলে হত—কিন্তু খুঁজে পেলাম না। তা পরলেনই বা শাড়ি—রাত্রিবেলা কে দেখছে!

আপনারও ভিজে কাপড়চোপড়। ছেড়ে ফেলুন গে—

উপদেশ দিয়ে শিশির কলঘরে ঢুকে পড়ে।

কিন্তু কাপড় ছাড়ার আগে জরুরি কর্ম ভানুমতীকে ডেকে তোলা। অতিশয় কঠিন কর্ম। বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছে বাইরের ঘরের মেজেয়। পূর্ণিমা এলে দোর খুলে দিতে হবে, নিশ্চয় সেই কর্তব্যের তাড়নায় এ-ঘরে আস্তানা নিয়েছে। পূর্ণিমা বলেও গিয়েছিল তাই: বাবার কখন কি লাগে না লাগে—আজ তুই বাড়ি যাস নে ভানু। বাবার খাবার দিয়ে তুইও খেয়ে নিস। ফিরতে আমার রাত হবে একটু। ততক্ষণ জেগে থাকবি, দোর খুলে দিবি আমি এসে ডাকলে।

সবগুলো কথাই রেখেছে, শেষটুকু কেবল পারে নি—জেগে বসে থাকা। এ জিনিষ অসাধ্য তার পক্ষে। কমবয়সি মেয়ের ঘুমটা কিছু বেশিই হয়, কিন্তু এ বড় সর্বনেশে ঘুম। পূর্ণিমা প্রাণপণ শক্তিতে ঝাঁকুনি দিচ্ছে—ঈষৎ চোখ মেলে ভানুমতী, পুনশ্চ চোখ বুজে যায়। ধরে বসিয়ে দিল—যতক্ষণ ধরে আছে ঠিক আছে, ছাড়লেই গড়িয়ে পড়ে।

কলঘর থেকে বেরিয়ে এসে শিশির দেখছে। হেসে বলে, পারবেন না। এখনো ভিজে কাপড়ে আছেন—চলে যান আপনি।

পূর্ণিমা বলে, আমি হারি নে কখনো।

বড় শক্ত লড়াই—আজ হারবেন।

বসিয়ে হচ্ছে না তো পূর্ণিমা খাড়া দাঁড় করিয়ে দেয়। শোওয়া নয়, বসে পড়ল ভানুমতী। চোখ ঠিক বুজে আছে। পুনশ্চ দাঁড় করাল, ছেড়ে দিতে ঝুপ করে বসে পড়ে। অনেক উন্নতি—শোওয়া অবধি আর যাচ্ছে না। বার কয়েক এমনি উঠ-বোস করানোর পর হঠাৎ ভানু চাঙ্গা হয়ে উঠল। চোখ মেলে বলে, এসে গেছ ছোড়দি?

পূর্ণিমা শিশিরের দিকে চেয়ে সগর্বে বলে, কই হারলাম?

শিশির বলে, দেখছি তাই। অসাধ্য-সাধনের ক্ষমতা আপনার। ঘুমে আর মরণে বড় বেশি তফাৎ ছিল না। আমার তো বিশ্বাস, মরা মানুষকেও এমনিধারা উঠ-বোস

করে বাঁচিয়ে তুলতে পারেন।

ভানুমতী এসব কানে নেয় না। সহজ ভাবে বলে, এতক্ষণে এলে ছোড়দি? দোর খুলে দিল কে?

পূর্ণিমা হাসিমুখে বলে, তুমিই তো দিলে ভানু। আবার কে?

আমি?

ঘুমের ঘোরে দিয়েছ, টের পাও নি। চট করে স্টোভটা ধরিয়ে আমাদের একটু চা করে খাওয়াও দিকি। বড্ড ভিজে গেছি। চা করে দিয়ে তারপর উপরের ঘর থেকে তোষক-বালিশ এনে তক্তাপোষের উপর ভাল করে বিছানা করে দাও। ইনি থাকবেন এখানে।

ভানুমতীর ঘুম কেটেছে। তাড়াতাড়ি স্টোভ ধরাতে গেল। পূর্ণিমা পিছনে চলেছে, বাইরে এসে নিচু গলায় বলল, আমার জন্যে যে ভাত আছে, ভদ্রলোককে দিয়ে দে। রাত্রে আমি খাব না। চায়ের সঙ্গে বরঞ্চ খানকয়েক বিস্কুট খেয়ে নেবো।

ভানুমতী বলে, ভাত যখন দেবো সে তখনকার ভাবনা। আগে তুমি ধুয়ে-মুছে সাফসাফাই হয়ে এসো ছোড়দি।

তারও আগে বাপের ঘরে যাবে একবার। কিছু কথাবার্তা হওয়া আবশ্যক। এক রিক্সা থেকে দু'জনকে নামতে দেখে মুখ হাঁড়ি করে সরে গেলেন, পুরুষের গায়ে গা ঠেকে গিয়ে ঠুনকো মেটে-হাঁড়ির মতন চরিত্র আমার চুরমার হয়ে গেছে! কিন্তু এতই যদি ছুঁয়েছে-ছুঁয়েছে বাই, ঘর থেকে অফিস-পাড়ায় আমায় তুলে দিয়ে এসেছিলে কেন? চাকরি পেয়ে সারা রাত ধরে কত কেঁদেছিলাম, খবর রাখ পূজনীয় জনক-জননী?

এমনি কয়েকটি কথার জিজ্ঞাসা।

তারণ বিড়ি টানছেন চুপচাপ এক দিকে তাকিয়ে। আলো জ্বলছে। পূর্ণিমাকে দেখেও দেখেন না।

পূর্ণিমাই তখন ডাকল: বাবা!

তারণ তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন: কি—কি চাই? আবার এ ঘর অবধি জ্বালাতে এসেছ?

চমক লাগে। দেবী হওয়া সত্ত্বেও বাবার মুখে তুই-তোকারি ছিল। এখন থেকে মান্যগণ্য 'তুমি'। কলহ করতে এসে পূর্ণিমাই এবার নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলে, অফিসের ভদ্রলোকটি বাড়ি এলেন। চোখে দেখলে তুমি, ভালমন্দ একটি কথা বললে না—এটা কি ঠিক হল বাবা?

ক্ষিপ্ত হয়ে তারণ চেঁচামেচি করেন: ভদ্রলোক এসে কৃতার্থ করেছে—পদতলে ফুল-চন্দন দাও গিয়ে তুমি। আমায় ডাকাডাকি কি জন্যে শুনি? চাকরি ঢের-ঢের মেয়ে করে, তোমার মতন কেউ নয়। চাকরি করে দিয়ে পূর্ণ-দা'রও পস্তানির শেষ ছিল না—নাক মলেছে কান মলেছে আমার কাছে। পূর্ণ-দা কলকাতা ছেড়েছে, আমিও ঘরের বার হই নে, কান-চোখ বন্ধ করে কোন রকমে আছি—কুলোজ্জ্বলকারিণী হতে দেবেন তাই? বাইরের আপদ টেনে ঘর অবধি আনা হয়েছে। আবার হুকুম: আজ্ঞে-হুজুর করো তার কাছে বসে-বসে। বয়ে গেছে আমার! অনেক লাঞ্ছনা হয়েছে, আর নয়।

হাতজোড় করে পূর্ণিমা বলে, এই অবধি থাক আজ বাবা। বাইরের লোক বাড়িতে। উনি চলে যান, আমার কথা তখন আমি বলব।

বলবার কী আছে! রোজগারের ক'টা টাকা দিয়ে মাথা কিনেছ নাকি? সে রোজগারও যদি বলবার মতন হত! তোমার এক মাসের মাইনে তাপস কোন কোন সময় এক দিনে

নিয়ে আসে। ঝাঁটা মারি তোমার টাকার মুখে। ও টাকা গোরক্ত, ব্রহ্মরক্ত, ও টাকার আম বিষ। মুখ দেখলে গা ঘিনঘিন করে, বেরিয়ে যাও বলছি ঘর থেকে—

যাবে কি না যাবে সে ভরসায় না থেকে তারণকৃষ্ণ সুইস টিপে ঘর অন্ধকার করে দিলেন। মেয়ের মুখ দেখতে হচ্ছে না আর।

পরের দিন। বাপে মেয়েয় কথাবার্তা আর হয় নি—কতটুকুই বা বাকি ছিল আর কথাবার্তার! পূর্ণিমা যথারীতি অফিস করতে গেছে। সন্ধ্যায় ফিরে এসে দেখে, তারণকৃষ্ণ নেই। বাড়িতে একা ভানুমতী।

তাজ্জব ব্যাপার। বারান্ডা-ঘর থেকে বাইরের ঘরে যে মানুষকে দেয়াল ধরে ধরে সতর্কভাবে আসতে হয়, তিনি নাকি বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। চিরদিনের মতো গেছেন, আর ফিরবেন না।

ফিরবেন না—ট্যাক্সিতে তুলে দেবার পর তারণকৃষ্ণ প্রকাশ করে বললেন। মতলবটা ভানুমতীকে আগে বুঝতে দেন নি, মনে মনে রেখেছিলেন।

পূর্ণিমা ব্যস্ত হয়ে বলে, তুলে দিলেই তো হল না—ট্যাক্সি থেকে নামিয়ে নেবার হাঙ্গামা আছে আবার। তা ছাড়া অসুস্থ মানুষ, কত রকম কি ঘটে যেতে পারে—এখন আমি কি করি! তোর এ মাতব্বরীতে কী দরকার ছিল ভানু। বললেই হত, অফিস থেকে ফিরে এসে যা করতে হয় আমিই সব করব।

বড়দি-ওঁদের জন্যে মন উতলা হয়েছে, কাশীপুর তক্ষুনি যেতে হবে—কী কাণ্ড করতে লাগলেন, সে যদি দেখতে ছোড়দি! অতিষ্ঠ করে তুললেন। রাগারাগি, ঝগড়া-ঝাঁটি—শেষটা হাউ হাউ করে কান্না। চাকরি-বাকরি নেই বলে অগ্রাহ্য করছি নাকি ওঁকে, হেনস্থা করছি। রিক্সায় গলি পার করে বড়রাস্তায় নিয়ে ট্যাক্সিতে তুলে দিলাম, তবে ঠাণ্ডা। একটা জিনিষ দেখলাম ছোড়দি, খুব জেদ হয়েছে কিনা—জেদের বশে দিব্যি আজ হাত-পা খেলছে। রিক্সা থেকে ট্যাক্সিতে ওঠবার সময় আমায় এমন-কিছু ধরতে হল না, একরকম নিজে নিজেই উঠে পড়লেন।

আর প্রবোধ দিয়ে ভানুমতী বলে, বড়দির বাড়ির গায়েই তো ট্যাক্সি দাঁড়াবে। হাঁক দিলে তাঁরা এসে নামিয়ে নেবেন। সেখানে গিয়ে কোন ঝঞ্ঝাট নেই।

চিন্তিত মুখে পূর্ণিমা বলে, দিদির বাড়িতে দোতলার উপর নিয়ে তোলা। আমরা আলগোছা ধরে তুলি—ওদের তো অভ্যাস নেই, তেমন ওরা কখনো পারবে না। ঝগড়া-ঝাঁটি আর কান্নাকাটির ভয়, তো নিজেই তুই আড়ালে সরে যেতে পারতিস, আমার বাড়ি ফেরা পর্যন্ত দেরি করানো যেত। আমাকেই তবে অগ্রাহ্য করা হল কিনা, বল্ তুই ভানু।

অবস্থা বুঝে ভানুমতীর এখন মনে হচ্ছে, তারণের কথা শুনে তাড়াহুড়ো করা ঠিক হয় নি।

পূর্ণিমা বলে, আমি যাব না। তুই কাশীপুর খবর নিয়ে আয়। ঠিকমতো পেঁাছে গেছেন কিনা, আছেন কেমন। রাগ কমে থাকে তো কবে ফিরবেন, তা-ও জেনে আসবি।

উদ্বেগের ছায়া পূর্ণিমার চোখে-মুখে। উপায় থাকলে নিজেই সে চলে যেত। কিন্তু তাকে দেখে তারণ ক্ষেপে উঠবেন, ওখানেও অকথা-কুকথা শুরু করবেন। মা-ও ফোড়ন কাটবেন বাবার সঙ্গে। রঞ্জু ফ্যালফ্যাল করে তাকাবে পূর্ণিমার বিষণ্ন মুখ দেখে। অণিমা মুখ টিপে হেসে অকৃত্রিম আনন্দ উপভোগ করবে। সে বড় অসহ্য অবস্থা।

ভানুমতী যাক চলে : খুব তাড়াতাড়ি ফিরবি কিন্তু। আমি এই বসে রইলাম—তুই ফিরে এলে তারপর অন্য কাজকর্ম।

কাছে-পিঠে নয়—সেই কাশীপুর অবধি যাওয়া ও ফিরে আসা—বেশ খানিকটা রাত্রি হয়ে গেল। ভানুমতী এসে দেখে সেই এক জায়গায় পূর্ণিমা ঠায় বসে রয়েছে—মুখে যা বলেছিল অক্ষরে অক্ষরে একেবারে তাই।

আসবেন না কর্তামশায়। এ-বাড়িতে কোনদিন আর আসবেন না। কাশী চলে যাবেন বড়দির ওখান থেকেই। গিন্নিমা-ও যাচেছন। বাবা বিশ্বনাথ পায়ে টেনেছেন ও'দের।

ঘোড়ার ডিম! টানছেন পূর্ণ-জেঠা আর তাঁর দাবা। আর কাশীধামের খাঁটি মালাই। আর মিঠেকুমড়োর সাইজের বেগুন। টানাটানি অনেক দিন ধরে চলছে, এবারে এই মওকা পেয়ে গেলেন।

তিক্তকণ্ঠে পূর্ণিমা আবার বলে, যার যেখানে খুশি চলে যান। আমার তো ভালো রে! দায়-দায়িত্ব নেই—পুরোপুরি স্বাধীন। খাসা থাকা যাবে। দুটো ঠাঁই করে নে ভানু—ক্ষিধে পেয়ে গেছে, খেতে বসা যাক আরাম করে।

অতএব দেখা গেল, মুখে ঠায় বসে থাকার কথা বললেও, কাজে সেটা করে নি। তাহলে তো মাথা খারাপ হয়েছে বলতাম। রান্নাবান্না ইতিমধ্যে পরিপাটি রূপে সমাধা করে পূর্ণিমা আবার সেই জায়গা নিয়ে একাকী বসে ছিল।

কাশীপুরে অণিমার ঘরে সকলে তাপসের অপেক্ষায় আছে। বাচ্চা চাকর আছে একটা, তার হাতে অণিমা চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছে :

বাবা রাগ করে চলে এসেছেন—পূর্ণিমার কাছে আর ইহজীবনে যাবেন না, কাশীবাস করবেন। আমার এখানেও হুলস্থূল—নিচের তিন গুণ্ডা সকালবেলা সাঙ্গোপাঙ্গ জুটিয়ে লাঠি নিয়ে পড়েছিল। দরজা বন্ধ তো কপাটের উপর দমাদম লাঠি মারতে লাগল। মা আর রঞ্জু কান্নাকাটি জুড়ে দিল, আমি দিশে করতে পারি নে। অপরাধ রাত্তিরবেলা ছাদের এক চাংড়া চুনবালি খসে পড়েছিল নাকি। পুরোনো জরা-জীর্ণ বাড়ি—সেটা কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু ওরা বলে, আমাদেরই কারসাজি—দোতলার মেজেয় নাচানাচি করে কাণ্ডটা ঘটিয়েছি। সবাই ঘুমুচ্ছিলাম—এর মধ্যে আচমকা কে উঠে পড়ে নৃত্যলীলা জুড়ে দিল, আমরা তো কিছুই জানি নে। নিত্যিদিন এই চলেছে, থাকা অসম্ভব হয়ে উঠছে দিনকে-দিন। চলে এসো তুমি, ভেবেচিন্তে ব্যবস্থা একটা করতেই হবে—

রোজগারে নেমেছে তাপস, সঙ্গে সঙ্গেই মস্তিষ্কের কুলুপ খুলে গিয়ে বিস্তর জ্ঞান-বুদ্ধির হদিস মিলেছে। যুক্তিপরামর্শের জন্য ইদানীং হামেশাই তার ডাক পড়ে।

লিখেছে : সম্ভব হলে আজই এসো। এই অবস্থার মধ্যে আবার বাবা এসে পড়লেন। ছেলেমানুষের বাড়া—পুনির নাম কানে শুনতে প্যারেন না। সম্ভব হলে আজকের মধ্যেই টিকিট কেটে কাশীর ট্রেনে উঠে বসতেন। তাঁকে ঠেকাতে জীবন বেরিয়ে যাচ্ছে আমার।

সন্ধ্যার পরেই তাপস এসে পড়ল স্বাতীকে নিয়ে। বাড়ির সবাই উপস্থিত শুধু এক পূর্ণিমা ছাড়া। ভাড়াটে ঠাণ্ডা করবার দাওয়াই মোটামুটি ব্যবস্থা করে এসেছে, নির্ঘাৎ কাজ দেবে। কিন্তু সে প্রসঙ্গ ওষ্ঠাগ্রে আনতে দেন না তারণ—ঘরে এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই একশ'খানা করে নিজের কথা—

পুনির টাকা গোরস্ত বলে এসেছি, তার ভাত গলা দিয়ে আর নামবে না। কাশীবাস

করব—'অর্থ্যক্যে বারাণসী' শাস্ত্রের বিধানে। পূর্ণ-দা রয়েছেন—চিঠির পর চিঠি দিচ্ছেন, একা-একা তাঁরও মন টেঁকে না। তোদের কাছে প্রত্যাশী নই—মাস মাস পেন্সনের টাকা যাবে, তাতে যদি অকুলান পড়ে, পূর্ণ-দাই'ই পূরণ করবেন। লিখেছেন তাই আমায়।

তাপস ঘাড় নেড়ে রায় দিল: হবে না—

ক্ষেপে গিয়ে তারণ বলেন, হবে না মানে? শেষ-বয়সে পরকালের চিন্তা করব—খবরদার, বাগড়া দিবি নে। ভেবেছিস কি, শিকলি বেঁধেও ঠেকাতে পারবি নে—জোর করে বেরিয়ে পড়ব।

শিকলি কেন, পা জড়িয়ে পড়ে থাকব। লাথি মেরে সরিয়ে দেবে, তেমন সাধ্য নেই তোমার বাবা। তার চেয়ে যা বলছি ভালোয় ভালোয় শোন—

বাপের পাদস্পর্শ করে মাথায় ঠেকিয়ে হাসিমুখে তাপস বলে, কাশীবাসের যাবতীয় খরচা আমার। তোমার পেন্সনের টাকা জমিয়ে রেখো, ইচ্ছে হয়তো দানসত্র করে দিও। পূর্ণ-জেঠার কোনকিছু তুমি ছুঁতে পারবে না বাবা—

অণিমা জুড়ে দিল: শুধু দাবা-বড়ে ছাড়া।

তারণ প্রসন্ন হয়ে চুরুট ধরালেন। তরঙ্গিণী বলেন, উনি যাবেন আর আমি বুঝি জনম ভোর সংসারের পাঁকে পচে মরব? সে হবে না, পরকাল আমারও আছে, আমি যাব ওঁর সঙ্গে।

তাপস সঙ্গে সঙ্গে সায় দেয়: যাবে। কুসমি-দি'রও নিশ্চয় মন টিঁকছে না। তোমায় পেলে বর্তে যাবে। এক কাজ কোরো মা, দু'জনে তোমরাও দাবাটা শিখে নিও। বাইরে বাবা আর পূর্ণ-জ্যাঠা ভিতরে তুমি আর কুসমি-দি। দিন তরতর করে কেটে যাবে। কাশীতে পরলোকের জন্য তো কিছু করতে হয় না, চোখ বুজলেই শিবলোক। দিন কাটিয়ে সেই অবধি পেঁছানো নিয়ে কথা।

অণিমা বলে, বাবা চললেন মা চললেন—আমি কোন চুলোয় যাই বলো তো। এই এই অবস্থায় এখানে আর থাকা যায় না।

অতিথি এসে গৃহস্থ তাড়ায়, সত্যি সত্যি সেই ব্যাপার। তুলসীদাস যতদিন ছিল, শাসনে ছিল ভাড়াটেরা। ইদানীং বিশ্রী রকম বাড়িয়েছে। তিন হুটকো ছোঁড়া—রোয়াকবাজি আর ব্ল্যাকমার্কেটিং-এ মজবুত—ইয়ারবন্ধু নিয়ে ছলে-ছুতোয় হামলা দিয়ে এসে পড়ে। বাধা বিন্দুমাত্র নেই—বাড়িতে বৃদ্ধা জননী, স্বামীত্যক্তা কমবয়সি মেয়েলোক এবং বাচ্চা ছেলে। বীরত্ব যতক্ষণ এবং যত ইচ্ছা চালানো যায়। উদ্দেশ্য বোধহয় ভাড়া কমানো। অথবা জঘন্যতর কোন মতলবও থাকতে পারে।

ভেবে এসেছে তাপস। বলে, তোমাদের এ জায়গায় থাকা চলবে না দিদি। পছন্দসই ভাড়াটে দেখে উপরতলাটাও ভাড়া দিয়ে যাও। যাও চলে আপাতত, সুবিধা হলে পরে ফিরবে।

লুফে নিয়ে অণিমা বলে, আমিও তাই ভাবছি। একদণ্ড এখানে আর থাকতে চাই নে। ভাড়াটে দেখ তাহলে। এদের মত বদমায়েস ছ্যাঁচড়া নয়, শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মানুষ—

তাপস হেসে বলে, সম্ভ্রান্ত মানুষ একটা দিনও টিকতে পারবে না—'বাপ' 'বাপ' করে পালাবে! ওরা তখন দল বেঁধে উপরতলাও দখল করবে। তাড়ানো মুশকিল হবে তারপরে।

চিন্তিত মুখে অণিমা বলে, তবে?

ভাড়াটে চাই ঘাগি জাঁদাড়—বুনো-ওলের পাল্টাপাল্টি বাঘা-তেঁতুল। উপরে

নিজে খাতে খুঁখুঁমার লেগে যায়। পেয়েছি তেমনি একজনকে—কথাবার্তাও বলে এসেছি। পুলিশের কাজ করতেন, রিটায়ার করেছেন। শ্বশুরমশায়ের পেসেন্ট—চিকিচ্ছে করে প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন, সেই থেকে ও'দের সঙ্গে বড্ড খাতির। কথায় কথায় প্রাণ দিতে চান—আমি বললাম, প্রাণ দিতে হবে না—পারেন তো প্রাণ নিয়ে নেবেন গুণ্ডা-তিনটের।

তরঙ্গিণী বলেন, ভাড়া তো হয়ে গেল—তারপরে? উঠবে কোথায় অনি?

সে কী আর ভেবে আসে নি তাপস! অণিমার দিকে অপাঙ্গে একবার চেয়ে মায়ের কথার জবাব দিল: আমাদের বাড়িটা তো একেবারে ফাঁকা। তোমরাও কাশী চলে যাচ্ছ। দু'বোনে বেশ একসঙ্গে থাকতে পারবে। ছোড়দি বাঁচবে রঞ্জুকে সর্বক্ষণ কাছে পেয়ে।

কথা পড়তে দেয় না অণিমা, ফোঁস করে উঠল: রক্ষে করো। সে হল শিক্ষিতা রোজগেরে বোন—মুখ্যুসুখ্যু তুচ্ছমানুষ আমি, কপালের ফেরে তারই কাছে গিয়ে হাত পাততে হয়। ভিক্ষের মতো টাকা ছুঁড়ে দেয়, ক্যাট-ক্যাট কথাও শোনায় সেইসঙ্গে। তবু এদ্দিন নিজের জায়গা ছিল, দুড়দাড় করে পালিয়ে আসতাম—সব কথা কানে শুনতে হত না। মুঠোর মধ্যে পেলে পুনি তো দাঁতে ফেলে চিবোবে।

তাপস চিন্তিত হল। বলে, আমি তো এইরকম ভেবে এসেছি। একসঙ্গে থাকবে তোমরা। তুমি সব গড়বড় করে দিচ্ছ দিদি, কী তোমার করেছে ছোড়দি জানি নে—

অণিমা বলে: আমার কথা থাক। নিজেকে নিয়েই কী কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে সে! স্বাধীন জেনানা—কত তার বন্ধুবান্ধব! দিনমানে তো বাইরে বাইরে—রাত্রেও বন্ধুরা এখন ঘর অবধি হানা দিতে লেগেছে। যার জন্যে বাবা পর্যন্ত টিকতে পারলেন না। এই পোড়া-কপালে আমার সমস্ত গিয়ে ইজ্জতটুকু তবু আছে। পুনির সঙ্গে থেকে আমারও মুখ পুড়বে—সে-জিনিষ আমি হতে দেবো না।

বলতে বলতে গর্জন করে উঠল: ছেলে নিয়ে ফুটপাতে পড়ে থাকব, শিয়ালদা স্টেশনে বিছানা পেতে নেবো—পুনির সঙ্গে কিছুতে নয়।

স্বাতী সমাধান বাতলে দেয়। তাপসকে বলে, বড়দি আমাদের সঙ্গে থাকবেন—নিউ আলিপুরে। তুমি তো বাইরে বাইরে রোগে তাড়িয়ে বেড়াবে। একা একা থাকতে ঘরের মধ্যে হাঁপিয়ে উঠব আমি।

তাপস বলে, যে-যার পথ দেখে নিচ্ছি—ছোড়দি তবে একলা পড়ে থাকবে?

অণিমা টিপ্পনী কাটে: একলা সে এখনো থাকে না, ভবিষ্যতেও থাকবে না। কথা আমার মিলিয়ে নিও।

স্বাতীর ইদানীং গলায় গলায় ভাব অণিমার সঙ্গে। অণিমার প্রতিটি কথায় সে সায় দেয়। মুখ টিপে হেসে সে বলে, কাল সিনেমায় দেখলাম, সেখানেও ছোড়দি একলা যান নি।

তারণের কোটরগত চোখদুটো দিয়ে যেন অগ্নিস্ফুরণ হয়। বললেন, পুনি কাল ছবি দেখতে গিয়েছিলে? ডাহা মিথ্যে আমায় বলে গেল—নাকি কোন সাহেব এসেছে বিলেত থেকে ফ্যাক্টরি দেখতে, ফিরতে রাত হবে। এতবড় ঘরের মেয়ে হয়ে কোথায় নেমেছে বোঝ এইবার। কম দুঃখে আমি সরে আসি নি।

তরঙ্গিণী বললেন, তোমার জন্যেই তো! বিয়েথাওয়া না দিয়ে মেয়ের রোজগার খেতে গেলে।

অণিমা করকর করে ওঠে: রোজগেরে মেয়ে ঢের আছে মা, কিন্তু পুনির মতন

কেউ নয়। কত কাণ্ড করল! বাবার কাছে ধাপ্পা দিয়ে কাল রাত্রে এই আরব্য উপন্যাস করে বেড়িয়েছে। অফিসের জনিব অবধি হাত বাড়িয়েছিল—ভাইয়ে ভাইয়ে কুরুক্ষেত্তোর, কোম্পানির গণেশ-উল্টানোর গতিক, কায়দা করে অফিস থেকে সরিয়ে দিয়ে শেষটা ভারা 'বাপ' 'বাপ' বলে বাঁচে। কেন মা, তুমিই তো গোড়ার আমলে ধরে ফেলেছিলে—যখন কোচিং ইস্কুলে পড়াত, টাইপরাইটিং শিখবার নাম করে বেরুত। কাশীপুরে থেকে গিয়ে তোমার হয়ে শাসানি দিয়ে আসতাম। সেইসব থেকেই তো আমার উপর আক্রোশ পুনির।

ঠিক কথাই বটে। তরঙ্গিণীর বলবার মুখ নেই, চুপ হয়ে যান।

তাপস বলে, আসল দোষটা কোথায় আমি জানি। ছোড়দির কিছু নয়, দোষ তালুকদারি রক্তের।

একটুখানি থেমে আবার বলে, বড্ড পাজি রক্ত—রক্তের বিষ কিছুতে যেতে চায় না। তালুকমুলুক চলে গিয়ে বাবা অফিসের কেরানি হলেন, রক্ত ঠাণ্ডা ছিল তখন। চাকরি গিয়ে বাবা বাড়িতে গদিয়ান হয়ে বসেছেন, স্বাধীন বৃত্তি নিয়ে আমিও দু-পয়সার মুখ দেখতে পাচ্ছি—পুরানো রক্ত চনমন করে মাথায় চড়েছে, মাথায় মাথা ঠেকিয়ে ছোড়দির দেবী-পদ খারিজ করে তাকে নরকে চালান করতে বসেছি।

হেনকালে ভানুমতী এসে ঘরে ঢুকল। মেয়েটা কতক্ষণ এসেছে, কোথায় ঘুরঘুর করছিল, কদ্দুর কি শুনতে পেয়েছে, জানা নেই। তারণ খিঁচিয়ে উঠলেন: খোড়া কেটে আগায় জল—বেইজ্জতি করে আবার খবর নিতে পাঠানো হয়েছে! বলবি যে, বেঁচে নেই আমি। পথে পড়ে মরি নি—তার আগে বাড়ি থেকেই মরে এসেছি।

॥ তেত্রিশ ॥

পাশপাশি খেতে বসেছে পূর্ণিমা আর ভানুমতী। ভানু বর্ণনা দিচ্ছে: একটুখানি জায়গার মধ্যে বাড়ির সকলে গোল হয়ে বসেছে। মায় রঞ্জু—সকলের মধ্যে সে-ও কেমন চুপচাপ গম্ভীর হয়ে ছিল।

পূর্ণিমা বলে, হাইকোর্টের নিয়মই তাই। খুব শক্ত কেস উঠলে ধুরন্ধর জজেরা মাথায় মাথা ঠেকিয়ে একত্র বসে। ফুলবেঞ্চের বিচার এর নাম।

বাড়ির সবাই ছিল, তুমি কেবল বাদ।

আমি যে আসামি। হাইকোর্টের নিয়ম নয়, ওঁদের নিজস্ব নিয়ম। আসামির আড়ালে বিচার। আসামি উপস্থিত থাকলে চোখা চোখা অপরাধগুলো বেপরোয়া বলে যেতে চক্ষুলজ্জা লাগত।

ভানু বলে, কাল তুমি ছবি দেখতে গিয়েছিলে ছোড়দি?

কে দেখতে পেলো আমায়? আমার ভাই-ভাজ কক্ষনো নয়। শাশুড়ির এখন-তখন অবস্থা—ফোনের মুখে শুনি অসুখের কথা, ভাইও এসে এসে অসুখের লক্ষণ শুনিয়ে যায়। অমন সাংঘাতিক রোগী ফেলে ওরা কখনো সিনেমায় যাবে না। সাক্ষি কে দিল তা হলে?

বাইরে দাঁড়িয়ে অল্পস্বল্প যা কানে পড়েছিল, সে রিপোর্ট ভানুমতী রাত্রিবেলা সেরে রেখেছে। পরের দিন তাপস এসে সবিস্তারে সব কথা শোনাল।

এই তো অবস্থা ছোড়দি। এবাড়ি একা একা পড়ে থাকা তো সম্ভব নয়, কিন্তু

আলিপুরের ফ্ল্যাটে তুইও চলে আয় তবে।

কাষ্ঠহাসি হেসে পূর্ণিমা বলে, বলেছিস ভালো। বাজারে ঝি-চাকর বড় অমিল। তা কুটনো কাটা বাটনা বাটা রান্না সবই পারি আমি। আগে ঢের ঢের করেছি, এখনো করে থাকি।

তাপস আহত কণ্ঠে বলে, এতবড় কথাটা বললি তুই ছোড়দি কি কি করতে পারিস তুই, আর কি করেছিস—আমায় তা বর্ণনা দিয়ে বোঝাতে হবে না। সবাই সব ভুলতে পারে, আমি পারি নে। আমার নতুন বাসায় বাটনা-বাটা কুটনো-কোটার জন্য ডাকছি, এমন কথা মুখে আনলি কেমন করে তুই?

পূর্ণিমা বলে, সংসারে দেবী হয়ে ছিলাম, এখন বাতিল। শালগ্রাম-শিলা বেদি থেকে যদি ছুঁড়ে ফেলে দেয়, নোড়া হয়ে লংকা-মরিচ বাটা ছাড়া অন্য কোন্ কাজে থাকে তখন?

আজে-বাজে বলে মন খিঁচড়ে দিবি নে বলছি। যে যাই বলুক, আমার কাছে চিরকাল ধরে দেবী তুই।

পূর্ণিমা চকিতে ভাইয়ের মুখে তাকাল। সে মুখে বিষাদের ছায়া, চোখ দুটো ছলছলিয়ে উঠেছে। তার সেই একফোঁটা ভাই তাপসই বটে! বলে, বাসায় নিয়ে তুলবি —কিন্তু একলা তোর বাসা নয়, স্বাতীরও বাসা সেটা। আমি তাকে একবিন্দু দোষ দিচ্ছি নে। বড়লোকের মেয়ে ভালবেসে আমাদের মতন ঘরে এসে পড়েছে। তুই আজ ডাক্তার, পশার বেশ জমে আসছে—কিন্তু কেমন করে ডাক্তার হলি সে খবর ছেলেমানুষ কি জন্য খুঁজতে যাবে? যে ক'টা দিন এ বাড়ি ছিল, আমার শাসনের মূর্তিটাই দেখে গেছে শুধু। দেবী যদি হই, নিরেট পাথরে-গড়া দেবী—সবাই ভয় করে, ভালবাসে না।

ঘাড় নেড়ে জোর দিয়ে পূর্ণিমা বলে, আমি যাব না। আশাসুখে স্বাতী আর তুই প্রথম বাসা করছিস, সে আশায় বাদ সাধব না আমি গিয়ে পড়ে। যাওয়ার কথা কখনো আর তুলবি নে, মিনতি করে বলছি ভাই।

তাপস একটুখানি গুম হয়ে রইল। বলে, কী মতলব তোর ছোড়দি? এইখানে একা একা থাকবি?

সে আর কেমন করে হবে! ভেবেছিলাম তাই বটে—পেঁছে গেছি একলা-থাকার বয়সে। কিন্তু বাবার গালিতে জ্ঞানবুদ্ধি ঘটে এলো—

হতাশ কণ্ঠে পূর্ণিমা বলে যাচ্ছে, বুঝলাম এখনো চলাচল শোওয়া-বসা হিসেব করে করতে হবে। যদ্দিন না দাঁত পড়ছে, দেহ ধনুক হয়ে যাচ্ছে। আরও তাহলে চারটে পাঁচটা বছর—

এমন ভোলাতে পারে ছোড়দিটা! গুরুতর আলোচনার মধ্যেও কেমন করে বলছে দেখ। ভঙ্গি দেখে তাপস হেসে পড়ে: ইঃ, ভারি তো তিন বছরের বড় ছোড়দি তুই। চুল পাকবে দাঁত পড়বে আদ্যিকালের বুড়ি হবেন—আস্বা দেখে হেসে বাঁচি নে। পঁচিশ-ত্রিশটা বছর চুপচাপ থাক্ গিয়ে এখন—ক'টা চুল পাকে, তারপরে আয়না ধরে গুণে দেখিস।

বলিস কি রে?

চোখ বড় বড় করে পূর্ণিমা—ভারি যেন শংকা লেগেছে, এমনিতরো ভাব। বলে, ভাবিয়ে তুললি যে ভাই। কাল রাত্রে ভানুমতী ছিল, আজকেও থাকবে বলেছে। জোরজবরদস্তি করে আরও কয়েকটা রাত্রি না হয় রাখা গেল। কিন্তু বরাবর তো রাখা

যাবে না। এই সেদিন বিয়ে হয়েছে—বর ছেড়ে দেবে কেন নিত্যি নিত্যি? আর তুই যেকথা বলছিস—সে তো দিনের হিসাবে মাসের হিসাবে কুলোবে না, বছরের হিসাব। এক-আধ বছরও নয়—বলছিস পঁচিশটা বছর কমপক্ষে। থাকবার লোকের একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত করতে হয় তবে তো। কী করা যায়, কী করা যায়!

ভ্রূ কুঞ্চিত করে পূর্ণিমা ভাবে, হাসে তাপস মিটিমিটি।

ভেবে শেষটা পূর্ণিমা সমাধান বের করে ফেলল: তোরা কেউ যখন থাকছিস নে, নিচের তলাটা ভাড়া দিয়ে দিই। উপরের ঘরে একলা আমার দিব্যি কুলিয়ে যাবে। ভাড়ার টাকাও কিছু আসবে, বাড়ির পুরো ভাড়া আমায় টানতে হবে না।

কিন্তু তাপসের মনস্তুষ্টি নেই, বারম্বার ফ্যাকড়া বের করছে: ভাড়াটে আজ আছে, কাল নেই। এক ভাড়াটে চলে গেলে আমার তো সেই অকূল-পাথার। তার চেয়ে এমন যদি পাওয়া যায়, কোনদিন যে নড়বে না—

পূর্ণিমা নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলে, কোন ভাড়াটেই আজকাল নড়ে না। ঘর পাবে কোথায় যে নড়বে?

তাপস বলে, আরও এক বাধা আছে ছোড়দি। দুরন্ত বাধা। নতুন আইনে আছে, ভাড়াটে হয়ে নতুন ভাড়াটে নিতে পারবে না। বাড়িওয়ালা নোটিশ দিয়ে উচ্ছেদ করে তোকেই তখন পথে তুলে দেবে।

টের পেলে তবে তো! খুব জানাশোনা বিশ্বাসী লোককে ভাড়া দেবো—মরে গেলেও সে ফাঁস করবে না। ভাড়া নেবো, রশিদ-টশিদ দেবো না কিছু।

আছে এমন জানাশোনা বিশ্বাসী মানুষ?

সগর্বে পূর্ণিমা বলে, আছে বই কি!

এবারে তাপস এক-গাল হেসে বলে, ছোড়দি, এতসব কজাতি কৌশল তোর মাথায় আসে, কিন্তু সবচেয়ে সোজা যে উপায়—একজনকে জীবনের দোসর পাকাপাকি বানিয়ে নিলেই তো হয়। চিরজীবন যার সঙ্গে নিশ্চিন্তে কাটিয়ে যাবি। ভানুমতী যে টানে তোর কাছে থাকতে চায় না, সে মানুষও তেমনি তোকে ছেড়ে থাকবে না।

তাই তো রে, ঠিক বলেছিস তাপস। এ জিনিষ হতে পারে বটে!

খুশিতে উচ্ছল হয়ে তাপস বলে, রাজি তা হলে ছোড়দি?

হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। ঘটকের ঠিকানাটা বাবার কাছ থেকে এক্ষুনি নিয়ে রাখ্—ওরা কাশী চলে যাওয়ার আগে। সেই যে ঘটক—দিদিকে যিনি সৎপাত্রে গেঁথে দিয়েছিলেন। পকেটে তাঁর সব সময় ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার গেজেটেড-অফিসার ডজন ডজন মজুত থাকে, দরে পটে গেলে বাঁ-হাতের দু-আঙুলে একটা তুলে এনে টুক করে সামনে ধরে দেন।

সত্যি কিংবা ঠাট্টাতামাসা—ধরতে না পেরে তাপস সোজা কথায় পুনরপি জিজ্ঞাসা করে, সত্যি তোর বিয়ের মত হয়েছে?

হাসিমুখ ছিল পূর্ণিমার—পলকে কঠিন, গম্ভীর। হাসির লেশমাত্র আর মুখে নেই। বলে, এ আমায় যে নতুন দায়ে ফেলছিস তাপস। মত আমার কবে ছিল না শুনি? কর্তব্য একের পর এক ঘাড়ে চেপে পড়ল। ঘাড়ে আপনাআপনি পড়ে নি, গুরুজনেরা সমত্নে এনে চাপিয়েছেন: পুনি আদর্শ মেয়ে, পুনি দেবী, পুনি দশভুজা জগজ্জননী। ঘাড় ভেঙে জগজ্জননী কবন্ধ হয়ে পড়লেও কোন্ লজ্জায় তখন আর 'না' বলবেন! সকলের উপর সব কর্তব্য চুকেবুকে গেছে—নিজের উপরে কোনো কর্তব্য আছে কিনা বেকার অবস্থায় পড়ে এতদিনে সেই খোঁজটা করছি।

বলেই চট করে কথা ঘুরিয়ে নেয়: বাবার প্রভিডেন্ড-ফান্ডের কিছু টাকা এখনো

ব্যাঙ্কে আছে, কাশীবাসে সে টাকা নিয়ে যাচ্ছেন নাকি ?

সেব-খরচের সম্বল ফেলে যাবেন কেন ? খরচা আমি মাসে মাসে পাঠাব—কিন্তু হিসাবের বাইরেও আলটপকা কত রোগপীড়ে বিপদআপদ ঘটতে পারে ঐ টাকায় দরকার মতো বিপদ কাটাবেন, পরে আমি পূরণ করে দেবো।

পুনশ্চ ভিন্ন এক কথা : কাশীতে মা গয়নাগাঁটিগুলোও নিয়ে যাচ্ছেন ?

কোন্ গয়না ?

বুঝে উঠতে পারে না তাপস।

পূর্ণিমা বলে, বিয়ের সময় আমি পরব, মা সেইজন্য গয়না গড়াতেন। তোর ভর্তির সময় নেকলেসটা কেড়েকুড়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু মাসে মাসে টাকা জমিয়ে এক একখানা করে বরাবরই তো গয়না গড়ানোর কথা।

সে বোধহয় হয়ে ওঠে নি। বড়লোকের শখের গয়না নয়, গেরস্তঘরে দশ রকম খরচা থেকে কাটকুট করে টাকা বাঁচানো। তুই নারাজ বলে ওদিকেও তাই চাড় হয় নি।

পূর্ণিমা খিলখিল করে হেসে ওঠে : মা আমার জন্যে গয়না গড়িয়ে রাখবেন, বাবা প্রভিডেন্ড-ফান্ডের টাকায় বিয়ের যৌতুক যোগাবেন—জানি রে ভাই, সেসব থেকে অনেককাল কেটে গেছে। কিছুই নেই, তবে আর ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হবে কিসে ? ঘটক-মশায়কে তবে বলিস, সাদামাটা বর একটা—দুটো হাত দুটো পা দুটো চোখ দুটো কান ঠিক ঠিক আছে, এইগুলো পরখ করে নিলেই হবে।

॥ চৌত্রিশ ॥

দরোয়ান একটা কার্ড এনে শিশিরের টেবিলে দিল। বলে, গাড়ি থেকে নেমে গেটের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। আসতে পারেন কিনা, জিজ্ঞাসা করলেন।

নাম পড়ে দেখে : ডক্টর তাপস সরকার এম-বি, বি-এস। বলে, ভুল করছ—আমার কাছে নয়। রোগপীড়ে নেই, ডাক্তার কোন্ কাজে আসবে ! চিনিও না এ ডাক্তারকে।

দরোয়ান বলে, শিশিরকুমার ধর—পুরো নামই তো বলে দিলেন। এ আপিসে শিশিরবাবু আর কে আছে বলুন।

শিশির অবাক হল : উনি এর মধ্যে কোথায় আসবেন ? আমিই তবে যাচ্ছি।

ঝকঝকে মোটরের পাশে তাপস। ডাক্তার অপূর্ব রায়ের গাড়ি—যদ্দিন না নিজের হচ্ছে, তাপস এই গাড়ি নিয়ে কলে বেরোয়। কাজকর্ম এমনিভাবে চলতে থাকলে সেকেন্ডহ্যান্ড একটা নিজস্ব গাড়ি কিনতে বেশি দেরি হবে না।

তাপস বলে, নমস্কার ! পাঁচ-সাত মিনিটের বেশি নেবো না। এখন যদি অসুবিধা হয়, অন্য সময়ও আসতে পারি।

শিশির তটস্থ হয়ে বলে, সে কী কথা ! অসুবিধা কেন হবে ?

নিরিবিলি একটা জায়গায় বসতে হবে। আপত্তি না থাকলে গাড়ির ভিতরেই বসা চলে।

শিশির বলে, বেশ তো, বেশ তো !

দু'জনে গাড়ির ভিতরে গেল। সামনের সিটের ড্রাইভারকে তাপস বলে, তুমি বাইরে গিয়ে দাঁড়াও একটুখানি।

কী না জানি ব্যাপার ! এমন গুপ্তকথা, ড্রাইভার অবধি সরিয়ে দিচ্ছে। অথচ

ডাক্তারটিকে চেনেই না শিশির—কোন জন্মে দেখে নি। কৌতূহল গলায় পর্যন্ত উঠেছে, গলগল করে আওয়াজ দিয়ে ফেটে না বেরোয়।

আয়োজন পরিপূর্ণ করে নিয়ে তাপস বলল, এই অফিসের পূর্ণিমা সরকার আমার বোন।

পূর্ণিমার ভাই আছে, ভাই-ভাজ সেদিন সিনেমায় গিয়েছিল—আবছা মতন একটু দেখেও ছিল শিশির। কিন্তু ঝকঝকে গাড়িতে স্মার্ট পোশাকে উজ্জ্বল-মূর্তি এই ছোকরা ডাক্তারের বোন হার্মান কোম্পানিতে কেরানিগিরি করে এবং থাকে গলির ভিতর অতি-পুরানো লঝঝড় একটা বাড়িতে—বিশ্বাস হওয়া কিছু কঠিন বটে। প্রশ্ন করে, কেমন বোন আপনার?

সহোদরা। দুই বোন আর এক ভাই আমরা।

শিশির বলে, বৃষ্টিবাদলার মধ্যে রাত্রিবেলা সেদিন আপনাদের বাড়ি থেকে এসেছি। বাবা আর পূর্ণিমা দেবী সেখানে থাকেন। আপনার আলাদা বাসা বুঝি?

তাপস বলে, ঠিক তেমনটা না হলেও প্রাকটিশের খাতিরে ভিন্ন পাড়ায় না থেকে তো উপায় নেই। দেখুন, খুলেই বলছি, কিছু মনে করবেন না। ঐ যে গেলেন আপনি—তাই নিয়ে বিষম কাণ্ড। গোঁড়া প্রাচীন পরিবার আমরা। পর্দা-ঢাকা রিক্সা থেকে দু'জনে নেমে পড়লেন—সেই আরো কাল হয়েছে। বাবা দারুণ চটেছেন।

শিশির বলে, সেটা তখনই আমি ঠাহর পেয়েছিলাম। প্রণাম করতে গেলাম, ঝটকা মেরে পা সরিয়ে ঘর থেকেই বেরিয়ে গেলেন।

ঘর থেকে বেরিয়ে শেষ হল না—একেবারে কলকাতা থেকেই বেরুচ্ছেন। ছোড়দির কাছে থাকবেন না, মুখ দেখবেন না আর ছোড়দির। কাশীবাস করবেন।

দুঃখে বেদনায় শিশিরের মুখ কালীবর্ণ হল। বলে, দোষ কিন্তু আমার একেবারেই নয়। আমি যেতে চাই নি আপনাদের বাড়ি। বেলগাছিয়ায় থাকি, সেখানে যাওয়ার উপায় ছিল না, তা এসপ্লানেডের গুমটিতে থাকব আমি বলেছিলাম। ছাড়লেন না কিছুতে। রিক্সার পাশে পাশে হেঁটে যাচ্ছি—হাত ধরে টেনে তুলে নিলেন। দোষ পূর্ণিমা দেবীর।

ছোড়দির দোষ? না, হতে পারে না—

তাপস সজোরে প্রতিবাদ করে উঠল: ছোড়দি দোষ করে না। রিক্সায় জায়গা রয়েছে, জলকাদা ভেঙে আপনি কষ্ট করে যাচ্ছেন—সেইটেই আরও দোষের ব্যাপার হত। ছোড়দি ঠিক কাজ করেছে।

সুর নামিয়ে তারপর তাপস বলে, দোষ বাবার। কিন্তু হলে হবে কি—তাঁর দিকটাও ভেবে দেখুন। বনেদি বংশ আমাদের, গ্রামের অর্ধেকটা জুড়ে সেকেলে অট্টালিকা। মেয়েদের জন্য পাঁচিলে-ঘেরা আলাদা মহল—বাইরে থেকে জেলখানার মতো দেখাত। আত্মীয়জন ছাড়া কোন পুরুষ সে মহলে ঢুকতে পেত না। শৈশবে বাবাও তার কিছু কিছু দেখেছেন। সেই বাড়ির মেয়ে দায়ে পড়ে দশটা-পাঁচটা অফিস করে—চোখ-কান বুঁজে বাবা সয়ে আসছেন। কিন্তু ঐ রাত্রে ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন।

শিশির লজ্জায় মরে গিয়ে বলে, পাড়াগাঁয়ের মানুষ আমারও এমন চলাফেরার অভ্যাস নেই। কিন্তু পূর্ণিমা দেবী একটা-কিছু নিয়ে জেদ করলে বাধা দেওয়া ক্ষমতায় কুলোয় না। বিশ্বাস করুন, রিক্সার মধ্যে দেহ গুটিয়ে বোধহয় আধখানা করে ফেলেছিলাম। গা বাঁচিয়ে কোনরকমে পাশে বসে এসেছি। সে এক বিষম শাস্তি।

বলার ভঙ্গিতে তাপসের হাসি পেয়ে যায়। হাসি চেপে সে বলে, কিছুমাত্র দরকার

ছিল না শিশিরবাবু। পুরুষের গায়ে গা ঠেকলে ইজ্জত যাবে, মেয়েদের ইজ্জত এত ঠুনকো নয় আজকাল। সে ছিল সেকালে—ইজ্জত মাপার ফিতেটা বিশ্রী রকম লম্বা ছিল। ফিতে একালে আমরা কিন্তু ছাঁটাই করে নিয়েছি—নইলে কাজকর্ম চলা অসম্ভব। কিন্তু মুশকিল হল—বাবা সেকেলে ফিতেয় মাপতে গিয়ে নিজে কষ্ট পান, সংসারে অশান্তি ডেকে নিয়ে আসেন।

শিশির অনুতপ্ত কণ্ঠে বলে, আমি নিমিত্তের ভাগী। আমার দিক দিয়ে যদি কিছু করণীয় থাকে—

আছে, নিশ্চয়ই আছে—

লুফে নিয়ে তাপস বলে, আছে বলেই তো আপনার কাছে এসেছি। কিন্তু তার আগে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করি। কে কে আছেন আপনার, বলুন।

শিশির বলে—ঠিক যে কথাগুলো একদিন পূর্ণিমাকে সে বলেছিল: কেউ নেই, একা আমি। মা ছিলেন, তিনি চলে গেছেন। গড়িয়ার কাছে এক কলোনি গড়ে মামা চিঠি দিয়েছিলেন—দেশভুঁই ছেড়ে সেখানে এসে দেখি, মালিক পক্ষ কলোনি পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। মামা-মামী নিরুদ্দেশ।

তাপস বলে, পরশু রাত্রে ছোড়দির সঙ্গে আপনাকে সিনেমায় দেখলাম। আমরাও গিয়েছিলাম সেদিন।

কৈফিয়তের ভাবে শিশির তাড়াতাড়ি বলে, ঐ একদিন শুধু। পূর্ণিমা দেবী রেস্তোরাঁয় নিয়ে খুব খাইয়েছিলেন, আমার পক্ষেও একটা-কিছু করা উচিত—সিনেমার টিকিট কেটে আমিই ধরেপেড়ে নিয়ে গেলাম।

ছোড়দি পছন্দ করে আপনাকে। এমন মেলামেশা সে অন্য কারো সঙ্গে করে না।

শিশির বলে, পছন্দ কিনা জানি নে, তবে দয়া করেন। পাড়াগাঁ থেকে নিঃসহায় এসেছি—দয়ার পাত্র আমি। জো পেয়ে সেকশনের বড়বাবু পাঁচটা মানুষের খাটনি আমায় দিয়ে খাটাচ্ছিল—ফাইলের গাদার মধ্যে থেকে উনি আমায় টেনেটুনে উদ্ধার করেন। ওঁরই সাহসে সাহস পেয়ে গেছি—নইলে ফাইলের মধ্যে হয়তো কবর হয়ে যেত আমার।

একটুখানি ভেবে নিয়ে তাপস বলে উঠল, গণ্ডগোলের নিষ্পত্তি হয়ে যায় আপনি যদি এক কাজ করেন।

বলুন, বলুন—

বিয়ের প্রস্তাব করুন আপনি ছোড়দির কাছে।

শিশির অবাক হয়ে বলে, বিয়ে—কার সঙ্গে?

কী আশ্চর্য! অন্যের জন্য আপনাকে ওকালতি করতে বলব কেন?

শিশির সঙ্গে সঙ্গে কেটে দেয়: মাপ করবেন, আমি পারব না।

তাপস বলে, কিসে অযোগ্য আমার ছোড়দি?

উনি অযোগ্য, তাই কি বললাম এতক্ষণ ধরে? ঠিক উল্টো। সে যাই হোক, আমি পারব না।

বিরক্ত হয়ে তাপস বলে, কি করণীয় আছে জিজ্ঞাসা করলেন কেন তবে? সেই জন্যেই তো বলতে গেলাম।

শিশির বলে, সাধ্যের মধ্যে থাকা তো চাই! যদি এখন বলেন, চিড়িয়াখানায় গিয়ে বাঘের মুখে হাত ঢুকিয়ে দাও—

ছোড়দি আর বাঘ বুঝি এক জিনিস হল?

শিশির বলে, বাপের চেয়ে বেশি ভরাই ও'কে। উনি না হলে সেদিন ঐ অবস্থায় মন্দ্যে কেউ আমায় রিক্সায় তুলতে পারত না। তারই জন্যে মত বিভ্রাট।

সমস্ত ঠিক হয়ে যাবে, ছোড়দি যদি রাজি হয়ে যায়। ভাবী স্বামীর সঙ্গে মেলামেশা করলে সেটা তেমন দোষের হয় না। বাবার কাশীবাস একেবারে বাতিল না হলেও কন্যা-সম্প্রদান করে মনে শান্তি নিয়ে তিনি যেতে পারবেন।

শিশির তবু দোমনা। বলে, আপনি তবে বলে দেখুন। কথা দিচ্ছি, যে মুহূর্তে বলবেন, হেঁটমুণ্ডে বরাসনে গিয়ে বসে পড়ব।

আপনাকে দেখে বাবা আগুন হয়ে বাড়ি ছেড়ে গেছেন। এর উপরে আমি যদি প্রস্তাব করতে যাই, ছোড়দি ভাববে কলঙ্কটা সত্যি বুঝেই সামাল দেওয়ার চেষ্টায় আছি। জানি তো তাকে—বিষম অভিমানী, আরো সে বিগড়ে যাবে। ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখুন শিশিরবাবু, ছোটভাই হয়ে আমার পক্ষে বলা ঠিক হবে কিনা।

শিশির ভাবছে। উৎসাহ দিয়ে তাপস বলে, বলেই দেখুন না। হাঁ কিংবা না—যা-হোক একটা বলবে। খেয়ে ফেলবে না তো!

আচ্ছা, দেখি—

দেখাদেখি নয়, খুব তাড়াতাড়ি। পারেন তো আজই। শ্রাবণের আর পাঁচটা দিন আছে, তারপরে অকাল পড়বে। বাবাও এই মাসের মধ্যে রওনা হয়ে পড়ছেন।

হাত-ঘড়ি দেখল শিশির, দেখে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ে। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে শেষ হবার কথা, সেখানে আধঘণ্টা হতে চলেছে। গাড়ির দরজা খুলে নমস্কার সেরে তাড়াতাড়ি সে নেমে পড়ল।

তাপস পিছন থেকে বলল, কাল সকালে আপনার মেসে গিয়ে শুনব।

সেদিন অফিসের ছুটির মুখে শিশিরের টেবিলে পূর্ণিমা এসে সহজভাবে ডাকল: চলুন—

বাড়িতে ওদের তো তুলকালাম লেগেছে। ভাই এসে একরকম বলে গেল, বোনেরও নিশ্চয় কথা আছে। কি বলবে, কে জানে!

রাস্তায় নেমে পূর্ণিমা শিশিরকে বলে, ঘর-ঘর করছিলেন—দিচ্ছি এইবারে ঘর, জিনিষপত্তোর নিয়ে চলে আসুন।

আকাশ থেকে চাঁদ নামিয়ে এনে যেন হাতে তুলে দিচ্ছে, শিশিরের তেমনি উল্লাস।

পূর্ণিমা বলে, নিচের তলায় কিন্তু—

চার-দেয়াল আর মাথায় এক চিলতে ছাদ আছে তো বটে! তার বেশি কে চায়?

পূর্ণিমা কথা শেষ করে: ঘর মোটমাট দেড়খানা—বারাণ্ডার একদিক ঘিরে আধখানা ঘর হয়েছে।

শুধু ঐ আধখানা ঘর হলেও আমার চলে যাবে। চলুন এক্ষুনি, বায়না দিয়ে আসি। বেহাত হয়ে না যায়।

বেহাত হবে না, বায়নাও লাগবে না। পরশু রাত্রে যেখানে থেকে এরসছিলেন, সেই বাড়ি—

তিক্ত হাসি হাসল পূর্ণিমা। বলে, সবাই ছেড়ে গেছে—একলা প্রাণী আমি সেখানে। একা না বোকা।? আমার নিজের গরজেই আপনাকে ডাকছি।

শিশির সবিস্ময়ে বলে, আর কেউ থাকবেন না?

কাকে আর পাচ্ছি। পেলে আপনাকেই বা বলতে যাব কেন? ছাতের উপর যে-ঘরে এখন থাকি, সেখানেই আমি থাকব। বাইরের ঘরটা নিয়ে আপনি থাকবেন। বাড়ীত

লোকের দরকারই বা কি? তাতে ঝামেলা বাড়ে।

হতভম্ভ হয়ে যায় শিশির। জওয়ানী মেয়ে আহ্বান করছে যুবাপুরুষকে এক বাড়িতে থাকবার জন্য। মেস করে থাকা আর কি—যেমন বেলগাছিয়ায় আছে ওরা সব। তবে এই মেসের মেম্বার সর্বসাকুল্যে দুই—দুয়ের উপরে তিন হলে নাকি ঝামেলা বাড়বে। ঘর পাওয়া শিশিরের জরুরী প্রয়োজন, এক কথায় 'না' বলে কেটে দিতে পারছে না। কিন্তু এই উৎকট অবস্থাটা পূর্ণিমার কিছুতে মাথায় আসে না, এই বা কেমন!

অবশেষে শিশির বলে, এক বাড়িতে শুধুমাত্র দুজনের থাকা—সেটা কি ভাল হবে?

ভ্রূ কুঞ্চিত করে পূর্ণিমা বলে, মন্দটা কিসের?

পুরুষ হয়ে রমণীর কাছে কত আর স্পষ্ট করে বলা যায়! আমতা-আমতা করে শিশির বলে, বিপদ কত রকম ঘটতে পারে—

পারেই তো। তাই বুঝেই তো আপনাকে চাচ্ছি। ধরুন, আমার অসুখ করেছে —আপনি ডাক্তারের কাছে ছুটবেন। আপনার অসুখ করলে আমি ছুটব। কিংবা ধরুন আগুন লেগেছে—একজনে বাড়ি আগলে আছি, অন্যজন বেরিয়েছি ফায়ার-ব্রিগেডে ফোন করতে।

পরিকল্পনা একেবারে নিখুঁত, কোথায় লাগে আমাদের সরকারি পঞ্চবার্ষিকীগুলো!

শিশির কিছু বিরক্ত হয়ে বলে, আমি শুধু বাইরের বিপদের কথাই বলছি নে।

এইবারে বুঝেছি—

শিশিরের দিকে তাকিয়ে পড়ে পূর্ণিমা খিল খিল করে হেসে উঠল: বিপদ আপনিই যদি ঘটিয়ে বসেন—এই তো! যতই ভয় দেখান, ভয় আমি পাব না। বিপদ ঘটানোয় যেটুকু হিম্মৎ লাগে, তা আপনার নেই। তাহলে সেই নির্জন নিশিরাত্রে রিক্সার ভিতরে বিপদ না-ই হোক, বিপদের সিগন্যাল একটু-আধটু পাওয়া যেত নিশ্চয়। হাত-পা ভেঙে কোণ নিয়ে আপনি বসে রইলেন, আমার তো কষ্টই হচ্ছিল আপনার অবস্থা দেখে।

ব্যস্, হয়ে গেল! এ-রমণী পাগল না ক্ষ্যাপা—এতবড় সাংঘাতিক জিনিষটা হাসি-ঠাট্টার ঢঙে উড়িয়ে দিল কেমন। শিশির বলে, বিপদ না-ই ঘটালাম, লোকনিন্দা বলে জিনিষ আছে সেটা তো মানেন।

পূর্ণিমা বলে, আমি গ্রাহ্য করি নে। যেদিন থেকে ঘরবাড়ির বাইরে রুজিরোজগারে বেরুলাম, লোকনিন্দা গায়ের গয়না করে নিয়েছি—গয়না পরে বেড়াতে মজা পাই। নটবরবাবুর চোখের উপর আপনার হাত ধরে ফরফর করে বেরুনো, আপনাকে নিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়া—এ-সমস্ত হল গরব করে সেই গায়ের গয়না দেখানো।

থামল পূর্ণিমা। নিঃশব্দে কিছু পথ গিয়ে আবার বলে, আমার মতন বাইরে বাইরে যারা কাজ করবে, ষোলআনা সাচ্চা তারা—তামা-তুলসী ছুঁয়ে বললেও কেউ বিশ্বাস করবে না। যে বাবা জোগাড়-যন্ত্র করে আমায় বাইরে বের করে দিয়েছিলেন তিনি অবধি না। বিশ্বাস যখন হারিয়েছি, বিচার পাবার প্রত্যাশা নেই, তখন আর কিসের পরোয়া? কেঁউ-কেঁউ করে কেন লোকের পায়ের কাছে কুকুর-কান্না কেঁদে আত্ম-অবমাননা করব?

কথায় কথায় বাস-স্টপে এসে পড়েছে। একটু দূরে একটা গাছের তলে দু'জনে দাঁড়াল। পূর্ণিমা বলে যাচ্ছে, দিনমানে অফিসের ভিতর পুরুষের সঙ্গে বসে কাজ করি, কাজের ফাঁকে গল্পগুজব হাসিমস্করা চালাই, ক্যান্টিনে পাশাপাশি বসে চা খাই—এই অবধি দিব্যি সয়ে গেছে। কিন্তু এই দিনমানের জায়গায় রাত্রিবেলা হলে এই অফিসের জায়গায় ঘরবাড়ি হলে অমনি বুঝি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল! হয় যাদের, মেয়েকে

তারা দেয়ালের ঘেরে বসিয়ে অচ্ছুৎ করে রাখুক। রোজগারের টাকা খাবার লোভে মেয়েকে যেন বাড়ির বাইরে না পাঠায়। কিন্তু আপনার শেষ-কথা এখনো তো শুনতে পেলাম না। ঘর না নেবেন তো বলুন—আমি অন্য দোসর দেখি।

শিশির বলে, আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না?

বলুন—

আমতা-আমতা করছে শিশির, ঘেমে উঠেছে: ধরুন, ধরুন—

হেসে পূর্ণিমা বলে, বলে ফেলুন না! ধরেই নেবো, পড়তে দেবো না।

মুখ লাল করে কোন গতিকে শিশির বলে ফেলল, বিয়ে হয়ে গেলে কেমন হয়?

বিয়ে? সচকিত হয়ে পূর্ণিমা তাকিয়ে পড়ে।

মরিয়া হয়ে শিশির বলে, বাবা মা কাশী চলে যাচ্ছেন—এই বিয়ে হলে তাঁদের আর ক্ষোভের কারণ থাকবে না, সম্প্রদানই করবেন আপনার বাবা। অফিসে নটবরবাবুদেরও মুখ বন্ধ। এক বাড়ি কেন, এক ঘরে দু'জনে থেকেও তখন কথা উঠবে না। বিয়ে হলে সব সমস্যার সমাধান একসঙ্গে।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে পূর্ণিমা বলে, সে তো বটেই। কিন্তু বাবা-মা কাশী চলে যাচ্ছেন এত খবর আপনি কার কাছ থেকে শুনলেন? আমি তো বলি নি।

তাপসের কথা আর চেপে রাখা গেল না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত শুনে পূর্ণিমা বলে, বাইরের ঘটক না ডেকে ঘটকালিতে নিজেই নেমে পড়েছে। তুখোড় ঘটক—কাজে গড়িমসি নেই, এরই মধ্যে এতখানি এগিয়ে ফেলেছে। চতুর বটে—বাবার কাছ থেকেই নাম পেয়েছে ঠিক, খুঁজে খুঁজে এসে পাকড়াও করল।

বলতে বলতে পূর্ণিমার কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল: কাল সকালে মেসে গেলে তাপসকে বলে দেবেন, বাবা মা নির্বিঘ্নে কাশী চলে যান। আমি রাজি নই।

বাস এসে পড়েছে, মানুষজন নামছে। এক পা সেইদিকে গিয়ে পূর্ণিমা মুখ ফিরিয়ে বলল, তাপস চলে গেলে আমার কাছে একবার যাবেন—যে-বাড়িতে আপনি থেকে এসেছিলেন। কাল আমরা অফিসে যাব না—আপনি না, আমিও না। বাড়ি চিনতে পারবেন তো?

খুব, খুব। কী ভাবেন আমায়!

পূর্ণিমা দ্রুত গিয়ে বাসে উঠে পড়ল।

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

বাড়ি কেন চিনবে না শিশির? ঠিক দশটায় গিয়ে হাজির—অন্যদিন যে সময়ে অফিসে হাজিরা দেয়। পূর্ণিমা সাজগোজ করে তৈরি। অপেক্ষা করছিল শিশিরের জন্য। বারাণ্ডায় পা দিতেই বলে, চলুন—

অতএব চলল। মাঝে একবার জিজ্ঞাসা করে, অফিস করবেন না কাল যে বলেছিলেন?

ঘাড় দুলিয়ে পূর্ণিমা বলে, তাই। আপনি করবেন না, আমিও না।

আর কোন কথা থাকতে পারে না। চলেছে নিঃশব্দে। ট্রামে-বাসে বিষম ভিড়। ভাগ্যক্রমে ট্যাক্সি পেয়ে গেল। পাশাপাশি বসেছে।

থাকতে না পেরে শিশির প্রশ্ন করে: চলেছি কোথায়?

ম্যারেজ-রেজিস্ট্রারের অফিসে। বিয়ে হয়ে যাওয়াই উচিত। তাই ঠিক করলাম। কাল যে বললেন, রাজি নন। আপনার ভাই ডাক্তার সরকার এসেছিলেন, তাঁকে তাই বলে দিয়েছি। বাবা-মা কাশী চলে যাচ্ছেন, ডাক্তার সরকার তাঁদের আটকাচ্ছে যাবেন না।

পূর্ণিমা বলে, ঠিকই বলেছেন। বাবা আমায় সম্প্রদান করবেন, তেমন বিয়ের রাজি নই। আমি স্বৈরিণী উচ্ছৃংখল মেয়ে—দোষ ক্ষমা করে মহত্ব দেখানোর সুযোগ ও'দের দেবো না।

নিরীহ কণ্ঠে শিশির বলে, সম্প্রদান কে করবেন তবে?

একফোঁটা শিশুর মতন প্রশ্ন। ওদের পাড়াগাঁয়ে এ জিনিষ চালু নয়, মানি। কিন্তু কলেজে পড়ে এতগুলো পাশ করেছে—পাঠ্যপুস্তকের বাইরে কোন বই-ই পড়ে নি? খবরের কাগজও না?

পূর্ণিমা বলে, আমি পুতুল না গ্রামোফোন না সেলাইয়ের কল যে, একজনে আমাকে দান করে দেবে, অন্যে হাত পেতে নিয়ে নেবে? একটা বয়স হয়তো থাকে, মেয়েরা যখন পুতুলেরই মতো। আমিও ছিলাম—

পুরানো কথা মনে এসে হাসি-হাসি মুখ হয়ে ওঠে। বলে, এইরকম ট্যাক্সি চড়িয়ে বাবা আমায় গড়ের-মাঠে নিয়ে যাচ্ছিলেন পছন্দ করানোর জন্য। সকাল থেকে খেটে-খুটে দেহটাকে নিদারুণ রকম সাজিয়েছি। পছন্দ করতে এলো তিন যুবাপুরুষ—বুক ঢিবঢিব করছে আমার, কালীঘাটে মা-কালীর উদ্দেশে মনে মনে মাথা কুটছি: পছন্দ করিয়ে দাও মা-জননী। পছন্দ করলও তারা—হায় আমার কপাল! পরের দিন জানতে পেলাম কনে-পছন্দ নয়, চাকরির জন্যে পছন্দ। কিন্তু সেদিন যা হতে পারত, আজকে তা আর হয় না, সে দিনকাল অনেক পিছনে ফেলে এসেছি। ভাবুন দিকি, আমি এই আধবুড়ি মানুষটা ঘোমটা-মোড়া পুত্তলিকা হয়ে আপনার সঙ্গে অপরিচয়ের ভান করে পিঁড়ির উপর আড়ষ্ট হয়ে বসে আছি পিতৃদেব কখন আপনার হাতে সম্প্রদান করে দেবেন সেই অপেক্ষায়। ভাবতেই তো হাসি পেয়ে যায়।

পূর্ণিমা সত্যি সত্যি হাসে। হাসি থামিয়ে তারপর বলে, আমাদের বিয়ের সম্প্রদানে কর্তাব্যক্তিদের লাগবে না। আমাকে সম্প্রদান আমি নিজে করব, আপনাকে আপনি করবেন—যদি নিতান্তই সম্প্রদান কথাটা এর মধ্যে নিয়ে আসতে চান।

শিশির বলে, কেউ থাকবে না—শুধু আপনি আর আমি?

থাকবে তিন জন সাক্ষি। আজকে নয়। আজ শুধু নোটিশ দিয়ে আসব। বিয়ে একমাস পরে, তিনটে বন্ধু তার মধ্যে বলে-কয়ে রাখবেন। সাক্ষির ভারটা আপনার উপর।

এমনি বিয়ের কথা শিশির একেবারে শোনে নি তা নয়। পাড়াগাঁয়ে থেকেও কানে গিয়েছে। সেখানে এ জিনিষ চালু নয়, বিয়ে বলেই মানে না কেউ—ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ রং-তামাসা করে। অদৃষ্টবশে তাই আজ নিজের উপর হতে চলল। ট্যাক্সি রাস্তার মোড়ে লাল আলোর নিষেধ এক এক সময় থেকে পড়ছে। দরজা খুলে লাফিয়ে পড়ে সাঁ করে দৌড় দিলে কেমন হয় তখন? হয় নিশ্চয় ভাল—কিন্তু পাশটিতে বসে প্রাণ খুলে নিশ্বাসটি নিতে পারছে না, সে মানুষ দৌড় দিয়ে পালাবে! সুন্দরবনের ময়াল সাপ, শোনা যায়, দৃষ্টি দিয়ে টানে—জঙ্গলের জীব সম্মোহিত হয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে কবলের মধ্যে পড়ে, সাপ লেজের পাকে জড়িয়ে ফেলে ধীরে-সুস্থে গ্রাস করে তারপর। শিশিরের অবিকল সেই অবস্থা।

প্রশ্ন করে, বিয়ে হতে যাচ্ছে—কোন্ জাত আমি, কি বৃত্তান্ত, সে খবর একটিও নিলেন না।

পূর্ণিমা হেসে বলে, নেয় নি বুঝি তাপস ? কী রকম আনাড়ি ঘটক, বুঝে দেখুন। যা করছে—ওই ডাক্তারিই করুক গে তবে, ঘটকালি করা তার কর্ম নয়। আবার দেখা হলে তাপসকে বলে দেবেন। আমিও বলব।

আগের কথাটা শিশির ফলাও করে যাচ্ছে : ধর উপাধি কত জাতের হয়। সুবর্ণ-বণিকের হয়, কায়েতের হয়, মাহিষ্যের হয়। শুধু 'ধর' শুনে জাত বোঝা যায় না।

তাই বুঝি ! তবে রেজেস্ট্রি-বিয়ের মজা হল, মন্ত্র পড়তে হয় না—কুলশীল গাঁইগোত্র কোন কিছুই দরকারে আসে না। তবু জেনে রাখা উচিত বই কি। বলুন না, আপনার কোন্ জাত। এখন না হলেও তাড়া কিছু নেই, সঠিক মনে না থাকলে ভেবে-চিন্তে পরে এক সময় বলবেন।

শিশির বেজার মুখে বলে, জাত-গোত্র কুলশীল না হয় বাতিল, কিন্তু অবস্থা কার কেমন, সে খোঁজটুকুই বা নেওয়া হল কই ? বিয়ে অন্তে নিত্যি দু'বেলা ভাত-ডাল-তরকারি লাগবে—বাতাস খেয়ে থাকা যাবে না।

পূর্ণিমা বলে, সে আর কতটুকু ব্যাপার ! আপনি চাকরি করেন—আপনার মাইনে আমার জানা। আমার মাইনে না-ও যদি জানা থাকে, এক অফিসের ভিতর জেনে নিতে আটকাবে না। এক পক্ষ একতরফা খাইয়ে যাবে, আমাদের সে ব্যাপার নয়—আপনি যদি আমায় খাওয়ান, আমিও আপনাকে খাওয়াব। মাইনে দুটো যোগ করে নিলেই সঠিক অবস্থা বেরিয়ে পড়বে। নিয়েছিও তাই—রাজার হালে দু'জনের চলে যাবে। এর বাইরে ধরুন পাকিস্তান থেকে হুণ্ডি করে আপনি এককাঁড়ি টাকা নিয়ে এসেছেন, কিংবা ধরুন আপাদমস্তকে ঢেকে দেবার মতন গয়না গড়ানো আছে আমার জন্য—আরো ভাল, সেগুলো আমাদের উপরি লাভ।

শিশির আবার বলে, স্বভাব-চরিত্রের খোঁজ নেওয়া—সে-ও কি বাহুল্য ?

ঘাড় নেড়ে পূর্ণিমা সায় দেয় : ঠিক তাই—

বলে, দিদির বিয়ের সময় পূর্ণ মুখুজ্জে বলে খুব কারিতকর্মা একজন প্রতিবেশী বাবার সঙ্গে পাত্র আশীর্বাদ করতে গিয়েছিলেন। পাত্রের বয়স জিজ্ঞাসা করতে বললেন বাবা, পূর্ণ-জেঠা তখন জবাব দিলেন : কী দরকার ? জানাই তো আছে চব্বিশ-পঁচিশ। চুল পেকে দাঁত পড়ে গেলেও বিয়ে না হওয়া অবধি পাত্রের বয়স চব্বিশ-পঁচিশ পাত্রীর বয়স উনিশ-কুড়ি পেরোয় না। সবাই জানে একথা। বয়সের বেলা যা, স্বভাব-চরিত্রের ব্যাপারে ঠিক তাই। জবাব আগে থেকে জানা : দেবোপম আদর্শ-চরিত্র। জিজ্ঞাসা বাহুল্য।

ট্যাক্সি ময়দানের পাশ দিয়ে চলেছে। পূর্ণিমা আবার বলে, মেনে নেওয়া গেল তাই—কী যায় আসে ! মাঠের মতন মস্তবড় জীবন আমাদের সামনে। আজকের দেবোপম চরিত্র কোন একদিন আসুরিক হয়ে উঠবে না, কে গ্যারাণ্টি দিতে পারে ? হচ্ছেই তো আকছার। কিন্তু সিভিল ম্যারেজের মজাটা হল ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ফাটাফাটির গরজ নেই। যেদিন না পোষাবে, চতুর্দিকে পথ খোলা রয়েছে—বিয়ের ইস্তফা দিয়ে নিজ নিজ পথে বেরিয়ে পড়ব।

ভয়ের ভঙ্গি করে শিশির বলে, ওরে বাবা, এ যে পদ্মপত্রের জল ! টলমল, টলমল—বেসামাল হলেই গড়িয়ে পড়ে যাবে।

ঠিক সেই জন্যেই এ ওকে সম্মান করে ভয় করে সতর্ক হয়ে চলবে। রেজেস্ট্রি-বিয়ের

আসল জোরটা এইখানে।

মোটের উপর কোন রকমে দমানো গেল না। আকারে ইঙ্গিতে শিশির অনেকরকম ভয় দেখিয়েছে, কিন্তু এ মেয়ে ধনুর্ভঙ্গ-পণ নিয়ে যাচ্ছে, নোটিশ আজকেই এবং এক মাস পরে উভয়ে স্বামী-স্ত্রী। ইতিমধ্যে ভূমিকম্প জলস্তম্ভ মন্বন্তর কিংবা এ্যাটমবোমা প্রসাদাৎ দুনিয়া ধ্বংস হয়ে গেলে আলাদা কথা, নতুবা এই ব্যবস্থার নড়চড় নেই।

এদিকে যখন পাকাপাকি, মাসান্তে শেষ পর্বের চিন্তাই জরুরি এবারে। তিন সাক্ষির আবশ্যক, তিনের এক হল ধরুন অমিতাভ—

আপনার এলাহাবাদের মামার তো পাত্তা নেই, মেস ছাড়বার জোর তাগিদ এদিকে। উপস্থিত ঘর ত্যাগ করে কদ্দিন এমন ঘুমিয়ে থাকা যায় বলুন। মেয়ের অবশ্য অনটন নেই, এ সম্বন্ধ গেলেও ঢের ঢের নতুন সম্বন্ধ এসে যাবে। কিন্তু ঘর বেহাত হলে তারপরে নোনাপানির কর্পোরেশন ডিপোয় পাইপের মধ্যে বসবাস ছাড়া তো উপায় দেখি নে। তা-ও হবে না, জন চারেক সেখানে জবর-দখল করে আছে, দেখে এসেছি। তারা জায়গা ছাড়বে না।

এমনি সব বলে অমিতাভকে রাজি করাবে। এলাহাবাদের মাতুল-কন্যা নিয়ে সে মাথা ঘামাবে না—রাজি হবে বলেই মনে হয়। চোখের উপর দিয়ে শ্রীপতিবাবু ভাগনির বর গেঁথে ফেলছেন—ভাইঝিকে প্রতিপক্ষ দাঁড় করিয়ে তাড়াতাড়ি একটা মোচড় দিয়ে রাখল। অন্যের অসুবিধা ঘটাবার জন্যে মানুষ মাত্রেই এটুকু ঝঞ্ঝাট নিয়ে থাকে। ঝঞ্ঝাট কী-ই বা এমন—এলাহাবাদে হয়তো লেখেই নি এখনো চিঠি। খুব সম্ভব মামাই নেই সেখানে এবং মাতুল-কন্যাও ভাঁওতা, শিশিরের উপর তার প্রভাবটা দেখানোর জন্যেই কাল্পনিক এক কনে খাড়া করেছিল। স্বভাবে অতিশয় স্ফূর্তিবাজ—আজব বিয়ের সাক্ষির সই দিতে মহানন্দে সে ছুটে যাবে।

পয়লা সাক্ষি অতএব অমিতাভ। আর, দুই নম্বরে তবে শ্রীপতিবাবুই বা নয় কেন? চার দিন রাবড়ি খাইয়েছেন—মোট মূল্য চার মুদ্রার নিচেই। ঋণ কাঁধে রাখা উচিত নয় —মাকের এই কুড়িটা দিনে শ্রীপতিবাবুকে ক্ষেপে ক্ষেপে খাইয়ে শোধ দেওয়া যাক। তার উপরে সেই দিনের দিন সাংঘাতিক একপ্রস্থ খানাপিনা তো আছেই। ভাগনি গছানোর কোনরকম আশা নেই—হেন ক্ষেত্রে খাইয়ে-মানুষ শ্রীপতি বেহিসাবি ক্রোধ পোষণ করে এমন একটি উত্তম ভোজ বাতিল করে দেবেন, এমন তো মনে হয় না। শিশিরের দুই নম্বর সাক্ষি মেসের ঐ শ্রীপতিবাবু।

তৃতীয় সাক্ষি—সেকশনের বড়বাবু নটবর রাজি হলে কেমনটা হয়? ঘাড় নাড়ছেন কেন শুনে?—ভবসংসারে হেন কর্ম নেই যথোচিত কৌশল ও তদ্বির প্রয়োগে যা সিদ্ধ হয় না। বড়বাবু লোকটাকে চটিয়ে রাখা উচিত হবে না—ভাল করতে না পারুক, মন্দ করবার ক্ষমতা ঈশ্বর কমবেশি সকলকে দিয়েছেন! লোকটার উপরওয়ালার কাছে আনাগোনা—ফাঁক বুঝে যখন তখন শিশিরের নামে কান ভাঙাবে। গাঁ-অঞ্চলের প্যাটোয়ারি খেলা একটুকু দেখিয়ে দাও হে শিশির—নটবর অবধি সাক্ষি হয়ে মনের সুখে সই দিয়ে আসবেন।

অফিস অন্তে নটবর বেরুচ্ছেন। শিশির তক্কে-তক্কে ছিল, পিছন ধরল। বলে, আপনার জন্যে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

কেন?

কথা বলতে বলতে যাব—

প্রীত হয়ে নটবর বলেন, তা বলো কথা—

কিছু আমতা-আমতা করে, স্বয়ং বিয়ের পাত্র হয়ে যে ধরনে বলা স্বাভাবিক, শিশির বলল, আপনার নাতনিটি বড়ই সু—ইয়ে সুলক্ষণা।

'সুন্দরী' 'সুশ্রী' ইত্যাদি বলবার জন্য ঠোঁটের আগায় 'সু—' অবধি এসে গিয়েছিল—কিন্তু গজদন্তী উৎকট-কালো কন্যাকে সুন্দরী বললে বিদ্রূপ ভেবে নিতে পারেন, সেই ভয়ে সামলে নিয়ে নির্দোষ বিশেষণ 'সুলক্ষণা' প্রয়োগ করে। বলে, ভারি সুলক্ষণা মেয়ে। আমার বেশ ভাল লেগেছে। আপনার প্রস্তাবে রাজি আমি। ষোলআনার উপর আঠারোআনা রাজি। আর জানেন তো, আমার অভিভাবক নিজেই আমি—কারো কাছে হাত কচলে 'আজ্ঞে' 'আজ্ঞে' করে মত চাইতে হবে না।

নটবর বলেন, বাড়িতে চলো ভায়া। এক কাপ চা খেয়ে আসবে। বড়বউমাকে সুখবরটা দেবো, বড্ড খুশি হবে। আজকেও জিজ্ঞাসা করছিল, কি হল? বললাম, উতলা হলে চলে রে বেটি! লাখ কথায় কম বিয়ে হয় না—কিন্তু লাখ কি, তুমি যে ভায়া এক-কুড়ি কথাও পুরতে দিলে না।

কয়েক পা গিয়ে শিশির সকাতরে বলে, শুভকর্মটা এই মাসের মধ্যে ঘটিয়ে দিন দাদু। জায়গা নিয়ে মুশকিলে পড়েছি। একটা মেস আশ্রয় করে ছিলাম, থাকতে দিচ্ছে না। নতুন করে আবার মেস না খুঁজে ঘর দেখে নেওয়া যায় তাহলে। আমি আর কি দেখব, কলকাতার ক'টা মানুষকেই বা জানি! ঘরের ভার আপনিই তো নিয়ে নিয়েছেন।

নটবর বলেন, ঘর হবে, সে জন্যে ভাবনা নেই। যদ্দিন না হচ্ছে, আমার বাইরের ঘরের চেয়ার-টেয়ার সরিয়ে তক্তাপোষ পেতে দেবো ওখানে। নাতনি আর নাতজামাইকে তো ফুটপাথে নামিয়ে দেওয়া যাবে না—

ঘরের সম্বন্ধে অভয় দিয়ে উচ্চহাসি হেসে নটবর বলেন, সবুর সইছে না যে ভায়া! শুভস্য শীঘ্রং, হয়ে গেলেই অবশ্য ভালো। কিন্তু ভাদ্রমাস পড়ে গেল, এ মাসে কেমন করে হবে?

আমাদের ওসব নেই দাদু। ভাদ্রমাস বলে আটকায় না।

পাশাপাশি যাচ্ছিলেন, নটবর তাকিয়ে পড়লেন শিশিরের দিকে: তোমাদের আটকায় না মানে?

শিশির জিভ কাটে: আপনাকে বলা হয় নি বুঝি? আমি ভেবেছি, জানেন আপনি সব। চাকরির দরখাস্ত করেছিলাম, তার মধ্যে সবই তো দিতে হয়।

বিরক্ত কণ্ঠে নটবর বলেন, সে দরখাস্ত আমা অবধি নামতে যাবে কেন? কে তুমি, কোন্ জাত?

বাঙালি, দেখতেই পাচ্ছেন। কায়স্থও বটে। ধর্মে—আমি নই, আমার ঠাকুরদা—পাদরির খপ্পায় পড়ে খৃস্টান হয়েছিলেন!

মিনিট খানেক নটবর স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। একটি কথাও না বলে আবার চলতে শুরু করলেন। ঠাকুরদাদার যে তিল পরিমাণ দোষ ছিল না, এবং তারা নামে-মাত্র খৃস্টান, সেই জিনিষ সবিস্তারে বোঝাতে বোঝাতে শিশির সঙ্গে চলেছে।

সে নাকি বড় ঘড়েল পাদরি। কাউকে সাহেবি ফার্মের চাকরিতে ঢোকাবে, কারো ছেলেকে বিলেত পাঠাবে, কারো জন্যে মেম-বউ জুটিয়ে দেবে—এমনি সব লোভ দেখিয়ে পাড়াসুদ্ধ ভাজিয়ে ফেলল। কাজ সমাধা করেই পাদরি সাহেব গ্রাম ছেড়ে পিঠটান। থাকলে শিষ্যগণ সাহেবের পিঠের চামড়া খুলে নিত ঠিক। পাদরি তো পালিয়ে বাঁচল, এরা তখন কি করে—পুকুরপাড়ে দোচালা বাংলোঘর তুলে মটকার উপরে কাক-তাড়ুয়ার

চেহারায় একটা ক্রশ বসিয়ে দিল। বড়বাদলে সে ক্রশ কতবার খসে খসে পড়ে, ছুতোর ডেকে পেরেক ঠুকে আবার এঁটে দিয়ে আসতে হয়।

হেসে হেসে রসিকতা করছে: সে ঘর চার্চ না গরুর গোয়াল, বলে না দিলে কারও ধরবার উপায় নেই। তেমনি আমরা—মানুষগুলোও। নামের সঙ্গে একটা লরেন্স কি স্টিফেন কি টমাস জুড়ে দিই নি, স্রেফ সাদামাটা শিশির—শিশিরকুমার ধর। না বলে দিলে কে বুঝবে রবিবার সকালে চার্চে গিয়ে বসি। আপনি পূজ্যপাদ মানুষ, ডেপুটি-ম্যানেজার হাতে ধরে আপনার জিম্মায় দিয়েছেন, আপনার কাছে গোপন করা চলে না। যা জানলেন আপনার মধ্যে রাখুন, অন্যকে বলবার কি গরজ?

ঘাড় নেড়ে নটবর বলেন, সে হয় না। ছাতন্যাতলায় শালগ্রাম-শিলা আসবেন, ভটচাজ্জি-পুরুত মন্তোর পড়াবেন, এঁদের সকলের জাতিপাত করে এই বয়সে পাপের ভাগী হবো না আমি।

শিশির বলে, শালগ্রাম আর পুরুত-বামুন না-ই বা এলেন। আখচার হচ্ছে এরকম বিয়ে।

কঠোর স্বরে নটবর বললেন, আমাদের হয় না।

শিশির সকাতরে বলে, আপনি রাগ করলেন দাদু! কিন্তু আমার দোষটা কি বলুন। কর্মটা করে বসেছেন বাবাও নয়, আমার ঠাকুরদাদা। পাদরি সাহেব ধোঁকা দিয়ে করাল। সেই ঠাকুরদাদা বেঁচেও নেই যে দুটো চারটে কড়া কথা শোনাব।

নটবর বলেন, রাগ কেন করব, আর কড়া কথাই বা ঠাকুরদাদাকে কেন শোনাতে হবে। যার যেমন অভিরুচি। খৃস্টান তো মন্দ কিছু নয়—এতাবৎ যারা হার্মান কোম্পানির চূড়োয় বসে গেছে, সবগুলোই খৃস্টান। কিন্তু এত বড় জিনিষটা সকলের কাছে চেপে যাব, ব্রাহ্মণ নেই নারায়ণ নেই বিয়ে হয়ে যাবে—এমন কাজ আমার দ্বারা হবে না। আজ না হোক, দুদিন পরে জানাজানি হবে—কনের বাপ আমার ছেলেই তখন কলঙ্ক দিয়ে বলবে, এমন অঘটন কেন ঘটালে বাবা, পান খেতে কত টাকা দিয়েছিল?

কথাবার্তার ইতি করে নটবর জোরে জোরে চললেন—তাঁর বয়সে গতিবেগ যতখানি বাড়ানো সম্ভব। শিশিরও নাছোড়বান্দা—সঙ্গ ছাড়ে না, সে-ও দ্রুত চলেছে। বলে, বড্ড আশা করেছিলাম আমি দাদু—

নটবর বলেন, আশা ছাড়ো। তোমার নিজের সমাজে কিংবা যারা এসব মানে না তাদের মধ্যে খোঁজখবর নাও, জুটে যাবে ঠিক। চাকরি জুটিয়েছ আর বউ জোটাতে পারবে না, এ কি একটা কথার কথা হল?

বউ যবে জুটুক পরোয়া করি নে দাদু। ঘরের গরজ বড্ড জরুরি।

রূঢ় হয়ে নটবর বললেন, অন্যায় আবদার তোমার। তা ছাড়া পাত্রী আমার মেয়ে নয়—নাতনি। আসল গার্জেন আমি নই, আমার বড়ছেলে আর বড়বউমা। তাদের কাছে সব কথা খুলে বলব। বলতে বাধ্য। তুমি এসো এবারে।

শিশির অতএব সেইখানে দাঁড়িয়ে পড়ল। নটবর হনহন করে চললেন। একলা হয়ে শিশির খলখল করে হাসে: বেড়ে হয়েছে—সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না। নাতনির কবল থেকে ত্রাণ পাওয়া গেল, সেকশনের বড়বাবুরও চটে থাকবার কারণ রইল না। হায় বৃদ্ধ, এত তোমার চতুরালির কথা শোনা যায়, সামান্য একখানা পাটোয়ারি প্যাঁচেই ধরাশায়ী হলে! কপালগুণে যার আগমন হচ্ছে কারো নাতনি ভাইঝি ভাগনি বোন তার ধারে-কাছে দাঁড়াতে পারে না। চেহারায় খানিকটা দুর্গা-প্রতিমা বই কি—এবং দুর্গাঠাকরুনের মতোই সিংহি চড়ে বেড়ানোর শক্তি রাখে। পুরোদস্তুর সংসার

জানিয়েছে, তার উপর ভাইকে ডাক্তারি পড়িয়েছে। নির্ভরযোগ্য বউ, সন্দেহ নেই—বিয়ের পরে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে হাত-পা ছেড়ে অহোরাত্র বিছানায় গড়ালেও ঠিক ঠিক সময়ে মুখবিবরে অন্ন এসে পৌঁছবে। কিঞ্চিৎ মিলিটারি ভাবাপন্ন—সেটা ভালই। কলকাতা শহর নিতান্তই বিদেশ-বিভুঁই শিশিরের কাছে, এ হেন জায়গায় একটি বহুদর্শী উগ্রচণ্ডা গার্জেন চোখে চোখে রাখছে, ভাল বই সেটা মন্দ হল কিসে?

নটবরের গমন-পথের দিকে চেয়ে শিশির এই সমস্ত ভাবছে। দ্রুতপায়ে এগিয়ে মোড় ঘুরলেন তিনি। কিন্তু এতেই শেষ হল না, আরও আছে দাদু। আমাদের বিয়ের সাক্ষি হয়ে সই দিতে হবে—তৃতীয় সাক্ষি তুমি। ছাড়াছাড়ি নেই।

দিন তিনেক পরে শিশির আবার নটবরকে ধরেছে: বড্ড বিপদে পড়েছিলাম দাদু। বিপদ কাটল বোধহয় কোনরকমে।

ঘর পেয়ে গেছ?

বিরস মুখে শিশির বলে, পেলাম। কিন্তু খালি ঘর দেয় না, ঘরণীও নিতে হচ্ছে।

কে সেটি?

সবিশেষ শুনে নটবর বলেন, তোমায় চালাক ছেলে ভেবেছিলাম—তুমিই শেষটা বড়শি গিললে হে?

বড়শি গিলেই তো ডাঙা পাচ্ছি। নইলে ভেসে ভেসে বেড়ানো ছাড়া উপায় ছিল না। আপনার বড়শিও তো গিলতে চেয়েছিলাম, আপনি সরিয়ে নিলেন।

নটবর বলেন, তোমার সব কথা বলেছ ওদের কাছে?

ওদের বলে কিছু নেই দাদু, একলা ঐ একজন। বলেছি তাকে সব। বিয়ের সেজন্য দেবতা-ব্রাহ্মণের ঝঞ্ঝাট নেই—

এইবারে হাত জড়িয়ে ধরে শিশির বলে, কলকাতা শহরে আপনিই আমার গার্জেন—ডেপুটি-ম্যানেজার হাতে ধরে দিয়েছিলেন। যেতে হবে বিয়ের সময়। সাক্ষি হবেন। বিয়ে যদি আপনার ঘরের মতন হত, ধরে আপনাকে আবু্যতিকে বসাতাম। সাক্ষি হওয়া তারই অনুকল্প।

বড্ড কাতর হয়ে বলছে, কৌতূহলও আছে নটবরের। তবু রাজি হতে পারেন না। ব্রাহ্মণ নেই, শালগ্রাম-শিলা নেই—বিয়ে বলেই তো মনে করি নে আমরা। এর মধ্যে যাব কি করে? লোকে কি বলবে?

নাছোড়বান্দার হাত এড়াতে অবশেষে স্তোক দিতে হয়: চুকেবুকে যাক ভালোয়-ভালোয়, একদিন তোমাদের বাসায় গিয়ে দেখে আসব। এখন গেলে জিনিষটা খুব চাউর হয়ে পড়বে। কিছু না হোক, বয়সটা আমার বিবেচনা করবে তো! লোকে বলবে, লাটুবাবু শিং ভেঙে বাছুরের দলে মিশেছে। সে হয় না। বরঞ্চ ভবতোষকে নিয়ে যেও, তাকে আমি বলে দিচ্ছি।

ভবতোষ বেশি বলাবলির পরোয়া করে না। ঘোরতর উৎসাহী। বলে, আলবৎ থাকব। বরযাত্রী, কন্যাযাত্রী দুই-ই আমি—দুটো সই দেবো দুই তরফে। দু'বার খাব।

নটবরকে একান্তে নিয়ে বলে, আপনি যাবেন না—আমিও যদি না যাই, প্রত্যক্ষদর্শীর রিপোর্ট পাবেন কোথা?

অতএব কনে নিয়ে যারা এগিয়েছিল, সবগুলো উমেদারকে মোটামুটি কাটান দেওয়া গেল—একটি কেবল বাদ। কুসুমডাঙার ব্যাপারে ভিন্ন পদ্ধতি। সুনীলকান্তিকে কিছু বলা হবে না, সইয়ে-সইয়ে ধীরে-সুস্থে প্রকাশ পাবে। আগে হয়তো কোন কোন

রবিবারে হেলা করে যায় নি—ইদানীং এমন হল, রবিবার তো বটেই, খুচরো এক বেলা-আধ বেলার ছুটিছাটাতেও সে কুসুমডাঙা গিয়ে পড়ে। ভাবখানা, মন পড়ে আছে সেখানে, দেহটাই কাজের গতিকে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ায়। খালি-হাতে কখনো যায় না—কোন দিন বাচ্চাদের জামা খেলনা, কোনদিন বা সংসারের জন্য মাছ সন্দেশ কমলালেবু। একদিন শাড়ি নিয়ে গেল দু'খানা : আপনার একটা বড়দি, আপনার ননদের একটা।

মমতা বলে, কী মুশকিল! যখনই আসবে গন্ধমাদন বয়ে নিয়ে আসবে তুমি—

তাঁবেদার হনুমান—গন্ধমাদন আমি বইব না তো কে বইবে!

মমতা বলে, কোনটা কার শাড়ি, বলে দাও ভাই।

নকল-রেশমের শাড়ি, আজকাল যা সব বেরুচ্ছে। একটা ঘি-রঙের খোল টকটকে লালপাড়, আর একটা ঝলমলে ময়ূরকণ্ঠ। ঝলমলে শাড়িটা মমতার হাতে দিয়ে শিশির বলে, এইটে আপনার বড়দি, আর ওটা অন্য জনের।

আবদারের সুরে বলে, পরে আসুন না বড়দি। মানায় কেমন দেখি।

মমতা সেই শাড়ি ননদের গায়ের উপর ছুঁড়ে দেয় : পরে এসো ঠাকুরঝি, শিশির দেখবে।

ননদ-ভাজে কলহ এবার। ঊর্মি বলে, শাড়ি তো তোমার বউদি। তুমি পরবে।

তাই বটে, আধবুড়ো মাগি—আমার জন্যে এই জেল্লা শাড়ি! যখন বয়স ছিল তখনই কত দিয়েছে! জিজ্ঞাসা করো না তোমার বড়দাকে—

ঊর্মি বলে, বড়দা তো দেয় নি—তাকে কি জিজ্ঞাসা করব, সে কি বলবে? যে মানুষ এনেছে সেই বলে দিল কোনটা কার।

মিথ্যেবাদী সে মানুষ। মনে এক মুখে আর, তার কথা কানে নিতে আছে!

শিশিরের বুকের মধ্যে ধ্বক করে ওঠে। খাঁটি সত্যিটা আচমকা কেমন বেরিয়ে পড়ল মমতার মুখে—মিথ্যাবাদীই বটে!

অবশেষে মমতা ননদের সঙ্গে সন্ধি করে নিল : বেশ, আমারই শাড়ি। মেনে নিলাম ভাই। আমার শাড়ি পরো না কোন দিন? পরতে বলছি, পরে এসো। একটি কথাও আর নয়, খবরদার!

এই ধমকটির জন্যেই ঊর্মি যেন দেরি করছিল, এবারে হাসতে হাসতে শাড়ি হাতে ঘরে ঢুকে গেল। এবং পরে বেরুল অনতিপরে। সাজগোজের পর ঊর্মিকে মন্দ দেখাচ্ছে না তো! বিনি সজ্জার মেয়ে তাকিয়ে দেখতে নেই, চোখ বুঁজে আসবে। সাজগোজ সমেত ওদের রূপের হিসাব।

মমতা এখনও রেহাই দেবে না। বলে, নতুন কাপড় পরে গুরুজনদের প্রণাম করতে হয় ঠাকুরঝি—

ঢপ করে বউদির পায়ের গোড়ায় প্রণাম করে ঊর্মি চলে যাচ্ছিল—মমতা শিশিরকে দেখিয়ে বলে, গুরুজন তো আরও একটি দাঁড়িয়ে। সে কোন্ দোষ করল?

লজ্জায় পড়ে সে গুরুজনকেও অগত্যা প্রণাম করতে হয়।

মমতা কলকণ্ঠে বলে, এক জায়গায় দুটিকে বেশ দেখাচ্ছে গো!

॥ ছত্রিশ ॥

ভবতোষ শত কণ্ঠে তারিফ করছে : যাই বলুন দাদু খাসা ব্যবস্থা। বড় শান্তির বিয়ে। হাঁক-ডাক বাজনা-বাদ্যি নেই, দাঁতভাঙা মন্তোর পড়তে হয় না। বর-কনের সই, সাক্ষী তিনটের সই, রেজিস্ট্রারের দক্ষিণা—পলক ফেলতে না ফেলতে শুভকর্ম সারা। স্বামী-স্ত্রী হয়ে ঝুটোপুটি করে বেড়াও গে এবার। মানুষজন আজকাল সদাব্যস্ত—গয়ংগচ্ছ বিয়েথাওয়ার সময় নেই, মেজাজও নেই। ঐ সব ঝামেলার ভয়ে বিয়েই করে না কতজনে।

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ শুনছেন নটবর। আরও কয়েকটি জুটে এসেছে—অনিল, দ্বিজদাস, মাখন। টেবিলের এপাশে-ওপাশে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে। অনিল বলে, একটা দোষ, ডিম পেড়ে একমাস ধরে তা দিতে হয়। নোটিশ দিয়ে পুরো মাস হা-পিত্যেশ বসে থাকো। সেই নোটিশ পড়ে বাজে লোকে বাগড়াও দিতে পারে।

ভবতোষ বলে, সংক্ষেপে ব্যবস্থা নেই বুঝি? তা-ও শুনে এলাম। নোটিশ আর বিয়ে একই ক্ষেপে এক ঘণ্টার ভিতরে। নোটিশের তারিখটা এক মাস পিছিয়ে দেয়—খাতা পাতা ফাঁকা রেখে দেয় ঐ বাবদে। বিশেষ দক্ষিণা লাগে অবশ্য—নইলে করতে যাবে কেন? সুবিধাটাও দেখুন ভেবে—

একটা তাজা কাহিনী শুনে এসেছে ভবতোষ, আসরে তার বিবরণ দিল। কে-একজন অফিসে গিয়ে শুনল পদোন্নতি হয়ে তার দেড়-শ টাকা মাইনে বৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু এর্নাকুলামে ট্রান্সফার করেছে, পরের দিনই সেখানে রওনা হতে হবে। এই মাইনের এবারে বিয়ে করা চলে, কিন্তু এর্নাকুলামে উপযুক্ত কনে কোথা? ঠিক সেই সময় একটা মেয়ে অফিসে ফাউন্টেনপেন ক্যানভাসিং করতে এসেছে, জনে-জনের কাছে গিয়ে কলমের গুণাগুণ বোঝাচ্ছে। লোকটি এক নজরে দেখছে তাকে। মেয়েটা কাছে এসে কলম এগিয়ে ধরে বলল, দেখুন না ব্যবহার করে—অপছন্দ হলে ফেরত নিয়ে যাব। উঁহু, কলম রাখুন, বরঞ্চ আর এক কাজ হতে পারে—। ঢোক গিলে লোকটা বলল, রাজি থাকেন তো বিয়ে করতে পারি আপনাকে। ফিসির-ফিসির কি-একটু কথাবার্তা হয়ে দু'জনে বেরিয়ে পড়ল। ফিরবার পথে ফুলটুল কিনে এনেছে, রাত্রে ফুলশয্যা লোকটির বাসায়। ওঠ্ ছুঁড়ি তোর বিয়ে, বলে থাকে না—একেবারে সেই জিনিষ।

নটবর বলে উঠলেন, তা যদি বলো—কালীঘাটের বিয়ের আরো তো কম ঝামেলা, কম খরচা। দুই পয়সার সিঁদুর ঘষে দেওয়া কনের সিঁথিতে, চার পয়সার এক ছড়া গাঁদা-ফুলের মালা-বদল, আর পুরুতের সওয়া-পাঁচ আনা দক্ষিণা। একুনে পৌনে সাত আনা—পুরো আট গণ্ডা পয়সাও নয়।

ভবতোষ বলে, কিন্তু ফ্যাকড়াও আছে কালীঘাটের গান্ধর্ব বিয়ের। মামলা-মোকদ্দমা হয় কত সময়—বাসরের বদলে বরকে জেলখানায় নিয়ে তুলল, এমনও শুনেছি। আর এ জিনিষ হল সরকারি নথিভুক্ত পাকাপোক্ত বন্দোবস্ত। বয়স লিখে দিতে হয় বর-কনের—এই ধরুন শিশিরবাবুর পঁচিশ, পূর্ণিমা দেবীর চব্বিশ। আইন দস্তুর সাবালক উভয়েই—বলবার জো নেই যে, কোন পক্ষ ভুজুং-ভাজাং দিয়ে বিয়ে ঘটিয়েছে।

কথার শেষাংশ কারো কানে ঢুকল না, হাসির তোড়ে ভেসে গেল। নটবর প্রচণ্ড হাসছেন। এতক্ষণে কথার মতো কথা পেয়ে গেছেন। বলেন, কি—কি বললে? কত

বয়স আমাদের ঠাকরুনের ?

আবার হাসি। বিস্তর কষ্টে সামলে নিয়ে বললেন, সরকারি খাতায় চব্বিশ বলে লেখাল বুঝি ?

ভবতোষ বলে, আসল বয়েসটা কত ? মেয়েলোক চোখে দেখে বয়স বুঝবে, তেমন তীক্ষ্ণ লেন্স আজও আবিষ্কার হয় নি। জিজ্ঞাসা করলে ক্ষেপে যায়। কিন্তু আপনার কাছে ফাঁকি চলে না দাদু। বলুন না, কত !

হাসি থামিয়ে হঠাৎ নটবর গম্ভীর হয়ে গেলেন ঃ ঠিক বটে, চব্বিশই। ভুল হয়েছিল আমার।

দ্বিজদাস চুমরে দিচ্ছে ঃ আপনার ভুল হবে দাদু ? অসম্ভব।

ভুল বই কি ! এ অফিসে যেদিন ঢুকল, বয়স সেদিন ছিল চব্বিশই। আমাদের আগে যে অফিসে ছিল সেখানেও ঐ চব্বিশ। তার আগে যেখানে ছিল, সেখানেও তাই। এই যত স্বাধীন জেনানা হয়েছে, নিয়মই তাদের এই—একটা বয়সে এসে অচল হয়ে থাকে। বিয়ের জন্য টোপ ফেলে ফেলে বেড়ায় - বয়স বাড়লে বুড়ি হয়ে যাবে যে ! খবর নিয়ে দেখ, তোমাদের পুর্ণিমা দেবী বছর চব্বিশ ধরেই তার চতুর্বিংশ জন্মদিবস পালন করে আসছে।

মুখে একটা পানের খিলি ফেলে দিয়ে কপ-কপ করে বার-কয়েক চিবিয়ে আবার বলেন, বেটাছেলের ক্ষেত্রে কিন্তু এ নিয়ম নয়। বছর ধরে ধরে তারা ঠিক এগিয়ে যাচ্ছে। ঐ শিশির দুটো বছর আগে ছিল তেইশ। চোরে-কামারে পরিচয় ছিল না তখন—হলেও কিন্তু বিয়েথাওয়া হত না। বর বয়সে ছোট হলে বাংলা দেশে নিন্দে হয়। সবুর করো —থরি-থরি হয়ে উঠেছে। গেল-বছর চব্বিশে উঠে সমবয়সি হয়ে গেল। সবুর—আরও কিঞ্চিৎ। এইবারে পঁচিশ—কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ হয়ে পড়েছে, দেরির আর কারণ নেই। ছলা-কলায় মজে গিয়ে ছোঁড়াটা দস্তখত হয়ে এলো—আখের ভেবে দেখল না।

দস্তখতের কালি এখনো শুকোয় নি—এক্ষুনি এই সব ভয়-ধরানো কথা মাখনের ভাল লাগে না। বলে, খারাপটা কি করল ? রোজগেরে মানুষ দু-জনেই—পয়সাকড়ির ভাবনা নেই। পিছনটানও নেই কোন রকম। হেথায়-হোথায় ঘোরাঘুরি করে সিনেমা-থিয়েটারে গিয়ে হেসে-খেলে ফুর্তিফার্তিতে দিন উড়িয়ে দিচ্ছে। ঠাহর করে দেখবেন দাদু—মাটির উপরে এখন ওদের পা পড়ছে না, উড়ে-উড়ে বেড়ায়।

নটবর বলেন, তা দিব্যি উড়ছে, তোমাদের চোখ জুড়োচ্ছে। দুম করে হঠাৎ আছড়ে পড়বে, টের পাবে সেই দিন। বাঙাল-বাচ্চা জানে না, ঠাকরুনটি কেমনধারা চিজ— কত ঘাটের জল খেয়ে হার্মান কোম্পানিতে এসে ভিড়েছে, কত পুরুষকে নাকানি-চোবানি খাইয়ে এসেছে। জানবে যখন চোখের জলে পথ দেখতে পাবে না। বেশি নয়, পাঁচ-সাত মাসেই দেখতে পাবে। খুব বেশি তো একটা বছর। তিন বছরের আগে ডিভোর্স মঞ্জুর করে না—একটা-একটা করে দিন গণবে, কদ্দিনে সেই এগারো শ' দিনের পুরেণ হয়।

এমনি চলে। হঠাৎ-প্রণয়ের মুখরোচক ঘটনাটা নিয়ে হার্মান কোম্পানির একটা সেকশন রীতিমত মশগুল। বীথির চরটি পুট-পুট করে সমস্ত শুনিয়ে যায় ঃ দাদুর আসরে আজকের এইসব কথোপকথন।

পুর্ণিমারা তখন বেরিয়ে পড়েছে—পাঁচটা বাজতে না বাজতে বেরোয় আজকাল, একটা সেকেন্ডও নষ্ট করে না। জোড়া পায়রার মতো বকম-বকম করতে করতে চলেছে, বীথি দ্রুতপায়ে গিয়ে তাদের ধরল।

ফুর্তিটুর্তি যন্দূর পারো করে নাও পূর্ণিমা-দি। দাদু অঙ্ক কষে পাঁচটা মাসের সময় দিয়েছেন। খুব বেশি তো এক বছর। তার পরে মুখ দেখাদেখি বন্ধ।

কী হবে তখন, বুক দুরদুর করছে যে আমার! বহুদর্শী লোক, আমাকেও বিস্তর সতর্ক করেছেন—

যেন কত ভয় পেয়েছে—ভাবখানা শিশিরের এমনি। বলে, দাদু দেমাক করেন: ওর ঠাকুরদা ত্রিলোচন জ্যোতির্ভূষণের অদৃশ্য আলাদা লোচন ছিল নাকি কপালের উপর। সেই চোখটায় দেখে ভবিষ্যৎ বলে দিতেন। লর্ড ব্রাবোর্ন কলকাতায় মারা পড়বেন, জ্যোতির্ভূষণ আগে থেকে বলে দিয়েছিলেন। কী জানি, সেই লোচনের খানিকটা যদি দাদুর উপরেও বর্তে থাকে!

ভঙ্গিমা দেখে হেসে গড়িয়ে পড়ে বীথি। পূর্ণিমাও। হাসতে-হাসতে হঠাৎ কী যেন হল—

চোখ বড় বড় হয়েছে। এক ধাক্কায় শিশিরকে সরিয়ে দিয়ে পাগলের মতো পূর্ণিমা চেঁচিয়ে ওঠে: ঠিক কথাই বলেছেন, মিথ্যে কিছু নয়। হায়-হায়, কী ভুলই করেছি! পাঁচ মাস কি—পাঁচ-সাত দিনেই তো অতিষ্ঠ হয়েছি।

থিয়েটারের নাটকে যেমনটি হয়—উঃ উঃ উঃ করে আর্তনাদ করে উঠল পূর্ণিমা: আর পারি নে, অসহ্য—একেবারে অসহ্য হয়ে উঠেছে। তুমি প্রতারক, মিথ্যেবাদী—ছলনা করেছ আমার সঙ্গে। অব্যাহতি দাও আমায়। আমার পথে আমি, তোমার পথে তুমি—আজ থেকে একেবারে আলাদা—

শিশির অবাক, বীথি অবাক, মাথায় ছিট নাকি পূর্ণিমার? সহজ কথাবার্তার ভিতরে এটা কী রকম হল!

কয়েক মুহূর্ত এই ভাব। তারপর খিল-খিল করে হাসি। বলে, ঝড় কেটে গেছে, আর দরকার নেই।

বীথি বলে, ঝড় কখন উঠল তা-ও তো জানি নে—

উঠেছিল, তোমরা দেখ নি। নটবরবাবু যাচ্ছিলেন ঐ ফুটপাথ দিয়ে—দেখিয়ে দিলাম এরই মধ্যে আমাদের সঙ্গীন অবস্থা. মনে নির্মল আনন্দ নিয়ে গেলেন, রাত্রে গাঢ় ঘুম হবে। বুড়োমানুষের জন্য এটুকু করতেই হয়।

বীথি বলে, চোখের ভুল তোমার—নটবরবাবু না হাতি। বস তাঁকে আজ চেম্বারে ডেকে নিয়ে কাজে আটকেছে। আজকাল চোখে বুঝি একেবারে কিছু দেখ না পূর্ণিমা-দি, দু-চোখ আড়াল করে রয়েছে একটিমাত্র মানুষ। ওই মানুষটি।

পূর্ণিমা মিটিমিটি হাসি: কী জানি, ঠিক যেন দাদুর মতন দেখলাম। তা মন্দ কি—নাটকের রিহার্শাল হয়ে রইল। এর পরে দাদুর চোখের উপর যেদিন করব, জিনিষটা নিখুঁত নির্ভুল হবে।

বীথি বলে, অভিনয় জানো বটে পূর্ণিমা-দি। ঐ লাইনে গেলে নাম করতে পারতে। বুকের ব্যথায় আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছ, এমনি ভাব দেখালে। নিত্যদিন দুবেলা পাশে বসে কাজ করি—আমার অবধি চমক লেগেছিল।

শিশির বলে, ভয় করছিল আমার সত্যি-সত্যি।

বীথির দিকে আড়চোখে চেয়ে হাসতে হাসতে শিশিরের কানের উপর মুখ নিয়ে এসে পূর্ণিমা ফিসফিস করে বলে, ভয় পেতে নেই। কোনদিন আমাদের কেউ আলাদা করতে পারবে না। বুঝলে? এ জীবনে নয়।

আরও কিছু পরে বীথি বাসে উঠে পড়ল। পূর্ণিমারা বাড়ি ফিরবে না এখন।

যেরেবে। অনেক—অনেকক্ষণ।

দুই জনে একলা হয়ে পূর্ণিমা এবারে বলে, দেখ এমন করে তুমি তাকিয়ে পড়লে, ভারি কষ্ট হচ্ছিল আমার। বাঁধ না থাকলে বেহায়া কাণ্ড কিছু করে বসতাম—পথ-চলতি মানুষগুলোকে মানতাম না। একটা অবোধ চাউনি যেন তোমার—মন পাগল করে দেয়, বুকের ভিতর কেমন করে ওঠে। শহুরে চটপটে মানুষ যদি হতে, এমনটি হত না। লাজুক-লাজুক ভাব কাটেনি আজও তোমার। ভিনগাঁয়ের মেয়ে নতুন বউ হয়ে এলো—আমাদের গাঁয়ে একবার দেখেছিলাম। তারও ঠিক এমনি। দেখলে আদর করতে ইচ্ছে যায়।

হেসে আবার বলে, আমাদের বেলা উল্টো হল—তুমি যেন কনে বউটি, আমিই দামাল বর।

॥ সাঁইত্রিশ ॥

সেই রাত্রে তাপস এলো গলির বাড়িতে। বাইরের ঘরে শিশিরকে পেয়ে হৈ-হৈ করে ওঠে: বেড়ে মানুষ আপনারা! ফন্দিটা আমিই শিখিয়ে এলাম। নিজেরা দিব্যি কাজ গুছিয়ে নিলেন, তখন আর নামই মনে পড়ল না আমার। লোকমুখে শুনে পুরো-পুরি বিশ্বাস হয় নি—চক্ষু কর্ণের ঝগড়া মেটাতে চলে এসেছি।

রান্নাঘরে ছিল পূর্ণিমা, ভাইয়ের সাড়া পেয়ে চলে এলো।

কি বলছিস?

তাপস বলে, ঘটক তো আমিই ছোড়দি—চোটপাট করে আমায় না বলে দিয়ে নিজেরাই তারপরে বন্দোবস্ত করে নিলি। এটা যেন হল, দালালের কাছ থেকে খোঁজখবর জোগাড় করে নিয়ে দুপক্ষে সোজাসুজি বিকিকিনি—দালালি মেরে দেওয়ার ব্যাপার। আমি তা বলে এত সহজে হাল ছাড়ব কেন। ভাবলাম, দেখে আসি ছোড়দি'র ঘর-গেরস্থালি, ভাব বুঝে আসি। অদৃষ্টে কি আছে—সন্দেশ না সম্মার্জনী সঠিক জানি নে। সাহস করে তবু চলে এলাম।

পূর্ণিমা হাসিমুখে বলে, দেখতে পাবি এক্ষুনি। গল্পসল্প কর্ আসছি।

শিশিরের কাছে তাপস সবিস্তারে শুনছে। পূর্ণিমা থালায় করে খাবার সাজিয়ে নিয়ে এলো।

সন্দেশই দেখছি অদৃষ্টে—

পূর্ণিমার হাত থেকেই তাপস একটা মিষ্টি তুলে মুখে পুরল। অভিমানের সুরে বলে, ক্ষিধে পেয়ে গেছে, তাই খাচ্ছি। কিন্তু তোর এ সন্দেশ তেতো। নিজে যেচে এসেছি, থালায় খাবার সাজিয়ে বাইরের ঘরে তুই নিয়ে এলি। তা-ই বটে, আমরা আজ পর-অপর বই তো নই!

ও, রান্নাঘরে ডাকি নি—সেই জন্যে বুঝি? আয়।

ভাইয়ের হাত ধরে রান্নাঘরে গিয়ে পূর্ণিমা ঠাঁই করে বসাল। বলে, বলবার ইচ্ছে হয়েছিল—অন্য কেউ না হোক, তোকে অন্তত। কিন্তু বলি কোন্ সাহসে?

তোর আবার সাহসের অভাব! অবাক করলি ছোড়দি। বাবাকে দিয়ে সম্প্রদান করাব। রাজি হয়ে বাবা কাশী যাওয়া তিনটে দিন পিছিয়ে দিলেন। কিন্তু শিশিরবাবু মাথা নেড়ে দিলেন: গররাজি নাকি তুই। সেই মল খসালি, কিন্তু স্রেফ

একা একা—আপনজন সকলকে বাদ দিয়ে। কী ভীষণ মন্ত্রগুপ্তি—ঘুণাক্ষরে কেউ আমরা টের পাই নি। এক মাসের নোটিশ—তার মধ্যেও কারসাজি ছিল কিনা কে জানে। আর ম্যারেজ-অফিসে নোটিশ পড়েছে—সে নোটিশ পড়তেই বা যাচ্ছে কে!

ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে তাপস বলে, সত্যি ছোড়দি, এমন তুই হলি কি করে?

সকৌতুকে পূর্ণিমা বলে, কি হলাম রে?

পর হয়ে গেছিস তুই সকলের থেকে—

আপন ছিলাম নাকি কোনদিন?

তারপর হারানো পূর্ণিমা বলে উঠল, ছিলাম রে ছিলাম। সকলের সঙ্গে এক রকমের হয়ে ছিলাম বটে একদিন। কোন্ যুগের কথা—ভেবে ভেবে মনে আনতে হয়। একদিন, জানিস রে, ভারি এক মজা হয়েছিল। মুখের পানে চেয়ে কি দেখিস—খেতে খেতে শুনে যা।

বলছে, বড্ড বেকুব হয়েছিলাম সেদিন মনে মনে। গড়ের মাঠে ট্যাক্সি চড়িয়ে দেখাতে নিয়ে গেল। ভাবছি, কনে দেখাচ্ছে। জড়পুত্তলি বিয়ের কনে হয়ে দাঁড়ালাম। পছন্দ করেছে, পূর্ণ-জেঠা রাত্রে সুসংবাদ দিয়ে গেলেন। সারা রাত্তির ঘুম হল না—তিন কন্দর্পপুরুষ, কাকে রাখি কাকে ফেলি। তারপরে ফাঁস হয়ে গেল—বিয়েথাওয়া কি, মেয়ে থেকে বাবা সরাসরি আমায় দেবিত্বে তুলে দিচ্ছেন।

গলা তোর অমনধারা ভারী কেন ছোড়দি?

দেমাকে। যে বয়সটায় মেয়েরা ফস্টিনস্টি ফুর্তিফার্তি প্রেম-প্রণয় নিয়ে তুচ্ছ জীবন কাটায়, তখনই আমি দেবী। দায় জানায় সকলে দেবীর কাছে। মাইনে তো সামান্য ক'টা টাকা—দেবীর কি আশ্চর্য মহিমা!—সব দায় পূরণ হয়ে যায় তারই মধ্যে। দেবীর জয়-জয়কার—বাবা যাকে পান, ডেকে ডেকে দেবীর মহিমা শোনান। এত নামযশ এত কর্তৃত্ব—চাট্টিখানি কথা!

তাপস বলে, সত্যি ছোড়দি, এইটুকু জীবনে কত তুই করলি। নইলে কোথায় আমরা সব ভেসে যেতাম!

চোখ বুঁজে পূর্ণিমা তলিয়ে গিয়েছিল সেই পুরানো দিনের মধ্যে। চোখ মেলে এবারে ম্লানহাসি হাসল। বলছে, কিন্তু দেবী তো আর মেয়ে নয়—মানুষই নয়। আমোদ-আহ্লাদে সে বেমানান, উৎসবে উৎপাত। সে হাজির থাকলে ফুল শুকোবে, আলো নিভে যাবে, মুখের হাসি ঠাণ্ডা হিমেল হবে। মিথ্যে অসুখের রটনা করতে হয় দেবীর কবল থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে। উৎসবে সবাই যায়, তারই কেবল ডাক পড়ে না।

তাপস পাথর হয়ে শোনে, ভাল-মন্দ একটা কথা বলার সাহস নেই।

পূর্ণিমা বলে যাচ্ছে, সেই দেবী তারপরে একদিন খারিজ হয়ে গেল। কারো কোন প্রয়োজন নেই—বাবা-মায়ের না, দিদির না, তোরও নয়। বেদী থেকে নেমে দেবী ভূঁয়ে নয়, একেবারে বুঝি পাতালে—পাতাল কি কোথা, কে-ই বা ঠাহর দেখল? লহমার মধ্যে বাবার কাজির বিচার সারা, চিরকালের 'তুই' থেকে 'তুমি'তে পতন। পাপসঙ্গ এড়াতে বাবা এক দৌড়ে কাশীপুরে—তাতেও হল না কাশীপুর থেকে কাশী। দশাশ্বমেধে ডুব না দিয়ে গায়ের জ্বালা জুড়োবে না। দিদিরও পরম সোয়াস্তি—ওরে দুশ্চরিত্র বরের দোসর এক দুশ্চারিণী পাওয়া গেল। দেবীর উঁচু বেদি থেকে পিছলে পড়ে গিয়েছে, উল্লাসটা তাই উৎকট রকমের বেশি—

ইনিয়ে-বিনিয়ে পূর্ণিমা এমনি বলে যাচ্ছে। নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করে তাপস উঠল। বলে, সন্দেশ সম্মার্জনী দুটোই খাওয়ালি ছোড়দি। আমাদের উচিত প্রাপ্য,

রাগ করি নে। সকলের জন্য সুখশান্তি চেয়ে এসেছিস—তোর জীবনেও তাই আসুক, কামনা করে যাচ্ছি। আসবেই—শিশিরবাবু সাধাসিধে সরল মানুষ, আমার তো বড্ড ভাল লেগেছে। আজকের ব্যথা-অভিমান ধুয়ে-মুছে যাবে, সেইদিন এসে আমি ঘটকালির পাওনা আদায় করব।

বাইরের ঘরে যখন এল, তাপস সম্পূর্ণ সামলে নিয়েছে। হাসিমুখে শিশিরকে বলে, খেতে খেতে আপনার কাব্য শুনছিলাম। যাচ্ছি এবারে। দুটো রুগী বড্ড খাবি খাচ্ছে —ফোঁড়াফুঁড়ি করে দেখি যদি তাড়াতাড়ি খতম করা যায়।

রবিবারে অণিমা এসে হাজির। তাপসের কাছে শুনেছে—শতমুখে সে শিশিরের কথা বলে। পাড়াগাঁয়ের সাধাসিধে স্বাস্থ্যবান যুবাপুরুষ—বিদ্বান, সুশ্রী, ছলচাতুরী বোঝে না, দেবতার মতো নিষ্পাপ। অনেক ভাগ্যে এমন একটি পাত্র মেলে। ছোড়দির ভাগ্য, আমাদের সকলের ভাগ্য।

বলে বলে শেষ করতে পারে না যেন তাপস। এত সব শুনে কার না কৌতূহল হয়? ছেলেমানুষ তাপস, কী-ই বা বোঝে! শিশিরের মুখের দুটো মধুর বচন শুনেই গলে গেছে। অণিমা নিজে একটু বাজিয়ে দেখবে। যে মানুষটিকে নিয়ে এত সব কাণ্ড —যার জন্যে পূর্ণিমা সকলের সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়েছে।

বলে, কেমন আছিস রে পুনি? তোর বর দেখতে এলাম।

বর তো নেই দিদি, বেরিয়ে গেছে। কোনো রবিবারে থাকে না।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলে, একলা এলি, রঞ্জুকে আনিস নি?

রবিবার বলেই আনা হল না। স্বাতী মায়ের কাছে যায় রবিবারে, রঞ্জুকেও নিয়ে যায়। মামির বড্ড ন্যাওটা হয়েছে রঞ্জু, সর্বক্ষণ তার সঙ্গে সঙ্গে আছে, একটুও কাছ ছাড়ে না।

পূর্ণিমা বলে, তাই? না পাপীয়সী মাসির গা গড়াবে, সেই ভয়ে আনলি নে? গড়াল-ই বা! বাচ্চা ছেলেপুলে দেবতার অংশ, ওদের গায়ে পাপের ছোপ লাগে না, কাশীর গঙ্গায় ধুতে যেতে হয় না।

অণিমা বলে, তুই ভুল ভেবে বসে আছিস। বাবা কাশী গেছেন দাবা আর পূর্ণজেঠার টানে। এমনিও যেতেন। তোর উপরে রাগ দেখানো—সে একটা ছুতো ছাড়া কিছু নয়।

দোতলার ঘরে গিয়ে পূর্ণিমা সমাদরে বসাল। অণিমা বলে, রবিবারে কোথায় যায় শিশির? আমি আরো রবিবার দেখে এলাম ধীরেসুস্থে কথাবার্তা হতে পারবে বলে।

ছুটির দিনে মামা-মামী খুঁজে খুঁজে বেড়ায়। এককালের বিখ্যাত মানুষ সেই মামা। কলোনি গড়েছিলেন, পুড়িয়ে দিয়েছে। আবার কোনোখানে গড়েছেন ঠিক নতুন করে। সে মানুষ হার মানেন না। কলোনির নাম যা হয়েছে তা-ও জানা—নববীরপাড়া। কোথায় হয়েছে, ঠিকানাটা কেবল জানা নেই।

অণিমার ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি দেখে কিছু উষ্ণ হয়ে পূর্ণিমা বলে, প্রথম শুনে আমিও হেসেছিলাম দিদি। কিন্তু মামার কাহিনী যা শুনি—আমাদের সাধারণ দশজনের মতো নয়, এই সব মানুষ ইতিহাসে থেকে যান। কলোনি আছে, নিশ্চয় আছে—এই কলকাতার কাছেপিঠে কোথাও। খুঁজে নেবার অপেক্ষা। পেয়ে গেলে সে-ই আমার শ্বশুরবাড়ি হবে।

দেয়ালঘড়ি আছে একটা—টং টং করে ন'টা বাজল। পূর্ণিমা ব্যস্ত হয়ে ভানুমতীর উদ্দেশ্যে হাঁক দেয়: উনুন ধরানো হল রে ভানু? ধরিয়ে দিয়ে এক্ষুনি বাজারে ছোট্।

দিদি এলো ক'দিন পরে—না খেয়ে যেতে দিচ্ছি নে। এসেছিস তো সন্ধ্যে অবধি থেকে যা—সেই সময় ফিরবে। হ্যাঁ দিদি, পাপীয়সীর হাতে খেলে জাতধর্ম যাবে না তো আবার ?

॥ আটত্রিশ ॥

কুসুমডাঙায় সুনীলকান্তির বাইরের উঠোনে শিশির। হাতঘড়ি দেখল, ন'টা। প্রতি রবিবার আসে এখানে। আগে কখনো-সখনো বাদ পড়ত, বিয়ের নোটিশ পড়ার পর থেকে একটি রবিবারও আর ফাঁক যায় নি। এমন কি যে শুক্রবারে ম্যারেজ রেজেস্ট্রি হল, তার দু'দিন পরের রবিবারেও এসেছিল। বেশি রকম মাখামাখি এখন। এ'রাও চোখে হারান কুমকুমকে। এবং শিশিরকেও। শিশির ঠেস দিয়ে বলেছিল, আমি বাজে লোক—পরস্য পর বই তো নই। কুমকম বোনের মেয়ে, সেই আসল—কুমকুমের বাপ বলেই যা-কিছু খাতির আমার।

মমতা বলেছিল, সেই বোনের কথা ভেবেই তো বলছি—

কথাবার্তা সেদিন আর রেখে-ঢেকে নয়, একেবারে স্পষ্টাপষ্টি। বলে, মনে মনে কত তার সাধসাধনা ছিল, তবু একুশ দিনের মেয়ে ফেলে চলে যেতে হল। মেয়ের অবস্থা দেখলে স্বর্গ থেকেও পুরবী সোয়াস্তি পাবে না। আমি সেকথা ঊর্মিকে বললাম। কিন্তু বলে দেবার কিছু নেই, তুমিও জানো ভাই। কী যে পেয়েছে তোমার মেয়ের মধ্যে, তিলেক তাকে বুক থেকে নামাবে না। কুকুমের মা নেই—আজকের এই বাচ্চা মেয়ে বলে নয়, কোন দিন ঊর্মি সেটা বুঝতে দেবে না।

চোখের উপর দিনের পর দিন দেখে কোন্ পাষণ্ড অস্বীকার করবে? ঘাড় নেড়ে শিশির সায় দিল: সত্যি কথা বড়দি।

মন ঠিক কর তবে ভাই। উদাসী বিবাগী হয়ে আর কতকাল ঘুরবে? আইবুড়ো ডাগর মেয়ে চোখের উপর ঘুরছে—আমার শাশুড়ি তো প্রায় ক্ষেপে উঠেছেন। তোমার বড়দা-ও আমায় খোঁচাচ্ছে কথা পাড়বার জন্য। আমি বলে দিয়েছি, তেমোর উদ্যোগ-আয়োজন তুমি আরম্ভ করে দাও—শিশির কি আর 'না' বলতে যাচ্ছে!

সে তো বটেই—

তারপর মিনমিন করে বলে, কিন্তু বড়দি, ঘর না পাওয়া পর্যন্ত কী করে হয়! নিজে যেখানে সেখানে পড়ে থাকি, কিন্তু বিয়ের পরে এমন তো চলবে না।

মমতা বলে, বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে ননদকে আর কুমকুমকে বাড়ি থেকে গলাধাক্কা দেবো, তাই তুমি ভেবেছ ?

এত চেষ্টাতেও এইটুকু আস্তানা হচ্ছে না—দায়িত্ব কাঁধে নিসে ত ভয় পেয়ে যাই। আমার মামা-মামীর ঠিকানা পেয়ে যেতাম! উড়ো খবর পেয়ে এক এক দিকে ছুটে যাই, হয়রান হয়ে ফিরি।

অকস্মাৎ মমতা অতিশয় আনন্দের খবরটা দিল: বাসা একটা পেয়ে যাচ্ছ বোধ হয়। খোঁজ পেয়ে তোমার বড়দা চলে গিয়েছিল, কথাবার্তা বলে এসেছে। স্টেশনের উল্টোদিকে আধ মাইলের ভিতর। হয়ে যাবে, মনে হয়। সকলে কাছাকাছি থাকব, দিব্যি হবে।

গৃহদেবতা লক্ষ্মী-জনার্দনকে শিশির আকুল হয়ে ডাকে (দেবতার নিজের কি অবস্থা, সঠিক জানা নেই—নিত্যিদিন বোধ হয় নির্জলা একাদশীতে আছেন)। ভারী জাগ্রত,

গাঁয়ে থাকতে বিস্তর বিপদ ঠেকিয়েছেন। তিনিই যেন ভণ্ডুল করে না দেন। ধরুন, হুড়মুড় করে ছাতই ভেঙে পড়ল বাসাবাড়ির—আপদ চুকল। ঠাকুর ইচ্ছে করলে কী না হতে পারে!

গেল-রবিবারের এই সব ঘটনা। ঠিক তার দুটো দিন আগে রেজেস্ট্রি-খাতায় তিন সাক্ষি সহ যুগলে সই মেরে এসেছে। শুকনো মুখ, বিস্তর কষ্টে হাসির পলস্তারায় ঢেকে আদরের কুটুম্ব হয়ে শিশির পুরো দিনটা দিব্যি কাটিয়ে গেল। আহারের সেদিনটা বিশেষ রকমের আয়োজন—ইয়া-ইয়া গলদা-চিংড়ি, ক্রিকেট বলের সাইজের রাজভোগ। খাব না খাব না করছে তো মমতা থালার সামনে জাপটে বসে খোলা ছাড়িয়ে মুখের কাছে চিংড়ি এনে ধরেছিল—

গেল-রবিবারে এই সব। আজকে একেবারে বিপরীত। উঠানের উপর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল—কাকস্য পরিবেদনা! বাড়ি যেন মরুভূমি, মানুষের গতিগম্য নেই। ছেলেমেয়েগুলো—ওদের ইস্কুলের প্রাইজ-ডিস্ট্রিবিউশন আজ, ন'টা বেলাতেই আরম্ভ, গেল-রবিবারে শুনে গেছে—সেইখানে নিশ্চয় গিয়ে জুটেছে।

সশব্দে গলা-খাঁকারি দিয়ে পায়ে পায়ে শিশির রোয়াকে উঠল। এক পলক দেখা গেল যেন মমতাকে, নিতান্তই পলকমাত্র—কপাট ফাঁক করে দেখে নিয়েই শুট করে সরে গেল। কলরব করে এগিয়ে এলো না অন্যদিনের মতো। ভাল করে না দেখে ভিন্ন লোক ভাবল নাকি?

হতভম্ব হয়ে ঐখানে দাঁড়িয়ে—বাইরের ঘরে ঢুকে পড়বে কিনা ভাবছে। হেনকালে অবাক কাণ্ড—

কানাচের দিক দিয়ে টিপিটিপি উর্মি এসে উপস্থিত। সন্তর্পণে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে—খরগোস বা সজারু গর্ত থেকে বেরিয়ে যেমনটা করে। কোলে যথারীতি কুমকুম—লক্ষ্মীঠাকরুনের ঝাঁপির মতন মেয়ে বাদ দিয়ে উর্মিকে দেখেছে, মনে পড়ে না। গায়ের উপর লেপটে আছে মেয়ে একখানা বৃহৎ আকারের গয়নার মতন।

কাছে চলে আসে উর্মি—এমন তো করে না কোনদিন। ঠাহর হল, কালো মুখ থমথম করছে। কুমকুম চোখ পিটপিট করে উদাসীন ভাবে বাপের দিকে তাকাচ্ছে। আপনা থেকে আপোসে আসবে না—তবে নিতান্তই যদি দিয়ে দেয়, আপত্তি করবে না। উর্মির কোলে চড়লেই মেয়ের এমনিধারা দেমাক হয়ে দাঁড়ায়।

একেবারে কাছে—গা ঘেঁসে উর্মি দাঁড়িয়ে পড়ল। ফিসফিস করে বলে, আপনি চলে যান। এক্ষুনি, এক্ষুনি, এক্ষুনি। দাদা বাজারে গেছে—বাজার থেকে ফেরার আগে।

কেন?

আকুল হয়ে উর্মি বলে, কুমকুমকে দিয়ে দেবে। বৌদি চিঠিও দিয়েছে আপনাকে, পান নি? আপনি নাকি বিয়ে করেছেন, তাই ওরা খুব রেগে গেছে। আমি দেবো না কুমকুমকে, আমি দেবো না—

কোল থেকে নিয়ে মেয়ে বুকের উপর চেপে ধরে উর্মি দ্রুতপায়ে বাইরের ঘরে ঢুকে গেল। খিল এঁটে দিল সশব্দে। যেন খিল দেওয়া না থাকলে শিশির গিয়ে পড়ে মেয়ে ছিনিয়ে নেবে তার বুক থেকে।

চর হয়ে উর্মি সতর্ক করে দিয়ে গেল। এই মুহূর্তে অতএব আত্মপ্রকাশ উচিত হবে না, ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখতে হবে কি ভাবে জিনিষটা সামাল দেওয়া যায়। দু-দুটো ফ্রন্ট—এই কুসুমডাঙার সুনীল-মমতা, এবং বাড়ির মধ্যে পূর্ণিমা। দায়ে পড়ে অনিচ্ছা

সত্ত্বেও বিয়ে করতে হল, বিয়ে না করে উপায় ছিল না—মর্মান্তিক কিছু রচনা করে চিঠি লিখবে মমতার কাছে। এবং পূর্ণিমার কাছে বিবিধ করুণ ঘটনার সমাবেশ করে আস্তে আস্তে ভাঙবে কুমকুমের কথা। হতচ্ছাড়ি মেয়ে, তোকে নিয়েই যত গোলমাল—জীবন-পথে কণ্টকখানি ফেলে রেখে পূরবী উপর থেকে মজা দেখছে।

স্টেশনে গিয়েই কলকাতা মুখো ট্রেন একটা পেয়ে গেল। এক্ষুনি বাড়ি ফিরে যাওয়া নয়—অমিতাভর মেসে দুপুরটা কাটাবে। অতগুলো মেম্বর সকলকেই বলা আছে—নব-বীরপাড়ার খবর যদি কারো ইতিমধ্যে কানে এসে থাকে। স্টেশনে স্টেশনে যারা উঠছে নামছে, ভাব জমিয়ে তাদের কাছেও জিজ্ঞাসা করে: হ্যাঁ মশায়, নব-বীরপাড়া নামে কোন কলোনির কথা শুনেছেন আপনাদের ওদিকে?

বেলা পড়ে আসে। অণিমা বলে, আর থাকা চলবে না, এবারে উঠি। স্বাতী এতক্ষণে বাপের বাড়ি থেকে ফিরেছে। তাপস তো বাইরে বাইরে ঘোরে—নতুন বাসা, স্বাতীর একলা থাকতে ভয় করে। রাতের বেলা তো নয়ই। শিশির এখনো ফিরল না।

এই রকম! অন্যদিন অফিস, রবিবারে কলোনি-খোঁজার কাজ। একটা দিনও জিরান পায় না।

অণিমা বলে, আজ ফিরে গেলাম। সামনের রবিবারে আসব, সেদিন শিশির থাকে যেন। বলে রাখবি। অন্তত সকালবেলাটা। বেরুতে হয় দুপুরে বেরুবে। তাপসের মুখে প্রশংসা ধরে না—অমন ছেলে নাকি হয় না। বাবা মা বাইরে আছেন—তাঁরা দেখলেন না। কিন্তু কলকাতার উপরে থেকে আমি দেখতে পাব না, এ কেমন কথা!

পূর্ণিমা সায় দিয়ে বলে, আসিস দিদি। আমি বলব, নিশ্চয় সে থাকবে। তোর নামে একটা দিন তবু জিরান পেয়ে যাবে।

কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়ে উঠল। বলে, আমরা দিদি খেয়ে দেয়ে দুপুরের ঘুম সেরে আরামে গল্প করছি, সে মানুষ সারাক্ষণ হন্ড হন্ড করে বেড়াচ্ছে। মামা-মামী পাণ্ডবদের মতন অজ্ঞাতবাসে আছেন, খুঁজে বের করবেই। চান সেরে বেরিয়ে পড়ে, বলে তো হোটেলে খেয়ে নেয়—ভাল খাওয়াই হয় নাকি। আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না। কষ্টের কথা আমায় জানতে দিতে চায় না।

অণিমা বলে, অত তাড়া কিসের? এখানে জলে পড়ে নেই তো!

বলে কি জানিস! জলে না হোক শ্বশুরবাড়ি পড়ে আছি—শ্বশুরবাড়ির ঘরজামাই হয়ে। এতে দম আটকে আসে। সে বড় মিথ্যেও নয়। বাবা না-ই থাকুন, বাড়ি তাঁর নামে। কোনদিন হয়তো হুমকি দিয়ে লিখবেন: দূর হয়ে যাও তোমরা বাড়ি থেকে। মামা-মামীর বাড়ি হবে আমাদেরই নিজের বাড়ি। মামার কথা যা-সব শুনেছি—ইতিহাসে বড় বড় বীরের কথা পড়ি, তিনি সেই দলের। ঠিকানা খুঁজে পেলে সেইখানে চলে যাব। আমার শ্বশুরবাড়ি। তুই কিম্বা সুজাতা বিয়ের পরে কেমন গিয়ে শ্বশুরবাড়ি উঠলি—আমারও ইচ্ছে করে না বুঝি!

অণিমা অবাক হয়ে শুনছিল। বলে, শিশিরকে বড্ড ভালবাসিস তুই। সে আর জিজ্ঞাসা করতে হয় না—ঐ এক মানুষের জন্যেই সকলের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। সে-ও তো ভালবাসে খুব?

পূর্ণিমা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল: তোরা সবাই ত্যাগ করলি, কিন্তু দিদি একটুকু ফাঁক নেই আমার জীবনে। ঐ একটি মানুষ সমস্ত ভরে রেখেছে। হাসি আর হাসি—কোনদিন জীবনে দুঃখ পেয়েছি, সে কথা ভুলে গেছি একেবারে।

ভাবতে গিয়েও পূর্ণিমার মুখে-চোখে যেন হাসির লহর খেলছে। বলে, নিত্যিদিন আমাদের বাসরঘর। সকালে ঘুম ভেঙেই ওর মুখে চেয়ে হেসে উঠি। রান্নাঘরে ঢুকি, একসময় দেখতে পাই ও গিয়ে পড়েছে। এটা-ওটা করতে গিয়ে ফেলে ছড়িয়ে একাকার করে—বকুনি খেয়ে একচোট হেসে নেয়। চান করে বেরিয়ে শীতে হি-হি করতে করতে হাসছে দেখি আমার দিকে তাকিয়ে। ট্রামে যাই হাসতে হাসতে। অফিসের মধ্যে যখনই চোখোচোখি, হাসিমুখ দু'জনার। তাই নিয়ে অন্যদের কত ঠাট্টাতামাসা! মুশকিল হয়েছে, প্রায়ই ওকে ফ্যাক্টরি যেতে হচ্ছে—একসঙ্গে ফেরা বড় একটা ঘটে না। তা হলে রক্ষে ছিল—ইস্কুল-পালানো ছেলেমেয়ের মতো হাসি-হুল্লোড় করে ঘোরাঘুরি করতাম।

এ হেন কথাবার্তা পুনির মুখে আগে কে ভাবতে পারত! মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে পূর্ণিমা আবার বলে, যখন মরে যাব তখম এলে দেখতে পাবি, মুখে হাসি লেগে রয়েছে। আমি মরে মরেও হাসছি।

॥ উনচল্লিশ ॥

সেই করাল রাত্রি। নব-বীরপাড়া কলোনির মানুষজন নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমোচ্ছিল। স্বপ্নেও কেউ ভাবে নি এত বড় সর্বনাশ মুকিয়ে আছে আসন্ন নিশিরাত্রির জন্য। ম্যাজিকের মতন একসঙ্গে বিশ-ত্রিশটা ঘর জ্বলে উঠল। লেলিহান সর্বব্যাপ্ত আগুন। তারই আলোয় দেখা যায়, কালো কালো ষণ্ডা ষণ্ডা যমদূত—হাতে লাঠি-শড়কি এবং কিছু বন্দুকও—ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। কয়েকটা তার মধ্যে অবিনাশের বেড়া ভেঙে ঘরে ঢুকে পড়ল। ঘুম ভেঙে অবিনাশ শশব্যস্তে উঠে পড়েছেন—লাঠিবৃষ্টি গায়ের উপর—মুখ থুবড়ে তিনি পড়ে গেলেন। স্ত্রী কনকলতা বুক-ফাটা চিৎকার করছেন—কারই বা কানে যাচ্ছে, কে আসবে রক্ষা করতে! মিনিট কতক সংজ্ঞা ছিল না অবিনাশের, ইতিমধ্যে কি ঘটেছে জানেন না। সংজ্ঞা পেয়ে দেখলেন, চ্যাংদোলা করে তাঁকে কলোনির বাইরে নিয়ে যাচ্ছে—পিছমোড়া দিয়ে দুটো হাত বেঁধেছে, মুখের ভিতর কাপড় গুঁজে দিয়ে মুখও বেঁধেছে। তালগাছ-তলায় জীপ দাঁড়িয়ে, জীপের ভিতর তাঁকে নিয়ে ফেলল।

মানুষজন জেগে উঠে বেরিয়ে পড়েছে। আগুন এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি, এ-ঘর থেকে ও-ঘরে লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ছে—লকলক লক্ষ জিহ্বা আকাশে। জীপের মধ্যে বন্দী বোবা অবিনাশ চোখের উপর দেখতে পাচ্ছেন—বিনি দোষে ঘরবাড়ি হারিয়ে এসে মানুষ আবার নতুন আশায় ঘর বেঁধেছিল, পুড়িয়ে সমস্ত ছাই করে দিল। কানে শুনতে পাচ্ছেন ব্যাকুল আর্তনাদ। মুখটাই শুধু বন্ধ করে দিয়ে চোখ কান খোলা রেখেছে—ইচ্ছে করেই করেছে বোধহয়, সর্বনাশটা যাতে ভালরকম প্রত্যক্ষ করতে পারেন।

বাঁচোয়া, খুব বেশিক্ষণ দেখতে হল না। আর্তনাদ দূরবর্তী হয়ে মিলিয়ে গেল, অগ্নিশিখা আর নজরে আসে না। অন্ধকার—কালিগোলা অন্ধকারে আকাশ-ভুবন ডুবে আছে।

জীপ চলেছে তো চলেইছে—কতদূরে কোথায় নিয়ে এলো, আন্দাজ পাওয়া যায় না। হঠাৎ থেমে পড়ে চার মরদে অবিনাশকে তুলে ধরল। খলখল করে হাসছে: ঘুমুচ্ছ নাকি হে বড়দা? জাগো, নতুন এক জঙ্গলে নিয়ে এসেছি। চোখ মেলে দেখে-বুঝে

নাও, কোন কায়দায় এবারে কি রকম কলোনি গড়বে।

কলোনির লোকে ভালবেসে অবিনাশকে বড়দা বলে ডাকে, সকল খোঁজখবর রাখে এরা। দলের বড়দা জেনেই বেড়া ভেঙে খাতির করে জীপে তুলে ধরাধরি করে এবারে আর এক জঙ্গলে নিয়ে এসেছে। নিজেদের মধ্যে বলাবলি হচ্ছে: ভাগ্যিস দেশ কেটে দু-খণ্ড করল। বাবুমশায়দের পোয়া-বারো। এইসব অজঙ্গি জায়গায় ভূতে বসত করতেও ভয় পেত—নিখরচায় সাফসাফাই হয়ে কাঠার মাপে বিক্রি এইবারে।

খানিকটা দূরে বয়ে নিয়ে, মরা-ইঁদুর কিম্বা ডাবের খোলা যে ভাবে ছুঁড়ে দেয় তেমনিভাবে ছুঁড়ে দিল অবিনাশকে। রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষ সেটা আর খেয়াল নেই। জঙ্গল নয়, কসাড় উলুবন। রাখে কৃষ্ণ মারে কে—যেন অবিনাশ গদির বিছানার উপর গিয়ে পড়লেন।

গোড়ায় যা লাঠির আঘাত পড়েছিল—এখন তো তোফা গদির উপরে আছেন। চিরকালের কঠিন মানুষটির তবু চোখ ফেটে জল এলো। স্বাধীনতা চেয়েছিলাম ছোট বয়স থেকে—সে-জিনিস পাওয়া হয়ে গেছে, আবার কি! বুড়ো হয়ে পড়েছি, বোঝা যাচ্ছে—চোখে তাই জল। হাত বাঁধা—জল মোছার উপায় নেই। এক সান্ত্বনা, কোন-দিকে কেউ নেই—মানুষজনে দেখতে পাচ্ছে না।

হাত বেঁধেছে মোচড় দিয়ে পিঠের দিকে নিয়ে। না বাঁধলেও ক্ষতি ছিল না—অন্তত ডান-হাতখানা। লাঠির সাংঘাতিক কয়েকটা বাড়ি পড়েছে কনুইয়ে, এমনিতেই নুলো ছিল যে-হাত। কনুইয়ের হাড় ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে মনে হয়। এ-নিশিরাত্রে প্রাণ খুলে দিব্যি কান্নাকাটি করা যেত, লোকে টের পেত না। বৃটিশ আমলে বোমার স্প্লিন্টারে হাতের আঙুল উড়ে গেল—মুখ সম্পূর্ণ খোলাই ছিল সেদিন, তবু চাদরে হাত-ঢাকা দিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে ধীরে পায়ে গলির মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন, যেন কিছুই হয় নি। সেই হাতের উপরেই দ্বিতীয় বার আক্রমণ—আষ্টেপিষ্টে মুখ এঁটে দিয়েছে, ইচ্ছা হলেও কান্না বেরুনোর উপায় নেই।

নিঃসাড়ে মড়ার মতন পড়ে থেকে ধকল কাটাচ্ছেন। হাত বেঁধেছে কাপড়ের ছিপি মুখ থেকে সরিয়ে চেঁচামেচি করতে না পারেন—অনাবশ্যক বলে পা-দুটো বাঁধে নি। পুবে ফরসা দিচ্ছে, দিনমানের দেরি নেই। এবারে উঠে পড়লেন অবিনাশ, পায়ে পায়ে উলুবন থেকে বেরুলেন। জীপ চলে গেল, চাকার চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে। আরও কিছু-দূর এগিয়ে রাস্তায় এসে পড়লেন। রাস্তার পাশে গাছের গুঁড়ি ঠেশ দিয়ে বসলেন।

সকাল হল, বেলা হল। অল্পস্বল্প লোক-চলাচল রাস্তায়। অবিনাশের দুর্দশা নজরে এলো, মুখের বাঁধন হাতের বাঁধন খুলে দিল তারা। খুলল বটে, কিন্তু ডান-হাত একেবারে নড়ানো যায় না, ফুলে গেছে। উৎকট যন্ত্রণা এখনো। প্রশ্নের পর প্রশ্ন আসছে। ঘটনাটা মোটামুটি বর্ণনা করে অবিনাশ বেহালার ঠিকানা দিয়ে দিলেন। শীতল বিশ্বাসের বাড়ির ঠিকানা: ডাক্তার তিনি—গিয়ে পড়লে আর কোন ভাবনা নেই। আপনাদের বেশি-কিছু করতে হবে না, একটা ট্যাক্সি ডেকে ধরেপেড়ে আমায় তুলে দিন। মরিয়া হয়ে উলুবন থেকে এই অবধি নিজের ক্ষমতায় এসেছি—আর বোধহয় পেরে উঠব না।

ট্যাক্সি এ-জায়গায় মেলা দুর্ঘট। কাছেপিঠে ঘরবাড়িও দেখা যায় না। যুক্তি-পরামর্শ করে ছোকরা কয়েকজন ছুটল। একটা বেঞ্চি জোগাড় করে আনল কোথা থেকে। বেঞ্চির উপর অবিনাশকে সন্তর্পণে শুইয়ে দিল। ছোট্ট একটা বালিশও নিয়ে এসেছে, বালিশটা মাথার নিচে গুঁজে দিল। পাঁচ-সাতজনে বেঞ্চি বয়ে নিয়ে চলল—তা

প্রায় মাইল-দুই যেতে হল এমনিভাবে। একটা চৌমাথা জায়গা, পিচের রাস্তা, কিছু দোকানপাটও আছে। সেইখানটা বেঞ্চি নামিয়ে বলে, শুয়ে থাকুন, উঠতে যাবেন না এখন—

ট্যাক্সি খুঁজতে গেল তারা। অবিনাশের অবস্থা দেখে পথের মানুষ দাঁড়িয়ে পড়েছে, হায়-হায় করছে সকলে। বেশির ভাগই উদ্বাস্তু। এই পোড়ো অঞ্চলটায় এখন লোকারণ্য। অগণ্য ঘর উঠেছে, আরও বিস্তর উঠছে। তারা সব তড়পাচ্ছে: আমাদেরও এই হবে, কোন্ দিন হামলা দিয়ে এসে পড়বে। নিতান্ত রাত জেগে পাহারা দিয়ে ঘুরি বলে পেরে উঠছে না। বে-সামাল হলেই সাবাড় করে দেবে। স্বাধীনতার মজা লুটছে ধূর্ত শয়তান হাজার-কয়েক মানুষ, শ' কয়েক পরিবার। মচ্ছবে আমরা সব বাদ। উল্টে ঘরবাড়ি মানইজ্জত কেড়ে নিয়ে ভিখারি বানিয়ে পথে তুলে দিয়েছে আমাদের।

যারা নতুন এসে পড়ছে, তাদের ডেকে ডেকে দেখায়: দেখুন তো, চেয়ে দেখুন। বাস্তু পুড়িয়ে সুখ হয় নি, লাঠি পিটিয়ে মানুষ পর্যন্ত জখম করেছে। এ-কলোনি ও-কলোনিতে ভাগ ভাগ হয়ে আছি, সেইজন্যে পারে। সকলে মিলে দল বাঁধুন, নয়তো রক্ষে নেই।

যন্ত্রণা চেপে অবিনাশ চোখ বুঁজে ছিলেন। মলিন মুখ উজ্জ্বল হল, চোখ মেলে বললেন, দল না বেঁধে বাঁচা যায় না। দুর্বলে বাঁচে না।

ট্যাক্সি এনে অবিনাশকে তুলে দিল। দুটি ছোকরা উঠে পড়ল তাঁর দু-পাশে। অবিনাশ মানা করেন: তোমরা কেন?

একলা ছাড়া যাবে না এ-অবস্থায়। ধরুন, ডাক্তারবাবুকে পেলেন না। কলে বেরিয়েছেন। কিম্বা শহরের বাইরে চলে গেছেন কোন কাজে।

অবিনাশ তাচ্ছিল্যভরে বলেন, কোন্ আমার সিভিল সার্জন রে—তাকে আবার কল দিতে যাবে! যাবে তো বড়জোর বস্তি-পাড়ার মধ্যে, চেঁচিয়ে ডাক দিলে ছুটে আসবে। কোন চুলোয় কেউ নেই, শহরের বাইরে এ ডাক্তার যাবে না। দরকার নেই, খামোকা কেন তোমরা কষ্ট করবে। দুর্ভোগ হবে ফিরবার সময়।

কিন্তু নিরস্ত করা গেল না। নামল না তারা। ট্যাক্সি ছেড়ে দিল।

বেহালার একটা অঞ্চলে শীতল ডাক্তার প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। অঞ্চলটা অবশ্য পুরোপুরি নয়, দালানকোঠা যত আছে সেগুলো বাদ দিয়ে। বড়লোক ও শিক্ষিত লোকে আমল দেয় না। তারা নাক সিঁটকায়, বস্তির ডাক্তার। বলে, আট আনা ভিজিটের ডাক্তার। বলে, ডাক্তারই নয়, বেপরোয়া ডাকাত—আলু-বেগুন-ঢ্যাড়শ-কুমড়ো কোটার মতন ভোঁতা ছুরি চালায় মানুষের গায়ে। কথা একটিও মিথ্যা নয়। বস্তির লোকেই ডাকে শীতলকে। এবং ঐ আটআনা ভিজিট নিয়েও কতরকম সাই-সুপারিশ, কত তর্ক-কলহ। শীতল ডাক্তারও গোঁ ধরে আছেন: ফী দিতেই হবে। মাংনা চিকিচ্ছে করে বেড়াব, তেমনধারা মহাপ্রাণ মহাপুরুষ পাও নি আমায়। কোন্ জিনিসটা মাংনা পেয়ে থাক তোমরা? মুদি মুফতে চাল-ডাল দেয়, ট্রাম-বাসে বিনি-টিকিটে চড়তে দেয়? এই যে নড়বড়ে অন্ধকার ঘর নিয়ে আছো—দুটো মাসের ভাড়া বন্ধ করে দাও দিকি বুঝি কেমন! ধোপা-নাপিত কেউ রেহাই দেয় না, পায়খানা-ধোয়ার জমাদারকে অবধি নগদ পয়সা ছাড়ো—বলি আমি ডাক্তার কি তারও নিচে?

তবে হ্যাঁ, ধারবাকি চলতে পারে। আজকে না পারো, ফীয়ের পয়সা কাল দিও। কাল না পারো পরশু। অসুখবিসুখ হিসাব করে দিন বুঝে আসে না যে, মক্কেলের হাতে পয়সা এসেছে—এইবারে গিয়ে ধরি। হাতে পয়সা আসুক, তারপরে তোমার

চিকিচ্ছে করব, এমন ব্যবস্থাও রোগে মেনে নেবে না। ধারবাকি চলবে বই কি—শীতল ডাক্তার অবিবেচক নন।

কম্পাউণ্ডার আছে একজন—নাম রাসবিহারী অথবা রাসু। লাল-খেরোয় বাঁধিয়ে মোটাসোটা খাতা বানিয়ে নিয়েছে সে—করচা খাতা। রোগীদের নামে নামে হিসাব, জমিদারি সেরেস্তায় সেকালে যেমন প্রজাপাটকের খাজনাকড়ির হিসাব রাখত। যথা: রোগী শ্রীঅমুকচন্দ্র অমুক। জমার ঘর খরচের ঘর দুটো আছে। অমুক তারিখে নিজ উদরাময় বাবদ ভিজিট আট আনা; তমুক তারিখে স্ত্রীর নিউমোনিয়া বাবদ ভিজিট আট আনা—খরচের ঘরে এমনি সব লেখা হয়ে আছে। জমা ঘরেও তেমনি আছে: অমুক তারিখে চার আনা, তমুক তারিখে কুড়ি নয়াপয়সা—

ডাক্তারের অত শত মনে থাকবার কথা নয়—রোগী হাজির হওয়া মাত্র রাসু কম্পাউন্ডার খাতা দেখে বলে দেয়, দুই টাকা বারো আনা। অর্থাৎ সেই রোগীর নামে যতকিছু জমা পড়েছে সমস্ত বাদ দিয়ে ভিজিটের বাবদ পাওনা ঐ পরিমাণ দাঁড়িয়েছে।

শীতল ডাক্তার বলেন, শুনতে পেলি? টাকা বের কর্।

রোগীর সাফ জবাব: অসুখে মরে যাচ্ছি, এখন বলে টাকা। চক্ষুলজ্জাও করে না। টাকাকড়ি দিতে পারব না, আজকের ভিজিটও লিখে রাখো হিসেবের তলায়।

রাসু মুখ কালো করে বলে, এই তো চলছে। পয়সাকড়ি কেউ ঠেকাবে না, সবাই কেবল লিখতে বলে। লিখে লিখে পাতাই ভরছি। কিন্তু ডাক্তারের দিন চলে কেমন করে বলো দিকি?

ঐ সুরে মিলিয়ে শীতলও খিঁচিয়ে উঠলেন: তাই তো, আমার দিন চলে কিসে? বেকুব বেয়াক্কেলে রোগী! বলি প্রেস্‌ক্রিপসন ধরে অষুধ কেনবার সময় তো রমারম টাকা বেরুবে। ওসব জানি নে—ফেল কড়ি মাখো তেল। ফীয়ের টাকা অগ্রিম ফেল, তবে বুকের উপর নল বসাব।

রোগী তেরিয়া হয়ে উঠে দাঁড়ায়: কাজ নেই, হাসপাতালে যাচ্ছি। ডাক্তার-অষুধ দুই-ই নি-খরচায়। শুইয়ে রেখে তার উপরে পথ্যিও জোগাবে।

শীতল ভয় দেখান: যাও না তাই, বুঝবে ঠেলা। হাসপাতালে ঢোকা চাট্টিখানি কথা নয়। হাঁটতে হাঁটতে পায়ের সুতো ছিঁড়ে যাবে। নিদেনপক্ষে ছ'টি মাস—ব্যারাম তদ্দিন চুপচাপ থাকে তো সেই চেষ্টাই দেখ বরং।

রোগী কিছু ঘাবড়ে গিয়ে বলে, হ্যাঁঃ, ছ'মাস না আরো-কিছু!

সে-ও বিনা তদ্বিরে হবে না। শুনতেই মাংনা—ওয়ার্ডের বড়-ডাক্তারকে ষোল টাকা ভিজিট দিয়ে একটা কল নিদেন পক্ষে দিতেই হবে। আমার আট গণ্ডা পয়সা দিতেই বেড়াল-ডাক ডাকছ, তুমি ঢুকবে হাসপাতালে!

এত ভয় দেখানো সত্ত্বেও লোকটা হয়তো বাইরে পা বাড়াল।

ডাক্তার হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন: শুয়ে পড়ো বলছি, বুকে নল বসাই।

রাসু তাচ্ছিল্যের সুরে বলে, যায় তো বয়েই গেল। খেয়ো খদ্দের—কোনদিন এ-লোক একটি পয়সা দেবে ভেবেছেন!

শীতল ডাক্তার বলেন, তবু আশা—আশার পিছনে মানুষ ঘোরে। আমার খদ্দের অন্যের হাতে গিয়ে পড়লেই তো সাবাড় করে দেবে। কী রাগ আমার উপরে জানো তো ডাক্তারদের! আর কিছু না হোক, আমার পাওনাগণ্ডা বরবাদ হবে, সেইজন্যে।

এবারে সকাতরে বললেন, শুয়ে পড় বাবা এখানটা। আর দিক্ করিস নে।

মাঝে মাঝে রাসু বলে, পাওনা হুড়হুড় করে বেড়ে যাচ্ছে। হালখাতা করে দেখা

যাক ডাক্তারবাবু। তাতে যদি কিছু উশুল হয়।

বাংলা নববর্ষের দিনে দোকানে দোকানে হালখাতা করে। গণেশপুজো হয়, মিষ্টি-মিঠাইয়ের আয়োজন থাকে, যাবতীয় খদ্দের নেমন্তন্ন করে। বিধি হচ্ছে, পুরানো বছরের যাবতীয় প্রাপ্য শোধ করে দিয়ে যাবে খদ্দের এই উপলক্ষে এসে। পাওনা আদায়ের জন্য রাসুর মাথায় এখন সেই মতলব ঘুরছে।

ডাক্তার নিরস্ত করেন: খবরদার, খবরদার! ডাক্তারখানায় যারা আসে তারা তো খদ্দের নয়—রুগী। চাল-ডাল তেল-তামাকের দায়ে নিত্যিদিন মুখ দেখাতে হয় না, অবরেসবরে আসে রোগপীড়ে হলে।

রাসু বলে, নেমন্তন্নে আসবে না বলছেন?

কেন আসবে না? নিজেরা আসবে, আণ্ডাবাচ্চা ঝি-বউ সাজিয়ে সঙ্গে করে আনবে। মোক্ষম খাঁ্যাট সেরে যাবার সময় ফাঁকা ট্যাঁক দেখাবে। মরব খরচখরচা করে. উশুলের বেলা লবডঙ্কা।

শীতল ডাক্তার ও তস্য কম্পাউন্ডার রাসু—দুটি বিশেষ চরিত্র। অজ পাড়াগাঁয়ে প্র্যাকটিশ করতেন, দেশ ভাগ হবার পর এই পারে চলে এসেছেন। পড়শিরা বলেছিল, তোমার এই নিয়মের প্র্যাকটিশ শহরে চলবে না। রুগী আসবে না, স্টেথেসকোপ গলায় ঝুলিয়ে মাছি তাড়াবে বসে বসে। ভয় পেয়ে শীতল ঠিক শহরের উপর না বসে শহরতলি ঘেঁসে এই বেহালা জায়গায় ঘর ভাড়া নিলেন। দেখা যাচ্ছে, সেইরকম পাড়াগাঁ জায়গা এবং গাঁয়ের নিয়মের রোগীপত্তর শহরের উপরেও আছে—খুঁজে নিতে পারলে হয়। বেহালার বদলে চৌরঙ্গির উপরে বসলেও পাওয়া যেত। তাহলেও বিস্তর কাহিনী এই যুগলের সম্পর্কে— হাসিমস্করা অঢেল চলে। গাঁয়ের মধ্যে সেই আদিস্থানে চলত, এখানেও চলে। সবিস্তারে না-হয় আর একদিন হবে, ব্যস্ত সময় এখন। অবিনাশের ট্যাক্সি ডাক্তারের দোরগোড়ায় এসে থামল।

ট্যাক্সি থেমে পড়ে দরজা খুলে দিল। রাসু তেল-মুড়ি খাচ্ছিল—মুড়ির বাটি অষুধের আলমারিতে ঢুকিয়ে নিমেষের মধ্যে সভ্যভব্য কম্পাউন্ডার মানুষ—কোথা থেকে পুরানো প্রেস্ক্রিপসন বের করে নিক্তিতে একটা শাদা গুঁড়ো ওজন করছে।

ডাক্তার হেসে বলেন, খাওয়া বন্ধ হল কেন? ট্যাক্সি এখানে নয়—ট্যাক্সি চড়ে নবাবি করে আমার কাছে কে আসতে যাবে?

চাপা গলায় রাসু বলে, নেমে পড়ল ঐ রুগী—আর বলছেন, এখানে নয়। আহা, উঠবেন না, উঠবেন না—গ্যাঁট হয়ে চেয়ারে থাকুন। ওদের চলে আসতে দিন।

উঠব না তো কি! ঠিকানা ভুল করে এসেছে। রুগী নামিয়ে ফেলছে, মানা করে আসি।

এক লম্ফে শীতল ডাক্তার বেরিয়ে পড়লেন। বলছেন, এখানে নয়' ভুল জায়গা—

অবিনাশ ততক্ষণে বেরিয়ে পড়েছেন। শীতলকে দেখে হাসিতে মুখ ভরে গেল। রাতদুপুর থেকে এতখানি বেলার মধ্যে এই প্রথম হাসি। বললেন, হ্যাঁ, এখানেই। তুমি না-ই চিনলে, আমি তো চিনি তোমায় ডাক্তার।

তবু রুক্ষস্বরে শীতল চেঁচাচ্ছেন: এখানে নামতে হবে না, নেমে কিছু লাভ নেই। পারব না আমি।

সঙ্গে যে ছেলে দুটি আছে, এই গলি ও পাড়ার অবস্থা দেখে রীতিমত ঘাবড়ে গেছে। অনেকক্ষণ থেকেই তারা আপত্তি করছিল: এ কোথায় নিয়ে চলেছেন? আপনার হাত যা ফুলে উঠেছে, হেলাফেলা করা ঠিক হবে না কিন্তু। এতক্ষণে মেডিকেল কলেজে

পেঁছে যেতাম, এমাজেন্সি ওয়ার্ডে নিয়ে নিত।

অবিনাশ কানে শুনে গেছেন, আর ট্যাক্সিওয়ালাকে সতর্ক ভাবে পথের নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যমনস্ক হলেই অলিগলির মধ্যে নির্ঘাৎ পথ ভুল হবে, ভুল জায়গায় গিয়ে পড়বেন। তারই এক ফাঁকে ছেলেদের সান্ত্বনা দিলেন: শীতল যা করবে, মেডিকেল কলেজে পারে কখনো তাই! তাদের পাইকারি চিকিচ্ছে। ঘর বারান্ডা সিঁড়ি—রোগীর ঠেলায় কোনখানে পা ফেলার জায়গা থাকে না। ডাক্তারবাবুদের গয়ংগচ্ছ ভাব, এক ঢোক জল চাইলে ঠাকুরুনরা, শুনতে পাই, খিঁচুনি দিয়ে ওঠে। আর শীতলের ডাক্তারখানা একেবারে নিজস্ব আপন জায়গা—

এতক্ষণে সেই ডিস্পেনসারি ও ডাক্তারের দর্শন লাভ হল। এবং মুখের বচনগুলোও কানে এসে ঢুকছে। ছেলে দুটি ক্ষেপে গেছে: হল তো? কেমন আপন, বুঝে নিন। ডিস্পেনসারিতে এনে হাজির করলাম—সাফ কথা বলে দিলেন, পারবেন না উনি।

অবিনাশ তবু হেসে-হেসে বলছেন, পারো-না-পারো সেটা পরের কথা। ট্যাক্সি ভাড়াটা আগে চুকিয়ে দাও। ঘর পুড়িয়ে দূর করে দিল, ভাড়া দিয়ে দিতে তারা ভুলে গেছে।

হুঁ, দিচ্ছি ভাড়া! টাকা আমার সস্তা কিনা!

বলতে-বলতে ডাক্তার সাঁ করে ট্যাক্সির কাছে চলে এলেন: বললাম, পারব না—কোন আশায় তবে নেমে পড়ছ? আমার দ্বারা হবে না। আমি কেন, স্বয়ং ধন্বন্তরিকে বেটে খাইয়ে দিলেও তোমার ব্যাধির চিকিচ্ছে নেই।

অবিনাশ যেন বদ্ধ-কালা—এত কথার একটিও বুঝি কানে গেল না। আগের সুরেই বলছেন, লাঠির বাড়ি মেরে হাতটা বড্ড জখম করেছে, চিকিচ্ছে হবে কিনা দেখ।

সেই হাতই শীতল ডাক্তার তীক্ষ্নদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। বলেন, হাত আগেও তো একবার চিকিচ্ছে করেছিলাম—আঙুল উড়ে গিয়েছিল। পুরানো চেনা হাত আমার—

বললে বলতে জ্বলে উঠলেন: হাতের চিকিচ্ছেয় কি হবে? ব্যাধি তো হাতে নয়—আসল ব্যাধি মাথায়। মাথা ছেঁচে চুরমার করে দিল না কেন? চিতেয় না শোয়ালে ব্যাধি তোমার নিরাময় হবে না। তাই দেখি এবারে—সেইটে যত তাড়াতাড়ি পারা যায়।

অবসন্ন কণ্ঠে অবিনাশ বলেন, রোগ এবারে সত্যিই বুঝি আরোগ্য হল। আর ভোগাবে না। কলোনির ছেলেগুলোকে পই-পই করে বলেছিলাম, দিনে-রাত্রে পালা করে খাটবি—নব-বীরপাড়ার পাহারা হবে, কাজকর্মও তাড়াতাড়ি এগোবে। কেউ কানে নিল না। উৎসাহ-উদ্দীপনা, আদর্শ-আত্মসম্মান সমস্ত যেন ওরা পুরানো ভিটেয় ফেলে এসেছে। মাথা গোঁজবার ঠাঁই পেয়ে বর্তে গেছে। এখন সরকারি ভোল কোন্ তাঁবিরে মেলে, আর ব্ল্যাকের কেনাবেচায় দুটো পয়সা কোন্ কায়দায় আসে; দিবারাত্রি সেই চেষ্টা।

চোখ ফেটে জল বেরিয়ে যায় বুঝি বৃদ্ধের। বলেন, শুধু আমাদের কলোনি নিয়ে বলি নে, দেশ জুড়ে এই এক জিনিষ। চিরজীবন ছেলেদের নিয়ে কাটিয়ে এলাম, এখনকার ছেলেরা যেন তাদের জাত নয়। অনাচারে মশগুল, ভিন্ন রুচি-প্রকৃতি। কলেজে পড়ে পাশ-টাশ যে করছে না এমন নয়—পাশ করুক আর না করুক লম্বা লম্বা বুকনি। চাকরি ছাড়া কিছু জানে না—চাকরি না পেলে চোখে সর্ষেফুল দেখে। সিনেমায় লাইন দেয়, ছুঁড়িগুলোর পিছন ছাড়ে না। আমার কি মনে হয় জানো—

এক মুহূর্ত নিস্তব্ধ থেকে অবিনাশ বললেন, যৌবনের অপমৃত্যু ঘটেছে। যুবকের চেহারা নিয়ে আছে কতকগুলো কীটপতঙ্গ, জন্তু-জানোয়ার।

শীতল ডাক্তার এসব খেদোক্তির কতক শুনলেন, কতক শুনলেন না। দ্রুত একবার গিয়ে কোটটা গায়ে চাপিয়ে এলেন। সেই কোটের এক পকেটে ডাক্তারি সরঞ্জাম—থার্মোমিটার ইনজেকসনের সিরিঞ্জ ইত্যাদি। অন্য পকেটে মনিব্যাগ। রাস্তার উপর দাঁড়িয়েই সর্বাগ্রে একটা ইনজেকসন দিলেন। ট্যাক্সির দরজা খুলে ড্রাইভারের পাশে বসে চৌরঙ্গি পাড়ার একটা ঠিকানা দিয়ে বললেন, জলদি চলো—

অবিনাশের ডাইনে-বাঁয়ে সেই দুটি ছেলে। তাদের একটি—নাম শংকর—প্রশ্ন করল : সেখানে কি ?

ডাক্তার অশোক চৌধুরির নাম করলেন শীতল। সার্জারিতে পয়লা সারির তিনি—লোকে একডাকে চেনে। বললেন, ডাক্তার চৌধুরির ক্লিনিক ঐ ঠিকানায়।

শংকর সবিস্ময়ে বলে, তাঁকে দেখাবেন ?

নইলে এত বড় কেস আমার নিজের উপর রাখব ? বলি ঠাউরেছ কি তোমরা—আমি ললিত বাড়ুয্যে না পঞ্চানন চাটুয্যে ? বিদ্যে কী পরিমাণ, চেহারা দেখেও কি মালুম পেলে না ?

শংকর বলে, ডাক্তার চৌধুরির ফী তো সাংঘাতিক—

দিতে হবে যেমন করে হোক। এই মানুষকে তা বলে হাতুড়ের হাতে ছেড়ে দিতে পারি নে। কিছু জানাশোনা আছে চৌধুরির সঙ্গে, যত্ন নিয়ে কাজ করবেন।

ঐবারে অবিনাশেরই ঘোরতর আপত্তি : শীতল, তুমি আজ হাতুড়ে সেজে দায় এড়াচ্ছ। কিন্তু আর একদিন আমার এই হাতেই আঙুল অপারেশন কে করেছিল শুনি ?

শীতল বলেন, আজকে স্বাধীন হয়েছি আমরা—সেদিন আর আজকের দিন ! রাসু নামে ক্লোরোফরম ধরে রীতরক্ষের মতো একটা অজ্ঞান করে দিল, ভোঁতা ছুরির পোঁচে-পোঁচে আমি হাড়-মাংস কেটে-কেটে বাদ দিলাম। নিরুপায় হয়ে করেছিলাম। টের পেলে পুলিশই নিয়ে গিয়ে সাহেব-ডাক্তার দিয়ে ভাল চিকিচ্ছে করাত। নিরাময় করে নিয়ে তার পরে মনের আনন্দে ফাঁসিতে ঝোলাত।

ডাক্তার চৌধুরির ক্লিনিকে অবিনাশকে নিয়ে তোলা হল। ছেলে দুটি সঙ্গ ছাড়ে নি। অবিনাশের পরিচয় পেয়ে অত বড় ডাক্তার চৌধুরীও তটস্থ। বললেন, অপারেশন এখানে তো হতে পারবে না। নার্সিং-হোম আছে আমার, সেখানে নিয়ে যান। আমার গাড়িতে যান চলে আপনারা। ফোনে বলে দিচ্ছি। তারা বন্দোবস্ত করতে করতে আমি গিয়ে পড়ব।

খাতির করে অশোক চৌধুরী রাস্তা অবধি গিয়ে অবিনাশকে গাড়িতে তুলে দিয়ে এলেন। নার্সিং হোমের ব্যবস্থা সেরে শীতল অনেক বেলায় বাড়ি ফিরে দেখেন, কনকলতাও ইতিমধ্যে এসে পড়েছেন। এটা জানা কথা। শীতল ডাক্তার বর্তমান থাকতে অন্য কোথা গিয়ে উঠবেন ও'রা স্বামী আর স্ত্রী !

॥ চল্লিশ ॥

মাসখানেক ঐ নার্সিংহোমে। গোটা হাতখানা কাটা গেছে এবারে। নব-বীরপাড়ার ছড়ানো বাসিন্দা অনেকে খোঁজখবর জোগাড় করে দেখা করতে আসে। ছেলেরাও আসে খুব—সেই দু'জন মাত্র নয়, আরও অনেক জুটে গেছে। বিকালবেলা দেখা করবার সময়—বিস্তর ভিড় হয় তখন। সিস্টারদের কেউ নিশ্চয় ডাক্তারের কানে তুলে দিয়েছে। চৌধুরী একদিন শীতলকে ডেকে বললেন, আপনি নিজে মেডিক্যাল-ম্যান হয়ে এরকম হতে দিচ্ছেন কেন? নিয়ম করে দিন, পাঁচ-সাত জনের বেশি না আসে। রোগী পুনর্জীবন পেয়েছেন বললেই হয়, এ সময় বেশি লোকজনের ধকল সহ্য হবে না। তাছাড়া ভিড়ের জন্য নার্সিং হোমে অন্য রোগীদের অসুবিধা হচ্ছে। আপনিই বলে দেবেন, আমরা এর মধ্যে মাথা দিতে চাই নে।

শুনে তো অবিনাশ তেরিয়া। বলেন, লোকজন এলে ধকল হবে আমার! ঠিক উল্টো। চেম্বারের গুহায় ঢুকে দরজায় দারোয়ান বসিয়ে কাজের মানুষেরা লোকজন ঠেকিয়ে রাখেন—আমার সে জীবন নয়। লোকজন দুটো দিন না দেখতে পেলেই আমি মরে যাব, ডাক্তার চৌধুরি হাজার চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারবেন না।

ঘরে যাবার জন্য জোর তাগিদ এই থেকে। সকালে-বিকালে শীতল যখনই আসেন, অবিনাশর এক কথা: গদিতে শুই নি আমি কখনো, সর্বাঙ্গে কাঁটা বিঁধছে। সেরে গিয়েছি, আর কেন, বাড়ি নিয়ে যাও আমায়।

কনকলতাকে বলেন, শীতলকে বলে নিয়ে যাও তোমরা আমায়। টাকা বেশি হয়েছে বুঝতে পারছি, মিছামিছি তাই খরচা করছে। আমার কিন্তু পা বাঁধা নেই—সুড়ুত করে কোনদিন সরে পড়ব, আগে-ভাগে বলে রাখছি।

শীতল গা করেন না। নার্সিং হোমের শতেক বিধিনিষেধের মধ্যে এই, বাড়ি নিয়ে গেলে কী কাণ্ড ঘটবে অনুমান করা চলে। কনকলতারও সেই পরামর্শ: যে ক'দিন এখানে আটক রাখা যায়। বাধা না থাকলে মানুষ একেবারে হামলা দিয়ে এসে পড়বে। জীবনভোর দেখে আসছেন। কলোনির নিরাশ্রয় মানুষরা তো আছেই—তার উপরে এই নতুন নতুন ছেলের উৎপাত জুটেছে, শঙ্কর যাদের মধ্যে মাতব্বর। শতেক জনের শতেক রকম সমস্যা তুলে মানুষটাকে পাগল করে তুলবে।

শীতল অতএব হচ্ছে-হবে করে কাটাচ্ছেন। রকমারি কৈফিয়ৎ রচনা করতে হয়: ডাক্তার চৌধুরী নিজের ফী নেবেন না বলছেন। তাহলেও ওষুধপত্রের দাম, নার্সিং-হোমের চার্জ—এ সমস্ত নেহাৎ সামান্য নয়। একটু মুশকিলে আছি। মাসের এই খুচরো ক'টা দিন কষ্ট করে থাক বড়দা। এরই মধ্যে টাকাটার ব্যবস্থা করে তোমায় নিয়ে যাব।

ইতিমধ্যে ছেলেরা অত্যুৎসাহে এক কাণ্ড করে বসেছে। একদিন শঙ্কর একটা পুরু খাম শীতল ডাক্তারের হাতে দিল

শীতল ভ্রূকুটি করেন: কি এটা?

খাম ছিঁড়ে একশ টাকার একটা নোট বেরুল, আর এক চিরকুট। পড়ে শীতল উত্তেজিত হলেন; চাঁদা তোলা হয়েছে। ভেবেছ কি শুনি—সার্বজনীন কালীপুজো না বন্যাত্রাণ-সংঘ? নার্সিং হোমের টাকা শোধ করতে পারছি নে—শুনে ফেলেছ আমার

কথাগুলো, শুনে একেবারে বেদবাক্য ধরে নিয়েছ? আমাদের ডাক্তারি নিয়মে রোগীর কাছে দরকার মতো মিথ্যে বলতে হয়। ক্যান্সার-রোগীকে বলি, টিউমার হয়েছে দেহের ভিতর। যক্ষ্মা-রোগীকে বলি গলা চিরে রক্ত উঠেছে। চিকিচ্ছের কত রকম কায়দা—এক ফোঁটা ছোকরা, তুমি তার কি জান?

ঘাবড়ে গিয়ে শংকর বলে, অভাব-অনটনের কথা কে ভেবেছে, আমাদের শ্রদ্ধা-ভক্তির সামান্য নিদর্শন। চাঁদা-তোলা যাকে বলে তা হয় নি—নিজেরাই কিছু কিছু দিয়ে টাকাটা জমেছে।

শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখাচ্ছ, খুব ভাল কথা। তার জন্যে টাকার কি দরকার? মুফতে শ্রদ্ধা হয় না? বড়দা কি আচায্যিঠাকুর—প্রণাম নেবার সময় পদতলে কি পরিমাণ পড়ল, আড়চোখে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখবেন? টাকা ফেরত নিয়ে যাও।

ছেলেটার অপ্রতিভ নিরীহ মুখের দিকে চেয়ে শীতলের রাগ পড়ে গেছে। হেসে উঠলেন তিনি। হাসতে হাসতে বলেন, জান ভাই, বড়দা'র ডান-হাতখানা আমার—মালিকানা আমায় বর্তেছে। অনেক কাল থেকে ভেবে রেখেছি, হাতটা অকেজো করে দিলে মানুষটা ঠাণ্ডা হবে। বাগে পেয়ে একবার আঙুলগুলো ছেঁটে নুলো করে দিয়েছিলাম, এবারে পুরো হাত কাটিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। কাটার কথা আমারই। নিজের বিদ্যের উপর আস্থা হল না, কাজটা চৌধুরি সাহেব আমার ব-কলমে করে দিয়েছেন। খরচ-খরচার দায় তবে আমারই উপর পড়ে কিনা, বলো তুমি বিচার করে।

তবু একদিন ছাড় হয়ে গেল—আরও হপ্তা দুই পরে। অশোক চৌধুরি নিজে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দেখে ছাড় করে দিলেন। বলেন, আমাদের নার্সিং-হোমে ঘর যা আছে রোগী তার বহু গুণ—রোগীরা নাম রেজিস্ট্রি করে মুকিয়ে আছে। তা হলেও আপনাকে ছাড়তাম না একটুও যদি প্রয়োজন থাকত। নেই, আমাদের যা-কিছু করণীয় হয়ে গেছে। স্বচ্ছন্দে এবার ঘরে চলে যান!

অনুরোধের সুরে বলেন, সারা জীবন খেটেছেন, বিশ্রাম নিন এবারে। ডাক্তার বিশ্বাসের কাছে শুনেছি সব। জ্যেষ্ঠের মতন আপনাকে মান্য করেন, কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে ওঁর কাছেই থেকে যান।

অবিনাশ হেসে উঠে বলেন, ডান হাত কেটে নিলেন—কাজকর্ম করবই বা কি দিয়ে?

ডাক্তার চৌধুরি ঘাড় নাড়েন: হাত কেটেই বুঝি ঠেকানো যায় আপনাদের! বৃটিশরাজ তা হলে গলায় ফাঁস না ঝুলিয়ে হাত কেটে কেটে ছেড়ে দিত। আঙুল ছেঁটে ডাক্তার বিশ্বাস আগেই তো নুলো করে দিয়েছিলেন। কি হল? আর দশজনের মতো কাঁধের সঙ্গে জোড়া দু'খানা মাত্র হাত নয় আপনাদের—দেশ-জোড়া ছেলেমেয়েদের হাজার লক্ষ্য হাত নিয়ে আপনারা আছেন।

নেই, নেই—

অবিনাশ অকস্মাৎ হাহাকার করে ওঠেন: অনাচার-ব্যাভিচার, শঠতা, কালো-বাজারের বান ডেকেছে দেশ জুড়ে। কোন-একটা ক্ষেত্র বাদ নেই, যেখানে বিচরণ করে সুস্থ নিশ্বাস নেওয়া যায়—

দেয়ালে ক্যালেণ্ডারের দিকে অবিনাশের নজর পড়ে গেল—লাস্যময়ী নারী। কাগজের বিজ্ঞাপনে, রাস্তার পোস্টারে, উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিমে যেদিকে তাকাবেন এই বস্তু। নানান ধাঁচের পোশাক পরেও নগ্ন অথবা নগ্নতার ইঙ্গিতে ভরা যুবতী-মূর্তি—রূপ সৌন্দর্য বলিষ্ঠতা সমস্ত ঘুচে গিয়ে উচ্চাবচ দেহ-কাঠামোর কুৎসিত হাতছানি কেবল। যেন মেয়ে ছাড়া পুরুষ নেই এদেশে, যেন মেয়ের সমাজ থেকে কন্যারা জননীরা সম্পূর্ণ

খারিজ হয়ে গেছে। অত্যাচারীর সামনে রিভলভার-ধরা শান্তি-সুনীতি-বীণাদাস অথবা সৈনিকবেশিনী প্রীতিলতা—এদের ছবি দিলে বুঝি জাতিপাত ঘটে—আমাদের মেয়ে নয় বুঝি এরা, যুবতী মেয়ে নয়? যুবতী হলে দেহভোগ ছাড়া অন্য কিছুই বুঝি জানতে নেই!

রোগশয্যায় পড়ে-পড়ে সুপরিচিত প্রবীণ এক লেখকের নাম দেখে অবিনাশ তাঁর নতুন উপন্যাস একখানা খুলে নিয়েছিলেন। ওরে বাবা, ওরে বাবা, গা গুলিয়ে আসে! গুটিকতক যুবা আর যুবতীকে ফিরিয়ে ঘুরিয়ে উৎকট উপাখ্যান—কী হাল দাঁড় করিয়েছে সেই হতভাগাদের! দেশের যুব-সমাজের তরফ থেকে মানহানির মামলা চলে কিনা, আইনজ্ঞেরা বলতে পারবেন। শীতল বললেন, এই জিনিসই দেদার চলছে বড়দা। ছোকরা লেখকদের সঙ্গে কোমর বেঁধেছেন—এমনি পৌঁছে না তো কেচ্ছা শুনিয়ে নাতি-নাতনীর বয়সী পাঠকদের বশ করছেন।

তিক্ত কণ্ঠে অবিনাশ অশোক চৌধুরিকে বলেছিলেন, শিল্প সাহিত্য শিক্ষা যা-কিছু পবিত্র বলে মনে করি, তার মধ্যেও নোংরা তদ্বির, কালোবাজারি কায়দাকানুন। তবে আর ভরসা কোথায় খুঁজব? স্বাধীনতার লোভে একদিন ফাঁসির দাঁড় এড়িয়ে ফেরারি হয়ে জন্তু-জানোয়ারের জীবন নিয়েছিলাম, এবারে কোন দিন শুনবেন সেই মানুষ স্বাধীনতার ঘেন্নায় গলায় দড়ি দিয়ে মরে আছে।

শীতল ডাক্তারের বাড়ির জায়গা সংকীর্ণ, ছোট্ট একটু ঘরে অবিনাশের ঠাঁই হল। ঠিকানা গোপন রাখতে শীতল অশেষ চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু অত্যুৎসাহীরা আবিষ্কার করে ফেলল। দুটো চারটে দিন পর থেকেই লোক-যাতায়াত—ছোটখাট এক মেলা। ঘরের সামনেটায় একটুকরো ফাঁকা জমি, তাই রক্ষা। জমিটায় ঘাসবন হয়ে ছিল, মানুষের পায়ে পায়ে কোথায় চলে গেল। মানুষ এসে স্থানাভাবে ঐখানে মাটির উপর বসে পড়ে।

আসে নব-বীরপাড়ার মানুষ। এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে তারা—ঢিল মেরে মৌচাক ভাঙলে মৌমাছির যে দশা হয়।

কি হবে বড়দা?

ব্যাকুল হয়ে সব ছুটে এসেছে। অবিনাশের উদাসীন হিমকণ্ঠ: আমি বুড়ো-মানুষ, তায় হাত-কাটা, অসুস্থ। ডাক্তার এসে এসে দেখে যায়, ডাক্তারের মানা রয়েছে—

কিসের মানা সে অবধি শোনার গরজ নেই, পয়লা কথা ধরেই টান: তুমি বুড়ো হলে আমাদের উপায় কি বড়দা? সাহস শক্তি তুমিই তো বরাবর জোগান দিয়ে এসেছ।

সাহস নিলে তোমরা কই? ও জিনিষ কেউ কাউকে দিতে পারে না। বুকের নিচে ফড়িঙের মতন একরত্তি প্রাণ—সেইটুকু নিয়ে পালিয়েছে, পালাতে পেরে চরিতার্থ হয়েছ তোমরা।

ঘৃণায় মুখ বাঁকিয়ে বলেন, কীটপতঙ্গ নর-সমাজে বরাবরই আছে—এখন একেবারে সাংঘাতিক রকম। যেদিকে তাকাই থুতু ফেলতে ইচ্ছে করে।

এমনি ধরনের কথাবার্তা আগেও হয়েছে। কিন্তু নার্স-ডাক্তারের আওতায় মধ্যে হাতের ব্যাণ্ডেজ নিয়ে শয্যাশায়ী মানুষটির সঙ্গে তর্ক করা যায় নি। আজকে বলল, বড্ড রেগে আছ বড়দা। দিনে-রাতে সর্বক্ষণ পালা করে খাটতে বলেছিলে—ধরো তাই হয়েছে। সে রাত্রে ধরো জেগেই ছিলাম আমরা। কিন্তু ষড়যন্ত্র ওরা ঘুণাক্ষরে জানতে দেয় নি, আট-ঘাট বেঁধে ষোলআনা তৈরি হয়ে তবে তো এসে পড়ল—

কত জনে এসেছিল? পনের—বিশ—পঁচিশ? তার কতগুণে ছিলে তোমরা?

কিন্তু ওদের কাছে বন্দুক ছিল, শড়কি ছিল।

বন্দুকে কতগুলো দেওড় করেছে, গুলিতে ক'টা মরল আমাদের? শড়কি দিয়ে ক'জনকে বিঁধেছে? কতখানি রক্ত ঢেলে দিয়ে তারপরে এই দ্বিতীয় বার উদ্বাস্তু হলে?

নিরুত্তর সকলে। দুর্বল অশক্ত প্রায়-পঙ্গু বুড়োমানুষ সিংহের মতন গর্জে উঠলেন: ওদেরই বা কতগুলো জখম হল, ক'টা খতম হল? হিসাব দাও আমায়, তবে কথা শুনব। নব-বীরপাড়া জ্বালিয়ে ছাই করে দিল, অত্যাচারীর গায়ে আঁচড়টি পড়ল না। একটি মুখের প্রতিবাদও না করে একদিন বীরপাড়া ছেড়ে এসেছিলাম, নব-বীরপাড়ার বেলাতেও ঠিক ঠিক তাই। বড্ড দেমাক ছিল, হারব না আমি কখনো। আমি হেরেছি, দর্পচূর্ণ হয়ে গেছে।

চোখ বুজলেন অবিনাশ। ক্ষিপ্ত হয়ে হাঁক ছেড়ে উঠেছিলেন, এবারে হাহাকার। করুণ ক্ষীণ কণ্ঠে স্মৃতি-মন্থন করে চলেছেন: ভণ্ডদের বড় বড় কথায় আস্থা করেছিলাম। ভাওতা না বাংলা—কী যায় আসে! বর্ডারে কর্তারা সব নাকি লাইনবন্দি বাহু বাড়িয়ে আছেন, আলিঙ্গনে বুকে জড়িয়ে ধরবেন—

শংকররাও এসে পড়েছে। তাদেরই কে একজন বলল, প্রতারণা!

চকিতে চোখ মেলে অবিনাশ দলটার দিকে চেয়ে দেখলেন। ঘাড় নেড়ে সজোরে সায় দিয়ে বললেন, প্রতিশ্রুতি নয়, প্রতারণা—তখন বুঝতে পারি নি। আলিঙ্গন ধৃতরাষ্ট্রের—লোহার ভীম হলেও চুরমার করে দেবে।

একমুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, তবু হতাশ হই নি। জঙ্গল কেটে জলা ভরাট করে নতুন ঘরবাড়ি তুললাম। সরকারের কাছে হাত পাতি নি—যাদের কূটনীতি বিনি দোষে আমাদের ভিখারী করেছে, ইজ্জত বিলিয়ে তাদের দয়া চাইব না। কলোনির নামের সঙ্গে, শুভার্থীরা বলেছিল, মুখ্যমন্ত্রীর—নেহাৎ পক্ষে যে কোন একটা মন্ত্রীর নাম জুড়ে দিতে। তা-ও নয়। বলাবলি হচ্ছে, শুনতে পাই, তেমনি কোন নাম থাকলে এমন নিষ্ঠুরভাবে লাঠি পড়ত না—উম্মেশ সর্দার খাতির করত। মানুষকে সম্ভ্রম না করুক, মন্ত্রীর নামে তার সম্ভ্রম খুব। কথাটা বোধহয় সত্যি। তা সত্ত্বেও আমাদের কলোনি নব-বীরপাড়া—যে বীরপাড়া ছেড়ে এসেছি, তার অনুকল্প। মাঝখানটায় পুকুর, পুকুর ঘিরে রাস্তা' ঘরবাড়ি—বীরপাড়াই ছোট আকারে সামান্যভাবে এনে বসানো। প্রতি পদক্ষেপে যাতে মনে পড়ে, আমাদের আসল বীরপাড়া আছে বর্তমান—অনেক অনেক দূরে, এখন যেটা আলাদা রাজ্য। নির্বাসনে রয়েছি, যাওয়ার পথ আমাদের বন্ধ—তবু আছে সেই নামের গ্রাম। ঘুমে-জাগরণে, সকালবেলা-সন্ধ্যেবেলা, শীতে-বর্ষায় ক্ষণে ক্ষণে বুক মুচড়ে নিশ্বাস পড়ে সেই বীরপাড়ার জন্য—

হঠাৎ উঠে পড়ে টলতে টলতে ঘরে ঢুকে গেলেন। রাত হয়ে গেছে, ঘুম ধরল বুঝি বুড়োমানুষের। দরজা বন্ধ করে সশব্দে হুড়কো এঁটে দিলেন অবিনাশ।

ঘুম না আরো-কিছু। সব কিছু আচ্ছন্ন করে বীরপাড়া এসে দাঁড়াল চোখের সামনে। জনতা এ সময়টা অসহ্য লাগে।

ছোট ছেলে খেলাধুলো নিয়ে থাকে। বেলার শেষে মনে পড়ে যায় বাড়ির কথা, মায়ের কথা: মা যাবো, বাড়ি যাবো আমি। কলোনি পুড়ল, হাত কাটা গেল, জরায় ঘিরে ধরেছে—নার্সিং-হোম থেকে ফেরা অবধি অবিনাশের বারবার মনে হচ্ছে খেলার শেষ তো এইবারে। চিরকালের শক্ত মানুষ, কিন্তু আজ এই নিশিরাত্রে কনকলতা ঘুমে

অচেতন, কোনদিকে একটি মানুষ নেই—অবিনাশ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন : আমার দেশ, আমার বীরপাড়া, আমার ধানক্ষেত, খেজুরবন, হাটখোলা, ঠাকুরতলা, আমার পড়শিরা—আজিজ ডাক্তার, নুটো হাজাম, মাদার ঘোষ, খাঁদু মোড়লরা সব। আকাশ, বটগাছের আড়াল দিয়ে উঁকি-দেওয়া সন্ধ্যাবেলার চাঁদ, রান্নবাড়ির ভাঙা দালানের আড়ালে ডুবন্ত রাত্রি-শেষের চাঁদ…

শুয়েছিলেন, উঠে পড়লেন যেন কণ্টকশয্যা থেকে। সারাজীবনে ঈশ্বরের নাম নেবার সময় পান নি আজ রাত্রে সেই অলক্ষ্য অপরিচিত ঈশ্বরের কাছে মাথা খোঁড়া-খুঁড়ি করছেন : আমি যাব। কলকাতার গঙ্গা-সলিলে আমার মুক্তি হবে না, বীরপাড়ায় নিয়ে যাও। গ্রামের শ্মশানে মরা-খালের দামের নীচে জল বড় শীতল, সেই জলে আমার দেহভস্ম পড়শিরা ধুয়ে দেবে।

॥ একচল্লিশ ॥

সকালবেলা শংকররা ক'জন আবার এসেছে। বাইরের কেউ নয়, ওরাই শুধু। সকলের দেখাদেখি ওরাও বড়দা বলে ডাকছে। বলে, বড়দা, কাজ দিন—

অবিনাশের চমক লাগল—এ যে ভিন্ন এক সুর! 'কি হবে' 'কি হবে' বলে হাহাকার আত্মপ্রত্যয়ে বলিষ্ঠ এরা কাজ করতে চাইছে। সেই পুরোনো দিনের কথা—চৌম্বক শক্তি ছিল যেন অবিনাশ মানুষটার মধ্যে, মানুষটার কথাবার্তায়। তরুণ ছেলে মেয়েদের মুহূর্তে মন্ত্রমুগ্ধ করত। প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে আসত তারা, আদেশমাত্রেই ছুঁড়ে দেবে। গায়ে তাদের যে পোশাকই থাক, অবিনাশ দেখতে পেতেন গৈরিক বস্ত্র। কিশোর বিবেকানন্দ, কিশোরী নিবেদিতা। কাজ চেয়ে চেয়ে অস্থির করতো তারা, ঠেকানো দুঃসাধ্য হত।

আজ অবিনাশ বুড়োথুত্থুড়ে, দেহশক্তি হারিয়েছেন—কিন্তু মন্ত্রটা ভোলেন নি, এইবারে টের পাওয়া গেল। গাঁ-গ্রাম তাঁর চিরকালের কর্মক্ষেত্র, শহর জায়গা অচেনা—বিশেষ করে কলকাতার মতন শহর! লোকমুখে শোনা ছিল, শহরের তরুণরা আদর্শহীন রোয়াকবাজ উচ্ছৃংখল, রমণী আর সিনেমা ছাড়া তাদের মুখে অন্য প্রসঙ্গ নেই। কারা তবে এই এসেছে, কোন্ জায়গার মানুষ? অভিজ্ঞ চোখের দৃষ্টি ফেলেই ধরতে পারেন ইস্পাতের ছেলে—গড়ে পিটে নেবার অপেক্ষা।

কে তোমরা? তোমাদের তো চিনি নে ভাই।

আমরা চিনি আপনাকে। কাজ চাইছি।

তবে যে শুনতে পাই—

কথা শেষ হতে দেয় না। শংকরই বলে উঠল, জানি জানি। যা শোনেন, মিথ্যাও বড় নয়। রোয়াকে বসে রোয়াকবাজি করি, কিন্তু সেই নিন্দুকদের জিজ্ঞাসা করবেন তো খোলা পার্ক ক'টা রেখেছে আমাদের জন্য? সিনেমায় লাইন দিই—ওই ছাড়া কোন কোন মজাটা আছে আমাদের বিকেলের অবসরের জন্য? এক শ' গণ্ডা কাগজ জুড়ে, মনস্বী সত্যসন্ধ বীরদের কীর্তিকথা নয়, সিনেমার হিরো-হিরোইনদের রসাল কাহিনী—ঋষি-তপস্বীরাও তো প্রলুব্ধ হয়ে পড়বেন। শাসন-ব্যবস্থার চূড়ায় যাঁরা, ছেলেদের সৎপথে নেবার পন্থা তাঁরা জেনেবুঝে রেখেছেন রাস্টিকেশন টিয়ারগ্যাস আর গুলি—স্বাধীনতার ক'টা বছরের ভিতরেই বিদেশি ইংরেজদের গো-হারান হারিয়ে দিয়েছেন এই

খাবদে।

আর একটি ছেলে বলে উঠল, আমাদের নিন্দেয় দেশসুদ্ধ সহস্রমুখ। পাথরের মানুষদেরও সহিষ্ণুতা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে একদিন যখন বিক্ষোভ ওঠে, জামার বোতাম খুলে দিয়ে বুক চিতিয়ে আমরাই তখন আগে আগে ছুটে যাই। মরি। হামেশাই এ জিনিষ ঘটছে—দূরে তাকাতে হবে না। কাজ চাচ্ছি—সেকালে দেখেছেন, দেখুন না একালে আমাদের উপরেও একটু পরখ করে। কি করব, বলে দিন।

বিস্মিত অবিনাশ বিহ্বল কণ্ঠে বললেন, যে দুঃখে দেশসুদ্ধ আমরা পাগল, সে কি আর চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে হয়! স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে যে সর্বনাশ এসে গেছে।

দেখি, এই উজ্জ্বল পবিত্র কোমল-মূর্তি ছেলেরাও অনেক জানে, অনেক দূর ভেবেছে। বলে, মসনদের জন্য অধীর হয়ে পড়ল, ক'ট মাস ক'টা বছর আর সবুর করতে পারল না। বিষফল নিল হাত পেতে। সুবিধাবাদীরা মুনাফা পেটবার হাতিয়ার বানিয়েছে স্বাধীনতাকে, নিরন্ন দেশ উৎসন্ন হয়ে যাচ্ছে। বিশ্বভুবনে আমরা আজ করুণা আর রং-তামাসার পাত্র। একফোঁটা দেশ হল্যাণ্ডের বাচ্চা ছেলেমেয়েরা অবধি টিফিনের পয়সা বাঁচায় আমাদের খয়রাতের জন্য। ভিটে ছেড়ে কেবল আপনারাই আসেন নি বড়দা—আমাদের সৎ পড়শিদের কতজনা কাঁদতে কাঁদতে ভিটে ছেড়ে ওপারে চলে গেছে, ধর্মে মুসলমান শুধুমাত্র এই অপরাধে।

শঙ্কর গভীর কণ্ঠে বলে, আগে যেমন ছিল আবার ঠিক ঠিক তেমনি হবে। নিজের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হবেন আপনারা। এ-পার থেকে যাঁরা চলে গেছেন, পায়ে ধরে তাঁদের ফিরিয়ে আনব। নিজেদের ভুলে যদি দেশ ভেঙে থাকি, নিজেরাই আবার জোড়া দিয়ে এক করব। একটা প্রবীণ দেশ দু-টুকরো হয়ে গিয়ে লড়ালড়ি করেছিল, এসব অতীতের বস্তু হয়ে ইতিহাসে লেখা থাকবে শুধু।

এই কথাগুলো হুবহু অবিনাশের—একদিন স্ত্রী কনকলতাকে বলেছিলেন। ছেলেদের মুখে শুনে তিনিই আবার প্রতিবাদ করছেন—সেদিন তাঁর কথার উত্তরে কনকলতা যেমন করেছিলেন।

অলীক স্বপ্ন—আকাশকুসুম! যাদের স্বার্থহানির ভয়, তারাই সব বাগড়া দিয়ে পড়বে। সর্বনেশে ক্ষমতা তাদের—দুনিয়া জোড়া চক্রান্তজাল।

এমনি কথাই কনকলতা বলেছিলেন। অনেকদিন আগে নব-বীরপাড়া প্রথম গড়ে তোলার মুখে। অবিনাশ স্ত্রীকে বলেছিলেন, আসল বীরপাড়ার দিকে নজর রেখে এই নববীরপাড়া কলোনির পত্তন। ঠিক ঠিক মিলছে কিনা বলো।

কনকলতা সায় দিয়ে বললেন, নামের যেমন মিল, ঘরবাড়ি পথ-ঘাট সাজানোর মধ্যেও মিল তেমনি। এতখানি কি জন্যে?

সকৌতুকে অবিনাশ বললেন, তুমি বলো দিকি—

একটুও না ভেবে কনকলতা বললেন, আপনজন মরলে অয়েল পেণ্টিং-এ যেমন ছবি আঁকিয়ে রাখে, এ তোমার তাই। বড্ড শোক পেয়েছ তুমি।

কঠিন কণ্ঠে অবিনাশ বললেন, শোক নয়—এ আমার সংকল্প।

তাকিয়ে পড়লেন কনকলতা। অবিনাশের মুখ ঘেমে থমথম করছে, কথার মধ্যে বিদ্যুতের ঝিলিক। থতমত খেয়ে কনকলতা চুপ করে গেলেন।

অবিনাশ বলতে লাগলেন, মরল কে আবার? বীরপাড়া অটুট রয়েছে এক দূর-অঞ্চলে। সেই কথা কোনরকমে যেন না ভুলি। নব-বীরপাড়ার সেই কাজ—ঘুমে-

জাগরণে মনে করিয়ে দেবে আমাদের, আমরা মরে গেলে আমাদের উত্তর পুরুষদের : বীরপাড়া নামে আছে আমাদের বুকের-রক্ত নিশ্বাসের-বায়ু এই মাটির ধরিত্রীর উপরেই। রাজনীতির প্যাঁচে পড়ে দেশান্তরিত আমরা—কিন্তু আছে, সে-ভূমি আমাদেরই আছে। শোকের হা হুতাশ নয়—সংকল্প আমাদের : ফিরে যাবো নিজস্ব ভূমিতে। হার মানব না, যাবোই—

কনকলতা তখন নিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, তাই কি হতে দেবে? আকাসকুসুম! একবার ভাঙলে জোড়া দেওয়া সহজ নয়। কত রকম বাগড়া এসে পড়বে।

কনকলতার হতাশা অবিনাশ উড়িয়ে দিয়েছিলেন : আমাদের জীবনকালে না ই হল তো বলে যাব আমাদের সন্তানদের। তারাও না পারে তো বলে যাবে পরবর্তীদের। ফিরবই। পুরুষ থেকে পুরুষান্তরে চলবে প্রতিজ্ঞা। ইতিহাসে শেষ-কথা বলে কিছু নেই। দু-পুরুষ কি দশ পুরুষ কি বিশ পুরুষ—বিশ বছর কি পঞ্চাশ বছর কি দু'শো বছর নিতান্ত সামান্য ক্ষণ। ইহুদিরা হাজার হাজার বছর অপেক্ষা করেছে আপন দেশ-ভুঁই ফিরে পাবার জন্যে। পেলো অবশেষে। বিদেশের ব্যাপার-বাণিজ্য সম্পদ ঐশ্বর্য তখন ছাইমুঠোর মতন ছুঁড়ে দিয়ে ছুটল। হোক না মরুভূমি—ঘামে আর রক্তে সোনা ফলিয়ে ছাড়বে সেখানে।

এমনি সব কথা হয়েছিল। আজকে অবিনাশ ছেলেদের কাছে কনকলতার সেই সব কথা মুখস্থর মতো তুলে ধরেন : অলীক স্বপ্ন! আমরা মিলতে চাইলেও স্বার্থবাদী বড় বড় শক্তি এ-পক্ষের ও-পক্ষের বন্ধু সেজে রণক্ষেত্রে উদয় হবে। ভাঙা জিনিষ জোড়া দেওয়া ভারি কঠিন।

কঠিন বই কি, কিন্তু অসম্ভব নয়। জীবনে না-ই পেরে উঠি, জীবন দিতে তো পারব।

বলল শঙ্কর নামে সেই ছেলেটি। অবিনাশের সর্বদেহ শিরশির করে ওঠে, চোখে বুঝি জল।

কি—কি বললে ভাই?

মরব। লক্ষ্যে পৌঁছানোর সিঁড়ি হবে আমাদের মরা-দেহ। মরে মরে জিতে যাব।

এ-ও যে মুখস্থ-করা কথা! অবিকল সেই জিনিস—সেকালের ছেলেরা যা বলত। শিখল এরা কোথা থেকে? কিম্বা যৌবনের মর্মকথা বুঝি এই—বীজের মতন চাপা থাকে। অবহেলার অনাবৃষ্টি অথবা শাসনের উত্তাপে বীজ তোমরা শুকিয়ে ফেল—অঙ্কুর উঠতে দাও না, ফুল ফুটতে পারে না। অসম্ভব কোন-কিছু সেকালের তারা স্বীকার করে নি, একালের এরাও করবে না—কথামাত্র হয়ে শুধু ডিক্সনারির পাতায় স্থিতি।

ডান-হাত যাক, আরও একটা হাত আছে তো আমার। হাতের কথা অকস্মাৎ অবিনাশের স্মরণে এলো। সেই এক হাতে শঙ্করকে জড়িয়ে ধরে বলেন, আমরা হারব না।

নব-বীরপাড়া আবার জন্ম নিয়েছে। কিন্তু কোথায়? খুঁজে খুঁজে শিশির তো নাজেহাল। এক-একটা অঞ্চল ধরে পাতি পাতি করে খুঁজেছে। কিন্তু চোর-পুলিশ খেলার চোরের মতো সে-বস্তু লুকিয়ে বসে আছে—কোনখানে হদিশ মেলে না। ঠিকানা কে বলে দেবে? কুসুমডাঙায় গিয়ে ঊর্মির মুখে যা-সমস্ত শুনে পালিয়ে এলো—আর বোধহয় তিলেক বিলম্ব সহ্য হবে না। মামী কনকলতা কোল বাড়িয়ে রয়েছেন, খুঁজে বের করে কুমকুমকে সেই কোলে পৌঁছে দেওয়া। কোনখানে সেই নব-বীরপাড়া?

॥ বিয়াল্লিশ ॥

ফ্যাক্টরির সঙ্গে হেড-অফিসের যোগাযোগ রাখা শিশিরের কাজ—কিন্তু ফ্যাক্টরী ইদানীং মুখ্য হয়ে উঠেছে। কাজের বিশৃঙ্খলা চলছিল ফ্যাক্টারিতে। বাইরে থেকে মোটা অর্ডার এলো, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অমুক অমুক জিনিস সাপ্লাই দিতে হবে। ফ্যাক্টরি-ম্যানেজারকে যথারীতি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে—কিন্তু গয়ংগচ্ছ ভাব ওদের, দিনের দিন হয়তো দেখা যাবে বিস্তর জিনিসের অকুলান প্রাণপণ চেষ্টা করেও হল না—কি করতে পারি? লেবারের মতিগতি খারাপ, কাজকর্ম কেউ করতে চায় না। হাজিরা ঠিকই আছে। হাজির হয়ে টুলের উপর ধ্যানী-বুদ্ধ হয়ে বসে থাকে। কোম্পানি তখন কি করে—শেষমুহূর্তে বাজার থেকে বেশি দরে মাল কিনে প্রেস্টিজ বজায় রাখে। লোকসান দিয়ে মরে।

এমনি ব্যাপার কদাপি না ঘটে, শিশিরের উপর সেই দায়িত্ব। ইতিমধ্যেই কাজ দেখিয়েছে শিশির—প্রোডাকসান বেশ-কিছু বেড়েছে। কিন্তু তারও চেয়ে বড় জিনিস, ভবিষ্যতের একটা নির্ভরযোগ্য ছক তৈরি করে দিচ্ছে ফ্যাক্টরি-কর্মীদের সঙ্গে যুক্তি-পরামর্শ করে। সেই হিসাবে অর্ডার নিলে পার্টির কাছে অপদস্থ হতে হবে না। এরই জন্য আজ ক'দিন একনাগাড়ে ফ্যাক্টরিতে কাটাতে হচ্ছে, হেড-অফিসে যাওয়া ঘটে ওঠে না।

এই নিয়ে পূর্ণিমা আজ রাগারাগি করেছে: এমন ধারা চলবে না।

বাড়ি থেকে একসঙ্গে বেরিয়ে পূর্ণিমা চলল হেড-অফিস ডালহৌসি স্কোয়ারে, শিশির চলল ট্যাংরার ফ্যাক্টরিতে। পূর্ণিমা বলে, দুজনে দু'দিকে মুখ ফিরিয়ে উল্টোপথে যাওয়া—এ আমার একটুও ভাল লাগে না। যাচ্ছ যাও, তাড়াতাড়ির সময় এখন আর কী বলি—ফিরব আজ একসঙ্গে কিন্তু আমরা।

শিশির কৈফিয়তের ভাবে বলে, ফ্যাক্টরিতে এই ক'দিন বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে। সোজাসুজি ওখান থেকে বাড়ি চলে যাই।

না—

মাথা ঝাঁকিয়ে পূর্ণিমা বলে, দেরি যতই হোক ফ্যাক্টরি থেকে তুমি হেডঅফিসে চলে আসবে। অফিস বন্ধ হয়ে যায় তো রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকব তোমার জন্য। একলা বাড়ি ফিরতে খারাপ লাগে আমার।

শিশির বলে, বরাবর একা-একাই তো ফিরতে—

মুখ টিপে হেসে পূর্ণিমা বলে. সে যখন ছিল তখন ছিল। এখন আর পারি নে, অভ্যাস খারাপ করে দিয়েছ তুমি। খারাপ যে কতদূরে, এই চার-পাঁচ দিনে হাড়ে হাড়ে বুঝছি সেটা। কী কাণ্ড! তুমি বাড়ি এলে একদিক থেকে—আমি এলাম উল্টো দিক থেকে—এ-পক্ষের ও-পক্ষের দুই জওয়ান যেন মুখোমুখি হল্ট করে দাঁড়াল। যা মন-মেজাজ তখন আমার, হাতে হাতিয়ার থাকলে বেশ এক চোট হয়ে যায়।

খিল খিল করে হেসে উঠল পূর্ণিমা। আবদারের সুরে বলে, আমি শুনব না। কাজে-কর্মে আলাদা থাকলেও—বাড়ি ফিরব আমরা একসঙ্গে। ঘোরাঘুরি করে এই ক'দিনের শোধ তুলব। মার্কেটে যাব, সময় থাকে তো সিনেমায় গিয়ে বসব, হোটেলে খাওয়াদাওয়া সেরে অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরব। রাতের রান্নাবান্না হবে না—ভানুর জন্য

ভাত-ব্যঞ্জন তুলে রেখে এসেছি। খেয়েদেয়ে সে শুয়ে থাকবে, আমরা ফিরলে তারপর সে বাসায় চলে যাবে।

এই কথা হয়ে আছে। পূর্ণিমার আদেশ। অতএব কাজকর্ম চাপা দিয়ে শিশির সকাল সকাল আজ বেরুনোর ব্যবস্থা করে নিয়েছে। কারখানার অফিসঘরে বসে ক্যান্টিনে এক কাপ চা পাঠাবার জন্য বলে দিয়েছে। চা খেয়েই রওনা হয়ে পড়বে। হেনকালে—

বজ্রাঘাত—বিনামেঘে।

সুনীলকান্তি এসে ঢুকল। খালি হাত নয়, কুমকুমকে পাঁজাকোলা করে এনেছে। এক বোঝা কাঠকুটো কিম্বা ভারী একটা পাথর যেমন করে নিয়ে আসে। গায়ে ছুঁড়ে মারল না ঠিক, সামনের টেবিলে বসিয়ে দিল। একটা বোঁচকাও আছে—কুমকুমের কাঁথা-তোয়ালে-জামা আর আধ-কৌটো বেবিফুড বোঁচকা বেঁধে এনেছে। বোঁচকা মেজের ছুঁড়ে দিয়ে একটা চেয়ারে ধপাস করে বসল ঃ বাব্বা!

তিক্ত হাসি হেসে বলে, পর্বত মোহাম্মদের কাছে গেল না তো মোহাম্মদকেই পর্বতের কাছে আসতে হল।

এসব কী বলছেন বড়দা, আমি কি যাই নে আপনাদের কাছে?

সুনীলকান্তি সঙ্গে সঙ্গে মেনে নেয় ঃ ভুল বলে ফেলেছি। গিয়েছিলে বটে আল্টিমেটাম পেয়ে। গিয়ে তারপর আবার কী মতলব হল—

শিশির সবিস্ময়ে বলে, আল্টিমেটাম কিসের?

বউ তোমায় যে চিঠি দিয়েছে, বউয়ের জবানি আমারই সেটা লেখা—

কোন চিঠি পাই নি তো এর মধ্যে।

সুনীলকান্তি উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলে, ঠিক, ঠিক। পাবার কথাও নয়—এমন চিঠি কেন পেতে যাবে! তুমি এমনি-এমনি গিয়েছিলে। গিয়ে পড়ে কী মতলব হল—দুড়দাড় করে পালালে। এত খাতিরের বড়দা-বড়দি, মুখের কথাটাও বলে এলে না।

কুমকুম এদিকে টেবিল থেকে ঝাঁপ দিয়ে এসে পড়ল শিশিরের কোলে। কুসুমডাঙায় সেদিন উর্মিলা বাহনটি ছিল—বাপের দিকে ফিরেও তাকায় নি। অবোধ শিশু হয়েও আজ বুঝেছে, নিষ্করুণ সংসারে আশ্রয় নেবার কোন ঠাঁই এবারে যদি থাকে, সে এই বাপের কোল।

সুনীলকান্তির স্বর চড়া হয়ে উঠল ঃ কী ভেবেছিলে—ঠিকানা দাও নি বলে হদিশ পাব না? কষ্ট হয়েছে, কিন্তু পেয়ে গেছি ঠিক। বাড়ি থেকে প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়ে-ছিলাম—

আমতা-আমতা করে শিশির কৈফিয়ৎ দেয় ঃ পালানোর কথা কেন বলছেন বড়দা, পালাতে যাব কেন? দাম-কাকার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল সেদিন, আমার জন্য সারা সকাল তিনি অপেক্ষা করছিলেন। একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম, হঠাৎ মনে পড়ে গেল—

কিন্তু সুনীকান্তি এমন ব্যঙ্গের হাসি হাসছে, জিনিসটা ফলাও করতে ইচ্ছে যায় না। লাভও নেই। চুপ করে গিয়ে শিশির মেয়ে আদর করতে লাগল।

সুনীলকান্তি বলে, অফিস কামাই করলাম। প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়েছি, বোঝা কাঁধ থেকে নামাবোই আজকের দিনের মধ্যে। প্রতিজ্ঞা-পূরণে কম ধকলটা গেল! জরাসন্ধ-বধে অর্জুনের প্রতিজ্ঞার মতো। হার্মান কোম্পানিতে গিয়ে উঠলাম। মানুষগুলো কথাই বলে না। শেষটা গেটের দারোয়ানকে একজোড়া সিগারেট নিবেদন করে তবে ফ্যাক্টরির খবর বেরুল। সে আবার কোন রাজ্যে বাপু? সিগারেটের পুরো বাক্সটা

দিয়ে ঠিকানাও আদায় হল। সেই ঠিকানা মুঠোয় নিয়ে সারা মুলুক চষে বেড়াচ্ছি। তোমাদের ফ্যাক্টরি আবিষ্কার আর কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার একই ধাঁচের জিনিস। রিক্সা-ভাড়া পুরো তিন টাকার একটি পয়সা কমে ছাড়ল না। এ ছাড়া কন্যের মুখ বন্ধ রাখার জন্যে লজেঞ্চুস আনা-ছয়েকের। কায়দাটা তোমারই কাছে শেখা।

খোশামুদি করে শিশির বলে, তিন টাকা ছ-আনার কি হিসাব দেখাচ্ছেন বড়দা। এদ্দিন আশ্রয় দিয়ে রাখলেন—খরচার কি লেখাজোখা আছে! সে উপকারের ঋণ টাকা-পয়সায় শোধ হয় না।

সুনীলকান্তি খিঁচিয়ে উঠল: শোধের ইচ্ছে থাকলে তো! সে যা-ই হোক, ঋণের হিসাব করে বিল করতে যাচ্ছি নে তোমার কাছে। বেকুবির দণ্ড দিয়েছি—মেয়ে ফেরত নিয়ে রেহাই দাও আমাদের। ঠিক জিনিসটা আমি আঁচ করেছিলাম, কিন্তু আমার বউ হল নিপাট হাঁদারাম। কিনা মরা-বোনের সন্তান! বাঁশবনে বিয়োল গাই, বাঁশ আমার পিশতুত ভাই—তেমনি সম্পর্ক। হিসাবপত্র করে সম্পর্ক বের করলে বউ আর গর্ভধারিণী-জননী বাদ দিয়ে সব স্ত্রীলোকই বোন হয়ে দাঁড়ায়।

মেয়ে-কোলে শিশিরের সঙ্গে এক আগন্তুকের কথা-কথান্তর হচ্ছে—জানলার বাইরে কৌতূহলী লোক দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। শিশির বলে, চলুন বড়দা, রিক্সাওয়ালা দাঁড়িয়ে আছে, ভাড়াটা আগে মিটিয়ে দিইগে।

বাইরে এসে বলে, আপনি ঠিক বলেছেন বড়দা। সেদিন পালিয়েই এসেছিলাম। কুমকুমকে দিয়ে দেবেন সেই ভয়ে। সত্যি সত্যি নিরুপায় আমি। আর একটা মাস রাখুন অন্তত, তার মধ্যে ব্যবস্থা কিছু করবই।

সুনীলকান্তি কানেই শুনছে না। রিক্সাওয়ালাকে বলে, সারাবেলা ঘুমিয়ে মেরেছ, এবারে তা নয়। সবচেয়ে কাছের ট্রামরাস্তা কি বাসরাস্তা, সেইখানে আমায় পেঁছে দেবে।

শিশির কাকুতিমিনতি করে: বড্ড বিপাকে পড়েছি বড়দা। আর একটা মাস। খরচার দায়ে একটুও যাতে না পড়তে হয়, আমি তাই করব। পয়লা তারিখ মাইনে পেয়েই দিয়ে আসব।

সুনীল দপ করে জ্বলে উঠল: কুসুমডাঙায় আমরা হোটেল খুলে বসি নি—

তবু শিশির বলে যাচ্ছে, আপনারা মুখ ফেরালে অনাথ শিশু বেঘোরে মারা পড়বে। বড়দি'র নিজের ছেলেপুলে আছে, কুমকুমের জন্য আলাদা কিছু করতে হবে না। তার উপরে আপনার বোন উর্মিলা—অমন গুণের মেয়ে দেখি নি, কুমকুমকে সে তো চোখে হারায়—

সুনীল গর্জন করে উঠল: আমার বোন মাইনের নার্স নয় যে টাকা নিয়ে পরের মেয়ে পুষতে যাবে।

আসল জ্বলুনি কোনখানে, পরক্ষণে সেটা প্রকাশ পেয়ে গেল: নতুন সংসার করেছ—তোমার আধ-বুড়ি বউ কেন মেয়েটার ভার নিতে পারবে না? না পারে, আমরা নাচার।

কথা শেষ করে দিয়ে সুনীলকান্তি রিক্সায় উঠে পড়ল। শিশিরকে শুনিয়ে শুনিয়ে রিক্সাওয়ালাকে বলছে, বোঝা নামিয়ে এলাম—বলো হে, হাল্কা লাগছে না এবারে? ছুটে চলো, সাড়ে-ছটার গাড়ি ধরব!

রিক্সা অদৃশ্য হল। পাষাণমূর্তি'র মতো শিশির পথের উপর দাঁড়িয়ে। যেন সে

বেঁচে নেই, শিরে বজ্রাঘাত হয়েছে। দুনিয়ায় কতই তো অঘটন ঘটে—হে ঈশ্বর দাও না তাই একটা ঘটিয়ে। রিক্সায় যেমন সুনীলকান্তি অন্তর্ধান করল, আর একটা তেমনি এসে পড়ুক—সে রিক্সায় মামী কনকলতা। শিশিরকে দেখতে পেয়ে মামী রিক্সা থামাবেন : রোখো, রোখো—এই বুঝি তোর মেয়ে ? নব-বীরপাড়া নতুন আবার গড়ে উঠেছে। মেয়ে আমি ছেড়ে যাব না—দে, আমার কোলে দিয়ে দে—

ঈশ্বর, জায়গাটা বলে দাও না, নব-বীরপাড়া কোথায় আবার নতুন করে গড়ে উঠল।

কুমকুমকে নিয়ে শিশির বাড়ি চলে এলো। হেডঅফিসে পূর্ণিমা তার জন্য অপেক্ষা করে আছে।

ভানুমতী ছুটে আসে : খাসা ফুটফুটে মেয়ে গো ! কোথায় পেলে দাদাবাবু, কাদের মেয়ে ?

এতখানি পথ আসতে আসতে মেয়ের পরিচয় রচনা করে ফেলেছে। বলে, আমাদের গাঁয়ের এক পড়শির মেয়ে। একেবারে এবাড়ি-ওবাড়ি। বড্ড ভাব ছিল মেয়েটার বাপের সঙ্গে। এখন ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরছে। মা-ও নেই—বড় দুর্ভাগা। কষ্ট দেখে নিয়ে এলাম। থাকুক কয়েকটা দিন—এর মধ্যে কোন একটা ব্যবস্থা করে বাপ এসে নিয়ে যাবে।

ভানুমতী বলে, বেশ করেছ। দিদিমণি ছেলেপুলে বড্ড ভালবাসে।

ভালবাসে মেয়েলোক মাত্রেই। তুইও কি কম ভালবাসিস রে ?

ভানুমতী এক কথায় মেনে নেয় : তা বাসি। তা হলেও দিদিমণির মতো নয়, ওর মতন কেউ পারে না।

হাত বাড়াতেই কুমকুম কোলে এসে পড়ল। ঐটুকু মেয়ে পুরুষ-মেয়ে বোঝে কেমন ! মেয়েলোকের দরদ কেমন যেন আলাদা করে চিনেছে। যে রকমের যেমন মেয়েই হোক, হাত বাড়ালে দ্বিধা করে না।

ভানু মুগ্ধকণ্ঠে বলে, বড্ড ভালো তো। আনকা নেই এ মেয়ের কাছে। তুলতুলে গা-হাত-পা—বিধাতা ননী দিয়ে গড়েছে গো। বাড়ি এসে দিদিমণি কি কাণ্ড করবে দেখো। বড়দিদিমণির ছেলে রঞ্জু আসে,—চিলের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ে কোলে তুলে নয়—

সবিস্তর বর্ণনা দিচ্ছে : নাচায় রঞ্জুকে কোলে তুলে, কাঁধে তুলে নিজেও নাচে, লোফালুফি করে বলের মতন। খাওয়াতে নিয়ে বসে, কাজল পরিয়ে টিপ কপালে দিয়ে সাজিয়েগুজিয়ে রাজপুত্তুর বানিয়ে দেয় ! আসুক না দিদিমণি, চোখেই সব দেখবে। বাপ কেন আর আলাদা ব্যবস্থা করতে যাবে—এইখানে রেখে দাও। দিদিমণিই ছাড়বে না দেখো।

ভানুমতীর কথায় অনেকখানি সোয়াস্তি। তা বলে আসল পরিচয় বলা যাবে না—আপাতত তো নয়ই। মা-মরা অনাথ মেয়ে—এই অবধি পূর্ণিমা জেনে রাখুক। অবস্থা বুঝে পরের ব্যবস্থা।

শিশির বলে, তুইও দেখিস রে ভানু। দেখাশুনো যত্নআত্তি করিস। মেয়েটার বাপ আমার বড় আপন। বড্ড বিপাকে পড়েছে বেচারি, মেয়ে ধরবার জন্য আলাদা টাকা দেবো আমি। দিদিমণিকে তুই এসব কিছু বলতে যাবি নে। কোলে বয়ে বাড়ি নিয়ে এলাম, পরের মেয়ে হলেও একটা দায়িত্ব এসে পড়েছে।

ভানু বলে, দিদিমণি ছাড়লে তো ! এই তার বড় দোষ—বিষম একবেঁড়ে। রঞ্জু যখন আসে, একাই সর্বক্ষণ তাকে দখল করে থাকে। অন্য কাউকে ছুঁতে দেয় না।

শিশির মেয়ে নিয়ে উপরে চলল। ভানুমতীকে ডেকে বলে, দুধ আছে রে? পেটটা একেবারে পড়ে গেছে। ক্ষিধে পেয়েছে, কাঁদছে না তবু। কান্নার অভ্যাসটা ভুলে গেল নাকি?

কাজটা পাছে তার উপরে পড়ে—ভানুমতী এড়িয়ে যায়ঃ ও-বেলার এঁটো-বাসন স্তূপই হয়ে আছে। পারিও না আমি দুধ খাওয়াতে। করি নি তো কখনো —

শিশির বলে, আমি দেখছি চেষ্টা করে। একবাটি দুধ তুই উপরের ঘরে দিয়ে যা। আর ক'খানা বিস্কুট।

(হেডঅফিসে পূর্ণিমা আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে। অফিস এতক্ষণে বন্ধ হয়ে গেল—পথের উপর নেমে এসে পূর্ণিমা এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। অধীর উৎকণ্ঠায় পায়চারি করছে পূর্ণিমা। পূর্ণিমা ফর্দ করে রেখেছে মার্কেটে ঘুরে ঘুরে আমরা কোন্ কোন্ জিনিস কিনব হয়তো বা সিনেমার টিকিটও কিনেছে। পথ চেয়ে চেয়ে হতাশ হয়ে কত রাত্রে পূর্ণিমা বাড়ি ফিরবে, কে জানে!)

হঠাৎ ঘরের মধ্যে পূর্ণিমা উঠে আসে। সঙ্গে ভানুমতী। এরই মধ্যে? তবে আর অপেক্ষা করল কোথা? অন্যদিনও এমনি সময় ফেরে—অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে এই পরিমাণ সময়ই লাগবার কথা।

কুমকুমকে দেখিয়ে ভানু কলকণ্ঠে বলে, দেখ দিদিমণি, কী সুন্দর মেয়ে! মিথ্যে বলেছি, বাড়িয়ে বলেছি?

বলার জন্য আঁকুপাঁকু করছিল ভানুমতী। বাড়িতে পা দেওয়া মাত্র বলেছে। পূর্ণিমাকে বলতে শিশির মানা করে দিয়েছিল, সেই কথাগুলোই সর্বাগ্রে।

জামাইবাবু চাঁদের মতন এক মেয়ে নিয়ে এসেছে কোথা থেকে। আমায় বলছে দেখাশুনো যত্নআত্তি করতে। তোমায় কিন্তু বলতে মানা।

পূর্ণিমা ভ্রূকুটি করে বলল, তুই কি বললি?

থতমত খেয়ে ভানুমতী আসল কথাবার্তা চেপে যায়ঃ কিছু এখনো বলি নি দিদিমণি।

স্পষ্টাস্পষ্টি 'না' বলে দিবি। বাচ্চা ধরার তুই কি জানিস? বিষম হাঙ্গামা— একটা-কিছু হলে গোলমালে পড়ে যাবি।

এই সমস্ত হয়ে গেছে সিঁড়িতে উঠতে উঠতে। কুমকুমকে দেখিয়ে মুগ্ধকণ্ঠে ভানু বলছে, ননীর পুতুল মেয়ে— তাই না?

আসনপিঁড়ি হয়ে বসে শিশির বাটি থেকে চামচেয় তুলে তুলে দুধ খাওয়াচ্ছে। আনাড়ি হাত এমনিই— পূর্ণিমাকে দেখে হাত নড়ে গিয়ে চামচের দুধ মেয়ের মুখের বাইরে গড়িয়ে পড়ল।

পূর্ণিমা আলগোছে দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে—শুচিবেয়ে গিন্নিরা ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে যেমন দাঁড়ায়--নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। ঘাড় তোলে না শিশির, তবু সুনিশ্চিত জানে মুখ টিপে টিপে হাসছে সে। পুরুষের খোয়ার দেখে কোন পতিব্রতার না নিবিড় পুলক-সঞ্চার হয়! মুখেও তাই বলল, দিব্যি তো পারো দেখছি—

অধিকতর সতর্ক হয়ে শিশির আবার দুধ তুলেছে, মেয়েই হাতের ঘা দিয়ে এবারের সবটুকু শিশিরের কাপড়ের উপর। বেশ তো—মেনেই নিচ্ছি পারি নে আমি। ক'টা পুরুষেই বা পারে! যার কর্ম তাকে সাজে। শোনা গেল, ছেলেপুলে দেখলেই নাকি ঝাঁপিয়ে পড়া হয়—এ তো দেখছি দেয়ালের গায়ের নিশ্চুপ ছবিখানি একেবারে!

প্রতিক্ষণে শিশির ভাবছে, ঝুপ করে সামনেটায় বসে পড়ে পূর্ণিমা ডাকাতি করে

মেয়ে কেড়ে নেবে : সরো, দের হয়েছে, ক্ষমতা দেখেছি খুব—। দুধ খাইয়ে পরিপাটি করে চুল আঁচড়ে কুমকুমের কপালের উপর চুলের-কাঁটার আগায় ছোট্ট একটু লাল বিন্দু এঁকে দেবে— ঊর্মিলা নিত্যিদিন যা করত। সেই জিনিসের প্রতীক্ষা করছে শিশির।

খানিকটা পরে মুখ তুলে দেখে, নেই তো পূর্ণিমা—চলে গেছে।

ভানুমতী কি কাজে এসেছে। ফিসফিসিয়ে শিশির বলে, দিদিমণি কি করছে?

রান্নায় বসেছে। আমার একলার ভাত ছিল, তোমাদের জন্য রান্না করছে।

তাই বটে! মার্কেটে ঘোরা সিনেমায় যাওয়া হোটেলে খাওয়া রকমারি প্রোগ্রাম ছিল আজ।

ভানু বলল, কোথায় নাকি নেমন্তন্ন তোমাদের—রাত্রে খাবে না, দিদিমণি বলে গিয়েছিল।

শিশির বিরস মুখে বলে, নেমন্তন্নে যাওয়া আর হল কই? পরের বাচ্চা ঘাড়ে এসে পড়ল যে!

কুমকুম সম্বন্ধে ভানুমতীকে যা বলেছে, সেটুকু পূর্ণিমা নিশ্চয় শুনেছে তার কাছে। তার উপরে একটি কথাও সে জিজ্ঞাসাবাদ করল না, একবিন্দু কৌতূহল নেই। সন্ধ্যাবেলাকার সাধের প্রোগ্রাম ভেঙে গেল তা নিয়েও একটি প্রশ্ন নয়। রান্নাঘরে অন্যদিন যেমন গিয়ে ঢোকে, আজও তাই গেছে। কাজে-কর্মে খুব চটপটে, আধঘণ্টার মধ্যে রাঁধাবাড়া শেষ। কলঘরে গিয়ে হাতে-মুখে সাবান দিয়ে উপরে চলে এলো অন্যদিনের মতোই। গল্পগুজব করে দু'জনে এমনি অবস্থায়, বইটই পড়ে। একটা রেডিও কিনব-কিনব করছে।

ভানুমতী উপরের ঘরে। খাট আর দেয়ালের মাঝে এতটুকু ফাঁক ছিল। একটা বেঞ্চি ঢুকিয়ে সেটা ভরাট করেছে। ভানু এই কাজে সাহায্য করছিল শিশিরকে।

পূর্ণিমা হাসিমুখে এসে দাঁড়াল : কি হচ্ছে?

শিশির বলে, বাচ্চাকে বেঞ্চির দিকটা দেবো—

পূর্ণিমা প্রসন্ন কণ্ঠে বলে, তা বেশ। মেয়ের পড়ে যাবার ভয় রইল না।

ভানুমতী বলে, খাটেরও জায়গা বাড়ল। দুয়ের জায়গায় তিনজন তোমাদের এইটুকু খাটে কুলতো না। জামাইবাবুর সকল দিকে খেয়াল থাকে।

ফিক করে হেসে ভানু আবার বলে, পরের মেয়ে নিয়ে চলে যাবে—তারপরেও বেঞ্চি সরিয়ো না তোমরা। দিদিমণির বাচ্চা হলে তখন আর টানাটানি করতে হবে না।

কথার বড্ড জুত একফোঁটা মেয়ের! দেখাচ্ছি তোকে, দাঁড়া—

কৃত্রিম রোষ দেখিয়ে পূর্ণিমা ভানুর দিকে চড় উঁচিয়ে যায়। হাসতে হাসতে ভানু দরজায় গিয়ে দাঁড়াল।

খানিকক্ষণ একদৃষ্টে কুমকুমের দিকে চেয়ে পূর্ণিমা শিশিরকে বলে, ঘুম পাড়িয়ে ফেলেছ— বেশ তো পারো এসব দেখছি।

ভানুমতী জুড়ে দেয় : মেয়েমানুষের ... কেটে দেয় আমাদের জামাইবাবু। সকল দিকে হুঁশ—দুধে ভিজিয়ে ভিজিয়ে আগে বিস্কুট খাইয়েছে। তারপরে দুধ খাওয়াচ্ছিল, সেই সময় তুমি এসে পড়লে। ক্ষিধে তেষ্টা দুই-ই মিটে গিয়ে বাচ্চা এবার বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছে।

ফিকফিক করে হাসে। কুসমির বোন ভানুমতী একেবারে ঘরের লোকের মতো— পূর্ণিমা দিদিমণি আর শিশির হল জামাইবাবু, ঠাট্টার সম্পর্ক। বলে, বাচ্চা হলে তোমার বড্ড মজা দিদিমণি। জামাইবাবু বাচ্চা খাওয়াবে ঘুম পাড়াবে—তুমি খাবে দাবে

আর ঘুমুবে।

পূর্ণিমা শাসিয়ে উঠল: আবার? বড্ড যে পাকা হয়েছিস তুই—

শিশিরকে বলে, মেয়ে কোলে তুলে একটুখানি তুমি নেমে দাঁড়াও। বিছানা ঝেড়ে-ঝুড়ে চাদরটা বদলে দিই। আহা, নেতিয়ে পড়েছে একেবারে। থাকুক ঘুমিয়ে—এর মধ্যে আমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে নিই গে।

ভানুমতীকে বলে, মজা তোর। বাসায় আজ সকাল সকাল যেতে পারবি, বর তোকে বেশি করে আদর করবে।

ভানুমতীও শাসিয়ে ওঠে: আবার? ভাল হবে না কিন্তু দিদিমণি—

॥ তেতাল্লিশ ॥

খাওয়া-দাওয়া চুকল। শিশির উপরে উঠে গেছে, ভানুমতীও বাসায় চলে গেল। সদর-দরজায় খিল এঁটে রান্নাঘর তালাবন্ধ করে ধীরেসুস্থে পূর্ণিমাও উপরে চলে এলো।

কুমকুমকে দেয়ালের একেবারে ধার ঘেঁষে সরিয়ে দিয়েছে। মেয়ে থাকা সত্ত্বেও স্বামী-স্ত্রী দু'জনের বেশ প্রশস্ত জায়গা। পূর্ণিমা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। বলল, ঘাড় বেঁকে পড়েছে, ঘাড়টা ঠিক করে দাও। সেই থেকে ঘুমুচ্ছে, নড়াচড়া নেই, ভারি শান্ত মেয়ে—

শান্ত না আরো-কিছু!

এইটুকু বলে ফেলেই শিশির থতমত খেয়ে বাকি কথা গিলে নেয়। জেরা উঠতে পারে: সবে তো নিয়ে এসেছ—শান্ত কি কাঁদুনে জানলে কেমন করে হে?

দরজার একপাশে ছোট ড্রেসিং-টেবল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল খুলতে খুলতে পূর্ণিমা বলে, পেলে কোথায় মেয়ে?

জবাবটা মনে মনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিস্তর রিহার্শাল দেওয়া আছে। অবাধে শিশির বলে যায়, ফ্যাক্টরি থেকে খানিকটা এসে বাঁ-দিকের শিবমন্দির লক্ষ্য করেছ নিশ্চয়। ঐখানে দেখা মেয়ের বাপের সঙ্গে—মন্দিরের চাতালের উপর মেয়ে নিয়ে বিশ্রাম করছিল।

পূর্ণিমা প্রশ্ন করে: খুব চেনা বুঝি?

গাঁয়ের পড়শি, আমাদের জ্ঞাতগুষ্ঠির মধ্যেই পড়ে। মেয়েটা কী কপাল নিয়ে এসেছে—জন্মের পরেই মা মারা গেল। আমার মায়ের কাছে এনে দিল—মায়ায় পড়ে তিনি ফেলতে পারলেন না। মাস কতক পরে তিনিও গেলেন। বাপ তারপরে হিন্দুস্থানে এসে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে, মেয়েটা দূর-সম্পর্কের এক আত্মীয়বাড়ি রেখেছিল, তারাও তাড়িয়ে দিয়েছে। আমায় দেখে বাপ সেই পথের উপরেই কেঁদে পড়ল।

পূর্ণিমা বলে, কদ্দিন থাকবে মেয়ে?

ছেলেপুলের নামে পাগল হয়ে ওঠে, ভানু বলল। কণ্ঠস্বরে করুণ ভাব এনে এত যে ইনিয়ে বিনিয়ে শিশির বলছে—কই, পাগলের লক্ষণ কিছুই তো দেখা যায় না। পাবলিক প্রসিকিউটারের মতন ঠাণ্ডা মাথায় দিব্যি জেরা করে চলেছে।

কদ্দিনের জন্য নিয়ে এলে—চিরকাল?

শিশির তাড়াতাড়ি বলে, তা কেন! মাসখানেকের কথা আমি বলে এসেছি, তার বেশি পারব না। হাঙ্গামা তো কম নয়, কে করে?

গলার হার খুলে পূর্ণিমা ড্রেসিং-টেবলের ড্রয়ারে রেখে দিল। শোয়ার আগে নিত্যিদিন যা করে। বলে, থাকেন কোথা ভদ্রলোক—ঠিকানা জেনে নিয়েছ?

বিরক্তি চেপে নিয়ে শিশির বলে, তবে আর বলছি কি! আজ এখানে, কাল সেখানে —পাকা-ঠিকানা আছে নাকি কিছু? ভয় নেই, নিয়ে যাবে মেয়ে একমাসের পর। তেমন লোক নয় সে।

ড্রেসিং-টেবেলটা একেবারে কোণের দিকে ঠেলে দিচ্ছে পূর্ণিমা। জিজ্ঞাসা করে নাম কি ভদ্রলোকের?

ঢোক গিলে শিশির বলে, 'পল্টু' 'পল্টু' করে ডাকতাম, ভাল নামটা যে কী—। কিন্তু রাতদুপুরে ড্রেসিং-টেবল টানাটানি কেন? কী ব্যাপার?

হঠাৎ খাড়া হয়ে এতক্ষণের পর স্পষ্ট শিশিরের চোখের দিকে তাকিয়ে পূর্ণিমা বলল, পল্টুবাবুর ভাল-নাম আমি কিন্তু বলতে পারি। শিশিরকুমার ধর।

হতভম্ব হয়ে গেছে শিশির। পূর্ণিমা জামার ভিতর থেকে চিঠি বের করে এগিয়ে ধরল।

তড়াক করে বিছানায় উঠে বসে চিঠিখানা একরকম ছিনিয়ে নেয়। হাতের লেখাতেই বুঝেছে মমতার সেই চিঠি—যা নিয়ে সুনীলকান্তি একগাদা কথা শুনিয়ে গেল। চিঠি মুঠোর মধ্যে শক্ত করে এঁটে ধরেছে। যেন ঝাঁপির মধ্যে কেউটেসাপ—আলগা পেলে ফণা ধরে বেরুবে।

বিপদে বেশি করে মেজাজ দেখাতে হয়, মনের আতঙ্ক প্রকাশ হয়ে পড়লে সর্বনাশ। রুক্ষ কণ্ঠে শিশির বলে, আমার নামের চিঠি খুলল কে?

আমি। আমি ছাড়া আবার কে?

ধমকে নরম হবার পাত্রী নয়। শিক্ষিত ও উপায়ক্ষম রমণী বিয়ে করার হাঙ্গামা এই। তার উপরে সিভিল ম্যারেজ—এই আছে তো এই নেই। পদ্মপত্রে জল। রাত্রে আমরা স্বামী-স্ত্রী—প্রেমে গদগদ অবস্থা। সকালবেলা ডিভোর্স। দুপুর নাগাদ কেউ কাউকে চিনতে পারছি নে। সন্ধ্যাবেলা হয়ত এক বন্ধু এসে বলল সাক্ষী হতে হবে তার বিয়ের। পাত্রীর নাম বলল—কাল রাত্রে বউ ছিলেন যিনি আমার। তাঁহারে নোটিশের তারিখ একমাস পিছিয়ে দেওয়া আছে। কিছু অবশ্য বাড়িয়ে গুছিয়ে বলা হল, কিন্তু জিনিসটা মোটামুটি এই। তাড়বাড়ি কাজকর্ম, পলক ফেলতে সবুর সয় না। অতএব প্রচলিত দাম্পত্য নিয়ম খাটানো চলবে না পূর্ণিমার ক্ষেত্রে—পুরবীর বেলা যা চলেছে, এখানে সে জিনিস অচল।

পূর্ণিমা বলে যাচ্ছে, অফিসে তুমি নেই—কবে আসতে পারবে কেউ জানে না। চিঠি ক'দিন এসে পড়ে রয়েছে, বেয়ারারা আমার কাছে এনে দিল। সে চিঠি হাতে নিয়ে আমিই বা স্থির থাকি কেমন করে? কত জায়গায় দরখাস্ত করেছিলে—হয়তো বা ভাল কোন চাকরির খবর। হয়তো বা মামামশায়ের কলোনির ঠিকানা। প্রেমময়ী প্রেয়সী পত্নী তোমার, সকলের সঙ্গে সব সম্পর্ক ঘুচিয়ে তোমার বুকে এসে আশ্রয় নিয়েছি, তোমার আমার মধ্যে দেয়ালঘেরা কোনকিছু থাকতে পারে না—চিঠি খোলার অধিকার তো আমারই।

চপল কণ্ঠে থিয়েটারি ঢঙে বলে। হাসি চোখে-মুখে উপচে পড়ছে। বলতে বলতে কি হয়ে যায়—মুখের উপরের মুখোশ যেন একটানে ছিঁড়ে ফেলে দিল। লহমার মধ্যে ভিন্ন এক পূর্ণিমা—কলকণ্ঠ প্রগলভ রমণী নয়, সিংহিনী। চোখে হাসি নেই আগুন। গর্জে উঠল: চিঠি না পড়েও বলতে পারতাম এ মেয়ে তোমার। মেয়ের মুখের উপরে

স্পষ্ট করে বাপের পরিচয় লেখা। নাক-মুখ-চোখ হুবহু তোমার। ভানুমতী হাঁদা-বোকা একফোঁটা মেয়ে, তাই সে বুঝতে পারে নি। আমার কপাল ভাল, পারে নি বুঝতে। চিঠি হল মেয়ে নিয়ে আসার নোটিশ। তারিখ মতো যাও. নি তাই ছুঁড়ে দিয়ে গেল। ফি রবিবারে কোন কলোনিতে তুমি যেতে, সে খবরও চিঠিতে পরিষ্কার রকম পাওয়া গেল।

টক-টক টক-টক করে দেয়ালঘড়ির কাঁটা এগুচ্ছে। ফুসছে পূর্ণিমা। মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে বলে, ভণ্ড বিশ্বাসঘাতক! তোমার আগের বউয়ের কথা একবর্ণ বলো নি আমায়। গোপন করে এসেছ। এত বড় প্রতারণা কেন আমার সঙ্গে—কোন্ ক্ষতিটা আমি করেছিলাম?

শিশির কৈফিয়তের সুরে বলে, ছিল বউ—মারা গেছে। থাকলে তবু কথা ছিল। পিছনের ক'টা কথাই বা বলতে পেরেছি এ তাবৎ? অনেক কিছুই তো ছিল পাকিস্তানে—দালান-কোটা বাগবাগিচা ছিল, সমস্ত গেছে। কিছুই তুমি শুনতে চাও নি। বিয়ে-থাওয়ার ব্যাপারে, এমন কি, জাতধর্মের কথাটা অবধি কান পেতে নিলে না।

তাই বটে! ভূসম্পত্তি দালান-কোঠা আর স্ত্রী একই জিনিস তোমার কাছে। নেই যখন, আলাদা করে কী আর বলবার আছে! কিন্তু গেছে কোথায় একেবারে—বউ না থাক, মেয়ে রয়েছে। আমার সতীনকাঁটা।

ঘুমন্ত মেয়ের উপর দু-চক্ষের অগ্নিবর্ষণ করে পূর্ণিমা গায়ে দেবার কম্বলটা টেনে নিল বিছানা থেকে। ড্রেসিং-টেবল সরিয়ে যে জায়গাটুকু বেরিয়েছে, সেখানে কম্বল বিছিয়ে নিচ্ছে।

শিশির বলে, কি হচ্ছে?

চোখ মেলা আছে, দেখতেই তো পাচ্ছ।

নিজের বালিশটা নিয়ে পূর্ণিমা সেই কম্বলের উপর রাখল।

শিশির বলে, ঐখানে শোওয়া হবে নাকি?

ঘৃণায় মুখ বাঁকিয়ে পূর্ণিমা বলে, এদ্দিন কিছু জানতাম না, সে একরকম। তোমায় আর আমি ছুঁতে পারব না। অন্যের ব্যবহারের জিনিসে আমার ঘেন্না। অন্যের পরা কাপড়জামা কখনো আমি পরি নে। খাট ড্রেসিং-টেবল—ঐ বেঞ্চিটা অবধি ছুতোর ডেকে নতুন বানানো। পুরানো একটা কোন ফার্নিচার বাড়ি ঢুকতে দিই নে আমি।

রাগে শিশিরের ব্রহ্মতালু অবধি চড়চড় করে ফেটে যাবার দাখিল। দোষ হয়েছে মানি। তা বলে মুখের উপর এমনি করে বলবে স্ত্রীলোক—বিবাহিতা স্ত্রী। সাত-পাকের বিয়ে হলে কিম্বা আমাদের গাঁ-গ্রাম হলে পারত না কখনো। কিন্তু পাশের এই ঘুমন্ত আপদ যতক্ষণ রয়েছে, অপমান হজম করে নিতে হবে।

কোন রকমে সংযম রক্ষা করের শিশির বলে, তোমারও অতীত জানি নে। জানতে চাইও না। তবু যদি দৈবাৎ বেরিয়ে পড়ে স্বামী মরে গিয়ে বিধবা হয়েছিলে, একটি কথাও আমি বলতে যাব না।

বিধবা হলে আবার বিয়ের রঙ্গে কখনো আসতাম না। একবার একজনের সঙ্গে ঘর করে এসে সেই ব্যবহার মুখস্থ জিনিসের মতো অন্যের সঙ্গে করব, তেমন ইতর রুচি নয় আমার।

দম আটকে আসছিল বুঝি। মুহূর্তকাল সামলে গিয়ে আবার বলল, ছাড়াছাড়ি তোমার সঙ্গে পাকা। এক শয্যায় আর শোব না—এ জীবনে নয়।

শিশির বলে, পাশাপাশি দুটো বালিশ কেন রেখেছ তবে? বিছানা ঝেড়েঝুড়ে তুমিই

নিজ হাতে করলে। তখন যাত্রা মেয়ে এসে গেছে, চিঠিও বুকে নিয়ে ঘুরছ।

ঐ ভানুটাকে ধাপ্পা দেবার জন্য। বালিশ যেমন থাকে, আজও তেমনি রাখলাম। ভোরবেলা এসে যখন কড়া নাড়বে, মেজের *কম্বল-বালিশ খাটে তুলে রেখে তবে দোর* খুলে দেবো। দেখবে রোজকার নিয়মে সব চলছে—এতটুকু হেরফের নেই। দিনমানে কেউ যদি আসে—আনার দিদি তো আসবেই—সবাই এসে দেখতে পাবে, দিব্যি আছে এই নতুন জুটি—পরম সুখে আছে।

বলতে বলতে—মাথায় ছিট আছে নাকি পূর্ণিমার ?—দু-হাতে রগ চেপে ধরে উঃ—উঃ করে আর্তনাদ ছাড়েঃ কী ভুল করেছি! এতটা বয়স কেটেছে তো বাকি জীবনও একলা কেটে যেত। মরণদশা ধরল যে আমার! দিদির অতবড় হেনস্থা চোখের উপর দেখেও পুরুষমানুষ চিনলাম না। টের পেলে সেই দিদিই যেচে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে চোখে জল এনে মজা দেখবে। অফিসের নটবরবাবু বলবে, কি বলেছিলাম? হিতকথা কানে নিলে না তখন—। কাউকে টের পেতে দেবো না আমি, লোক-হাসাহাসি হতে দেবো না। একদিন ঠিক আমায় আত্মঘাতী হতে হবে, তার আগে পর্যন্ত ঘুণাক্ষরে কেউ জানবে না।

আবার চুপচাপ। দেয়ালঘড়িতে পেণ্ডুলামের আওয়াজ শুধু। কঠিন মেয়ে পূর্ণিমার দু-চোখে হঠাৎ হু-হু করে জল গড়িয়ে পড়ে। দু-হাতে মুখ ঢেকে ঝপ করে সে মেঝের কম্বলে উপুড় হয়ে পড়ল।

বিছানায় বসে শিশির নিঃশব্দে দেখছিল। শান্ত কণ্ঠে বলল, মেজেয় না পড়ে তাহলে নিচে গিয়ে ভাল হয়ে শোওগে—বারান্ডার ঘরে কি বাইরের ঘরে। তাই বা কেন?

খাট থেকে সে নেমে পড়ল। বলে, তোমাদের বাড়িঘর, তুমি কেন যেতে যাবে, মেয়ে নিয়ে আমি নিচে চলে যাচ্ছি। খাটের উপর তুমি ভাল হয়ে শোও।

খবরদার!

উঠে পড়ে পূর্ণিমা দরজা চেপে ধরলঃ যেমন আছ, তেমনি থাক। ভোরবেলা ভানুমতী এলে দোর খুলে দিতে হবে—উপর-নিচের হুড়োহুড়িতে বুঝে নেবে সমস্ত। যত বোকাই হোক, বুঝতে তখন বাকি থাকবে না। মড়ার উপরে আর খাড়ার ঘা দিও না—এইটুকু দয়া কর আমায়!

চোখ বুঁজে পূর্ণিমা নিঃসাড় হয়ে আছে। শিশিরের হাতের মুঠোয় মমতার চিঠি। এতক্ষণে চিঠি পড়ল। না পড়লেও ক্ষতি ছিল না—যা ভেবেছিল, ঠিক ঠিক তাই। ভাষাটাও বোধহয় পড়ার আগে হুবহু বলে দেওয়া যেত। বিয়ের বৃত্তান্ত কুসুমডাঙা অবধি চলে গেছে। বলল কে—ভবতোষই হতে পারে। প্রকাশ একদিন না একদিন হতই—কিন্তু এত তাড়াতাড়ি হয়েই গোলমাল।

এই রবিবারে এসে অতি-অবশ্য তোমার মেয়ে নিয়ে যাবে, অজুহাত চলবে না। ঠাকুরঝির নিজের সংসারে নিজের ছেলেমেয়ে হবে—পরের মেয়ে সারাজীবন টানতে পারে না। কেন যাবে সে টানতে? তেমন ইচ্ছে তোমার থাকলে কাউকে না জানিয়ে আচমকা বিয়ে করে বসতে না। তা বেশ করেছ—বিপদে পড়েছিলে, যথাসম্ভব সাহায্য করেছি। এবারে নিজের সংসারে মেয়ে নিয়ে যাও, আমরা আর কিছু জানি নে—

পুনশ্চ করে আবার লিখেছেঃ রবিবারে না এসে যদি ডুব দিয়ে থাক, তোমার বড়দা-ই চলে যাবে মেয়ে নিয়ে। সেটা হয়তো দৃষ্টিকটু দেখাবে। কিন্তু তোমার যখন এতটুকু চক্ষুলজ্জা নেই, আমাদেরই বা কী এমন।

পোস্টাফিসের শিলমোহরে দেখল, চিঠি শুক্রবারের দিনই পৌঁছে গেছে রবিবারের

পুরো দেড়টা দিন আগে। হেডঅফিসে যায় নি সে, ফ্যাক্টরিতে যাতায়াত—সেইজন্য হাতে পড়ে নি। চিঠি যদি পেত, সুনীলের বাড়ি থেকে তবে অমন করে পালিয়ে আসত না—দেখাসাক্ষাৎ করে যা-হোক কিছু ফয়শালা করত। কেলেঙ্কারি এদ্দুর গড়াতে দিত না।

॥ চুয়াল্লিশ ॥

সারারাত শিশির ঘুমোতে পারে নি। ভণ্ড···বিশ্বাসঘাতক···ছাড়াছাড়ি পাকা··· এক-শয্যায় এ জীবনে আর নয়···পূর্ণিমার কথাগুলো মুখ থেকে বেরিয়ে সেই একবারেই শেষ হয়ে যায় নি—বুলেট হয়ে অন্ধকারের মধ্যে মুহুর্মুহু এসে বিঁধছে। না, কোন দোষঘাট করি নি। বিয়ে করেছি আমি দু'বার নয়, শুধু একবারই—পুরবীকে। পুরুতের মুখের মন্ত্র পড়ে, শালগ্রাম-শিলা সাক্ষি রেখে, বরযাত্রী-কন্যাযাত্রী আত্মীয়কুটুম্ব সকলকে নিয়ে উৎসব-আনন্দের মধ্যে। আর এই যা বিয়ে—খত-তমশুক পাট্টা-কবলুতি জাতীয় জিনিসটাকে বিয়েই যদি বলতে চাও—আমি কস্মিনকালে করি নি, তুমিই আমায় বিয়ে করলে। কিম্বা বলি, গ্রাস করলে—ময়ালসাপ যেমন চোখের টানে হরিণ আকর্ষণ করে গিলে খায়। হাবাগবা গেঁয়ো মানুষটা মুখগহ্বরে ঢুকে গেলাম—পুরবীর ইতিহাস এবং কুমকুমের কাহিনী খেনোহাটায় ওস্ত নামানেরে মতোই নিতান্ত অবান্তর সেই অবস্থার মধ্যে। বিশ্বাসই করতে না। খৃস্টান-মানুষ বলে নটবরকে ধাপ্পা দিয়েছি, বউ-মেয়ের কথা বলে তেমনি তোমাকেও এড়াতে চাইছি—ক্ষেপে যেতে তুমি একেবারে। এই আজ যেমনটা করলে, ঠিক তেমনি।

মনে মনে এমনি সব কৈফিয়ৎ গেঁথে তুলছে! এবং আরও উৎপাত, উঠে উঠে কুমকুমের কাঁথা বদলাতে হচ্ছে। ঘুমোয় আর কখন তবে ?

পূর্ণিমাও ঘুমোয় নি। মেজেয় পড়ে পা গুটিয়ে এমনভাবে ঘুম হয় না। তার উপরে সর্বাঙ্গ জ্বালা করছে অপমানের যন্ত্রণায়। দিদি অণিমা তবু কিছুকাল বরের ভালবাসায় ছিল, আবার কাচের স্বর্গ ক'টা দিনেই চুরমার। দিনই বা হল কিসে—একটিমাত্র লহমাও নয়। পিছনের কথা গোপন রেখে আমায় নাচিয়েছিল খাটের উপরের ঐ চক্রী মানুষটি।

জেগে থেকে এই পরম লাভ, মানুষটার হেনস্থা চোখ মেলে দেখা যাচ্ছে। ধন্ম দেখছে পূর্ণিমা, হিংস্র আনন্দে ভরা মন। কদ্দিন পারে, দেখা যাক, দরদের কন্যা এমনিভাবে লালন করতে!

রাত্রি শেষ। আকাশে শুকতারা—জানলা দিয়ে দেখা যায়। দেয়ালের হুকে রান্না-ঘরের চাবি, চাবি নিয়ে শিশির নিচে চলল। ফুড তৈরির জন্য জল গরম করে আনবে। মেয়ে নয় তো জেগে উঠে ধুন্ধুমার লাগাবে এখনই। ছাড়াছাড়ি পাকা—সাফ জবাব মিলে গেছে। গাঁটরি তোল শিশিরকুমার, আবার কি! এ আশ্রয়ের ইতি। মামা অবিনাশের ভরসা আর নয়; চতুর্দিকে দশ-পনেরো মাইল হুড-হুড করে দেখেছে। কাছাকাছি অন্য কোন্ আত্মীয় থাকতে পারে, আকাশ-পাতাল ভেবেছে কাল নিদ্রাহীন রাত্রে। দু-একটা মনে না পড়েছে এমন নয়—বিশেষ করে বিধবা জেঠতুত দিদি একজন। ছেলেরা চাকরিবাকরি নিয়ে আগে থেকেই কলকাতায় ছিল—দিদিও নাকি শেষটা ঘর-বাড়ির মায়া কাটিয়ে এসে পড়েছেন। কিন্তু বিপদ হল, ঠিকানা জানে না। ঠিকানার

এমন জরুরী প্রয়োজন ঘটবে, কে ভেবেছে !

শিশির নিচে গেল তো পূর্ণিমাও উঠে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। ঢালা বিছানার বড় চাদরটায় পূর্ণিমার শোওয়ার অংশটুকু পরিপাটি রয়ে গেছে—রগড়ে রগড়ে ভাঁজ ভেঙে দিল, একটা মানাষ সারারাত্রি শুয়ে থাকলে যেমনটা হয়। মেজে থেকে বালিশ-কম্বলও যথাস্থানে তুলে দিয়েছে। ভানুমতী সাধাসিধে মেয়ে, সে এত সমস্ত ঠাহর করবে না। তা বলে খুঁত থাকবে কেন কাজের মধ্যে—আচমকা অন্য কেউ আসতেও তো পারে ! ছাড়াছাড়ি পাকা, তাতে কোন সন্দেহ নেই—তবু কিন্তু ছেড়ে যাওয়া চলবে না। লাঞ্ছনার বাকি রাখো নি, কিন্তু বাইরের লোকের কাছে ইজ্জতহানি আরো সাংঘাতিক। পূর্ণিমা নোটিশ দিয়ে রেখেছে, বর দেখতে আসছে তিনটে দিন পরে। সে এসে অবাক হয়ে ছলছল-চোখে তাকাবে : উড়েছে ? পুরুষমানুষ ওই। আমি তবু পাঁচটা সাতটা বছর আটকে রেখেছিলাম। হায় হতভাগী, পাঁচটা সাতটা দিনেই তোর শেষ। নটবরও বাহাদুরি নেবেন : কী বলেছিলাম দিদিমণি, অজানাকে কুলমান সঁপে দিও না—হল তো ! তাপস শুনতে পেয়ে তড়পাবে, কাশী থেকে বাপ-মা হা-হুতাশ করে চিঠি দেবেন, বিজয়া দেবী হয়তো দরদ জানাতে চলেই আসবেন এই বাড়ি অবধি। অফিস-সুদ্ধ হাসাহাসি। হায় হায়, দুনিয়া জুড়ে সকলকে আমি শত্রু বানিয়ে রেখেছি। কিংবা একলা নই আমি—সব মানুষেরই বোধহয় এই অবস্থা। বিপাকে পড়লে তবে টের পাওয়া যায়। ছাড়াছাড়ি আমাদের ঠিকই, তা বলে ছেড়ে যেতে দিচ্ছিনে—

গরম জল নিয়ে শিশির ঢুকল। দুই হাত কোমরে দিয়ে পূর্ণিমা দোরের কাছে বীরভঙ্গিমায় দাঁড়িয়েছে। তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে, মুখ গোমড়া করে আছ কেন ?

শিশির জবাব দিল না। কৌটো থেকে গুঁড়ো নিয়ে ফুড তৈরি করতে ব্যস্ত।

নিঃশব্দে পূর্ণিমা দেখল মুহূর্তকাল। বলে, দিনমান হল, ভানুমতী আসবে এইবার। যতক্ষণ একলা আছি, যেমন খুশি থাকতে পারো—আপত্তি নেই। কিন্তু এসে পড়লে—

শিশির মাঝখান থেকে বলে, কি করতে হবে তখন—নাচতে হবে ?

পূর্ণিমা সহজ সুরে বলে, তা নয়—নাচলে বাড়াবাড়ি হবে, লোকের সন্দেহ আসবে। যেটা স্বাভাবিক তাই কোরো, শুধু হাসলেই হবে। ভালবাসায় গদগদ নতুন বর-বউ যেমনধারা হাসে।

খটাখট খটাখট—দোরের কড়া নাড়ে নিচে। ভানুমতী এসে গেছে। ধমক দিয়ে পূর্ণিমা বলে, হাসতে যদি না পার, শুয়ে পড়ো বিছানায়। এক্ষুনি, এক্ষুনি। কাঁদো, কোঁকাও—যা ইচ্ছে করো শুয়ে শুয়ে। বলব ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে মাথার যন্ত্রণা।

শিশির জো পেয়ে বলে, তুমি নিজেই যেন কত হাসছ !

পূর্ণিমা জ্বলে উঠল : খোঁটা দিচ্ছ আমায় ! হাসতামই তো—যত দুঃখ-ব্যথা হেসে হেসে সব উড়িয়ে দিতাম ! হাসবার জো রাখলে তুমি ? বাবা-মা, ভাই-বোন, এমন কি চাকরিদাতা মনিব অবধি, আঘাত দিতে কেউ ছাড়ে নি। কিন্তু সবচেয়ে নিষ্ঠুর আঘাত তোমার।

সুর বদলে পরক্ষণেই দৃঢ়কণ্ঠে বলে, তা হলেও হাসতে হবে। বুক ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, তবু মুখে হাসি। বড় শক্ত, বড় শক্ত—সকলের চোখে ধুলো দিতে সেই শক্ত কাজটাই করতে হবে আমায়। কত নিখুঁত ভাবে করি দেখ।

যা বলল, লহমার মধ্যে ঠিক ঠিক তাই। অবাক কাণ্ড, আশ্চর্য ক্ষমতা পূর্ণিমার। চোখে হাসি, মুখে হাসি—

বাইরের দরজা থেকে ভানুমতী হাঁক পেড়ে উঠল : ও দিদিমণি, ঘুমুচ্ছ এখনো তোমরা ?

যাচ্ছি রে ভানু, দাঁড়া—

হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠল কথা ক'টির মধ্যেও। সিঁড়ি দিয়ে নামছে—তা যেন ছলকে ছলকে পড়ে হাসি। নতুন বর-বউ শিশির-পূরবীও ছিল একসময়—কিন্তু তারা এমনিধারা করেছিল, মনে তো পড়ে না। ডোজ বোটহয় বেশিই হয়ে যাচ্ছে, বেশি রকম মিঠে। কমের দিকে কখনই নয়। কে বলবে, কাল রাত্রে মহাঝড় বয়ে গেছে এদের দাম্পত্যজীবনে—রাতের বিধ্বস্ত চেহারা পাঁচটা মিনিট আগেও মুখের উপর সুস্পষ্ট ছিল। জাত-অভিনেত্রী এই পূর্ণিমা—একলা পূর্ণিমা কেন, মেয়ে জাত ধরেই। অনভিজ্ঞ গ্রামবধূ পূরবীই বা কোন্ অংশে কম ছিল? মনের যা আসল মতলব তার উল্টোটাই বরাবর বুঝিয়ে এসেছে শাশুড়িকে।

শেখানো কথাগুলো ভানুমতী শিশিরকে বলল, ছেলেপুলে ধরি নি তো কখনো—ভয় করে। ভালও লাগে না। ও কাজ আমায় দিয়ে হবে না জামাইবাবু। তুমি অন্য লোক দেখ।

শিশির বলে, তাহলে বিশ্বাসী লোক একজন খুঁজে-পেতে দে। ভাল মাইনে দেবো।

আমার জানার মধ্যে কেউ নেই। দিদিমণিকে বলো। কাল কথাটা বললে, সেই থেকে ভাবছি। তেমন কাউকে মনে পড়ছে না।

একফোঁটা ভানুমতী—সে-ও উপদেশ ঝাড়ছে : গরজই বা কী এত! যাদের মেয়ে তাদের ফেরত দিয়ে এসো গে। বেটাছেলে এসব পারে কখনো!

কথা শেষ করে দিয়ে ভানুমতী রান্নাঘরে পূর্ণিমার কাছে রিপোর্ট করতে ছুটল : অক্ষরে অক্ষরে বলে দিয়েছে দিদিমণি। ঘটা করে ফুড খাওয়ানো হচ্ছে এখন। কাল রাত্তিরে যেমনধারা হয়েছিল—একফোঁটাও মুখের ভিতরে যায় না, কষ বেয়ে গড়িয়ে জামাইবাবুর কাপড়ে মাখামাখি। নিজে পয়লা নম্বরের আনাড়ি, তা যত দোষ মেয়েরই যেন। গজরাচ্ছে তার উপরে, গালিগালাজ করছে। মেয়েটা দেখছি না খেয়ে গলা শুকিয়ে দু'দিনেই মারা পড়বে।

পূর্ণিমা নিস্পৃহ কণ্ঠে বলে, আমায় জিজ্ঞাসা করে তো আনে নি! মরলে কী করতে পারি?

তুমি আবার পারো না! রঞ্জুকে নাওয়ানো-খাওয়ানো চুল আঁচড়ে কাজল পরিয়ে সাজিয়ে-গুজিয়ে ফুলবাবুটি বানানো—দেখি নি বুঝি! তার নিজের মা সাতজন্ম তপস্যা করেও অমন পারবে না। ছেলেপুলে ধরতে তুমি ওস্তাদ।

পূর্ণিমা ফোঁস করে ওঠে : আছি ওস্তাদ, মেনে নিলাম। তাই বলে নর্দমা থেকে না ডাস্টবিন থেকে অজানা অচেনা বাচ্চা কুড়িয়ে আনবে, তার উপরেও বুঝি ওস্তাদি খাটাতে যাব! বয়ে গেছে আমার।

বাচ্চার কি জাত থাকে দিদিমণি?

ভানুমতীর কষ্ট লেগেছে শিশিরের দুর্গতিতে। বাচ্চার উপরে মায়াও পড়েছে। মুখে তাই পাকা পাকা কথা। বলে, কুড়িয়ে আনাই বা কিসে হল? মা মরে গিয়ে কষ্ট পাচ্ছিল, দেখেশুনে জামাইবাবুর দয়া হয়েছে—দয়া করা কি দোষ? চিরকাল নয়, ক'টা দিনের জন্যে শুধু। একটা কোন ব্যবস্থা করতে পারলেই বাপ এসে নিয়ে যাবে।

বাজে কথা, মিথ্যে কথা—তুইও যেমন। দরদ দেখিয়ে যত্নআত্তি করলেই গেছিস।

ব্যবস্থা হয়ে গেছে বড়কলে এখানেই পাকাপাকি রেখে দেবে। নিয়ে যাওয়ার নামও করবে না।

ভানুমতী তর্ক করে: রাখলই বা! তার জন্যে ভাবনার কি আছে? নিজের বাচ্চা হলে কি করতে শুনি?

ভানুর চোখে পূর্ণিমা ছোট হয়ে যাচ্ছে—দয়াবান জামাইবাবু, কঞ্জুস নিষ্ঠুর দিদিমণিটা। অতএব পূর্ণিমা সবিস্তারে বোঝাতে লেগে যায়: শুধু বাচ্চাটা দিয়ে ধরছিস কেন? এই একবারেই শোধ নয়। ভালরকম খোঁজখবর নিয়ে তবে আমি বলছি। তোর জামাইবাবুটি নিপাট ভালোমানুষ—নরম মন, চক্ষুলজ্জা বড় বেশি। ধরে পড়লে 'না' করতে পারে না। চোর-জোচ্চোর চারদিকে—'মা' নেই বলে কে-একজন ঘাড়ে গছিয়ে দিয়েছে। চেনেও না লোকটাকে ভাল করে। বাচ্চার ভালমন্দ কিছু হলে সেই লোকই আবার গণ্ডগোল পাকাবে, চোখের জলে তখন পথ পাওয়া যাবে না। এমন ঝামেলায় দরকারটা কী আমাদের! মুখে বললে ও সেটা কানে নেবে না—কড়া হয়েছি সেই জন্যে। তুইও কড়া হবি। বাচ্চার কোন কাজ করবি নে, দুধটুকুও এগিয়ে দিবি নে। নাকের-জলে চোখের-জলে হয়ে তবে যদি তাড়াতাড়ি বিদেয় করে দেয়।

ঠিক এতখানি ভানুমতীর প্রত্যয়ে আসে না। তা হলেও পূর্ণিমাকে বরাবর দেখে আসছে—ছেলেপুলের নামে সে পাগল। সেই মানুষ বাচ্চা সরিয়ে দেবার জন্য আঁকু-পাঁকু করছে, দেবকন্যার মতো রূপ বাচ্চাটার—কোন একটা কারসাজি আছে নিশ্চয় ভিতরে। বিশ্বাস তেমন করুক না করুক, ভানুও ঘাড় নেড়ে দিল—দরদ দেখাতে কদাপি সে যাবে না, বাড়ি থেকে তাড়াতাড়ি মেয়ে বিদেয় হয়ে যাক।

খেয়েদেয়ে পূর্ণিমা অফিসে রওনা হয়ে গেল। শিশির আর সে একত্র হয়ে যায়—এই কিছুদিন থেকে ভিন্ন পথ দু'জনার, শিশির যাবে ফ্যাক্টরিতে, পূর্ণিমা হেড অফিসে—বাড়ি থেকে তবু গুঞ্জন করতে করতে গায়ে গায়ে বেরোয়। আজকেই পূর্ণিমা একলা। বিয়ের আগে সেই যেমন একা একা যেত। স্নান সেরে পূর্ণিমা উপরে গিয়েছিল। ড্রেসিং-টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে যথারীতি তৈরি হয়েছে। শিশির তখন ছাতের উপরে। মেয়েরও স্নান হবে—ছাতের উপর মাদুর পেতে চিতপাত করে শুইয়ে তাকে তেল মাখানো হচ্ছে। চোখ তোলে একবার সে স্ত্রীর দিকে। পূর্ণিমারও বা কী এমন—ঘরে বসে করুক গিন্নিপনা, যেমন কর্ম তেমনি ফল। একটি কথাও না বলে দুমদুম করে সিঁড়ি কাঁপিয়ে পূর্ণিমা নিচে চলে এল। রান্নাঘরে ঢুকে একখানা পিঁড়ি পেতে নিয়ে একলা খেতে বসে গেল।

ভানুমতী জিজ্ঞাসা করে, জামাইবাবু যাবে না?

মেয়ে ছেড়ে কোথায় যাবে?

মুখ তুলল পূর্ণিমা। দু-চোখে যেন অগ্নিশিখা। বলে, বোঝ তবে কেন আমি মেয়ে তাড়ানোর ফিকিরে আছি। সাক্ষাৎ-শনি মেয়ের চেহারা নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়েছে। নতুন চাকরি ওর, মেয়ের সোহাগে নিত্যিদিন অফিস কামাই হতে থাকলে বিদেয় করে দেবে। ঐ মেয়ে হতে সমস্ত যাবে, দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

গরগর করতে করতে পূর্ণিমা বেরিয়ে পড়ল। দিদিমণি নেই—ভানুমতী সর্বেশ্বরী আপাতত বাড়ির মধ্যে, যা-ইচ্ছে তাই করতে পারে। সদর-দরজা বন্ধ করে পা টিপে টিপে উপরে চলল। শনি না আরো-কিছু—শনির বুঝি অমন লক্ষ্মীঠাকরুনের রূপ হয়। দেখা যাক, ঠাকরুনটির কী সেবা চলছে এখন। নিঃসাড়ে উঠে সে দরজা ধরে দাঁড়াল।

স্নান সারা হয়ে এখন মেয়ের উপর জামা পরানোর কসরত চলছে। ইচ্ছে করে, ছুটে গিয়ে জামাইবাবুর হাতের জামাটা কেড়ে পরিয়ে দিয়ে আসে। কিন্তু দিদিমণি না-ই থাকুক, কড়া নিষেধটা মাথার উপর ঝুলছে।

দাঁড়িয়ে একটু শব্দসাড়া করে শেষটা ভানু কথা বলে উঠল ঃ ঘড়ি না হয় পিছন করে বসেছ, কিন্তু টং-টং করে ন'টা বেজে গেল—আওয়াজটাও কি কানে যায় নি ?

মুখ না ফিরিয়ে শিশির বলে, অফিসে যাব তো আপদ কার কাছে ফেলে যাই ? তোরা যে সব মুখ ফিরিয়ে রইলি।

উনি বলেন শনি, ইনি বলেন আপদবালাই—শোন দিকি কথাবার্তার ঢং! মনে মনে ভানুমতী চটে গেছে। পূর্ণিমার সেই কথাগুলোই একটু ঘুরিয়ে বলল, কদ্দিন এমন চলবে জামাইবাবু ? নতুন চাকরি—বেশি কামাই করলে মানিবে শুনবে কেন ?

চকিতে তাকিয়ে পড়ে শিশির বলে, যাওয়া অবিশ্যি এখনো যায়। ফ্যাক্টরিতে যেতে হবে, অফিসে নয়—সময়ের একটু এদিক-ওদিক হলে যায় আসে না। মেয়ের দেখাশোনা করবি তুই ? বল্—তা হলে রওনা হয়ে পড়ি।

এক-সংসারের পুরো কাজ একটা মানুষের ঘাড়ে। চোখেই তো দেখছ—

সে বুঝেছি—

হতাশ কণ্ঠে শিশির বলে, চাকরি বা মেয়ে দুটোর একটা ছাড়তেই হবে। তা ছাড়া উপায় নেই।

ভানুমতী বলে, মেয়ে ছেড়ে এসো, সেই তো সোজা। বাপের কাছে দিয়ে এসো। তোমার কষ্ট, মেয়েরও কষ্ট—দু'জনেই রেহাই পেয়ে যাবে।

বাপ ভবঘুরে মানুষ—পাত্তা কোথায় পাব ? একটিমাত্র রাস্তা আছে—

ভানুমতীর মুখে একনজর চেয়ে দেখে শিশির বলল, ফুটপাথে বা কোন এক বাড়ির রোয়াকে ফেলে পালিয়ে আসা—এই ছাড়া দ্বিতীয় উপায় দেখি নে।

ভানু আর্তনাদ করে ওঠে ঃ না জামাইবাবু, অমন কথা মুখেও আনবে না। বাচ্চারা অন্তর্যামী-দেবতা, বোঝে সমস্ত। দুঃখ পেয়েছে—ড্যাবড্যাব করে তাকাচ্ছে কী রকম দেখ।

ভঙ্গি দেখে এত দুঃখের মধ্যেও শিশিরের হাসি পেয়ে যায়। বলে, আর হতে পারে —চাকরি ছেড়ে দেওয়া। ছাড়তে হবে না, ওরাই ছাড়িয়ে দেবে। একদিন-দু'দিনের ব্যাপার নয় যে ইনফ্লুয়েঞ্জা বলে কাটান দেবো।

কুমকুমের জামা পরানো পর্ব শেষ এতক্ষণে। স্নান করে বেশ স্ফূর্তি হয়েছে, মুখ-ভরা হাসি। হঠাৎ মেয়ের কী রকম ঝোঁক—হাসতে হাসতে টলতে টলতে সে ভানুর দিকে এগোয়। খাট ঘেঁষে ভানু দাঁড়িয়ে ছিল—তিড়িং করে লাফিয়ে সে সরে দাঁড়াল।

শিশির হেসে পড়ল ঃ মুখে তো অন্তর্যামী-দেবতা বললি—পালাচ্ছিস সাপ যেন যেয়ে আসছে। আশাসুখে গিয়েছে—নিয়েই দেখ না, ছোবল মারে না আদর করে!

প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে তবু ভানুমতী চুপচাপ তাকিয়ে থাকে।

শিশির বলে, সত্যি সত্যি এরা দেবতা। চটাতে নেই, শাপমন্যি দেবে।

লোভের সঙ্গে এবারে ভয়ও। ইতস্তত করে ভানুমতী বলে, দিদিমণির কাছে মিথ্যে বলতে হবে যে!

তা বলবি। মিথ্যে বলে না কে ? অমন যে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, তিনি অবধি মিথ্যে বলেছিলেন।

ভানু বলে, তুমি বলে দেবে না তো জামাইবাবু ?

কক্ষনো না। নিচ্ছিস একটু শখ করে, তার জন্যে বকুনি খাওয়াব কেন? নিয়েই দেখ্—

কাছে এসে ভানুমতী সসংকোচে একটু হাত বাড়িয়েছে, কুমকুম অমনি বুকের ভিতর চলে এলো। গলা জড়িয়ে ধরল ভানুর উর্মিকে যেমনধারা করত।

শিশির উসকে দেয়ঃ আদর, আদর—ছোট্ট মাসিকে আদর হল কই কুমকুম?

মেয়ে তুলতুলে গাল নিয়ে ভানুর মুখে চেপে ধরল। তাতে হল না—বোবার মতন উঁ-উঁ করছে।

শিশির বলে, মুখ ফেরাতে বলছে ভানু, ও-মুখেও আদর হবে। ধরেছিস যখন, একটুখানি দাঁড়া। চানটা সেরে আসি।

অগত্যা ভানুমতী স্বীকার করে নিয়ে বলে, তাড়াতাড়ি এসো জামাইবাবু। ছিষ্টির কাজ বাকি পড়ে আছে।

স্নান সারা হলে ভানুমতী শিশিরের কাছে মেয়ে দিয়ে দিলঃ তোমার ভাত বাড়তে যাচ্ছি জামাইবাবু। দিদিমণি বলে গেছে। নিচে চলে এসো, দেরি কোরো না।

কুমকুমকে কোলে বসিয়ে ভাত টিপে টিপে দলা পাকিয়ে শিশির আগে খাইয়ে দিল। মুখ ধুয়ে দিয়ে ভানুকে বলল, ধর্ একটু। আমি খেয়ে নিই এবারে।

একবারের কথাই তো ছিল জামাইবাবু।

নিশ্বাস ফেলে শিশির বলে, তবে আমি খাব না। অফিসের তাড়া নেই—ধীরে-সুস্থে জুত করে বসে খাব, বাচ্চাকে তাই আগেভাগে খাইয়ে দিলাম। কপালে না থাকলে কী করে হবে! ক্ষুধার অন্নে বঞ্চিত হচ্ছি, তুই দায়ী তার জন্যে।

ইতস্তত করে ভানুমতী কুমকুমকে নিয়ে নিলঃ এই দুই বার হল। আর কিন্তু নয়। টের পেলে দিদিমণি আস্ত রাখবে না। দিদিমণির কাছে কোনদিন কিছু গোপন করি নি, সেই পাপ আজ করতে হবে।

খেতে বসে শিশির আবদারের ভঙ্গিতে বলে, আরও একটু আছে ভানু। কাল রাত্রে একটুও ঘুমোই নি। অফিসে যখন গেলাম না, দুপুরে ঘুমিয়ে নেবো। মেয়েও ঘুমোবে। যদি জেগে ওঠে, তখন তাকে ধরবি একটু।

সন্ত্রস্ত হয়ে ভানুমতী ঘাড় নাড়লঃ সে হবে না। মোটমাট এই যা হল—এই দু'বার।

দুই নয়, তিন—। জেদ ধরল শিশির: মানুষ একটা মারলে ফাঁসি, দুটো মারলে ফাঁসি, তিনটে মারলেও সেই ফাঁসি। মিথ্যে যখন বলতেই হবে, দুটোয় আর তিনটের কী আসে যায়?

বিড়বিড় করে তারপর খানিকটা স্বগতভাবে বলছে, প্লাস্টিকের একরকম আহা-মরি চিরুনি উঠেছে, তাই একটা দিতে হবে ভানুকে। ভাল সাবানের কথাও বলছিল যেন একদিন—

ভানু কোথায় তখন! অত্যধিক পাপের মধ্যে না পড়তে হয়—সেই শঙ্কায় কুমকুমকে নিয়ে রান্নাঘর থেকে সে সরে পড়েছে।

মেয়ে নিয়ে ভানু সরে গিয়েছিল, তা বলে চিরুনি ও সাবানের প্রস্তাব কান এড়ায় নি। সারা বিকালটা কুমকুম তার কাছে। খুব স্ফূর্তি মেয়ের। শিশির বলে, মেনে নিয়েছে তোকে। আমাদের ফ্যাক্টরিতে বিষম কাজের চাপ—এ সময়টা কামাই হলে কোম্পানির নজরে পড়ে যাবে। আজকের মতন দুপুরবেলা তুই যদি একঘণ্টা দু-ঘণ্টা

রাখিস, ফ্যাক্টরিতে আমি একবার করে হাজিরা দিয়ে আসি। তাতেই কাজ হবে।

ভানুমতী আঁতকে ওঠে : সে হবে না, কখনো না। দিদিমণি খুন করে ফেলবে।

দুম করে শিশিরের সামনে মেয়ে বসিয়ে দিয়ে ভানু একছুটে কলতলায় এঁটো-বাসনের কাঁড়ি নিয়ে বসল। মেয়ের অপমান হল বুঝি—কেঁদে উঠল অমনি।

ঘড়িতে পাঁচটা, পূর্ণিমা বাসায় ফিরবে এইবার। কুমকুম চোখ বুঁজে কাঁদছে। সেই কান্না—গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে যে কান্না পথঘাট ট্রেন-বাস তোলপাড় করতে করতে এসেছিল। ভাবা গিয়েছিল, কুসুমডাঙা থেকে মেয়ে ভদ্র হয়ে এসেছে, কান্না জিনিষটা উর্মি ভুলিয়ে দিয়েছে। ওরে বাবা! বাসন মাজা ভুলে ভানুমতী তাজ্জব হয়ে দেখে। গলা শুনে বাচ্চা-মেয়ে কেউ বলবে না, লড়াইয়ের জওয়ান যেন রে-রে করে উঠছে।

জামাটা ঝপ করে গায়ে চড়িয়ে বোতাম না এঁটেই শিশির মেয়ে তুলে নিয়ে পথে বেরুল। মোক্ষম প্রতিষেধক জানা আছে—এক দোকানে গিয়ে এককাঁড়ি লজেন্স কিনে গোটা তিন-চার তাড়াতাড়ি মুখে ঢুকিয়ে দেয়। অবাক কাণ্ড—কাজ দিল না আজকে, থুঃ থুঃ করে ফেলে দিল। কণ্ঠের কোন প্রকার প্রতিরোধ মেয়ে সহ্য করবে না।

দ্রুতপায়ে এ-রাস্তা ও-রাস্তা করছে। কান্না যে একেবারে থামে না, তা নয়—ক্ষণবিরতির পর দ্বিগুণ তেজে শুরু হয়ে যায় আবার। মজা দেখবার মানুষ জুটে যাচ্ছে : মেয়ে নয়—আজব জিনিষ, সুতো-শঙ্খ সাপ—দেখে যান দেখে যান, সুতোর দেহ দিয়ে শঙ্খনাদ কি করে বেরোয়। বুকের উপর অমন চেপে ধরেছেন মশায়, দম আটকে শেষ করে দেবেন ?—আহা, অমন আলতো ভাবে ধরলেন, পড়ে গিয়ে মাথা ছাতু-ছাতু হবে যে! তাই যদি মনের বাসনা, ঠ্যাং ধরে সরাসরি ফুটপাথে আছাড় মারুন।

ইত্যাদি, ইত্যাদি। মন্তব্যের ঠেলায় পথ ছেড়ে পুনশ্চ বাড়ি ঢুকতে হল। ঘোরাঘুরি এবং যত্ন-চেষ্টার ফলে কণ্ঠ যৎকিঞ্চিৎ খাদে নেমেছিল, ঘরে পা ঠেকানোর সঙ্গে সঙ্গেই ধুন্ধুমার।

পূর্ণিমা অফিস থেকে ফিরে রান্নাঘরে চা বানাচ্ছে, বাসনকোশন ধুয়ে ভানুমতী সশব্দে করলা ভাঙছে এখন। বাইরের ঘরের তক্তাপোশে শিশির মেয়ে নিয়ে বসেছে। আক্রোশ ভরে হাঁ করিয়ে গালের মধ্যে লজেন্স ঢুকিয়ে দিল, দিয়েই মুখ চেপে ধরেছে—ফেলে দেয় কেমন করে দেখি। কার জোর বেশি, মেয়ের না বাপের—পরীক্ষা হয়ে যাক। একের পর এক ঢুকিয়ে মুখগহ্বর ভরাট করে দিচ্ছে, আওয়াজ বেরুনোর এতটুকু ছিদ্রপথ না থাকে।

পূর্ণিমা হেনকালে এক কাপ চা তক্তাপোশের উপর শিশিরের সামনে রেখে যেমন এসেছিল নিঃশব্দে তেমনি বেরিয়ে গেল। মেয়ের সঙ্গে এত যে ধস্তাধস্তি—হঠাৎ যেন চোখ কানা হয়ে গিয়ে কিছুই দেখছে না, কান কালা হয়ে গিয়ে কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। ভাবখানা যেন, শিশির ঈশ্বরের ধ্যানে কিংবা কোন মজাদার নভেলে ডুবে আছে—পতিপ্রাণা রমণী শব্দসাড়া করে স্বামীর শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটাল না।

আরো কিছু পরে সাজগোজ করে পূর্ণিমা বেরিয়ে গেল। সন্ধ্যাগুলো এই কিছুকাল ধরে দু'জনের হয়েছিল—মার্কেটে ঘোরাঘুরির, গঙ্গাকূলে বেড়ানোর, আজেবাজে কথোপকথনের, সিনেমার অন্ধকারে গায়ে-গায়ে বসার সন্ধ্যাকাল।

ভানুমতীকে ডেকে শিশির বলে, তোর দিদি বুঝি সিনেমায় গেল? তা বেশ হয়েছে—কয়লা-মাখা হাত ধুয়ে আয়। সাবান এনেছি তোর জন্যে। চিরুনি খুঁজেছিলাম, পাড়ার এসব দোকানে সে জিনিষ রাখে না। কাল যদি অফিসে যাবার ব্যবস্থা করে দিস, নিউমার্কেট থেকে চিরুনি কিনে আনব।

পুলকিত ভানুমতী সাবান নেড়েচেড়ে নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুঁকছে।

শিশির বলে, কাণ্ড দেখছিস ভানু। তুই কোল থেকে নামিয়ে দিলি, মেয়ে তখন থেকে কাটা-পাঁঠার মতন ধড়ফড় করছে। আবার তুই না নিলে থামবে না। দুধ-রুটি খাইয়ে তারপর ঘুম পাড়িয়ে দেবো। ধকল হয়েছে খুব, পেটে কিছু পড়লেই ঘুমিয়ে পড়বে। হয়েছে কি জানিস—জন্মে তো মায়ের সুখ পায় নি, তারই শোধ নিয়ে নিচ্ছে। মেয়েলোকের কোল পেলেই তাকে মা ধরে নেয়।

ঘণ্টাখানেক পরে পূর্ণিমা ফিরল। অতএব সিনেমায় যায় নি—সিনেমা দেখে এত শিগগির ফেরা সম্ভব নয়। কাপড়-চোপড় ছেড়ে রান্নাঘরে ঢুকে গেল। গরজ ছিল না। রান্না-করা ওবেলার তরকারি আছে, স্টোভ জ্বেলে চাট্টি চাল ফুটিয়ে নেওয়া—ভানু-ই ইদানীং সেটা করে। ভানুকে সরিয়ে পূর্ণিমা আজ তার জায়গা নিয়ে নিল।

রবিবারের দিনটাও তোকে ছুটি দিচ্ছি ভানু—

খুশিতে উজ্জ্বল হল ভানুমতীর মুখ। পূর্ণিমার দৃষ্টি এড়ায় না, আরও ফলাও করে বলে, তোর বরের কারখানা তো বন্ধ থাকে রবিবারে—সেই জন্য।

ভানুমতী ঘাড় দুলিয়ে বলে, চিড়িয়াখানায় যাব তা হলে দিদিমণি।

না, বরের সঙ্গে বাড়ি থাকবি। হুড্‌-হুড্‌ করে বেড়ানো কি ভাল? রাত্তের বেলা ছাড়া দিনমানে তো থাকতে পাস না—দিচ্ছি একটা দিন, তা-ও ঘুরে ঘুরে নষ্ট করবি কেন?

ঘুরলে বুঝি নষ্ট হয়?

মুখফোঁড় ভানু আরও বলতে যাচ্ছিল, তাই যদি হবে তোমরা দু'জনে অত ঘোরো কেন? পরের মেয়ে কুড়িয়ে এনেছে বলে চটে আছ, নয় তো আজকের এই সময়টা থাকতে তোমরা বাড়ি?

বলতে পারত এই সমস্ত—কিন্তু পূর্ণিমা বলে, ছুটি দিচ্ছি রবিবারে, একটা কাজও দিচ্ছি। ভোরে এসে বাচ্চাকে বাসায় নিয়ে যাবি। তোর বর বাড়ি থাকবে, দু'জনে মিলে পালা করে দেখবি। পুজোর সময় চুড়ি চেয়েছিলি—তখন হয়ে ওঠে নি, কিন্তু ভুলি নি কথাটা। মাপ দিয়ে দিস, চুড়ি কিনে দেবো।

ভানুমতী কর-কর করে ওঠে। এই যে বলো দিদিমণি, মেয়ে ছুঁলে হাত কেটে দেবে আমার—

রবিবারের দিনটা খালি বাদ। হাত কাটব না, হাতে রেশমি-চুড়ি পরিয়ে দেব। কেন পারবি নে, কী আর ঝঞ্ঝাট!

পারব, খুব পারব—গলা ফাটিয়ে ভানুর বলতে ইচ্ছে করে। বেড়ে মজা, পাওনার কপাল পড়েছে—দু-তরফে আসছে। মেয়েটাই লক্ষ্মী, মেয়ে হতেই আসছে সব।

বেশি উৎসাহ দেখানো ভাল নয় বলে ভানুমতী সামলে নিল। বলে, যদি কান্নাকাটি করে দিদিমণি?

ভুলিয়ে-ভালিয়ে ঠাণ্ডা করিস। নিজের বাচ্চা হবে, তখন কি করবি? পরের কাছে থেকে এত বড়টা হয়েছে—অভ্যেস আছে, হাঙ্গামা বেশি করবে না।

মুহূর্তকাল থেমে পূর্ণিমা অজুহাত রচনা করে নিল: রবিবার সকালে অফিসের মেজো-সাহেব আমাদের দু'জনকে ডেকেছে। বাচ্চা ঘাড়ে নিয়ে কি করে যাবে? একা-একা সামলাতে তোর কষ্ট হবে, বাসায় নেবার কথা সেই জন্যে বলছি। তাড়ানোর এত ফিকির করি কেন, বোঝ্‌ এইবারে। এই দিনটা ঠেকিয়ে দে তোরা, তারপরে দেখব।

স্টোভে ভাত বসিয়ে ভানুকে দেখবার কথা বলে পূর্ণিমা উপরে চলল। মেয়ে

ঘুম পাড়াচ্ছে শিশির, মাথায় থাবা দিয়ে দিয়ে ছড়া গুনগুন করছে। পূর্ণিমা ঝঙ্কার দিয়ে পড়ে : সিনেমায় আজকে নয়—কাল যাবার কথা ছিল। একলা নয়, দু'জনে। টিকিট কেটে রেখেছিলাম। চিঠি পড়বার পর সেই টিকিট তক্ষুনি ছিঁড়ে কুচি-কুচি করলাম।

ভানুটা কী বিচ্ছু মেয়ে গো! সিনেমায় গেছে কিনা একেবারের একটুখানি জিজ্ঞাসা। বাড়িতে আসা মাত্তোর তাই অমনি পুটপুট করে লাগিয়েছে! চিরুনি-সাবান ঘুষ দিয়ে কুমকুমের দায় চাপানোর মতলবে আছে, সেটা আবার ফাঁস করে না দেয়। এরই মধ্যে দিয়েছে কিনা কে জানে!

পূর্ণিমা বলে, সিনেমায় ইহজন্মে আর যাচ্ছি নে। একটা তাজ্জব কথা শুনে দেখতে গিয়েছিলাম। বিশাখা আমার ইস্কুলের বন্ধু। মারা গেছে সে হঠাৎ, আর বরটা নাকি হা-হুতাশ করে মরছে তার জন্য। এই কখনো বিশ্বাস হয়। বর আরও তো দুটো দেখা আছে—দিদির বর, আমার বর। জানি ঝুটো খবর, তবু পরখ করতে গেলাম। তা দেখলাম, অঘটন ঘটে আজও দুনিয়ায়। বর সত্যি সত্যি কাঁদছে বিশাখার জন্য। তোমাদের পুরুষকুলের কলঙ্ক, কি বলো?

দরজা জুড়ে পূর্ণিমা দাঁড়িয়ে। অসহায়ভাবে একবার সেই দিকে তাকিয়ে দেখে শিশির গভীর মনোযোগে ঘুমন্ত মেয়েকে ঘুম পাড়ানোর কাজে লেগে গেল।

আসল কথায় এলো পূর্ণিমা : রবিবার সকালে দিদি তোমায় দেখতে আসছে। কি করবে, ঠিক করেছ?

প্রশ্ন করেছে, জবাব দিতেই হল : থাকব।

কিন্তু মেয়ে? একনজর না দেখেই যে না সে-ই বলবে, মেয়ে তোমার ছাড়া কারও নয়। ভানুর মতন হাঁদা নয় দিদি। জেরা করবে। উকিল-ব্যারিস্টার কোথায় লাগে দিদির জেরার কাছে!

শিশির বলে, সরে পড়ব তবে মেয়ে নিয়ে!

কখনো নয়। এ হপ্তা আগে আমায় বলে গেছে—আমি কথা দিয়েছি, আটকে রাখব তোমায়। জানবে সামান্য কথাটাও রাখ না তুমি। তাপসের মুখের প্রশংসাগুলো নির্জলা মিথ্যে, বাড়িসুদ্ধ সকলের সঙ্গে লড়ালড়ি বোকামি হয়েছিল আমার। আমি পরাজিত। দিদি সমস্ত জেনে বুঝে যাবে।

থতমত খেয়ে শিশির বলে, থাকব তা হলে।

তুমি থাকবে, কিন্তু মেয়ে থাকবে না। ভোরবেলা ভানু এসে বাসায় নিয়ে যাবে। বাসায় নিয়ে রাখবে। আপত্তি করতে লাগল। বলে, কান্নাকাটি করবে। উৎকট ঐ কান্না দেখে ভয় পেয়ে গেছে! চুড়ির লোভ দেখিয়ে বিস্তর কষ্টে শেষটা রাজি করিয়েছি।

ওরে বিচ্ছু মেয়ে, কুমকুম কান্নাকাটি করে তোমার কাছে গিয়ে! দু-তরফের ঘুস খেয়ে মজা জমিয়েছে ভাল।

॥ পঁয়তাল্লিশ ॥

কিন্তু শেষ মুহূর্তে ব্যবস্থা বানচাল। শনিবারে ভানুমতী সকাল-সকাল বাসায় চলে গেল। নাকি পেট গড়গড় করছে, বমিও হয়েছে একবার। মেয়েটা খাওয়ার বিষয়ে বড় অত্যাচারী—রাস্তার তেলেভাজা গুচ্ছের গিলেছে হয়তো। রবিবারে হাজির নেই—বাড়াবাড়ি হয়েছে নিশ্চয়। ব্যাকুল হয়ে পূর্ণিমা উপর-নিচে করছে। আর নিঃশব্দে অগ্নিবর্ষণ করছে যখনই চোখোচোখি হচ্ছে শিশিরের সঙ্গে।

শিশির বলে, আমি নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। বিষম জরুরি কাজ আমার, কিংবা বলতে তোমার মনে ছিল না—এমন-কিছু বলে দিও।

যাও তাই। রাত্রের আগে ফিরো না। এবেলা না এসে ওবেলাও এসে পড়তে পারে দিদি—

সহসা গর্জন করে ওঠে: ফেরত এনো না মেয়ে, মানা করে দিচ্চি। আজ দিদি আসছে, কাল হয়তো তাপস আসবে, লোকজন বন্ধুবান্ধব সব আসে—নিত্যিদিন কেমন করে সামলাব? এত উদ্বেগের দায়টা কি আমার? ভাবছ, দিচ্ছি-দেবো করে ক্রমশ সইয়ে নেবে। কখনো না, কখনো না—

কুমকুমের জামা-জুতো বের করল শিশির, পরিয়ে বাইরে নিয়ে যাবে। শান্ত কণ্ঠে পূর্ণিমার কথার জবাব দিল: ফেরত না এনে উপায় তো নেই! সাতটা দিন আমায় সময় দাও।

বেশ, তাই। সাত নয়, তেরোটা দিন আছে এ মাসের। পুরো মাসটা সময় রইল। তার উপরে একটা বেলা—একটা ঘণ্টাও আর নয়।

দ্রুতহাতে শিশির জামা পরাচ্ছে, জুতো পরাচ্ছে। তবু পূর্ণিমা ব্যস্ত করছে: এত সময় কেন লাগে? হাত চালাও তাড়াতাড়ি, খুব তাড়াতাড়ি—

এমনি সময় কড়া নড়ে উঠল। সর্বনাশ!

নিউ আলিপুর থেকে এরই মধ্যে এসে পড়ল! জামাই দেখার তাড়ায় রাত্রে ঘুমোয় নি বোধহয় দিদি। আমি এখন কী করি—

শিশির বলে, বাড়ি নেই বলে দাও গে। দরজা বন্ধ করে থাকি আমি।

তারপর! গুণের মেয়ে কেঁদে ওঠে যদি? মাথা ভেঙে মরি, না কী করি আমি এখন!

সিঁড়ি বেয়ে নিচে ছুটল। কয়েক ধাপ গিয়ে ফিরে আসে: হাসিমুখ থাকে যেন। দোহাই তোমার!

হাসিমুখের কথা বলছে, কান্নায় নিজের কণ্ঠ বুজে আসে। খটখট আওয়াজে দোরে কড়া নাড়ছে। সদর-দরজা খুলে দিয়ে পূর্ণিমা আহ্বান করে: আয় দিদি। আছে, তোরই জন্যে বেরুতে দিই নি। বোস।

এক কণিকা উদ্বেগের চিহ্ন নেই, মুখ-ভরা হাসি। বলে, একা এসেছিস দিদি? রঞ্জুকে আজও আনলি নে?

অণিমা বলে, আনব কি করে? সেই যে বললাম, স্বাতী বাপের বাড়ি নিয়ে যায়, কিছুতে ছাড়ে না। স্বাতীর মা-ও নিয়ে যেতে বলেন। খুব ভালবাসেন তিনি।

(আর পূর্ণিমা যেন মোটেই ভালবাসে না! গরিব বলে—অথবা দুশ্চারিণী বলেই

নাকি ? পূর্ণিমার ভালবাসার কানাকড়ি দাম নেই ! চোখ ফেটে জল বেরিয়ে পড়বে, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি একমুখ হেসে সামলে নিল।)

হেসে-হেসে বলে, তা না-ই বা আনলি তোর রঞ্জুকে। আমারও আছে—

দুম-দুম করে উপরে উঠে যায়। কুমকুমকে সাজিয়েগুজিয়ে কোলে নিয়ে শিশির হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বাজপাখির মতন পূর্ণিমা ছোঁ মেরে কোল থেকে মেয়ে নিয়ে নিল।

শিশিরকে বলে, নিচে চলে এসো। যা বলেছিলাম—হাসিমুখে এসো তুমি। আমি হেরে গেছি, একটুও যেন সন্দেহ না করে। বড্ড চালাক দিদিটা, ভারি শয়তান।

ঘাড় কাত করে মেয়ের গালে মুখ চেপে ধরেছে : খানিকটা গণেশজননীর ভাব। পুরবী থাকলেও এর বেশী কী করত ! নেমে যাওয়ার মুখে আরও একবার শাসানি : যেমন বলেছি, হেরফের না হয়। তাহলে আমার আত্মঘাতী হওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না।

মেয়ের মুখ ঘুরিয়ে অণিমাকে দেখিয়ে পূর্ণিমা জাঁক করে : কী সুন্দর মেয়ে, দেখ্ চেয়ে। কোন্ জব্দটা করলি আমায় শুনি ? কিসে তোরা হারালি ?

অণিমা সবিস্ময়ে বলে, কার মেয়ে রে ?

হেসে উঠে পূর্ণিমা বলে, আমার—আমার। কতবার বলব ?

খাসা মেয়ে। সত্যি কথা বল্ পুনি, কোথায় পেয়েছিস ?

পূর্ণিমা বলে, রঞ্জুকে তুই যেখানে পেয়েছিলি, সেই একখানে। তোর হতে পারে, আমার বুঝি হতে নেই। খুব শুভাকাঙ্ক্ষী দিদি আমার—আমায় তুই বাঁজা ঠাউরেছিস ?

শিশির এই মুহূর্তে এসে পায়ের ধুলো নিল। অণিমা একবার শিশিরের মুখে একবার কুমকুমের মুখে চেয়ে বলে, হলে কিন্তু অবাক হতাম না। জামাইয়ের মুখের স্পষ্ট আদল মেয়ের মুখে।

অণিমাকেই সালিশ মেনে পূর্ণিমা অভিমানের সুরে বলে, ওকে বুঝিয়ে বল্ তুই দিদি, দিন-রাত আমার উপর খিটিমিটি করছে। বিশাখার কথা আমার মুখে অনেক শুনেছিস, মেয়ে রেখে হঠাৎ সে মারা গেছে। দু'টিতে বাসা করে ছিল বর বেচারী এখন অকূল পাথারে। অবস্থা দেখে মেয়েটাকে আমি নিয়ে এসেছি। কয়েকটা দিনের জন্য—নাগপুর থেকে বিশাখার শাশুড়ি আসছেন, এসেই নাতনীকে নিয়ে যাবেন। তা দিদি, যে কাণ্ড করছে—

(বিশাখার ছেলেপুলে হয় নি, হাতপা-ঝাড়া মানুষ ছিল, সে খবর অণিমা কেমন করে জানবে ?)

মুখ টিপে হেসে পূর্ণিমা বলে, কী কাণ্ড যে করে দিদি, গুরুজন তুই—কেমন করে বলি। অফিস থেকে পাঁচটায় বেরিয়ে রাত দশটার আগে কোন দিন বাসায় ফিরতে পারি নে। নিত্যিদিন এক-এক আজব প্রোগ্রাম—এতও আসে ওর মাথায় ! কোথায় বজবজ, কোথায় এরোড্রাম সব আমাদের পায়ের তলায়। পারে মানাব, বল্ তুই ? বাচ্চা এসে সবে ভণ্ডুল ঘটেছে, 'সরিয়ে দাও'—'সরিয়ে দাও' বুলি হয়েছে তাই। বিশাখার বর তা হলে কী ভাববে. বল দিকি। নিয়েই তো যাবে—ক'টা দিন আর সবুর সইছে না !

অণিমা শিশিরকে গুরুজনোচিত গাম্ভীর্যে বোঝাচ্ছে : অত অধীর হলে কি চলে ভাই ! পুনি তোমার তো আছেই—ক'টা দিন প্রোগ্রাম না হয় মুলতুবি রইল। নিজেদের ছেলেপুলে হলে তখন কি সরিয়ে দিতে পারবে ? তেমনি ভেবে নাও না কেন।

নিশ্বাস চেপে নিয়ে তারপর পূর্ণিমাকে বলে, তোর বড্ড ন্যাওটা হয়েছে ক'দিনের মধ্যে। গায়ের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাকাচ্ছে কেমন জুলজুল করে! নিয়ে গেলে কষ্ট পাবি খুব।

মুখ চুন করে পূর্ণিমা বলে, নিয়েই তো যাবে—রাখতে দেবে না পরের মেয়ে।

শিশির তাজ্জব হয়ে দেখছে। এবং কথাবার্তা সমস্ত কানে শুনছে। কী বুদ্ধি ধরে পূর্ণিমা, কেমন চমৎকার মানান করে দিল। ধাপ্পা দিয়ে এই হাটে সে সুচ বেচতে গিয়েছিল!

খানিক পরে অণিমা বলে, যাই এবারে সুখ-শান্তিতে থাকো তোমরা শতেক বছর পরমায়ু হোক—

শিশির খাতির দেখিয়ে বলে, এক্ষুনি কেন দিদি? দুপুরটা অন্তত থেকে যান।

(শুধু দুপুরই বা কেন, পাকাপাকি থেকে যান এখানে। পাশা এখন উল্টে গেছে—আমিই নাকি মেয়ে সরানোর তাড়া দিচ্ছি, পূর্ণিমা বুকে জড়িয়ে নিয়ে আছে!)

অণিমা বলে, স্বাতী বাপের-বাড়ি, তাপসও কলে বেরিয়ে গেছে। বাসায় ঝি-চাকর শুধু। এখন যাই, আবার আসব।

শিশির গলির মোড় অবধি গেল এগিয়ে দিতে। কুটুম্ব-অভ্যর্থনায় তিলেক ত্রুটি না ঘটে। বলে, আসবেন কিন্তু—কথা দিয়ে গেলেন। সকালটা বড় আনন্দে কাটল।

আর মনে-মনে বলছে, সকালবেলা কঠিন পরীক্ষা হয়ে গেল। পাশ হয়েছি বোধহয়। আর বলিহারি পূর্ণিমাকে কী অভিনয়টা করল! মেয়ে যেন পলকে হারায়—মাথায় রাখলে উকুনে খাবে, মাটিতে রাখলে পিঁপড়ের খাবে, ও মাণিক কোথায় রাখবে যেন ভেবে পায় না!

শিশির বাড়ি ফিরে দেখে একেবারে পট-পরিবর্তন। অণিমা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাসিখুশি সমস্ত নিভে পূর্ণিমার মুখ থমথম করছে—সুইস টিপে লহমায় আলো নেভানোর মতন।

সদর-দরজা অবধি এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। শিশির চৌকাঠে পা দিতেই আর্তনাদ করে ওঠে: উঃ, উঃ, আগুনে' চ্যাংড়া! গা পুড়ে জলে যাচ্ছে। এতক্ষণ ধরে কি করছিলে, কন্দুর গিয়েছিলে সঙ্গে? খাতির যে বড্ড বেশি জমে গেছে!

মুখ কালো করে শিশির বলে, কাজ সারা হয়ে গেছে—মাটিতে নামিয়ে রাখলেই হত।

হাত বাড়াল মেয়ে নেবার জন্য। কী আশ্চর্য, আসবে না কুমকুম। সেই ঊর্মিলার কোলে উঠে যেমনধারা করত। অবোধ উদাস দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে, কোল ছেড়ে আসার কোন লক্ষণ নেই।

শিশির দু'হাত ধরে টানল। তা-ও আসবে না, প্রাণপণে আঁকড়ে আছে।

পূর্ণিমা আঁকুপাঁকু করে: কী বিপদ। কাঁকড়াবিছের মতন কামড়ে আছে। বলি, জোর নেই গায়ে—না, মজা দেখছ? লাঞ্ছনা-অপমানের কিছুই তো বাকি নেই—সতীন-কাঁটা বুকের উপর উঠে হুল ফুটাচ্ছে, দেখে বুঝি বড্ড মজা।

হুংকার দিয়ে বলে, নিয়ে নাও বলছি। গা-ঘিনঘিন করছে—কলঘরে ঢুকে জল ঢেলে জ্বালা জুড়াব। শুচি হব।

ছোট বাহুদুটো কী শক্তি ধরে বাবা! পাষাণে মাথা খুঁজে কোন্ সুখটা পাচ্ছিস ওরে হতভাগী? সব মেয়েমানুষই ঊর্মি হয় না।

কাটা-পাঁঠার চামড়া ছাড়ানোর মতো কুমকুমকে কোল থেকে টেনেহিঁচড়ে নিল তো—কান্না। পূর্ণিমার দিকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে শিশির পথে বেরিয়ে গেল। পথে পথে বেড়াবে, পার্কে নিয়ে বসবে, কোন হোটেলে চলে যাবে—রবিবার আছে, কিছুমাত্র তাড়া নেই।

পূর্ণিমা সেই এক জায়গায় পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়ের কান্না দূর হতে দূরবর্তী হয়ে ক্রমশ মিলিয়ে গেল, তখন বোধহয় কলঘরেই চলল জল ঢেলে গায়ের আগুন নেভাতে।

অসুখ করেছিল ভানুমতীর, সন্ধ্যার কাছাকাছি এসে দর্শন দিল। একটা দিনেই বেচারি কাহিল হয়ে গেছে।

পূর্ণিমা ধমক দেয়ঃ পেঁয়াজি ফুলুরি কতগুলো গিলেছিলি বল্ তো। এত ভুগিস, তবু লজ্জা নেই। তুই এলি নে বলে বেরুনো হল না, মেজো-সাহেব হয়তো রাগ করেছে।

কুমকুমকে শিশির পার্কে নিয়ে গিয়েছিল, এই মাত্র ফিরে এলো। মেয়ে আকুলি-বিকুলি করে পূর্ণিমাকে দেখে। হাত বাড়িয়ে দিল হঠাৎ তার দিকে—কোলে যাবে। যাবেই সে। শিশির জোর করে হাত টেনে ফিরিয়ে দ্রুত উপরে উঠে গেল।

পূর্ণিমা বলে, মেয়েমানুষের মতন বাচ্চা ঘাড়ে করে বেড়ানো—দেখে গা জ্বালা করে আমার। লজ্জাও করে না পথে বেরুতে!

কান্নার আওয়াজ আসে উপর থেকে। মুহূর্তকাল কান পেতে থেকে পূর্ণিমা সত্যি সত্যি জ্বলে উঠল: নোটিশ দিয়ে দিয়েছি—মাসের এই বাকি তেরোটা দিন। কোন অজুহাত চলবে না—একটা বেলা একটা ঘণ্টাও রাখা চলবে না তার পরে।

ভানুমতী সে-কথা কানে না নিয়ে সহজভাবে বলে, দেখলে না দিদিমণি, কোলে উঠতে চাচ্ছিল তোমার—

ছেলেপুলে কত কি চেয়ে থাকে। আকাশের চাঁদও চায়।

ভানুমতী বলে, তোমার কোল কিছু আর চাঁদ নয়—

চাঁদের চেয়ে আরও দুর্লভ। আরও বেশি উঁচুতে।

একটু থেমে তিক্তকণ্ঠে আবার বলে, দুর্ভিক্ষের ভিখারি পেটের ক্ষিধের হাত বাড়িয়ে এমনি করে ভিক্ষে চায়। ভিখারি দেখে আমার দয়া হয় না, ঘেন্না করে।

অফিসে রওনা হবার মুখে সেদিন বিষম কাণ্ড। উপরের ঘরে ড্রেসিং-টেবলের সামনে সামনে দাঁড়িয়ে পূর্ণিমা তাড়াতাড়ি একটু প্রসাধন সেরে নিচ্ছে। ছাতের উপর মাদুর পেতে এককাঁড়ি খেলনার মধ্যে কুমকুমকে বসিয়ে দিয়েছে, মেয়ে একমনে খেলা নিয়ে আছে। ভানুমতী ঝাড়ু নিয়ে ঘর ঝাঁট দিতে এসে ঢুকল।

পূর্ণিমা টিপ্পনী কাটেঃ আহ্লাদি মেয়ে ছেড়ে, গেল কোথায় তোর জামাইবাবু?

নাইতে গেছে কলঘরে। কলে এর পরে জল থাকবে না—চৌবাচ্চার জলে নাইলে মাথা ধরে।

পূর্ণিমা বলে, আপদবালাই জুটিয়ে এনে খাসা মজা জমেছে। অফিস কামাই করে মেয়ের সোহাগ করা—চাকরি আর কদ্দিন?

না বোঝার ভান করে ভানুমতী বলে, কেন, কি হবে চাকরির?

তাড়িয়ে দেবে।

ভ্রূভঙ্গি করে ভানু বলে, দিলেই হল! অত সোজা নয়। দেখো তুমি দিদিমণি—

গুহ্যকথা প্রকাশ করা যায় না যে অফিস মোটেই আর কামাই হচ্ছে না। বন্দোবস্ত পাকা হয়ে গেছে ভানুমতীর সঙ্গে। পূর্ণিমা বেরিয়ে যায়, খেয়েদেয়ে শিশিরও পিঠ-পিঠ

বেরিয়ে পড়ে। কুমকুম সারাক্ষণ ভানুর কাছে থাকে—একটা সিল্কের শাড়ি এই বাবদে। ফ্যাক্টরির ডিউটি বললেই বন্দোবস্ত চালু রাখা যাচ্ছে। ফ্যাক্টরি জানে, হেড-অফিস ঘুরে এসেছে—দেখাশুনো সেরে হেড-অফিসেই ফিরে যাচ্ছে শিশির। হেড-অফিস জানে, কাজ যখন ফ্যাক্টরিতে হেড-অফিস অবধি উল্টো আসতে যাবে কেন? ফেরে শিশির পূর্ণিমা ফিরে আসার বেশ খানিকটা আগে। এসেই কুমকুমকে নিয়ে নেয়। সারাদিনই যেন সে বাড়িতে রয়েছে—পূর্ণিমা এসে দেখে, কোন দিন মেয়ে নিয়ে পার্কে বেরুচ্ছে, কোন দিন খাওয়াচ্ছে মেয়েকে, কোন দিন বা খেলা করছে মেয়ের সঙ্গে—

ভিতরের কথা প্রকাশ করা যাবে না। ভানুমতী আপন মনে ঝাড়ু দিচ্ছে। হঠাৎ সে খিলখিল করে হেসে উঠল: ও দিদিমণি, দেখ দেখ—পিছনে কে তোমার।

মুখ ফিরিয়ে পূর্ণিমা দেখে, কুমকুম এসে ধরেছে। খেলায় মগ্ন ছিল মেয়ে—পূর্ণিমাকে দেখে বুঝি মতলব এসে গেল, খেলা ছেড়ে চুপিসারে ছাত থেকে এতটা দূর চলে এসেছে।

ভানুমতী বলে, বজ্জাতিটা দেখ। ধরেছে কী রকম দুটো হাত বেড় দিয়ে। হাত বাড়িয়েছিল বলে ভিখারি বলেছিলে দিদিমণি। জোর করে জাপটে ধরেছে, এবারে কি বলবে?

ডাকাত বলব। বড় হয়ে মেয়ে আর এক দেবীচৌধুরাণী কি পুতলিবাঈ হবে। ডাকাত-ভিক্ষুক—তেড়ে ধরে ভিক্ষে আদায় করে। আরও যদি ভাল হাঁটতে পারত—এক পা যেতেই টলে টলে না পড়ত!

কুমকুম নিবিড় করে ধরে আছে। পূর্ণিমার গ্রাহ্য নেই, সন্তর্পণে পাফ বুলোচ্ছে মুখে। মেয়ে তখন আর পিছনে থাকে না—ঘুরে সামনে এসে আত্মপ্রকাশ করল। ঊর্ধ্ববাহু হয়ে ড্যাবডেবে চোখদুটো মেলে তুলে নিতে বলছে।

পূর্ণিমা বিব্রত হয়ে ভানুকে বলে, আমার হাত-জোড়া। ছাতের উপরে এটাকে ছুঁড়ে দে দিকি।

কে যেন কাকে বলল—ভানুমতী মনোযোগে কাজ করে যাচ্ছে।

পূর্ণিমা বলে, কথা বুঝি কানে গেল না?

ভানু বলে, হাতের ছিল্টির ময়লা—ছুঁড়ে দেবো, তা এ-হাতে ধরি কেমন করে?

খুব যে ডাক্তারি শিখেছিস—

মুখফোঁড় ভানুমতী বলে, তোমার কাছে দিদিমণি। রঙ্গুর বেলা কোনদিন এমন-ভাবে ছুঁতে দিয়েছ? তখন এমনি জলে হয় না, সাবানে হাত ধুয়ে তবে তুমি ছুঁতে দাও।

পূর্ণিমা রেগে বলে, আমার হাত ধোওয়া আছে। আমিই করছি।

ভানু ততক্ষণে ঘরেই নেই—ময়লা তুলে নিয়ে বাইরে ফেলতে গেছে।

ছুঁড়ে ফেলার কাজটা অতএব পূর্ণিমা নিজেই করছে। প্রসাধন-সামগ্রীগুলো তাড়াতাড়ি ভ্যানিটি-ব্যাগে ভরে দুর্দান্ত ক্রোধে মেয়ে তুলে ধরল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে চট করে ওষ্ঠ রাখল মেয়ের গালের উপর, চেপে ধরল মেয়েকে বুকের মধ্যে। হাসছে দেখ মিটিমিটি শয়তানি-হাসি। হঠাৎ যেন পাগল হয়ে গিয়ে পূর্ণিমা চুমায় চুমায় অস্থির করে তোলে। কী মন্ত্র জানে সতীন-কাঁটা ঐ শত্রুটা—অপমানিতা নারীর সকল দুঃখ নিমেষে জল করে দিয়েছে।

সংবিৎ পেয়ে তারপর তাড়াতাড়ি নামিয়ে দিল। মেজাজটা উত্তপ্ত করে নেবে আবার—হরি হরি দরজার উপর ভানুমতী দুটি হাত কোমরে রেখে বীরভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। সিঁদের মুখে ধরা পড়ে চোরের যে অবস্থা হয়, পূর্ণিমার তাই। মুখ শাদা হয়ে গেছে

কাগজের মতো।

অরে ওদিকে খট করে কলঘর খুলে গেল। স্নান সারা হয়েছে, ভিজে কাপড় মেলে দিতে শিশির এবার ছাতে আসছে। পূর্ণিমা ব্যস্তসমস্ত হয়ে কুমকুমকে ছাতের উপর খেলনার মধ্যে বসিয়ে এলো—নড়ে নি তো মেয়ে ওখান থেকে, ঐ একটা জায়গায় খেলা নিয়ে মেতে আছে।

ভানুকেও সামাল করে দেয়ঃ জামাইবাবুকে বলবি নে কিছু।

ভানু ঘাড় নাড়ে তাই কেউ বলে নাকি ?

খবরদার, খবরদার !

দেখো তুমি। এর কথা ওকে বলা—সে আমার স্বভাবই নয়।

সঙ্গে সঙ্গে আবদারের সুরে বলে, তোমার ঐ ছাপা-রুমালটা দাও না আমায় দিদিমণি।

রুমালটা ভানুর বড় পছন্দ—ভাল জিনিষ কোনটাই বা নয় ? আরও একদিন চেয়েছিল, পূর্ণিমা কানে নেয় নি। কায়দায় পেয়ে আজ আবার চেয়ে বসল। পাকা ঘুঘেল হয়ে পড়েছে ভানুমতী—ঘুষ বিনে কাজকর্ম নেই। একেবারে আমাদের সরকারি আমলা।

বিনা বাক্যে পূর্ণিমা রুমাল দিয়ে দিল। তারপরেও ভানু ঠোক্কর দিতে ছাড়ে নাঃ তেরো দিনের মধ্যে মেয়ে সরাতে হবে—তুমি তো নোটিশ দিয়ে রেখেছ দিদিমণি।

পূর্ণিমা বলেঃ কমছে না বুঝি সে তেরো দিন। তার ভিতরে তিন দিন চলে গেছে দশটা দিন বাকি।

মুহূর্তে আবার এতখানি কড়া—পিছন তাকিয়ে ভানু দেখল, যা ভেবেছে তাই—ছাতে এসে শিশির কাপড় মেলে দিচ্ছে, কানে শুনতে পাচ্ছে যাবতীয় কথাবার্তা।

পূর্ণিমা অফিসে চলে গেল তো এবার শিশির। কলে জল থাকতেই এই কারণে নেয়ে নেবার তাড়া।

শিশির বলে, ভাত দে ভানু, আর দেরি করব না। কপাল ভাল যে দয়া হয়েছে তোর। কপাল আরো ভাল যে ফ্যাক্টরির কাজ পড়েছে।

ভানু বলে, কদ্দিন চলবে আর ফ্যাক্টরির কাজ ?

সে খোঁজ নিয়ে কি হবে ? মেয়ে তো সরিয়ে দিতেই হচ্ছে।

না বোঝার ভান করে ভানুমতী বলে, কেন ?

কানেই তো শুনলি। আর দশটা দিন আছে—তাড়িয়ে দেবে তারপরে।

ভ্রূভঙ্গি করে ভানু বলে, দিলেই হল ! অত সোজা নয়।

না রে, বিষম একগুঁয়ে তোর দিদিমণি। বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে বলে গেল, শুনলি নে ?

তবু ভানুমতী তিলমাত্র উদ্বিগ্ন নয়। বলে, বিদ্যে শিখেছে—তারই খানিকটা ভুড়ভুড়ি। বলুক গে যা খুশি।

যে কাণ্ড এইমাত্র স্বচক্ষে দেখল—দিদিমণির জারিজুরি জানতে কিছু বাকি নেই। কিন্তু গুহ্য কথা খুলে বলা যায় না। ভানুমতী বলে, ওসব কথায় কান দিও না। সিল্কের শাড়ি যেদিন কিনবে, আমায় বোলো কিন্তু জামাইবাবু। দোকানে গিয়ে পছন্দ করব।

॥ ছেচল্লিশ ॥

দিব্যি চলেছে বন্দোবস্ত মতো। বারান্ডা-ঘর ইদানীং ভানুমতীর দখলে। দুপুরে-বেলাটা ঐ ঘরে কুমকুমকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে, পাশে পড়ে নিজেও ভোঁসভোঁস করে ঘুমোয়। আজ দুপুরে মেয়ে কেমন বিগড়ে গেছে, ঘুমোবে না! থাবা দিয়ে ভানু হয়রান। রাগ করে ওঠে: হয়েছে কি তোমার শুনি, বজ্জাতি বড্ড বেড়েছে! ভালো চাও তো ঘুমোও এক্ষুনি।

অনেক করে অবশেষে চোখ বুঁজল। নিজেরও ঘুম ধরেছে খুব, মেয়ে কোল থেকে বিছানায় নামিয়ে ভানুও শুয়ে পড়বে। ওমা, থাবা নেওয়া যে-ই না বন্ধ, মেয়ে অমনি চোখ পিটপিট করে তাকিয়ে পড়ে। ভয় দেখাচ্ছে ভানু: দাঁড়াও, হোঁদলকে ডেকে দিচ্ছি। ও হোঁদল, এই দেখ, ঘুমুচ্ছে না—ধরে নিয়ে যাও। ডাক শুনে হোঁদল যেন এসে পড়েছে—গলা চেপে একটা আওয়াজ তুলল। আওয়াজ শুনে ভয় পাবে কি—হাসিতে ঝিকমিক করে মেয়ের চোখ-মুখ। না ঘুমানোর শাস্তি দিতে হোঁদল যদি সত্যি সত্যি আসত, এসেই তার মত বদলে যেত: না, কক্ষনো তুমি ঘুমোবে না কুমকুম—চোখ মেলে থেকে হাসি ছড়াবে অমনি। পদ্মের পাপড়ি বন্ধ হয়ে গেলে ভাল লাগে কার!

রাগে হয় না, ভয় দেখিয়ে হয় না—শেষটা ভানু অনুনয়-বিনয় করছে। ঘুমোও সোনা আমার,যাদু আমার—

হেনকালে খটখট করে সদর দরজার কড়া নড়ে উঠল। কোন্ মুখপোড়া জ্বালাতে এলো দেখ। ঘুঁটেওয়ালিকে ঘুঁটের কথা বলে দিয়েছিস কাল।

কে? আর সময় পেলি নে—এখন এসেছিস ঠিক দুপুরবেলা?

দোর খোল্ ভানু—

সর্বনাশ, পূর্ণিমার গলা। ভানুর সর্বদেহ হিম হয়ে যায়। অফিস ছেড়ে পূর্ণিমা এলো কি জন্যে? দিশা পায় না ভানুমতী—বাচ্চা নিয়ে কি করে এখন, কোথায় ঢাকা দেয়?

দরজা খুলে ভানু বলে, অসময়ে কেন দিদিমণি?

মাথা ধরেছে বড্ড, বসতে পারলাম না। ছুটি নিয়ে এসেছি।

চেহারাতেও সেই কাতর ভাব! ভানু তাড়াতাড়ি বলে, শুয়ে পড়ো গে যাও। বিছানা করে দিচ্ছি।

আর কন্যারত্নটি এমন—ভানু বেরুল, এক মিনিট তারপরে আর ঘরে থাকবেন না। দু-দুখানা পা হয়েছে, থপথপ করে বেরিয়ে পড়লেন বারান্ডায়। ভেবেচিন্তে একটা কৈফিয়ত দাঁড় করাবে, এতটুকু তার সময় দিল না।

পূর্ণিমা গরম হয়ে বলে, মেয়ে নিচে কেন? তোর জামাইবাবু কি করছে?

ভানু নিরুত্তর থাকে।

মেয়ে দিয়ে বাবুর বুঝি মজা করে ঘুমানো হচ্ছে? কিন্তু সিঁড়ি বেয়ে তো নামতে পারে—মেয়ে নিচে এলো কেমন করে?

ভানু তথাপি নিরুত্তর।

পূর্ণিমা গর্জে ওঠে: মেয়ে উপরে নিয়ে আয়, বোঝাপড়া হবে। মেয়ে-ধরার জন্য

তুই শোস। যে এনেছে তার দায়—সে দেখবে।

চিৎকার করে বলছে, উপরতলার মানুষটির কানে যাতে পেঁছিয়। এবং দুমদুম করে মেঝে কাঁপিয়ে চলাফেরা করছে।

ভানু বলে, জামাইবাবু নেই—

নেই তবে গেল কোথা ?

হাতে-নাতে ধরে ফেলেছে—রক্ষা নেই আর। ভানু হাউ-হাউ করে কেঁদে পড়ল।

পূর্ণিমা অবাক হয়ে বলে, কাঁদছিস কেন রে ? কি হয়েছে ?

ভানু বলে, মেয়েটাকে ছুঁতে পর্যন্ত মানা করেছে—তোমার মানা রাখতে পারি নি দিদিমণি। চাকরি চলে যায় বলে জামাইবাবু এমন করতে লাগল—

পূর্ণিমা ভ্রুকুটি করে : কী হয়েছে, খুলে বল্।

গোপন ব্যবস্থাটা ভানুমতী মোটামুটি বলে গেল ' বলে আর অঝোর ধারে কাঁদে। বজ্রপাত তো এইবারে—পূর্ণিমার মুখে তাকাতে সাহস পায় না, দুই পা জড়িয়ে ধরে : সমস্ত তোমার কাছে গোপন রেখেছি দিদিমণি, মিথ্যে বলেছি—

তা কি হয়েছে !

ভানুকে তুলে ধরল পূর্ণিমা। আশ্চর্য মধুর কণ্ঠ। বলে, মিথ্যে একটু-আধটু সবাই বলে থাকে। কলিকাল বলেছে কেন তবে !

অনুতপ্ত কণ্ঠে ভানুমতী বলে যাচ্ছে, চাকরি যাক আর থাক—আমি তার কি জানি ? মেয়ের কাজ আমায় দিয়ে আর হবে না। জামাইবাবু আসুক, স্পষ্টাপষ্টি বলে দেবো আজ।

পা-পা করে এগোচ্ছে কুমকুম—পূর্ণিমার সকৌতুক দৃষ্টি সেই দিকে। অন্যমনস্ক ভাবে সে ভানুর কথায় সায় দিয়ে যায় : বলছি তো তাই। চাকরির জন্যে তোর দায়টা কিসের।

পা টলে গিয়ে আছাড় খায় বুঝি এবারে মেয়ে ! ঝাঁপিয়ে পড়ে পূর্ণিমা কোলে তুলে নেয়। ভানুকে বলে, কাজের তো অন্ত নেই তোর—দুটো হাতে কত আর খাটবি ? এসে পড়েছি যখন, মেয়ে আমি দেখছি। এদিককার কাজকর্ম এগিয়ে নে তুই।

মেয়ে নিয়ে চক্ষের পলকে উপরতলায়। ক্ষণ পরে ডাক পড়ল : শুনে যা ভানু একবার—

শুয়ে পড়েছে পূর্ণিমা। বাঁ-হাত মেয়ের গায়ে জড়ানো, ডান-হাতে মাথা টিপে ধরেছে। যন্ত্রণা বিষম, সে আর মুখে বলতে হয় না।

ভানু এলে আচমকা প্রশ্ন : কে তোর মনিব ভানু ? জামাইবাবু, না আমি ?

তুমি দিদিমণি। জামাইবাবু এই তো সেদিন মাত্র এলো।

জামাইবাবুর কথা আমার কাছে গোপন রেখেছিস তো আমার কথাও ওর কাছে গোপন রাখবি।

ভানু সঙ্গে সঙ্গে রাজি : রাখব।

ওর ফেরার আগেই আমি সরে পড়ব। এই যে এসেছি, ঘুণাক্ষরে যেন জানতে না পারে।

এই কর্মে ভানুমতী সাতিশয় দক্ষ। সজোরে ঘাড় নেড়ে বলে, জানবে না। দেখো তুমি—

আর দেখ্, মেয়ে নিয়ে ওকে তুই কিছু বলতে যাবি নে। যেমন চলছে, চলতে দে। সত্যিই তো, কামাই হলে ওর চাকরি থাকবে না। চাকরি গেলে নিরুপায়—এ-বাজারে

একজনের রোজগারে সংসার চলে না। পুরুষমানুষ হয়ে ঘরে বসে বউয়ের রোজগার খাবে, সেই বা কেমন!

ভানু হাত বাড়াল কুমকুমকে নেবার জন্য: আমার কাছে থাকুক। তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও দিদিমণি, মাথা ছেড়ে যাবে।

পূর্ণিমা বলে, তোর যে একগাদা কাজ—

সে আর কবে নেই? পড়েও থাকে না তো কিছু। মেয়ে কাছে থাকলে তোমার ঘুম হবে না।

পূর্ণিমা চটে ওঠে: দিনদুপুরে ঘুমোব কেন রে? অফিসে বুঝি ঘুমোতে যাই?

কষ্ট হচ্ছে, সেই জন্যে বলি—

না, না—করে পূর্ণিমা উড়িয়ে দিল তো ভানু হেসে বলে, নেই কষ্ট তো বাঁ-হাতটা সরাও কপাল থেকে। আমি একটু টিপে দিই।

পূর্ণিমা বলে, কাজকর্ম ফেলে তোকে টিপতে হবে কেন রে? সেজন্যে লোক রয়েছে —তার মতন কেউ তোরা পারবি নে।

কুমকুমের হাত টেনে কপালের উপর দিল। আরামে আ—আ করছে। কয়েকটা মিনিট পরে তড়াক করে উঠে পড়ল।

সেরে গেছে—

একগাল হেসে কুমকুমকে পূর্ণিমা বুকে তুলে নিল: বুঝলি রে, মেয়ের হাতে মন্তোর আছে—মাথার যন্ত্রণা হাত বুলিয়ে মুছে দিয়েছে।

নিচে নেমে এলো তরতর করে, আবার উপরে উঠল। মেয়ে নিয়ে কি করছে আর না করছে। কখনো কোলে, কখনো কাঁধে, কখনো মাথায়, আড়কোলা করে কখনো বা বুকের উপরে। সারা বাড়ি যেন নেচে বেড়ায়। লোকে নেহাৎ পাগল বলবে—নইলে বুঝি উল্লাসে রাস্তা জুড়ে ছুটোছুটি করত।

ঢং করে ঘড়িতে সাড়ে-তিনটা বাজল। কুমকুমকে নামিয়ে ভানুর কাছে দিল পূর্ণিমা: চললাম—

ভানু বলে, এক্ষুনি কেন দিদিমণি? জামাইবাবুর আসার দেরি আছে।

তাই কি বলা যায় রে? পালিয়ে চলে আসে, নিয়মের বাঁধা-বাঁধি নেই। আজ যদি খানিকটা আগেই এসে পড়ে।

কুমকুমের গাল টিপে আবার একটু আদর করল। বলে, ধরা না পড়ি—সময় থাকতে সরে যাওয়াই ভাল। অন্যদিন যেমন অফিস থেকে আসি, আজকেও তেমনি আসব। কোন রকমে সন্দেহ করতে না পারে। দেরি করেও আসতে পারি। মেয়ে তখন তো ওর দখলে চলে গেছে, তোর কাজে ভণ্ডুল দিচ্ছে না—তবে তাড়াতাড়ি আসতে যাব কেন?

পরের দিন পূর্ণিমা অফিস করতে গেছে। শিশিরও যথারীতি বেরুল। অনতি-পরেই পূর্ণিমা ফিরে এসে কড়া নাড়ে।

মেয়ে খাওয়াচ্ছিল ভানু। হাত ধুয়ে দোর খুলে দিয়ে জিজ্ঞাসা করে: আজকে কি দিদিমণি? আবার মাথা ধরল?

মাথাধরা কেন? মাথা ক'দিন ধরে থাকে—ধরে নে, জ্বরই হয়েছে আজ।

ব্যস্ত হয়ে ভানুমতী বাঁ-হাতের উল্টোপিঠ কপালে ঠেকিয়ে উত্তাপ দেখে। হেসে উঠে পূর্ণিমা বলে, সত্যি সত্যি নাকি? অফিস থেকে কাল জ্বর-ভাব নিয়ে এসেছিলাম—

আসত ঠিকই জ্বর। যা দুর্দান্ত মানুষ আমি—জ্বর কাছাকাছি এসে ভয়ে পালিয়ে গেছে। ট্রামে উঠে কালকের কথাটা মনে এসে গেল। সবাই ভেবে রেখেছে, জ্বর হয়েছে আমার—ভুগব এখন ক'দিন। আচমকা গিয়ে পড়লে অবাক হবে—কাজ কি অত জনকে অবাক করে দেওয়ায়। জ্বরে ভুগছি, অফিসের ওরা জেনে বসে থাকুক।

সাবানে হাত ধুয়ে এসে ভানুকে ঠেলে দিল : সর্, আমি খাইয়ে দিচ্ছি। তোর কী অভ্যাস আছে?

সত্যি, কী পরিচ্ছন্ন পরিপাটি খাওয়ানো! রঞ্জুকে খাইয়ে খাইয়ে খাসা শিখে নিয়েছে। খাওয়ানো শেষ করে সগর্বে পূর্ণিমা বলে, তুই খাওয়াচ্ছিলি, তোর জামাইবাবু খাওয়ায়, আর আমি এই খাওয়ালাম—বল্ এবারে কেমন?

মুগ্ধকণ্ঠে ভানুমতী বলে, ছেলেপুলে হবার আগেই তুমি পুরোপুরি মা। গণ্ডায় গণ্ডায় পেটে আসুক না, তোমার কিছু অসুবিধে হবে না।

খাইয়ে ধুইয়ে মেয়ে উপরে নিয়ে গেল পূর্ণিমা। সিঁড়ির দরজায় আজ খিল এঁটে দিল—দিয়ে নিঃশঙ্ক হল, মেয়ের লোভে ভানু এসে হাত বাড়াতে পারবে না।

এই অসুখটা চলল এখন কয়েকটা দিন ধরে। ঠিক সময়ে অফিসের নাম করে বেরিয়ে যায়—শিশির চলে গেলে আধ-ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসে।

ভানুমতী বলে, জামাইবাবু তো চাকরি বাঁচাচ্ছে—নিত্যিদিন কামাই করছ, চাকরি তোমারই তো যাবে দিদিমণি।

তা বলে মানুষের অসুখ-বিসুখ বুঝি হতে নেই! হতেই তো যাচ্ছিল, তা যেন সারিয়ে ফেললাম।

ভানু জুড়ে দেয় : খুকু সেরে দিল—হাতের মন্তোরে।

ঘাড় নেড়ে পূর্ণিমা সায় দিল। তারপর তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলে, যায় চাকরি যাক গে—আপদ চুকে যায়। সারা দিনমান বসে বসে ফাইল ঘাঁটা, আর টান টান হয়ে বসে টাইপ করা—মেয়েমানুষের পোষায় এই সব? মেয়েমানুষের রোজগার খেতে পুরুষের লজ্জা, কিন্তু পুরুষের রোজগারে মেয়েরা তো ঘরে ঘরেই খাচ্ছে—তাতে কোন লজ্জা নেই।

মেয়ে বুকে তুলে পূর্ণিমা উপরে চলে যায়।

খানিকটা পরে তোলপাড় লাগিয়েছে : ওরে ভানু, কাণ্ড দেখে যা! শিগগির চলে আয়, শিগগির—

চিৎকার শুনে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ভানুমতী ছুটে এলো : কী হয়েছে দিদিমণি?

উত্তেজিত কণ্ঠে পূর্ণিমা বলে, মুখে কি বলব? ভয়ানক কাণ্ড রে—দাঁড়া, একটু নিজের কানে শুনে যা।

না জানি কোন্ ব্যাপার—উদ্বেগে ভানুর মুখ শুকিয়েছে। দেরি হল না, ভয়ানক কাণ্ড আবার ঘটল—পূর্ণিমার মুখে মুখে রেখে আধো-আধো স্বরে কুমকুম ডেকে উঠল : মা মা—

শুনলি রে, শুনলি? এ সর্বনাশ কে করল? এরা হল তোতাপাখীর মতো, যা শেখাবে তাই শিখে নেবে—

ভানুর উপর চোখ গরম করে : তোর কাজ। পেটে পেটে শয়তানি—তুই শিখিয়েছিস ঠিক।

ভানু আকাশ থেকে পড়ে : কক্ষনো না। আমার গরজটা কি বলো দিদিমণি।

গরজ আছে বইকি! নিজে তুই মায়ায় মজেছিস, আমাকেও তেমনি মজাতে চাস।

ভানুমতী দিব্যিদিশেলা করে: তোমার গা ছুঁয়ে বলছি দিদিমণি, আমি নই। মিথ্যে আমায় বদনাম দিও না।

হেন ক্ষেত্রে মেয়েকেই সাক্ষি মানতে হয়: আমি 'মা' নই, তবু কে শিখিয়েছে 'মা' বলতে। এই ভানু-দুষ্টুটা—উঁ?

হুঁ-উ—করে কুমকুম কলের পুতুলের মতো ঘাড় নাড়ে।

বিজয়ীর উল্লাসে পূর্ণিমা বলে, দেখলি তো? ছেলেপুলেরা হল দেবতা—

ভানুমতী রাগ করে বলে, দেবতা না ঘোড়ার-ডিম। বিষপুঁটুল। দেবতা হলে এমন ডাহা মিথ্যে বলত না।

তখন গবেষণা চলে—কে হতে পারে মানুষটা, শয়তানি করে যে 'মা' বুলি শেখাল?

ভানুমতী ভেবে বসে, ঘুঁটেওয়ালি এসে কেবলই তো 'মা' 'মা' করে। তোমায় 'মা' বলে, আমায় 'মা' বলে। তাই হয়তো শুনে শুনে শিখেছে।

এ সন্দেহ পূর্ণিমা উড়িয়ে দেয়: দু'বার চারবার শুনে কি আর শিখে নিতে পারে, ধরে ধরে শেখাতে হয়।

তবে বুড়ো ডাকপিওনটা হবে। বখশিস নিতে এসে মেয়ের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে আগডুম-বাগডুম বকছিল। সে শিখিয়ে গেছে বোধহয়।

পূর্ণিমা বিরক্ত হয়ে বলে, দুনিয়াসুদ্ধ ধরে টানছিস, তোর জামাইবাবুর নাম একবারটি করলি নে। সে-ও তো হতে পারে।

সন্দেহ যে আসে নি, তা নয়। ইচ্ছে করেই ভানু নামটা তোলে নি। পরের মেয়ে আশ্রয় দিয়ে এমনিই বেচারি অহোরাত্র নাস্তানাবুদ হচ্ছে—তার উপরে আবার নতুন দোষ চাপাতে মায়া লাগে।

পূর্ণিমা বলে, মা বলিয়ে ভেবেছে মন গলাবে আমার। সে হচ্ছে না—কঠিন মেয়েমানুষ আমি। মন পাথরে গড়া।

কায়দায় পেলো তো ভানুমতীই বা না শুনিয়ে ছাড়বে কেন? বলে, তা সত্যি, তুমি বড্ড কঠিন। মেয়েটাকে দূর-দূর করছ, তাড়ানোর নোটিশ দিয়ে রেখেছ।

হপ্তার সময় চেয়েছিল, আমি পুরো মাস দিয়ে দিলাম। সে-ও তো পুরে গেছে—

মন গলাবার উদ্দেশ্যে ভানুমতীর ঐ সমস্ত বলা। কিন্তু কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ—নোটিশের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, মনে করিয়ে দেওয়া হল পূর্ণিমাকে। না জানি কি খোয়ারটা ঘটে আবার এই নিয়ে!

চাপা দেবার জন্যে তাড়াতাড়ি ভানু বলে, ভুলে গেছে জামাইবাবু। গেছে তো কী হয়েছে, কী আর ঝঞ্ঝাট আমাদের! আজ আমি মনে করিয়ে দেবো।

পূর্ণিমা কড়া হয়ে বলে, তোর কোন্ দায় পড়েছে? এ-সবের মধ্যে থাবি নে তুই, মানা করে দিচ্ছি।

একটু থেমে আবার বলে, আমারই বা দায়টা কিসের? তোর আছে সংসারের খাটনি, আমার আছে চাকরি-বাকরি। নিজেদের কাজে হাবুডুবু খাচ্ছি—কোথেকে কার মেয়ে কে কুড়িয়ে আনল, কবে তাকে ফেরত দিতে হবে, এত খোঁজখবরে আমাদের কি দরকার?

তাচ্ছিল্যের ভাবে ভানুও সায় দিয়ে বলে, কী দরকার!

এই সমস্ত হয়ে পূর্ণিমা আজকেও সাড়ে তিনটায় বেরিয়ে গেছে। একটু রাত্ত করে বাড়ি ফিরল। এক পুরানো বান্ধবীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল হঠাৎ অনেকদিন পরে। মেয়ে তো সন্ধ্যা থেকে বাপের দখলে, তাড়াই-বা কিসের! আরও এক আশংকা আছে—

[illegible] [illegible] মামাকে 'মা' ডেকে বসে, কেলেঙ্কারির অন্ত থাকবে না। মেয়ে ঘুমিয়ে থেকো ভাবে সে উপরে দেখা দেবে আজ। এমনি সব ভেবে ইচ্ছে করেই খানিকটা দেরি করল।

বাড়িতে পা দিতেই ভানুমতী শুষ্কমুখে বলল, খুকু নেই দিদিমণি—

সে কি-রে ? গেল কোথায় ?

বাপের খোঁজ হয়েছে। জামাইবাবুর সঙ্গে আর একজন এসেছিল—সেই মানুষটাই বোধহয় বাপ। ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে চলে গেল। জামাইবাবু বলল, আর তোদের জ্বালাতন হতে হবে না—চুকে-বুকে গেল।

বলতে বলতে ভানু চোখে আঁচল দিল।

পূর্ণিমা পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ক্ষণকাল। তারপর বলে, ভালই হল। নিরিবিলি হলাম আমরা। কেমন রে ভানু ?

জবাব না দিয়ে ভানুমতী রাগে রাগে চলে যাচ্ছে। ধপ করে শব্দ হল। মুখ ফিরিয়ে দেখে, হাত-পা ছেড়ে পূর্ণিমা মাটির উপর বসে পড়েছে। লজ্জা-বাধার কিছু নেই আর এখন—দু'চোখে জলের ধারা।

॥ সাতচল্লিশ ॥

শিশিরের সঙ্গী সেই মানুষটা হল অমিতাভ। পরম উপকারী বন্ধু—বেলগাছিয়ার মেসে এক সিটে যার সঙ্গে থেকেছে। ফৌজদারি কোর্টের জুনিয়ার উকিল—পশার জমে নি এখনো। যেসব আসামি উকিল জোটাতে পারে নি, তাদের পক্ষ নিয়ে উপযাচক হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে মামলার মধ্যে স্বদেশি গন্ধ থাকে যদি একটু। আজকের মত বাঘা বাঘা উকিল-ব্যারিস্টার—পিছন তাকিয়ে দেখুন, অনেকেই এমনি পথ ধরে তিলে তিলে নামযশ কুড়িয়েছেন।

আজ অমিতাভ পয়লা কেসটা সেরেই কোর্ট থেকে শিশিরের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে। বাসার ঠিকানা জানা নেই, তবে সুবিখ্যাত হার্মান কোম্পানির ঠিকানা কে না জানে ? সেখানে গিয়ে শুনল, শিশির ফ্যাক্টরিতে। খুঁজে খুঁজে ফ্যাক্টরিতে এসে হাজির। ভিতরে যাবার নিয়ম নেই, স্লিপ পাঠিয়ে দিয়ে সে বাইরে অপেক্ষা করছে।

শিশির হন্তদন্ত হয়ে এসে বলে, এদ্দুর অবধি ধাওয়া করেছেন—খবর কি অমিতবাবু ?

আছে বই কি খবর ! সে খবর সবচেয়ে বড় আপনার কাছে।

চোখ মিটমিট করে রহস্য-ভরা কণ্ঠে অমিতাভ বলে, বলুন তো কি হতে পারে ?

শিশির মনে মনে আকাশ-পাতাল হাতড়ে বেড়াচ্ছে। অমিতাভ বলে, অথচ আমার আগে আপনার নিজে থেকেই খবরটা জানা উচিত ছিল। খবরের-কাগজ পড়েন না—আইন-আদালতের খবর ?

মোটা-খবরগুলোয় চোখ বুলিয়ে নিই, অত কে পড়তে যায় !

তারপর তাচ্ছিল্যের সুরে শিশির বলে, সাহিত্য শুনেছি খুব কেচ্ছাদার আজকাল। বানানো গল্প খবরের কাগজে চলে না বলে পাল্লা দিয়ে ওরা ফৌজদারি কেচ্ছা ছাপে। আইন-আদালত আর হালের সাহিত্য—কোনটাই পড়িনে আমি।

অমিতাভ বলে, আপনার মামার খবরও থাকে ঐ আইন-আদালতে।

আমার মামা ? স্তম্ভিত বিস্ময়ে শিশির তাকিয়ে পড়ে।

অবিনাশ মজুমদার।

সগর্বে অমিতাভ বলে, ওঁদের ডিফেন্সে আজ থেকে ঢুকে গেছি। আলাপ-পরিচয় হল। আপনার নাম করলাম। প্রসিকিউশন আজ কেস মুলতুবি চাইল। তারপরেই শুটতে ছুটতে আপনার কাছে এসেছি।

এত সমস্ত শিশির শুনছে না। ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করে: কোথায় আছেন আমার মামা?

নব-বীরপাড়া কলোনি—আবার কোথা?

শিশির বলে, কোথায় সে কলোনি? কলকাতার চারিদিকে পনের-বিশ মাইল অবধি আমি যে তন্ন-তন্ন করে খুঁজেছি—

অথচ পাঁচটা মাইলও নয় শহর থেকে। এই তো মজা, অতি কাছের জিনিষ নজরে আসে না।

অমিতাভর হাত জড়িয়ে ধরে গভীর কণ্ঠে শিশির বলে, আজ ক'দিন নিরুপায় হয়ে কেবল মামা-মামীর কথাই ভাবছি। সেই মুখে আপনি খবর নিয়ে এলেন। অনেক উপকার নিয়েছি আপনার কাছ থেকে, কিন্তু আজকের এই উপকারের তুলনা হয় না।

ভাগ্যক্রমে একটা ট্যাক্সি যাচ্ছিল। গাড়ি থামিয়ে অমিতাভকে বলে, চলুন যাই মামার কাছে—এখনই।

ওয়ার্কস-ম্যানেজারকে বলে-কয়ে যাওয়া উচিত, সেটুকু সবুর সয় না। গাড়িতে বসে মামার খবর সবিস্তারে শুনছে।

ফৌজদারি মামলার আসামি অবিনাশ। তিনি এবং আরও অনেক জনা। শিশিরের বন্ধু জেনে অমিতাভর সঙ্গে অনেক কথা হয়েছে! এই কলোনিতে গিয়ে আরও দু-তিনটে চিঠি দিয়েছেন তিনি শিশিরের গ্রামে। চিঠি ফেরত আসে নি, তবে গাঁয়ের একজন দয়া করে খবরটা দিলেন, শিশির হিন্দুস্থানে এসে গেছে। গাইগরুটা নেই, সেই রাত্রে লুঠ করে নিয়েছিল। দুগ্ধবতী ছাগী কিনেছেন এবার। বাড়তি একটা ঘরও আছে—বিয়ে করেছে—তা শুধু মেয়ে কেন, বউমাকে নিয়েই চলে আসুক না।

(বউমা বলছ কাকে মামা—জান না তাই, বউয়ের চেহারায় আস্ত একখানি ঢেঁকি। অনুরোধে ঢেঁকি গিলতে হয়েছে। পরিপাক করা যাচ্ছে না, অসম্ভব! সেই ঢেঁকি কোনরকমে এখন উগরে ফেলার চেষ্টা।)

ট্যাক্সিওয়ালাকে শিশির বলে, ঘুমাও—

অমিতাভ বলে, কি হল?

হাতঘড়িতে সময় দেখে নিয়ে শিশির বলে, বাসায় যাচ্ছি। মেয়েটাকে নিয়ে নেবো।

অমিতাভ বলে, এক্ষুনি কেন? সুবিধা-অসুবিধা দেখে আসুন আগে গিয়ে—

আমার মামা আমার মামীর চেয়ে দুনিয়ার মধ্যে কোন খানে বেশি সুবিধা আমার মেয়ের?

বাসায় এসে কুমকুমকে ট্যাক্সিতে তুলে নিল।

অমিতাভ জিজ্ঞাসা করে: মিসেস নেই বুঝি এখন?

না, অফিসে।

তারপর অমিতাভ'র কাছে মুখরক্ষার মতো ভাহা মিথ্যাকথাটা বলল: থাকলে কি এত সহজে হত? মেয়ে-অন্ত প্রাণ। তাড়াতাড়ি চলুন ভেগে পড়ি।

ফিরে আবার ভানুমতীর কাছে গিয়ে তাঁর কণ্ঠে বলে, আপদ বিদেয় হল—শান্তিতে সংসারধর্ম কর্ তোরা এবারে! সিন্দেকর শাড়ি ঠিক ঠিক পেয়ে যাবি—ভয়

করিস নে।

ট্যাক্সি কলোনির ভিতরে যাবে না, কাঠের পুল পেরিয়ে তিন-তালগাছ অবধি এসে থামল। পথের শেষ। আগে একদিন এখানেই এসেছিল,সেদিন দেখতে পায় নি—আজকে তালগাছের গায়ে নতুন সাইনবোর্ড জ্বলজ্বল করছে: নব-বীরপাড়া দেখে গিয়েছিল, পোড়ো-ভিটে আধপোড়ো চাল-বেড়া আর ছাই। ছাইয়ের স্তূপ। ছাই সরিয়ে ভিটের ভিটের চালাঘর উঠে গেছে। আটষট্টি ঘর গৃহস্থ আবার এক জায়গায় জমেছে। সেই আগেকার জায়গায়।

ট্যাক্সি হর্ন দিয়েছে, ছেলেপুলের দল পিলপিল করে এসে দাঁড়াল। নেমে পড়ে অমিতাভ জিজ্ঞাসা করে, বড়দা'র কোন্ বাড়ি? অবিনাশ মজুমদার নয়, বড়দা নামে চিনবে—একদিনের পরিচয়ে অমিতাভ সেটা জেনে নিয়েছে।

ছেলেপুলেদের কেউ গিয়ে খবর দিক, কিংবা ট্যাক্সি দেখে নিজেরাই বুঝে নিন—মামী কনকলতা, দেখা গেল, ছুটতে ছুটতে আসছেন! এবং অনতিদূরে বাড়ির দরজায় অবিনাশ বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন।

কনকলতা ছোটখাটো মানুষ, বাঁধন-আঁটা শরীর তাঁর। এবারে দেখা গেল, শরীরের সে বাঁধন নেই আর—জরা এসে যাচ্ছে। ছুটোছুটিতে তবু কম যান না। এতদিন পরে দেখা—প্রণাম করে শিশির দুটো খবরাখবর নেবে, তা যেন ছটকট করছেন। ছিনিয়ে নিয়ে নিলেন কুমকুমকে। পায়ের ধুলো নিতে যাচ্ছে—তিড়িং করে সরে গেলেন। কোন মহারত্ন পেয়ে গেছেন যেন, কলোনির বাইরে এই অরক্ষিত স্থানে লুঠ হয়ে যাবার ভয়—এমনি ভাবে কুমকুমকে কোলের মধ্যে আঁচল-ঢাকা দিয়ে পাড়ার ভিতর ঢুকে গেলেন।

অমিতাভ অবাক হয়ে দেখছে। শিশির সগর্বে বলে, আমার মামী। বাইরেটা বদলেছে। ভিতরে সেই একরকম। বয়সে মামা-মামীকে বুড়ো করতে পারে না।

দুই বন্ধু ভিতরে গিয়ে মাদুরে বসেছে। তাতেও জুত হল না শিশিরের—তড়াক করে উঠে কোত্থেকে এক তাকিয়া জুটিয়ে এনে গড়িয়ে পড়ে: আঃ!

এ-বাড়ি ও-বাড়ির বয়স্ক দু-চারটি এসে জুটেছেন - গ্রামে যেমন হয়ে থাকে। হুঁকো খাচ্ছেন—এ-হাতে ও-হাতে হুঁকো ঘুরছে। গ্রাম্য কথাবার্তা, গ্রামের চালচলন। বীরপাড়া নামক জায়গাটিকে পাকিস্তানের কঠিন বেড়া ঘিরে তফাত করে দিয়েছে, বেড়া গলে বেরিয়ে মহানগরের গা ঘেঁষে সে ঠাঁই নিয়ে আছে। নিজস্ব চেহারায় নিজের ইজ্জতে আছে সে, শহুরে নকল পোশাক অঙ্গে নেয় নি। আঃ—বলে শিশির বড় আরামের নিশ্বাস ফেলে। প্রবাস থেকে আজ যেন সে নিজের ঘরে ফিরে এলো।

বলে, সব জায়গা ঘুরেছি মামা, এই জায়গাটুকু বাদ। একদিন এখানে এসে ছাই দেখে গিয়েছিলাম, আবার এমনি সোনার পাড়া জমে উঠবে কেমন করে বুঝি।

অবিনাশ বলেন, এমনিই হয়, ছাই উড়িয়ে পত্তন ওঠে। লাঞ্ছনা নিয়ে চোখ মুছতে মুছতে একদিন যে পথে গিয়েছিলাম, বুক ফুলিয়ে জয়ের উল্লাসে সেই পথেই ফিরে আবার দখল নিয়েছি। নব-বীরপাড়া তো নকল বীরপাড়া। আসল বীরপাড়ায় তার মহলা হয়ে রইল।

মুহূর্তকাল স্তব্ধ থেকে দৃঢ়কণ্ঠে আবার বলেন, হবেই—দু-বছরে, কিংবা দু হাজার বছরে! আমার আগুন তোর বুকে জ্বালিয়ে নিবি, তুই আবার জ্বালিয়ে যাবি কুমকুমের বুকে! সে জ্বালাবে পরে যারা আসছে সেইসব উত্তরপুরুষের ভিতর। হিটলার দেশের পর দেশ দখল করে ফেলল—সেই সেই গবর্নমেণ্ট লণ্ডনে দফতর খুলে অপেক্ষা করছিল, হিটলার ধ্বংস হলে যে যার স্বদেশে ফিরল। আমরাও ফিরব। যে ব্যবস্থা পড়শিতে

পড়শিতে বিভেদ আনে, এক দেশ ভেঙে দুটো দেশ বানায়, দাঙ্গা বাধিয়ে হাজারে হাজার মানুষ হত্যা করে আরও লাখ লাখ মানুষকে ভিখারি বানিয়ে পথে বের করে দেয়, তার উপর কারো এতটুকু মমতা থাকতে পারে না। অধঃপাতে যাক আপন-মোড়ল সেই মাতব্বরগুলো, এতবড় সর্বনাশ যারা নিয়ে এসেছে। মূর্তি বানিয়েছে তারা নিজেদের, রাস্তার গায়ে নাম সেঁটে দিয়েছে। ইংরেজও করেছিল। কী হল—মূর্তি গুদামঘরে গাদা হচ্ছে, রাস্তার নাম পাল্টাচ্ছে। পরিণাম এদেরও আলাদা হবে না।

সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে। কুমকুমের সাড়া-শব্দ নেই—ছেলেমেয়ে ধরা অন্তঃপুরের কাজ, তাঁদের কাজ তাঁরা দেখছেন। কুসুমডাঙাতেও এমনি ছিল। শিশির অমিতাভকে বলে, রাত্তিরটা অন্তত থেকে যান। এটা গ্রাম জায়গা, আমার মামার বাড়ি, গাঁ-গ্রামে এসেই অমনি যাই-যাই করা চলে না।

অমিতাভ হেসে বলে, নতুন কি শেখাচ্ছেন—দেখে আসি নি আপনাদের গ্রাম? অসুবিধাও এমন কিছু নেই। চাকরিবাকরি নেই যে সকালে উঠে অফিসে দৌড়ানোর তাড়া, মক্কেলের ভিড় নেই যে সকাল সকাল কোর্টে দৌড়ানোর তাড়া। একটা জিনিষ কেবল—মেসের ওরা সব ভাববে।

শিশির বলে, ঘর খোলা আছে তো? তাশের আড্ডা ঠিক থাকলে কেউ কিছু ভাবতে যাবে না। 'তুমি কার কে তোমার—' মেস জায়গায় থাকলে তত্ত্বটা তবেই পুরোপুরি মালুম হয়।

রয়ে গেল অমিতাভ। মামলার দিক দিয়েও ভাল—অকুস্থল উকিলের সরেজমিনে দেখা হয়ে যাচ্ছে। আরও আছে—রোগচিকিচ্ছের সময় ডাক্তারে যেমন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যাবতীয় লক্ষণ শোনে, উকিলের বেলাতেও তেমনি হওয়া উচিত। হাকিমের সামনে বেকবুল যাব—বিলকুল মিথ্যে একটা মন-গড়া কাহিনী খাড়া করব। কিন্তু সত্যি ঘটনার আগাগোড়া চেহারাটা সামনে থাকলে তবেই ডিফেন্স নিখুঁত করে গড়া চলে। কোর্টের তাড়াহুড়োর মধ্যে খানিক খানিক শুনে জুত হয় না, সকলের কাছে সবিস্তারে শোনা যাবে এইবার।

নব-বীরপাড়ায় বড়দা'য় বাইরের-ঘরে ভারি জমল সে-রাত্রে। কলোনির মাতব্বরেরা আছে, ভিন্ন কলোনি থেকেও এ[illegible]ছে। কলোনি ছাড়াও আছে কেউ কেউ। ফৌজদারি আসামি এরা, জামিনে খালাস আছে। উকিল অমিতাভ এসে পড়েছে বলেই ভিড়টা কিছু বেশি। উমেশ সর্দারের লোক কলোনি পোড়াল, অবিনাশের হাত ভেঙে দিল। অনেকেই বলেছিল, ফৌজদারি দায়ের করো উমেশকে জড়িয়ে। অবিনাশ তখন নার্সিং-হোমে। ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন, বিচারের জন্য জোড়হাতে গিয়ে দাঁড়াব—কোন্ বিচারটা পেয়েছি আমরা এ যাবৎ? অবিনাশ মামলা করতে দেন নি তখন। এবারে উল্টো রকম ঘটল—উমেশই আদালতে এসেছে বিচার চেয়ে। ফৌজদারি দেওয়ানি—দুই রকম। দাঙ্গাহাঙ্গামা খুনজখম জমির জবরদখল—এই সমস্ত চার্জ।

সেই এক রাত্রিবেলা ঘর জ্বালিয়ে লাঠি মেরে বন্দুকের দেওড় করে জমি থেকে তাড়িয়েছিল, তারপরে আবার এক রাত্রি—প্রতিহিংসা নেবার রাত্রি। শুধু বীড়পাড়ার মানুষ ক'টি নয়, আশেপাশে যাবতীয় কলোনীর বাছা বাছা মরদ। আরও আছে—খাস কলকাতা শহরের মাঝ্যারি একটা দল, শঙ্কর এবং আরও সব ছেলে। মুরুব্বিদের ভুলভ্রান্তি ও ছলচাতুরীর কলঙ্ক মেখে বসে থাকতে রাজি নয় তারা। সশস্ত্র সকলে—অন্নের এখন অপ্রতুল বটে, অস্ত্রের নয়। অবিনাশদের যৌবনে হাজার টাকা দিয়েও একটা চোরাই রিভলবার মিলত না—অস্ত্র জোটাতে গিয়ে জেলবাস হয়েছে কত ছেলের,

জীবনও গেছে। সেই জিনিস মুড়িমুড়কির মতন হাটে-বাজারে বিকায়। অস্ত্র বেচে লাল হয়ে গেল কারিৎকর্মা জাতগুলো। মুখে জ্ঞানগর্ভ উত্তম বচন, কিন্তু মানুষ আজ সবচেয়ে বেশি খরচা করে মানুষ-হননের ব্যবস্থাপনায়। দেশে দেশে অস্ত্রের প্রতিযোগিতা, ডিফেন্সের বাজেট দিনকে দিন আকাশচুম্বি হচ্ছে। বৈজ্ঞানিকেরা কোমর বেঁধে গবেষণায় লেগেছেন, পাইকারি হারে কত নিপুণতায় মানুষ মারা যায়। পারমাণবিক কৌশল বের করে ফেলেছেন, আরও কতদূর অবধি পেঁছে যাবেন—অলক্ষ্যের অন্তর্যামী অবধি থরথর করে কাঁপছেন। এত বড় সমারোহের দিনে কোন্ বুদ্ধিহীন শূন্যহাতের সত্যাগ্রহে নামতে যায়! ভারতের তলোয়ার থাকলে তলোয়ার খুলতে বলতাম আমি, নেই বলেই অহিংস-অসহযোগ—গান্ধীজীরই কথা। দস্তুরমতো শাস্ত্রপাণি হয়ে এসেছে—অতএব। বোমা ফাটিয়ে রোশনাই করে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল। দরকার হলে প্রাণ দেবে, এবং নিতেও গররাজি নয় তারা—

রাত্রি থমথম করে বাইরে। ঘরের মধ্যে মানুষের ভিড়। হেরিকেন একটা টিমটিম করে জ্বলছে। ভারি জমেছে—অমিতাভ আর শিশির মগ্ন হয়ে কলোনি দখলের গল্প শোনে। ক্ষণে ক্ষণে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে।

আর ওদিকে, পূর্ণিমাদের সেই গলি একেবারে নিশুতি। ভানুমতীর খাওয়া-দাওয়া সারা। বাসায় যাবার টান—শিশির ফিরলেই চলে যাবে।

পূর্ণিমা বলছে, বাচ্চার জন্যে দুধটুকুও এগিয়ে দিবি নে, তোকে মানা করে দিয়েছিলাম—মরুক বাঁচুক তাকিয়ে দেখবি নে। কেন বলেছিলাম, বোঝ এবারে। একলা একজনের ক্ষমতায় রাখা যায় না। পারল না, দেখলি তো? চাপ পড়েছে, বলেই খুঁজে-পেতে বাপ বের করে ফেলল। জানতাম আমি—

ভানু বলে, তোমার অনেক বুদ্ধি।

প্রশংসাটা পরিপাক করে নিয়ে মুখে হাসি এনে পূর্ণিমা বলে, ঝঞ্ঝাট চুকে-বুকে গেল—কেমন নির্বিবিলি দেখ্ এখন।

মুহূর্তকাল চুপ থেকে ভানুর দিকে তাকিয়ে পূর্ণিমা বলে, কেন রে, কোন্ দুঃখে কাঁদতে যাব?

স্পষ্টাপষ্টি কাঁদা ভালো। কেঁদে হালকা হওয়া যায়।

কতটুকু বয়স ভানুমতীর—তার মুখে এমনি কথা! বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েগুলো বড্ড বেশি পাকা হয়ে যায়। কিন্তু সর্বনেশে ব্যাপার—অভিনয়ে অমন ঝানু নটবরকে অবধি ঠকিয়ে আসছি, সে ক্ষমতাটুকুও বাচ্চা মেয়ে সঙ্গে করে নিয়ে গেল।

তাড়াতাড়ি পূর্ণিমা বলে, আর রাত করিস নে ভানু, বাসায় চলে যা।

ভানুও তাই চায়, কিন্তু চক্ষুলজ্জায় আটকাচ্ছে। বলে, জামাইবাবু এসে যাক—

বাপটা এসেছিল তো—সেই লোক ওকে ঠিক আস্তানা অবধি টেনে নিয়ে গেছে। সেইজন্য দেরি হচ্ছে। এসে যাবে এক্ষুনি। চলে যা, তোর বর ভাবছে।

তুমি যে একলা থাকবে দিদিমণি?

থাকলামই বা একটুখানি। অফিসে কাজ করি, হনুমান জাম্বুবান কত সেখানে—তাদের মধ্যে থাকতে হয়। কনে-বউয়ের মতন ভয়তরাসে হলে চলে আমাদের?

চলে গেল ভানুমতী। সদর-দরজা বন্ধ করে দিয়ে একলা বাড়িতে প্রেতিনীর মতো পূর্ণিমা সারারাত্রি উপর-নিচে করে বেড়াচ্ছে।

॥ আটচল্লিশ ॥

কলোনি দখলের সেই গল্প। দুড়ুম-দাড়াম বোমা ফাটাল কাঠের পুলে ছাড়িয়ে এসে। হাতে হাতে মশালের আলো। জাঁকজমকের বিয়ে, বর-বরযাত্রীরা পেঁছে গেল —আয়োজন দেখে আচমকা এমনি মনে হবে। উমেশ সর্দার ইতিমধ্যে জায়গাটা বেড়ায় ঘিরে দিয়েছে—পুরোপুরি দখল না দেখলে খদ্দের গাঁইগুঁই করে, ভাল দর দিতে চায় না। পতিত জলা-জায়গা—শহরের ময়লা-নির্গমের খাল থেকে জল তোলা হত মাছের খাদ্য হিসাবে, সেই ময়লা জমে জমে একটা অংশ চরের মতো হয়েছিল। এই পথে চলাচলের সময় ময়লার দুর্গন্ধে লোকে নাকে কাপড় দিত। এইসব জায়গাজমি জগৎ-সংসারের কাজে আসবে, কোনদিন কেউ ভাবতে পারে নি।

লোকে বলাবলি করে, সর্দারমশায়ের কপাল! দেখ না, কোত্থেকে কারা সব এসে পড়ে নিখরচায় জমি হাসিল করে দিয়ে গেল। এখন কাঠা হিসাবে দর।

উমেশ সর্দারেরও কানে উঠেছে। কথাটা একটু ঘুরিয়ে সে বলে, মা-কালীর কৃপা! দেখুন না কেন, কিছু জানি নে, কিছুই করি নি—হঠাৎ দেখি, হিন্দুস্থান-পাকিস্তান হয়ে গেছে।

কালীভক্ত মানুষ, বাড়ির সামনে বিস্তর খরচা করে মন্দির তুলেছে। বলে, এখনো হয়েছে কি—স্বাধীনতা জমুক না আরও ভাল করে! পিঁপড়ের মতন লাইন দিয়ে মানুষ আসছে—শহরের এত কাছাকাছি জমি পাবে কোথায়? মা-কালীর শরণ নিয়ে চেপে বসে থাকি আর কিছুদিন—যে দরদাম দেবো, সোনা হেন মুখ করে লোকে তাতেই নিয়ে নেবে।

তা বলে সর্দারমশায় শুধুমাত্র মা-কালীর শরণ নিয়েই বসে নেই। বরকন্দাজ মোতায়েন রেখে দস্তুরমতো পাহারার বন্দোবস্ত হয়েছে। তিন-তালগাছতলায় অস্থায়ী ঘর উঠেছে তাদের জন্য। বন্দুক-লাঠি শড়কি-বল্লম নিয়ে টহল দিয়ে বেড়ায়। দিনমানে দু-পাঁচটি, রাত্রিবেলা পনের-বিশ জন।

সেই তালতলায় একরাত্রে বোমা ফাটিয়ে জকার দিয়ে উঠল। আলোয় আলোয় দিনমান—এত মশাল ইচ্ছে করেই জ্বালিয়েছে আয়োজনটা যাতে ভালো রকম চোখে পড়ে। বরকন্দাজদের বিশ গুণ অন্তত ওরা। এদের এক বন্দুক—আর মহড়াতেই ওরা পাঁচ-সাতটা বন্দুক তাক করে আছে। সেই একমাত্র বন্দুকই তোলার ফুরসত দিল নাকি! ঝাঁপ দিয়ে ঘাড়ের উপর উপর এসে পড়ল। শুধুমাত্র লাঠির ঘায়েই কেল্লা ফতে অধিক অস্ত্রের প্রয়োজন হল না। পিটিয়ে আধ-মরা করে কাঠের পুলের ওধারে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে—মরা-ইঁদুর লেজ ধরে ছুঁড়ে দেয়, সেই গতিক। বেশি নয় গোটা পাঁচেক এমনি। বাকিগুলো ছুটে পালাল—

ছুটতে ছুটতে ছ' মাইল পথ গিয়ে উমেশ সর্দারের বাড়ি। নিশিরাত্রে আর্তনাদ করে পড়ে: সর্দারমশায় সর্বনাশ হয়েছে।

মিনিট দশেকের মধ্যে লড়াই খতম। পিছনে আর এক দল আছে কোন্ অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়েছিল। তাদের কাজ এইবারে। বরকন্দাজের ঘাঁটি ভেঙে পথ করে দিয়েছে, পিল পিল করে এবারে ঢুকছে তারা—এই দ্বিতীয় দল। খালি হাতে কেউ নয়—ছাউনিসুদ্ধ চাল বয়ে আনছে পাঁচ-সাতজনে মিলে, বাঁশ-খুঁটি আনছে, কাচনির

বেড়া আনছে, চৌকাঠ-দরজা আনছে। অস্ত্র এদের হাতেও, বন্দুক-লাঠির বদলে কাটারি-খন্তা-কুড়োল। শূন্য ভিটেগুলোর উপর দ্রুতহাতে মাটি খুঁড়ে খুঁটি পুঁতে ফেলল। দেখতে দেখতে চাল উঠে গেল খুঁটির মাথায়, বেড়া-চৌকাঠ বসে গেল। সারি সারি চালাঘর—পোড়ানোর আগে যেমনধারা ছিল। মানুষের কাজ কেউ প্রত্যয় পাবে না—রাত্রে এসে দৈত্যদানোয় বানিয়ে গেছে, কাল লোকে বলাবলি করবে।

তারপরেও আছে। সর্বশেষ দল—শেষরাত্রের দিকে তারা এসে গেল। ঘরের বউ-মেয়ে-গিন্নিরা—কোলে-কাঁখে আগেপিছে বাচ্চা ছেলেপুলে। তাদের পিছু পিছু বাক্স-বিছানা তৈজসপত্র। তালগাছের গায়ে নতুন করে সাইনবোর্ড উঠে গেল ঃ নব-বীরপাড়া। বীরপাড়ার তৃতীয় জন্ম। বীরপাড়া মরেও মরে না—ছাইয়ের মধ্যে থেকে মাথা খাড়া করে নতুন জীবন নিল।

আর, পয়লা দলটা সতর্ক পাহারায় আছে সেই থেকে। চক্কোর দিয়ে বেড়াচ্ছে——চোখ বুঝি জ্বলছে অন্ধকারে, সুন্দরবনের বাঘের যেমনধারা হয়। হাঁ, বাঘেরই মতো বেপরোয়া বাংলার যুবা— বৃটিশ-রাজত্বের ভিত যারা নাড়িয়ে দিয়েছিল। এবং শেষ মারটা মারল তাদেরই নেতাজী সুভাষ। কাঠের পুল অবধি এগিয়ে এদিক-সেদিক দেখছে—উমেশ সর্দারের লোকজন নজরে আসে কিনা। কাকস্য পরিবেদনা! হবেই এমনি- অত্যাচারী যত বড় নিষ্ঠুর, ঠিক ততখানি ভীরু। পুলিশ ডাকবে নিশ্চয়। হয়তো বা থানায় এতক্ষণে ধন্না দিয়ে পড়েছে। কিন্তু রাত্রিবেলা বেরোতে বয়ে গেছে পুলিশের—দিনমানে ধীরেসুস্থে কাল দেখা দেবে। দেখেশুনে কর্তব্যের দায় সেরে যা লিখবার লিখে নিয়ে চলে যাবে। তার বেশি সাহস করবে না। এখন এরা আর একাকী নয়। চতুর্দিকে অগণ্য কলোনি—ঝাঁঝ-শঙ্খ ঘরে ঘরে, নারীর কণ্ঠে উলু। হামলা দিয়ে কলকল করে উলুধ্বনি উঠবে, ঝাঁঝ-শঙ্খ বাজবে। সেই ধ্বনি অন্য কলোনিতে চলে যাবে—তারা ঝাঁঝ-শঙ্খ বাজাবে, উলু দেবে। অঞ্চল জুড়ে কলরোল। বিপদ এসেছে, বেরিয়ে এসো সব। সাইরেন বাজলে ঘরে ঢোকবার নিয়ম, এ বাজনার উল্টো সংকেত ঃ একের বিপদে সকলের বিপদ, বেরিয়ে পড়ো এক্ষুনি—

এই সমস্ত খবর থানাওয়ালারা রাখে, সেখানে তেমন সুবিধা করা গেল না। পান খাওয়ানোর দরাজ প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও না।

দাঙ্গায় হেরে চুপচাপ থাকা চলে না, রীতিমতো ইজ্জতের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। উমেশ সর্দার অগত্যা কোমর বেঁধে নিজে তদ্বিরে নামল। স্বাধীনতার আমলে মস্ত সুবিধা—পয়সাকড়ি হবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিষ্ঠা। উপর-মহলে ইচ্ছামতন চলাফেরার অধিকার জন্মে যায়। এক আধা-মিনিস্টারের সঙ্গে তো রীতিমত দহরম-মহরম—উমেশ তাঁর কাছে গিয়ে পড়ল। খাতির করে চেয়ার দিলেন তিনি, অবস্থা শুনে আহা-ওহো করলেন বেশ খানিকটা। দেশ জুড়ে অরাজক অবস্থা—তাই নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করলেন। ব্যস, হয়ে গেল। অন্য কথায় আসেন এবার—আগামী ইলেকসন নিয়ে কথাবার্তা।

. উমেশ সর্দার নাছোড়বান্দা হয়ে বলে, যে জন্যে এসেছি তার কিছু উপায় বাতলে দিন।

ফৌজদারি দেওয়ানি দু-দুটো কোর্ট রয়েছে—এ ছাড়া আর তো কিছু ভেবে পাচ্ছি নে। বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ—আইন ছাড়া পথ নেই।

তার মানে, বাস্তুহারা হওয়া সত্ত্বেও কলোনির লোক হেলাফেলার বস্তু নয়—এক এক কবচ ধারণ করে আছে। ভোট আছে প্রতি জনার। সেই গুণে আপাতত শনির দৃষ্টি

পড়বে না। কোর্টের উপদেশ দিয়ে আধা-মন্ত্রীমশায় দরজা অবধি অন্তরঙ্গ ভাবে এগিয়ে দিয়ে গেলেন।

মাছের ভেড়ির লোক হলেও কোর্টের গতিক উমেশ সর্দারের একেবারে অজানা নয়। ফৌজদারি না দিকদারি—ভেড়ির মাছ-লুঠ বাবদে কে-একজন ফৌজদারি করেছিল, উকিল-মোক্তারের দেনা শুধতে শেষটা গোটা ভেড়ি মর্টগেজ দিতে হল। আর দেওয়ানি কী বস্তু, নামের মধ্যেই প্রকট সেটা—দেও আনি, এনে এনে দিয়ে যাও। দিতে থাক দু-বছর চার বছর—এজলাসে মামলা কবে উঠবে সে জানে পেস্কার পতিতপাবন আর চাপরাশি চতুরআলি। নিরুপায় হয়ে তবু উমেশের মামলায় যেতে হল—জমির স্বত্ব সাব্যস্তের জন্য দেওয়ানি, দাঙ্গাহাঙ্গামার জন্য ফৌজদারি।

আসামি পক্ষে মোক্তার একটি টিমটিম করছিল, খবর শুনে অমিতাভ উপযাচক হয়ে ওকালতনামা নিল। মুফতের খাটনি, একটি পয়সাও লভ্য নেই—উপরন্তু নথিপত্রের নকল নিজ খরচায় নিতে হয়েছে। তা হোক—সেই নথি ধরে সারা সকালটা আজ বক্তৃতার মুশাবিদা বানিয়েছে। অরবিন্দ ঘোষের মামলায় এক বক্তৃতা ব্যারিস্টার সি-আর-দাশকে হাইকোর্টের চূড়ায় তুলে দিল। অতখানি না-ই হোক, অমিতাভ'র জিনিষটাও নিতান্ত নিন্দের হবে না। উৎকৃষ্ট সাজগোজ করে, বিড়বিড় করে বক্তৃতা রপ্ত করতে করতে কোর্টে এসেছিল অমিতাভ।

কিন্তু আয়োজন বরবাদ হল—মামলা মুলতুবি। উমেশের পক্ষ থেকেই দরখাস্ত করে মুলতুবি নিয়েছে। ব্যাপার কি, সর্দারমশায়ের সুবুদ্ধি উদয় হল? অনুতাপ? হওয়া খুবই ভালো, কিন্তু অমিতাভ'র তৈরি বক্তৃতার পরে হলে বলবার কিছু ছিল না। ভারি মুশড়ে গেছে বেচারি, রাত্রিবেলা এখন অবধি ধকলটা কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

তার উপরে শঙ্কর আরো ভয় ধরিয়ে দিল: আজকে সময় নিল, সামনের তারিখে মামলাই তুলে নেবে দেখতে পাবেন।

শঙ্কিত হয়ে অমিতাভ বলে, কেন, কেন? আপনি কি করে জানলেন?

রহস্যময় হাসি হেসে শঙ্কর বলে, আমিও ডিফেন্সে আছি।

ল-প্রাকটিশনার আপনি?

কিছুই নই। বখাটে রোয়াকবাজ। মেয়েদের উত্যক্ত করার জন্যে সেবারে থানায় নিয়ে পিটুনি দিয়েছিল আমায়।

বলছে হয়তো সত্যি। কিন্তু সে শঙ্কর আলাদা—এ তরুণের সঙ্গে কোন মিল নেই তার। কিছুদিন থেকে অবিনাশ এই জিনিষটাই ভাবছেন—তারুণ্যশক্তি মরে না। মারবার আয়োজন আমরা কম করি নি। সত্যনিষ্ঠা আদর্শ ইত্যাদি বস্তু দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধে খুন হয়ে গেছে, প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর মতো পাঠ্যপুস্তকেই শুধু বর্ণনা আছে। স্বরাজ মানে লাইসেন্স ও পারমিট-রাজ। দেশ দু-টুকরো—এপারে ওপারে চলাচলটাও ব্লাকে চলছে। খাওয়া-থাকা, কাজকর্ম জোটানো, ছেলেমেয়ের শিক্ষা সর্বক্ষেত্রেই গলিঘুঁজির অন্ধকার খুঁজুন। সাদা-বাজার খাঁ-খাঁ করে, ব্লাকে কেনাবেচা ভেজাল জিনিষের। টাকা দিয়ে ভেজাল কিনতে হচ্ছে (টাকাও অবশ্য কাগজের)। মানুষে পর্যন্ত ভেজাল—এই ভেজাল-মানুষেরা দলে দলে গণতন্ত্রের ভোট দিয়ে আসে। সাহিত্য পড়ুন—যৌনতা ছাড়া দেশে যে কিছুমাত্র সমস্যা আছে, মনে হবে না। সাংস্কৃতিক আসরে গিয়ে বসুন—মন দেয়া-নেয়ার মিনমিনে গান, ঠাকুরমা হলে বলতেন শাঁকচুন্নির কান্না। সরু-লিকলিকে হাত-পা খেলিয়ে কেঁচোর মতন কিলবিল করছে, তারই নাম হল নৃত্য। সকল দিকে জাল পেতেছে—যাবে কোন্ দিকে? পালাবে কোথা? পৌরুষের

শেষ বিন্দু অবধি না নিংড়ে ছাড়াছাড়ি নেই।

তবু কিন্তু পারে না। সময় এলে দেখা যায় জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়েছে তরুণ। বুকের মধ্যে আগুন, হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। বাইরের শত্রু নিপাত করবে, ভিতরের শত্রুও বাঁচতে দেবে না। তারাই প্রফুল্লচাকি-ক্ষুদিরাম কানাই-সত্যেন্দ্র বাঘাযতীন-চিত্তপ্রিয়-নীরেন সূর্যসেন-নির্মলসেন-রামকৃষ্ণবিশ্বাস। তারা প্রীতিলতা-বীণাদাস শান্তি-সুনীতি। তারা উধমসিং-আসফাকউল্লা চন্দ্রশেখর-আজাদ হরিকিষেণ-ভগতসিং। বিনয়-বাদল-দীনেশ গোপীনাথসাহা ভবানী-প্রদ্যোত-যতিজীবন সন্তোষ-তারকেশ্বর-যতীনদাস তাদেরই মধ্যে আবার নতুন করে জন্ম নেয়। অন্তহীন অগ্নুস্তি তারা—আকাশের নক্ষত্র, ধরণীর মণিমাণিক্য। অতীত ভারতে তারা ছিল, ভবিষ্যৎ ভারতও তাদের। হেরোডোটাস ফিনিক্স পাখির কথা লিখে গেছেন—পাঁচ-শ বছর অন্তর আগুনে জরাদেহ পুড়িয়ে ফেলে ছাইয়ের মধ্য থেকে উজ্জ্বল নতুন দেহে বেরিয়ে আসে। সে বুঝি তারাই।

সারারাত্রি পূর্ণিমার ঘুম নেই। বাড়ির মধ্যে একলা। আলো নিভিয়ে অন্ধকার করে দিল—আলো চোখে সইছে না। দুনিয়ার সকলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে, মৃত্যু হয়ে গেছে বুঝি তার। অন্ধকারের প্রেত হয়ে ঘুরছে।

ঘুম নেই, ঘুম নেই।

সকাল হল, আলো দেখা দিল। ভানুমতী কড়া নাড়ছে। কত ঘুম ঘুমাচ্ছে যেন পূর্ণিমা—শুনতে পায় না। আরও খানিক পরে নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে সাড়া দেয়ঃ যাচ্ছি রে, দাঁড়া—

দোর খুলে দিল। ভানু এদিক-ওদিক তাকিয়ে প্রশ্ন করেঃ জামাইবাবু এসেছে?

মুখে হাসি-হাসি ভাব এনে পূর্ণিমা বলে, হ্যাঁ, এসেছে।

ঘুমুচ্ছে বুঝি?

পূর্ণিমা বলে, এসেছিল—ভোরের বেলা ফুড়ুত করে আবার চলে গেল।

রসিকতা করছে, ভানুমতী বুঝল। প্রবোধ দিয়ে বলে, কোনখানে আটকে পড়েছে, আজ আসবে।

হেসে পূর্ণিমা সায় দেয়ঃ সে তো জানিই। আসার জন্য আনচান করছে। যেমন করে হোক এসে পড়বে।

খেয়েদেয়ে যথারীতি অফিসে গেল। যেন বেশি সাজগোজ আজ। একটা প্রগল্‌ভ ভাব কেমন যেন। অনেকেরই নজরে পড়েছে। মুখ টিপে হেসে বীথি বলল, খুশি যে উপছে পড়ছে—কী ব্যাপার?

যাঃ—বলে পূর্ণিমা ঘাড় ঝাঁকি দিলঃ হতেই পারে না, সারারাত তো কাল ঝগড়া-ঝাটি করেছি।

বীথি বিবাহিতা নয়। নিশ্বাস চেপে সে বলে, ঝগড়াতে এত সুখ তো নিত্যিদিন ঝগড়াই চলুক তোমাদের—

ছুটির ঘণ্টাখানেক আগে পূর্ণিমা বেরিয়ে পড়ল। একলাই ভালো, লোকের সঙ্গ বিষের মতো লাগে। রাস্তায় রাস্তায় চক্কোর দিয়ে বেড়াচ্ছে। অগণ্য মানুষ চতুর্দিকে, কারো সঙ্গে কোন বন্ধন নেই, ডেকে কেউ কথা বলে না। প্রেতলোকের বাসিন্দা—বাতাসে না হোক মাটির উপরেই ভাসছে যেন। ঘোর হয়ে গেলে তখন ময়দানে গিয়ে বসে পড়ে।

খানিকটা রাত করে বাড়ি ফিরল। ভানুমতী আগ বাড়িয়ে খবর দেয়ঃ জামাই-

বাবু ফেরে নি। মানুষটা সেই গেল, দু'দিনের ভিতর পাত্তা নেই। ভাবনার কথা হল।

পূর্ণিমা তাড়াতাড়ি বলে, পাত্তা নেই কে বলল? অফিসে খবর পাঠিয়েছে।

কি খবর?

অবস্থা এমনি দাঁড়িয়েছে—মানানসই একটা খবর রচনা করবে, তা-ও পূর্ণিমার মাথায় আসে না। যা মুখে এলো, তাই বলে দেয়ঃ আসানসোল যেতে হয়েছে মেয়ের বাপের সঙ্গে। ফিরে আসুক, তখন ভাল করে জানা যাবে।

মনের ব্যাকুলতা তবু কিছু প্রকাশ পেয়ে থাকবে। তিক্তকণ্ঠে ভানু বলে, এখন বুঝি আর আপিস কামাই হয় না! চাকরি যাবে বলে জামাইবাবু এমন করে ভয় দেখাতে লাগল—কথা আমি আর ফেলতে পারলাম না। তোমার কাছে মিথ্যুক হয়ে রইলাম দিদিমণি।

পূর্ণিমা বলে, সে-সমস্ত চুকেবুকে গেছে—আবার তুলছিল কেন এখন? তুই দয়া করেছিলি—আমিই বা উদাসীন থাকতে পেরেছি কই! কিন্তু দয়ার কোন খাতির রাখল না। পরের মেয়ে যাবেই চলে—কে রাখতে যাচ্ছে! কিন্তু আমাদের বলে-কয়ে যাওয়া তো উচিত। তা হলে ভদ্রতা হত। কি বলিস?

ভানুমতী বলে, তুমি বাসায় যেতে বললে, আমিও চলে গেলাম। তারজন্য কাল আমায় কী বকুনিটা দিল! বলে, একলা ফেলে কোন্ আক্কেলে চলে এলে?

পূর্ণিমা হেসে বলে, বটে! বর হয়ে বউকে বকে এত বড় আস্পর্ধা! মিনমিনে ভালো-মানুষ তুই—উঠতে বসতে তোরই তো বকুনি দিয়ে ঠাণ্ডা রাখার কথা। তোর জামাই-বাবুকে কী রকম নাকের-জলে চোখের জলে করি, দেখতে পাস নে?

মুখরা ভানু ফস করে বলে, কে কার চোখের জল বের করে সে বুঝি দেখি নি আমি!

পূর্ণিমা তাড়া দিয়ে ওঠেঃ খবরদার বলছি, বদনাম দিবি নে। আমার চোখে জল দেখেছে, কেউ সে-কথা বলতে পারবে না। সমস্ত পারি আমি, শুধু কাঁদতে পারি নে। কিসের দুঃখে কাঁদিব?

ওর চেয়ে কান্না অনেক ভালো—

সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেই কাজের ছলে মেয়েটা সামনে থেকে সরে পড়ে।

সকালে এই অবধি। সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরলে ভানুমতী শুষ্ক মুখে বলে, আজকেও এলো না। বিকেলে দুয়োরে তালা দিয়ে আমি একবার বাজারে গিয়েছিলাম। ছুটতে ছুটতে আসছি—জামাইবাবু এসে হয়তো পথের উপর দাঁড়িয়ে আছে, রেগে আগুন হচ্ছে। তারপর থেকে ভাবছি, আজ বোধহয় আপিসে এসে তোমার সঙ্গে কাজ করছে। দু'জনে জোড়ে ফিরবে।

এত ব্যস্ত কি জন্যে? বলি পুরুষমানুষ কি আঁচলে বেঁধে রাখবার জিনিষ? বাইরে গিয়ে লোকে অমন এক মাস দু'মাস থেকে আসে।

ব্যস্ত হবার আসল কারণটা ভানু এইবারে প্রকাশ করে বলেঃ মেয়ে নিয়ে চলে গেল —দেখ নি দিদিমণি, সেই সময়কার চেহারা। বলে, আপদ বিদায় হয়ে যাচ্ছে—শান্তিতে সংসারধর্ম কর্ তোরা। রাগে যেন জ্বলছিল। আসানসোল-টোল মিছে কথা মনে হয়। কাছাকাছি কোনখানে আছে, খবরাখবর দিচ্ছে না।

তাচ্ছিল্যের সুরে পূর্ণিমা উড়িয়ে দেয়ঃ আছে তো আছে—বয়ে গেল! রাগ হয়ে থাকে, চাট্টি বেশি বেশি করে খাবে। কোন্ জব্দটা করল আমাদের? আমরাও কোন

খবর নিতে যাচ্ছি নে।

আবার বলে, দিব্যি তো আছি রে! কাল তুই চলে গেলে একটুখানি বিছানায় গড়াচ্ছি—রাজ্যের ঘুম এসে গেল। সেই ঘুমে রাত কাবার। খাবার পড়ে আছে, একবার উঠে খেয়ে নেবো—তা চোখই মেলতে পারলাম না। সকালবেলা তুই এসে ডাকাডাকি করছিস, তখন ঘুম ভাঙল।

ভানুমতী বলে, এত ঘুম ঘুমিয়েছ তো চোখে-মুখে কালি মেড়ে দিয়েছে কেন? আয়না ধরে দেখ না চেয়ে, কত কাল ধরে যেন অসুখে ভুগছ।

তোর নিজেরই চোখ খারাপ—অন্যের চোখে তাই কালি দেখে বেড়াস।

চপল মেয়েটাকে শাসন করে দেয় পূর্ণিমা: ঘরের মধ্যে যা খুশি বলছিস, বাইরে এসব মুখাগ্রে আনবি নে। খবরদার, খবরদার! বরের কাছেও নয়। কথা এ-মুখ থেকে সে-মুখে চলে যায়। লোকে ভাববে, সত্যিই বুঝি কেঁদে কেঁদে আমি রাত জাগি। কী লজ্জা বল্ তো! তার চেয়ে মরণ হওয়া ভালো।

জোর দিয়ে আবার বলে, ও বাড়ি আসছে না—তা-ও যেন কেউ ঘুণাক্ষরে জানতে না পারে। দুটো হাঁড়ি-কলসিও একসঙ্গে থাকলে ঠোকাঠুকি হয়ে যায়। ঘরের খবর বাইরে কেন জাঁক করে জানাতে যাব? লোকে মজা দেখে। দিদি যদি এর মধ্যে এসে পড়ে, তাকেও বলিস নে। বলবি, জামাইবাবু কাজে বেরিয়ে গেছে। কিংবা বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা করতে গেছে। সত্যিই তো, পুরুষমানুষ কতক্ষণ আর হাত-পা কোলে করে বাড়ি বসে থাকে!

খানিকটা পরে দেখা যায়, ভানুমতী উপরের ঘরে ড্রেসিং-টেবল সরাসরি করছে। ইদানীং পূর্ণিমা যেমন করত—খাটের উপর মেয়ে পাশে নিয়ে শিশির পিটপিট করো দেখত তখন।

পূর্ণিমা প্রশ্ন করে, কি হচ্ছে?

একলা এক ঘরে শুতে ভয় করে দিদিমণি। আমি এখানটা শোব।

হুকুমের সুরে পূর্ণিমা বলে, শুবি তুই বাসায় গিয়ে—বরের সঙ্গে।

সঙ্গে সঙ্গে আদর করে থুতনি নেড়ে দেয়: কী একটুখানি বলেছে—বড্ড রাগ হয়েছে, উঁ?

ভানু বলে, একলা বাড়িতে তোমায় রেখে বাসায় চলে যাওয়া—সত্যিই তো অন্যায়। খুব অন্যায়। কিন্তু তুমি চলে যেতে বললে—কথার উপর কথা বললে তুমি রেগে যাও। ভয়ে ভয়ে তাই যেতে হল।

আজও চলে যেতে বলছি। থাকার কোন দরকার নেই। খাসা ছিলাম কাল, খুব ঘুমিয়েছি—আজকেও দিব্যি থাকব।

ক্ষীণ প্রতিবাদ তবু ভানুমতীর কণ্ঠে: বাসায় যাব না, আজকে আমি বলেকয়ে এসেছি।

সেই তো ভালো রে! হঠাৎ গিয়ে উঠবি। আশা ছিল না—আচমকা পেয়ে গিয়ে বর আজ ডবল আদর করবে দেখিস।

একরকম জোর করে ভানুকে বাসায় পাঠিয়ে দিল। আপন-কেউ নেই সংসারের মধ্যে—চোখে পড়ে শুধু পর-মানুষ, হিংসুটে শত্রু-মানুষ। মানিয়ে-গুছিয়ে হাসিমুখ করে সতর্ক চলাফেরা তাদের সঙ্গে। রাতটুকু অন্তত নিজের থাকুক, অভিনয়ের খোলস ছুঁড়ে দিয়ে যখন সে উপর-নিচে হাহাকার করে বেড়াবে।

নির্বোধ ভানুমতীকে ভোলানো যায়। কিন্তু ডাক্তারবাবু ধরে ফেললেন। হার্মান শ্লাম্বার্সের নিজস্ব ডাক্তার। ফ্যাক্টরির লোকজনের জন্য আছেন তিনি—হপ্তায় কয়েকটা দিন বিকালবেলা হেড-অফিসে আসেন। অসুখবিসুখ হলে ঐ সময়টা দেখানো চলে। সাধারণ অষুধপত্তোর কিছু কিছু বিনামূল্যে দেবার ব্যবস্থাও আছে। পূর্ণিমা যায় নি ডাক্তারবাবুর কাছে, করিডরে হঠাৎ সামনাসামনি পড়ে গেল।

ডাক্তার উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলেন, একি, শরীর ভাল নেই আপনার মিসেস ধর?

অফিসের দুই কর্মচারী প্রেম করে বিয়ে করেছে—আর কিছু না হলেও সেই কারণে পূর্ণিমা ও শিশির সকলের কাছে চিহ্নিত হয়ে আছে। ডাক্তার চেনেন তাদের। অন্তরঙ্গ-ভাবে জিজ্ঞাসা করেন: কি হয়েছে বলুন—

পূর্ণিমা এড়িয়ে যায়: কিছুই তো হয় নি।

আপনার মুখের উপর লেখা রয়েছে অসুস্থ আপনি। 'না' বললে শুনব কেন?

অগত্যা বলতে হয়: ঘুম হচ্ছে না আজ ক'দিন।

কি জন্যে? ব্লাডপ্রেসার দেখিয়েছেন? চলে আসুন আমার সঙ্গে, অবহেলা করবেন না। চেহারা আপনার বড্ড খারাপ হয়েছে।

হাত এড়ানো গেল না, ডাক্তার চেম্বারে নিয়ে বসালেন। রোগলক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করছেন, হাতে রবারের নল বাঁধছেন প্রেসার মাপার জন্য।

বললেন, ফ্যাক্টরিতে আজও মিস্টার ধরের সঙ্গে দেখা। চা-টা খেলাম একসঙ্গে। তিনি তো একটি কথাও বললেন না।

পূর্ণিমা ভ্রূকুটি করে বলে, জানলে তো বলবে! জানতে দিই নাকি আমি?

মিটিমিটি হেসে মধুর ভঙ্গিতে বলে, বড্ড নার্ভাস। আমি কিছু জানতে দিই নি ডাক্তারবাবু। জানলে ওর নিজেরই ঘুম বন্ধ হয়ে যাবে। সে আমার বিষম জ্বালা। করি কি জানেন—আরও বেশি-বেশি ঘুম দেখাই। ও ঘুমিয়ে গেলে তারপরে চোখ মেলি। উঠে বসি, ছাতে ঘুরে বেড়াই, কলতলায় গিয়ে মাথায় জল থাবড়াই। আপনি নেহাৎ ধরে ফেললেন—নয়তো আপনাকেও বলতাম না। ওর ভয়ে—পাছে ওর কানে গিয়ে পেঁছিয়। নিজের চেয়ে ওকে নিয়েই বেশি ভাবনা আমার—

কাতর হয়ে বলে, আমি জানি আর এই আপনি জানলেন ডাক্তারবাবু। একটি কথাও ওকে বলবেন না—দোহাই আপনার!

অতএব খবর মিলল, বহাল-তবিয়তে আছে মানুষটি—ফ্যাক্টরিতে গিয়ে যথারীতি কাজকর্ম করে। ভালো। আছে কলকাতায় বা কাছাকাছি কোনখানে, যেখান থেকে নিত্যিদিন এসে অফিস করা যায়। নিজস্ব ঘর পেয়ে গেছে এত দিনে। খুব ভালো।

বাড়ি এসে সেই দিনই আবার লেটারবক্সের মধ্যে শ্রীহস্তের চিঠি পাওয়া গেল: ছাড়াছাড়ি পাকা। এক শয্যায় আর শোব না—এ-জীবনে নয়। কথাগুলো হুবহু তোমারই। শুধু মুখের কথাই নয়, কায়মনে পালন করে এসেছ। আমার তরফ থেকেও এতদিন পরে জবাব পাঠাচ্ছি—ছাড়াছাড়ি আমাদের পাকা। এক-বাড়িতে থাকবার অতএব মানে হয় না। আর আমি যাব না। চিঠিতে বক্তব্য জানিয়ে দিলাম, যা ভালো মনে হয় করতে পারো।

ঠিকানা দেয় নি—ঠিকানা থাকলেই পূর্ণিমা যেন একছুটে পদতলে গিয়ে আছড়ে পড়বে! তাই ভেবেছে বোধহয়।

॥ ঊনপঞ্চাশ ॥

মোক্তার-উকিল ছাড়া শংকরও ডিফেন্সে আছে। অমিতাভকে সে বলেছিল। আইন পড়া নেই, প্যাঁচের কথাবার্তা জানে না—শংকরদের কাজকর্ম তাই হাকিমের এজলাসে নয়। ক'জনে তারা সরাসরি একদিন উমেশ সর্দারের বাড়ি চলে গেল।

দেখা করব সর্দারমশায়ের সঙ্গে—

পয়সাকড়ি হয়ে উমেশ এখন মান-সম্ভ্রমের দিকে ঝুঁকেছে। সামনের ইলেকসনে দাঁড়ানোর ইচ্ছে। তরুণ ছেলেদের সঙ্গে দহরম-মহরম করতে চায়—রাস্তায় যারা পোস্টার আঁটবে, মিছিলে জিন্দাবাদ দেবে, মিটিং-এ চেয়ার সাজাবে, বাড়ি-বাড়ি ভোটারের লিস্ট নিয়ে ঘুরবে, ইলেকসনের সময়টা ভোটার সেজে জাল ভোট দিয়ে আসবে। ছোঁড়ার দল হাতে না থাকলে ইলেকসন জেতা যায় না। ক্লাব-লাইব্রেরি সার্বজনীন পুজোর চাঁদা দরাজ হাতে দিয়ে যাচ্ছে—চাইলে ইদানীং আর 'না' বলে না। দেশের দুরবস্থার জন্যে সেইসঙ্গে অশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করে: যতসব চোর ঢুকে গিয়ে সর্বনাশটা করল। প্রকারান্তরে বোঝানো, যেহেতু নিন্দেমন্দ করছি—আমি ঐ চোরের দলের বাইরে, আমি লোকটা অতিশয় সাচ্চা।

শংকরদের উমেশ নিজের ঘরে ডেকে বসাল। কিন্তু ছোঁড়াটা শুরুতেই তিরিক্ষি বচনে আরম্ভ করে: কলোনি পুড়িয়েছিলেন, অবিনাশ মজুমদার মশায়কে আধমরা করেছিলেন কুকুর-বেড়ালের মতো ল্যাঠিপেটা করে। তার উপরে মামলা জুড়ে দিয়েছেন আবার?

তোমরা কে হে?

উমেশ সর্দারের সন্দেহ, অধর মাইতির লোক এরা সব। সে মানুষটার তাক শুধুমাত্র ইলেকসন-বিজয় নয়—ছোটখাটো একটা মিনিস্টারিও।

উমেশ বলে, কে পাঠিয়েছে তোমাদের?

কারো মাইনের লোক নই—হুকুম মেনে আসি নি। পরিচয় দেবো না, যে-কাজে এসেছি পরিচয় দেওয়া চলে না।

কোন্ কাজ?

মামলা তুলে নেবেন আপনি।

উমেশ সর্দার গর্জন করে ওঠে: তোমাদের কথায়?

ভালো কথায় বলে দেখছি, না হলে পরের ব্যবস্থা তো আছেই। বিস্তর কাল বেঁচেছেন অবশ্যি—তাহলেও স্বাস্থ্য ভাল, আরামে রয়েছেন, মাথায় লাঠি কি গলায় কোপ না পড়লে আরও অনেক দিন বাঁচবেন। সামান্য একটু জমির জন্যে কী দরকার এতদূর ঝুঁকি নিতে যাওয়া!

ঘাবড়ে গিয়ে উমেশ সর্দার বলে, হকের জমি ছেড়ে দিতে বলো?

বাইরের মন্দিরে আরতির কাঁক-ঘণ্টা বাজে এমনি সময়। শংকর বলে, হকেরই বটে! জমি মা-কালী বুঝি লেখাপড়া করে দিয়েছেন!

মা-কালী দিলে কোর্ট কি আর মানতে চাইত? এলাকার আদি-মালিক চৌধুরিবাবুরা তাঁদেরই বড়কর্তা শ্রীনাথ চৌধুরির দস্তখতে মকররি মৌরশি পাট্টা—

হাসছে দেখে উমেশ চটে গিয়ে বলে, মামলা কোর্টে গেছে—তোমাদের কী মাথাব্যথা?

স্বত্বে খুঁত থাকলে কোর্টই সেটা বিচার করে বলবে।

শান্তকণ্ঠে শঙ্কর বলে, আমাদের মুখোদের আলাদা এক কোর্ট আছে। তার বিচার নির্ভুল, শাস্তি অমোঘ। আপনার বিচারও হয়ে গেছে সেখানে। যে জমিতে গোড়ায় ও'রা উঠেছিলেন আর সেই জমি এখন যা তৈরি করে নিয়েছেন, দু'য়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত। কলোনির জমি ও'দেরই—ভালোয় ভালোয় মামলা তুলে নিন। লোভ করে কখনো ও'দের পিছু লাগতে যাবেন না।

উমেশ বলে, বাড়ি বয়ে এসে ভয় দেখাচ্ছ। আমি পুলিশ ডাকব।

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে একটি ছেলে বলে, ক্ষমতা কত পুলিশের ! ঢের ঢের পরীক্ষা হয়ে গেছে। ইংরেজ-আমলে পুলিশের আরও দাপট—খয়েরখাঁ-গুলোকে সে যুগের ছেলেরা মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল, পুলিশ তার মধ্যে ক'টাকে বাঁচাতে পেরেছে ?

নাম করে করে দৃষ্টান্ত তুলে ধরছে ছেলেরা :

নন্দলাল বাড়ুজ্জের হাত এড়াতে প্রফুল্ল চাকি গলায় রিভলবারের নল ঢুকিয়ে আত্মঘাতী হলেন। তারই কয়েকটা দিনের মধ্যে বাড়ুজ্জে-দুশমন আচমকা গুলি খেয়ে জীবন দিল। পুলিশ একগাদা লোক জালে ছেঁকে তুলল, আসল দণ্ডদাতা দূরে থেকে মজা দেখছেন তখন। স্বাধীন হয়ে এতকাল বাদে নিজে থেকে নাম বলেছেন বলেই আমরা জেনেছি। পুলিশ মাথা খুঁড়েও বের করতে পারে নি।

(ওরে ব্যাবা, বাড়ুজ্জের দশা এখানেই না ঘটে যায়—এই ঘরের মধ্যে !)

কানাই-সত্যেন জেলের ভিতরেই এপ্রুভার নরেন গোঁসাইকে সাবাড় করলেন। পুলিশের এত কড়াকড়ি, রিভলবার তবু জেল-গেট দিয়েই তাঁদের হাতে পে'ছে গেল। পাহারায় ঠেকাতে পারল না।

(ঘরে এসে চড়াও হল, রিভলবার এদেরও নিশ্চয় আছে—খালি-হাতে আসে নি।)

পুরস্কারের লোভে সূর্য সেনকে ধরিয়ে দিল নেত্র সেন। স্ফূর্তি করে নেত্র সেন খেতে বসেছে—মাছের তরকারিটা ভারি উতরেছে, বউ আর একটা মাছ আনতে রান্নাঘরে গেছে। ফিরে এসে দেখল, মেলতুকের কোপে গলা দু'খণ্ড—কাটা-মুণ্ড থালার উপর পড়ে আছে। সেই মানুষটি কে, পুলিশের ক্ষমতায় আজও সেটা বেরুল না।

উমেশ সর্দার শুষ্কমুখে বলে, এবারে এসো বাবাসকল, আমি একটু মায়ের নাম করব। শোনা রইল সব, আমি ভেবে দেখব।

খানিকটা এগিয়ে এসে শঙ্কর একেবারে সামনাসামনি হল। বলে, অবস্থা গতিকে দেরি হতে পারে, কিন্তু শাস্তি এড়ানো যায় না। বুক পেতে নিতেই হবে একদিন না একদিন। জালিয়ানওয়ালাবাগের মহাপাপী মাইকেল ওডায়ারের বেলা যেমন হল। কাজের পরেই চাকরি ছেড়ে বিলেত পালাল। ভেবেছিল, হাজার হাজার মাইল দূরে আমার আপন ভাইব্রাদারের মধ্যে কে কি করবে ! দেরি হল অবশ্য—১৯১৯ আর ১৯৪০ —একুশটা বছরেও পাপের শাস্তি তামাদি হয়ে যায় না। খাস লণ্ডন শহরে মিটিং-এ জনতার ভিতরেই উধম সিং দণ্ডদান করলেন।

উমেশের মুখ পাংশু হয়ে গেছে। উঠে দাঁড়াল—হাঁটুতে ঠকঠকানি। সকাতরে বলে, যাও তোমরা বাবাসকল। সামনের তারিখে মামলায় সাবকাশ নিচ্ছি। একেবারে তুলে নেওয়ার কথা আলবৎ উকিলকে বলব। ভেবো না তোমরা, উপায় একটা বেরুবেই।

সর্দারমশায়ের জ্ঞানোদয় হচ্ছে, পয়লা দিন মুলতুবি নিয়েছে—গূঢ় রহস্যটা এই। ডিফেন্সে শঙ্কর সদলবলে নেমে পড়েছে। অতি শীঘ্র পূর্ণজ্ঞানও হবে, মামলা পুরো-

পুরি তুলে নেবে—তাতে আর সন্দেহ করা চলে না।

ডাক্তারবাবুর দেওয়া কৌটো-ভরতি ঘুমের পিল—আজ আর পূর্ণিমা ডরায় না। ঘুম তুমি কেমন না এসে পারো দেখি!

ফুটফুটে জ্যোৎস্না। ছাতের উপর ঘুরে বেড়ায় একটুখানি। জ্যোৎস্না বড় শত্রু—দিনমান বলে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। দিনমানে ঘুম আসে না। ঘরের-মধ্যে থাকা বউটি নয় সে, অফিসের কেরানি—দিনমানে ঘুমাল আর কবে!

বড় সমস্যা হল রে পুনি—একা একা এমনিধারা কতকাল চলবে? কাল হোক পরশু হোক জেনে ফেলবে লোকে। শিশিরের নিজের হাতের চিঠি পেয়ে গেছ, পথ ঠিক করো এবারে। যাবে তো নিউ আলিপুরের ফ্ল্যাটে চলে যাও, ভাইয়ের কাছে গিয়ে ওঠো। নয় তো কাতর হয়ে কাশীতে চিঠি দাও—বাবা না-ই হোন, মা অন্তত কলকাতায় চলে আসুন। আর নয় তো—

নয় তো চলে যাও কোন একটা ছলে-ছুতোয় হার্মান প্লাম্বার্সের ফ্যাক্টরিতে। এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে খপ করে হাত ধরে ফেল মানুষটির: পেয়েছি তোমার চিঠি। ছাড়াছাড়ি আমাদের পাকা—তাই না? হাতের কাছে কলম-কালি থাকলে যা-খুশি লেখা যায়। মিথ্যে গল্পও লেখে মানুষে, লিখে আবার ঘটা করে ছাপতে দেয়। খুব রাগ দেখানো হয়েছে—চলো এবার, তোমায় নিতে এসেছি। একা নয় কিন্তু—

মেয়েসুদ্ধ যাবে, একলা নয়। কুমকুম তোমার সঙ্গে আসবে। আর নিতান্তই রাগ করে থাকবে তো কুমকুমকে দিয়ে দাও আমার কাছে। কোলে সন্তান পেয়ে মায়েরা বর ভুলে যায়। যদ্দিন ছেলেমেয়ে না আসে বরই সন্তানের মতো—জান না বুঝি?

ঘরে ছুটে এসে পূর্ণিমা দুড়দাড় সমস্তগুলো জানলা এঁটে দিল। দরজা দিল। জ্যোৎস্নার একটি ফলা না ঢুকতে পারে কোন ছিদ্র-পথে। লোভে লোভে পিল কয়েকটা খেয়ে নিল। এক্ষুনি আসবে ঘুম। আলো নিভিয়ে দিল। ঘুমের আজ খোশামুদি করবে না। পোষা কুকুরের মত বাধ্য ঘুম—চোখ বুজলেই সুড়সুড় করে চলে আসতে হবে। ঘুমের পিছু পিছু স্বপ্ন—ঘুমানো তো স্বপ্নের লোভেই। সংসারে যা পেলাম না, স্বপ্নেরা তাই দিয়ে দেয়। স্বপ্নে একদিন রাজকন্যা হয়ে স্বয়ম্বর-সভায় ঘুরেছি—রূপবান তিন তরুণ গলা বাড়িয়ে, আছে, কার গলায় মাল্যদান করি হায় রে হায়, বিয়ের পাত্র নয়—তিনজন মনিব তারা আমার। স্বপ্নে কত দিন বিশাখার মতন বরের কাছে পড়া তৈরি করেছি—সেই মধুর পড়া জীবন-যৌবন আচ্ছন্ন করে থাকে, পড়ার গুণে পরীক্ষায় পাশ হওয়া ঘটে না কখনো। স্বপ্ন দেখাই জীবন আমার—সেই স্বপ্নেরা কতদিন আজ বঞ্চনা করে আসছে।

জমেও জমছে না যেন কিছুতে। বালিশের নিচে কৌটো-ভরতি রেখে দিয়েছে—আবার একটা পিল পূর্ণিমা মুখে ফেলল—

ওমা, দেখি নি তো, তুমি চলে এসেছ। কতক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছ, চোখ মেলে আমি দেখি নি। কোলে আমার কে চলে এলো—কোল যে আলো-আলো হয়ে গেছে!

কুমকুম ডাকছে মা মা—করে। কথা খুব স্পষ্ট হয়েছে তো এই কয়েকটা দিনে। কি গো, বড্ড যে রাগ করে গিয়েছিলে—জীবনভোর ছাড়াছাড়ি নাকি! তোমারই হার—ফ্যাক্টরিতে যাই নি আমি, খবর দিয়ে পাঠাইনি। আপনাআপনি আসতে হল।

শিশির যেন বলল, না এসে রক্ষে ছিল! মেয়ে এই ক'দিনে পাগল করে তুলেছে। কেউ সামলাতে পারে না। তাজ্জব! এত হেনস্থা করো, মেয়ে তবু ন্যাওটা হল কেমন

করে ?

হ্যাঁ কুমকুম, হেনস্থা নাকি করি তোমার ?

ঘাড় দুলিয়ে থোপা-থোপা চুল নাচিয়ে মিষ্টি রিনরিনে গলায় কুমকুম ডাকছে : মা, মা, মা—

পাগল-করা ডাক। কেমন করে এর পর স্থির থাকা যায়! হাত বাড়িয়েছে—অমনি কুমকুম ঝাঁপ দিয়ে এসে পড়ল।

শিশির যেন বলল, তোতাপাখির মতন এমন 'মা' বুলি শেখাল কে ?

তুমি। তুমি ছাড়া কে আবার! সবার সামনে 'মা' বলিয়ে আমায় অপদস্থ করবে, সেই মতলব তোমার। ঘাড় নাড়ছ—তা হলে কে হতে পারে বলো। ভানুকে বকাবকি করেছি, সে শেখায় নি। ঘুঁটেওয়ালি আর বুড়ো-পিওনের কথা উঠেছিল, তারাও নয়। তখন তোমার উপর সন্দেহ এলো। তুমিও যখন নও, কে তবে সেই মানুষ ? 'মা' বলতে কে শেখাল ? তা হলে বোধহয়—

আমি গো আমি। কাউকে বলি নি, সকলের উপরে তড়পে বেড়িয়েছে। তুমিও বোলো না কাউকে। 'মা' বুলি শিখিয়েছি আমি—আমি—। বুকের উপর তুলে ধরে কানে কানে শেখাতাম।

মায়ে মেয়ের সুখ-দুঃখের কথাবার্তা এইবারে : তুমি ছিলে না কুমকুম, এই ক'দিন কেউ আমায় মা বলে ডাকে নি।

লজ্জা পেয়ে শিশিরের দিকে তাকিয়ে ধমক দিয়ে ওঠে : শুনছ তুমি আমাদের কথা। যাও, এখান থেকে চলে যাও।

অনিচ্ছুক পায়ে শিশির কয়েক পা সরে গিয়ে দাঁড়ায়। মুখে দুষ্টামির হাসি।

শিশির শুনতে না পায়, এবারে মেয়ের কানের উপর মুখ নিয়ে ফিসফিস করে পূর্ণিমা বলে, আমায় ফেলে চলে গেলি কুমকুম—সারারাত আমি কাঁদতাম। এখনো দেখ্ চোখ আমার ভিজে।

বলে, আর শিশিরের দিকে কটাক্ষ হানে : দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে, আমাদের একটি কথাও কানে যাবে না। অ্যাঁ, কুমকুম ?

ঐ একরত্তি মেয়ে বোঝে মায়ের দুঃখ। তুলতুলে হাত দু'টি তুলে যেন তার চোখের উপর দিয়েছে। পাগল হয়ে পূর্ণিমা জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে—

কই, কিছুই না। শূন্য বিছানায় একা পূর্ণিমা।

অসুখ নয়, মন্তোর—ডাক দিলেই আবার ঘুম চলে আসবে। ঘুমের সঙ্গে স্বপ্ন, স্বপ্নের মধ্যে কুমকুম। স্বপ্নের কুমকুম হেসে নেচে ঘরময় চক্কোর দিয়ে ফেরে। স্বপ্ন যতবার ফিকে হয়ে আসে, বালিশের নিচে থেকে পিল নিয়ে মুখে ফেলে। স্বপ্ন ভাণ্ডারের চাবি পেয়ে গেছে, আর পূর্ণিমা ভাবনা করে না···

সকাল হল। ভানুমতী এসে কড়া নাড়ে, দোর ঝাঁকায়, চেঁচিয়ে ডাকাডাকি করে। দোর খুলল না। হাউ হাউ করে ভানু কেঁদে পড়ল। বাড়ির সামনে লোক জমেছে, পুলিশ ডেকে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকবার কথা হচ্ছে—ভানুমতী কাঁদতে কাঁদতে বাসায় গিয়ে বরকে নিউ আলিপুর তাপসের কাছে পাঠাল। ছুটে এসে আবার বাড়ির সামনে ভিড়ের ভিতর দাঁড়িয়েছে।

দশটা বাজতেই হার্মান শ্লাম্বার্সের ফ্যাক্টরিতে তাপস এসে পড়ল। শিশির তখনো পৌঁছয় নি—মোড় ঘুরে যে-ই দেখা দিয়েছে, ছুটে গিয়ে তাপস হাত চেপে ধরল। খুনী

আসামির হাতে হাতকড়া পরানোর মতন।

চলুন, সর্বনাশ হয়েছে।

হতভম্ভ হয়ে শিশির বলে, কি হল?

হঠাৎ তাপস ধমক দিয়ে উঠল: আপনি কি মানুষ?

গাড়িতে নিজের পাশে নিয়ে বসিয়ে পরক্ষণেই তাপস হাহাকার করে ওঠে: মানুষ কেউ আমরা নই। দেবী আমার ছোড়দি—কেউ তাকে চিনলাম না। বাবা নয়, মা নয়, দিদি নয়, আমিও নই।

ড্রাইভার নেই আজ, গাড়ি নিজে চালাচ্ছে। যেতে যেতে গভীর কণ্ঠে বলে, যে বয়সে মেয়েরা হাসিখুশি আমোদ-আহ্লাদে মেতে থাকে, সেই তখন থেকেই ছোড়দি সংসারের সকলের সমস্ত ভার কাঁধে নিয়ে নিল। নিজের কোন সুখ সে চায় নি। আমি জীবনে যত-কিছু পেয়েছি সমস্ত ছোড়দি'র দান। ছোড়দি না হলে কোন এক অফিসে কলম পিষে জীবন কাটাতাম। সেই আমিই বা কী করলাম—ভাল ঘরবাড়িতে সুখে-স্বচ্ছন্দে আলাদা হয়ে রইলাম। আর এই যে আপনি—ভেবেছেন কখনো, কত ত্যাগ করেছে কত লাঞ্ছনা সয়েছে সে আপনার জন্য?

আত্মসমর্থনে শিশির তাড়াতাড়ি বলে, জেনে ফেলেছেন যখন, আমার কথাটাও তবে বলি। ছাড়াছাড়ির বিধানটা ও-ই দিয়েছিল। তারপরেও ছিলাম অনেক দিন—অবশ্যি দায়ে পড়ে থাকতে হয়েছিল। আমার পক্ষে জবাবটা কালকেই মাত্র দিয়েছি।

কথা তাপস কানে পড়তে দেয় না। অধীর কণ্ঠে বলে, ঐ ভুল সবাই আমরা করি। ছোড়দি'র বাইরেটা দেখে লোকে, মুখের কথাই বেদবাক্য বলে ধরে নেয়। যাদের জন্য এত করল, সকলে আজ তার পর। অভিমানের কেউ মর্যাদা দিল না, জীবনের উপর তারই শোধ নিয়ে নিল।

সমস্ত শুনে শিশির আকুল হয়ে পড়ে: ভুল বুঝেছিলাম তাকে। কী দেখাতে নিয়ে চললেন তাপসবাবু? চোখ মেলে আমি দেখতে পারব না, আমায় ছেড়ে দিন।

তাপস বলে, যদি জ্ঞান ফেরে এইটুকু অন্তত সান্ত্বনা নিয়ে যাবে, আপনি ত্যাগ করেন নি তাকে। আপন-মানুষদের পাশে দেখে ছোড়দি তৃপ্তি নিয়ে চোখ বুজবে। জ্ঞান ফিরলে তবেই এসব, নইলে অবশ্য মিছিমিছি আপনার কষ্টভোগ।

জুনিয়ার ডাক্তার বটে তাপস, কিন্তু প্রবীণ বিচক্ষণ অনেক ডাক্তার তার মুরুব্বি। অপূর্ব রায়ের জামাই বলে স্নেহসম্পর্ক একটা আছেই, তা ছাড়া কনসাল্টিং ফিজিসিয়ান হিসাবে ভাল ভাল কল পেয়ে থাকেন তাঁরা তাপসের হাত দিয়ে। তেমনি এক মুরুব্বি ডাক্তার এসেছেন, তাঁর ব্যবস্থা মতো পূর্ণিমার চিকিৎসা চলছে। নার্স'ও আছে একটা। পিল অনেকগুলো খেয়ে ফেলেছে, তার জন্যে প্রথম কাজ হল স্টম্যাক পরিষ্কার করা। রক্তেও বিষক্রিয়া রয়েছে, রক্ত বের করে ফেলতে হয়েছে খানিকটা। এতক্ষণ এই সমস্ত চলেছে। ফ্যাক্টরিতে হয়তো শিশিরকে পাওয়া যাবে—ভানুমতীর কাছে খবরটা জানা গেল। সেই আন্দাজে শিশির বেরিয়ে পড়েছিল। ভয়ে ভয়ে এবারে বাড়ি ঢুকছে।

বারান্ডায় ভানু। শিশিরকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিল। বিষম চটে আছে।

তাপস বলে, কেমন আছে?

ভালো।

কী-ই বা বোঝে ভানু, ওর কথার কতটুকু দাম।

ভানুমতী পুনশ্চ বলে, ভালো দেখেই ডাক্তারবাবু চলে গেলেন।

দোতলায় উঠে যেতে নার্স হাসিমুখে বেরিয়ে এলো: জ্ঞান ফিরেছে, নাড়ি প্রায়

স্বাভাবিক এখন।

শোবার ঘর হাসপাতালের চেহারা নিয়েছে। তাপসের সঙ্গে স্বাতী-অণিমাও চলে এসেছে, রঞ্জুকে আনার কথাই ওঠে না এই অবস্থায়। রোগিণীর খাটের পাশে ননদ-ভাজ বিষন্ন মুখে দাঁড়িয়ে। নিঃশব্দ। চোখে বুজে এলিয়ে আছে পূর্ণিমা—জ্ঞান ফিরেছে, ভাব দেখে কিন্তু মনে হয় না।

নার্স বলে, ঘুম-ঘুম ভাব—কিন্তু ঘুমুতে দেওয়া হবে না কিছুতে। ডাক্তার বলে গেছেন।

নিঃসাড়ে এরা ঢুকেছে, ঠারেঠোরে কথাবার্তা—তবু কিন্তু পূর্ণিমা টের পেয়ে গেছে। পূর্ণ সম্বিৎ। ব্যস্ত হয়ে শাড়ির আঁচল বুকের উপর টানে। নার্স ঠিকঠাক করে দেয়।

পূর্ণিমা জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, কথা আছে আমার কয়েকটা।

নার্স বলে, উঠতে যাবেন না—শুয়ে শুয়ে বলুন।

পূর্ণিমা দৃষ্টি মেলে তাকায় তাপসের দিকে। ইঙ্গিতটা বুঝে তাপস নার্সকে বলে, চলুন, একটু বাইরে যাই আমরা। শিশিরবাবু একলা থাকবেন। অণিমাকে বলে, চলে এসো দিদি।

সকলে ছাতে গিয়ে দাঁড়াল।

নির্জন ঘরে স্বামী আর স্ত্রী দু'জনা। কী বলতে গেল পূর্ণিমা—কথা ফোটে না, দু'চোখের প্রান্তে জল গড়িয়ে পড়ে।

শিশির আর পারে না—শয্যার পাশে বসে পড়ল। এ মেয়ের হাসি আনন্দ রাগ আর ধমকধামক জানা আছে! চোখের আগুন দেখেছে, চোখের জল দেখে নি কখনো। সন্তর্পণে শিশির জল মুছিয়ে দেয়।

ম্লান হেসে পূর্ণিমা বলে, চলে যাচ্ছি,। রাগ পুষে রেখো না।

একটু থেমে আবার বলে, ক্ষমা কোনদিন চাই নি কারো কাছে? আমি জানি না, ক্ষমা চেয়ে কী বলতে হয়।

অভিভূত ভাবে শিশির বলে, ক্ষমা চাইবার কাজও করো নি তুমি জীবনে। ক্ষমা চেয়ে কেন আমার দুঃখ বাড়াও?

একটা কথা রাখবে? মুখটা নামাও, বলি—

চুপিচুপি পূর্ণিমা কান্নার মতো সুরে বলে, তোমার কুমকুমকে একটিবার দেখতে ইচ্ছে করছে। একটুকু কোলে নেবো।

কুমকুম তোমারই তো। কথা দাও তুমি, তবে নিয়ে আসি। একবার কুমকুম মা হারিয়েছিল, আবার মা হারাবে না—এই কথাটা বলো তুমি আমায়।

পাছে তারও চোখে জল এসে পড়ে—শিশির দ্রুতপায়ে বেরিয়ে এলো। তাপসকে বলে, নব-বীরপাড়া যাব। কুমকুমকে আনতে গ...।

তারপর কম্পিত কণ্ঠে বলে, ডাক্তার-নার্স সবাই বলছেন ভালো ও কেন বলে, বাঁচবে না?

অণিমা প্রশ্ন করে: কুমকুম কে?

সেদিন যাকে দেখলেন। ঠিকই ধরেছিলেন দিদি—আমার মুখের আদল, আমারই মেয়ে। পূর্ণিমাও ঠিক পরিচয় দিয়েছিল, মেয়ে তারও।

তাপসকে বলে, চলুন। মেয়ে এনে কোলে না দিলে ওকে বাঁচানো যাবে না।

সকালবেলা দুঃসংবাদ পেয়েই তাপস চলে এসেছিল, ড্রাইভার তখনো এসে পৌঁছয়

নি।—নিজে চালাচ্ছে গাড়ি। শিশিরকে নিয়ে ছুটল এখন নব-বীরপাড়ায়।

শুধু কুমকুম নয়, বৃদ্ধ অবিনাশ মজুমদারও এসে পড়লেন।

অবিনাশ বলেন, আমায় তুই চিনিস নে মা—

হাসিমুখে পূর্ণিমা প্রতিবাদ করে: চিনি বই কি! আপনি মামা।

দেখেছিস?

না দেখলেও চিনি। আপনাদের কি দেখে চিনতে হয় মামা?

অবিনাশ বলেন, আমিও চিনি তোকে। শিশিরের কাছে শুনেছি। আর, আজ এই আসতে আসতে তাপসের কাছে শুনলাম। এত বজ্জাতি কেন রে বেটি? শুনলাম, মরতে যাচ্ছিলি। ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ, এত লড়াই করে এসে তোর মতন মেয়ে হার মানবি শেষকালে! আমার উপরেও কত রকমের অত্যাচার হয়েছে—আমার তবে তো বিশ-পঁচিশ বার মরা উচিত ছিল। বাঁচতে বাঁচতে কত বুড়ো হয়ে গেলাম, এখনো তবু মরতে চাই নে।

কুমকুমকে জড়িয়ে ধরে পূর্ণিমা মৃদু মৃদু হাসে: মরতে যাই নি আমি, সকলে ভুল জেনে বসে আছেন। যত গণ্ডগোল এই দুষ্টু মেয়েটা নিয়ে। এসে এসে পালিয়ে যায়, কী করব আমি তখন—পিল খেয়ে খেয়ে আবার ওকে ধরে আনি। দোষ যদি কারো থাকে, সে আমার কুমকুমের।

কিন্তু এ সমস্ত মুখে ফুটে বলা চলে না। মেয়েকে একেবারে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে পূর্ণিমা বলল, না মামা, মরব না। কুমকুমকে ছেড়ে মরি কেমন করে? কী রকম বজ্জাত দেখুন, কেমন এসে মুখ লুকিয়েছে।

অবিনাশ বলেন, শুধু বুঝি কুমকুম? একচোখো মা তুই—আমি এই বুড়ো-ছেলেটা কেউ হলাম না বুঝি। তোর বুড়ি মামীমা ঘরদোর সাজিয়ে হা-পিত্যেশ করে আছে। বীরপাড়াব লাঞ্ছিত পুরুষ-মেয়েবা আছে। মরে গেলেই হল!

মেঘ কেটে গিয়েছে। উল্লাসে তাপস এবাব শিশিবেব উপর টিপ্পনী কাটে: দেখলেন তো সবার নাম করলেন মামা, আপনি কেবল বাদ।

অবিনাশ বলেন, বাদই তো। লেখাপড়া জানা আকাট মুখ্যু কোথাকার! আমার মা'কে কষ্ট দিয়েছে। এই ক'দিন উঠতে বসতে ওকে বকাবকি করছি, মেয়ে নিয়ে একা একা এলি তুই কোন বিবেচনায়! আজেবাজে কৈফিয়ত দিল। কি বলিস মা, ও মিথ্যুককে কখনো আমরা দলে নিচ্ছি নে।

শিশির বলে, তবে আমি দেশেই ফিরে যাই।

তা কেন অফিসে যেমন চাকরি-বাকরি করছিস, তাই করে যা। রোজগার করে টাকা এনে দিবি - আমরা খরচ করব।

পূর্ণিমার মুখে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে অবিনাশ কী যেন পড়ে নিলেন! গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, এত সাহস আর আত্মপ্রত্যয় নিয়ে মা আমার অফিসের কেরানি হতে আসে নি। মা-ছেলে দুয়েরই আমাদের এক ব্রত। এবারটা হার হয়েছে—হার মেনে চুপ করে থাকব না। সকলের মনে মনে আগুন ধরিয়ে দেবো। বাড়ি ফিরে যাব আমরা—আমাদের চিরকালের ঘরবাড়ি। রাজনীতির চক্রান্তে নির্বাসন ঘটিয়েছে। যেখান থেকে। ঠিক তেমনি বাড়ি ছেড়ে যারা এপার থেকে পালিয়ে চলে গেছে তারাও সব ফিরে আসবে।

মেয়ে কোলে নিয়ে পূর্ণিমা উঠে দাঁড়ায়। পা টলমল করছে, আলুথালু বেশ।

চোখের কোণে অশ্রুরেখা শুকিয়ে আছে। নার্স হাঁ-হাঁ করে ওঠে : কী হচ্ছে! উঠে পড়লেন কেন?

পূর্ণিমা বলে, বাধা দেবেন না। মামাকে আমি প্রণাম করব।

অবিনাশ বলেন, আচ্ছা মেয়ে তো, মনে মনে বুঝি প্রণাম হয় না?

না মামা সকলের বেলা হয় না। বিষম জেদি আমি—তাপসের মুখে কিছু কি আর শোনেন নি! রোখ চাপলে কারো মানা শুনি নে—

হেসে নির্ভর করে পূর্ণিমা : আমি সেরে গেছি, সেরে দিয়েছে সেই মেয়ে। জানেন না মামা, কুমকুমের হাতে মন্তোর। হাত বুলিয়ে একদিন মাথাধরা সেরে দিয়েছিল, আজ আমায় মরণের মুখ থেকে ফেরত নিয়ে এলো।

দুর্বল পায়ে টলতে টলতে এসে পূর্ণিমা অবিনাশের পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করল।

অবিনাশ মাথার উপর বাঁ-হাত রাখলেন। বললেন, কিছু মনে করিস নে মা, বাঁ-হাত দিয়ে আশীর্বাদ করছি। ডান হাত আমার নেই।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে পূর্ণিমা তাকিয়ে পড়ে : সে কি মামা?

গায়ের চাদরটা সরিয়ে দিলেন অবিনাশ।

হেসে বললেন, চারটে আঙুলে বৃটিশ-সিংহ চিবিয়েছিল, গোটা হাতখানা দেশি হাঙরে খেয়ে নিয়েছে। খেয়ে আর কী করল মা! বুকের নিচে ধুকধুকানিটুকু থাকতে কেউ আমায় জব্দ করতে পারবে না।